প্রভাত-সূর্য্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

আলোর ফোয়ারা উঠে আকাশ ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দমকলের গাড়িগুলো যেমন করে পাঁচ-সাততলা বাড়িতে জল ছিটোয় অবিকল সেই ভাবে আলোর ধারা যেন কারা আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে। চারদিক থেকে এই আলোর গোল ধারা উঠে কাটাকুটি হয়ে আকাশের একটা কোণ যখন দিনের মতন ফরসা তখন আচমকা যেন সাইরেনের শব্দটা শুনতে পেল বাসু। শুনেও অনেক মুহূর্ত কেমন অবশ অনড়ভাবে পড়ে থাকল। তারপর প্রায় পলকেই তার মনে পড়ে গেল এ আর পি-পোস্টে সে শুয়ে আছে। আর এই চেতনা তাকে চমকে দিল। বিমূঢ় অথচ ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে বসল বাসু।

মাথার ওপর টুপি পরানো মিটমিটে বাতিটা জ্বলছে। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। টেবিলের ওপর টেলিফোনটা পড়ে আছে। নন্দী ঘুমোচ্ছে।

সাইরেনের শব্দ আর শুনতে পাচ্ছিল না বাসু। যেন তার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গেছে।

অস্পষ্ট অস্ফুট গলায় নন্দীকে একবার ডাকল বাসু। টেবিলের পাশে দুটো বেঞ্চি জোড়া করে নিয়ে নন্দী ঘুমোচ্ছে। তার মামুলি বিছানা, সেই ময়লা কালো সতরঞ্চির পাশগুলো ঝুলে আছে, একটা বুঝি শ্মশানে কিংবা আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া তোশকের মতন তোশক, এ আর পি-র খাতা আর মেসেজ রিপোর্টের প্যাড দিয়ে তৈরী করা বালিশ। নীল প্যাণ্ট শার্ট, নীল সোয়েটার—এ আর পি-র পুরো পোশাক পরে ছেঁড়া কাঁথাটার ওপর কয়করে একটা গরম চাদর চাপিয়ে নিয়ে নন্দী ঘুমোচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা।

এই চারপাশ বন্ধ ঘরের মধ্যে আলোর ফোয়ারা কোথা থেকে দেখল সে, আকাশ কোথায়? যদি সাইরেন বাজত, এত সহজে কি থেমে যেত! সেই আতঙ্কিত আর্ত তীক্ষ্ণ ডাকটা এত সহজে থামে না। গোটা

কলকাতার হয়ে ব্যাকুল ত্রস্ত অসহায় শব্দটা পথে-ঘাটে অলিগলি আকাশ-বাতাসে ছোটাছুটি করে পাগলের মতন। এক প্রদীপের আগুন থেকে যেমন অন্য প্রদীপ জালিয়ে নেয় মানুষ, তেমনি এক এলাকার আচমকা ভীত প্রাণান্ত চিৎকার অন্য এলাকাকে সচকিত করে তোলে—প্রায় পলকে অন্য এলাকার গলায় ভীত আর্তনাদের ছোঁয়া লেগে যায়।

স্বপ্ন! বাসু বুঝতে পারল, সে স্বপ্ন দেখছিল।

বোকার মতন খানিকক্ষণ বসে থাকল বাসু; হাই তুলল, চোখ রগড়াল তারপর ভাল করে ঘরটা একবার দেখে নিল। কিছুদিন আগে ডিসেম্বরের শীতের দুপুরে যে-ভাবে দুমদাম বোমা পড়ে গেল—বাসু একবার অন্যমনস্ক ভাবে সে-কথা ভাবল।

মাথার ওপর চাপা অন্ধকার ছাদ, ডান দিকে দেওয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে স্টিরাপ-পাম্প বালতি কয়েকটা রাখা আছে, লোহার টুপি দুটো দেওয়ালে ঝুলছে। একপাশে একটা কাঠের সিঁড়ি। টেবিলের পাশে জোড়া বেঞ্চিতে নন্দীটা টেনে ঘুমোচ্ছে। বাসুর কেন যেন একটু রাগ হল নন্দীর ওপর। বাজে স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গেল তার অথচ নন্দীটা মড়ার মতন ঘুমোচ্ছে। শালাকে ডেকে দিলে কেমন হয়!

খুব শীত। বাসুর শীত করছিল। ভেজানো কনকনে গামছা যেন কেউ তার গায় জড়িয়ে রেখেছে। এই শীতে বাড়ি থেকে আনার মতন গরম কিছু-ছু নেই। তার ছেঁড়া তুলো-ওঠা লেপটা বয়ে আনবে! তা হয় না। বাবার পুরোনো গরম ছেঁড়া শালটা এদিক ওদিক কেটে সেলাই করে দিদি বাড়িতে গায়ে জড়ায়। মা একটা কাঁথা দিয়েছে—সেই কাঁথাই সম্বল। বাসুকেও নন্দীর মতন সোয়েটার পরে এ আর পি-র জামা প্যান্ট এঁটে ঘুমোতে হয়। বাসুর একটা মাফলার আছে। শোবার সময় বেশ করে মাথা গাল গলা জড়িয়ে নেয়, কিন্তু মাঝরাতে কখন যে ঘুমের ঘোরে খুলে ফেলে বুঝতে পারে না। ভোরে উঠে দেখে মাফলারটা মাটিতে পড়ে আছে।

এ আর-পি পোস্টে এই শীতকালটা রাত কাটানো যায় না। ঘরটা ছোট্ট

কিন্তু মাঠের একেবারে কোণায় পড়েছে, লম্বা লম্বা কটা গাছ আশে পাশে— শীত আর বাতাস যেন ঘরটাকে ফাঁকায় পেয়ে চেপে ধরে। তাও যদি একটা বিছানা থাকত। নন্দীটার এদিক থেকে মজা, শালার ঘর বাড়ি নেই বলে বিছানাটাও এই ঘরের আলমারির মাথার ওপর তোলা থাকে। যেমনই বিছানা হোক, তবু ত বিছানা। গায়ের তলায় একটা কিছু পাততে পারে।

শীত করছিল বলে বাসু জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিল, মাফলারে ভাল করে মাথা জড়িয়ে কান গলা ঢেকে নিল। নন্দী দুটো বেঞ্চি নেয় বলে বাসু একটা বেঞ্চি এবং মাথার দিকে একটা চেয়ার নিয়ে শোয়। বেঞ্চিটা আবার পলকা। কাল নন্দীকে এই বেঞ্চিটা ঠেলে দেবে। কাল—: বাসুর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কাল আর তার নাইট ডিউটি নেই। কথাটা ভাবতেই বেশ একটু আরাম লাগল।

পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা সিগারেটের প্যাকেট বের করল বাসু। পাসিংশো একটা আছে এখনও, গোটা পাঁচেক বিড়ি। বিড়িটা কড়া হবে ভেবে এবং এই ভীষণ শীতে একটু গরম হওয়া যাবে মনে করে একটা বিড়িই ধরিয়ে নিল বাসু। শুকনো গলায় বিড়ির কড়া তামাকের ধোঁয়া আলজিবের কাছটায় যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল। দমকা কাশি এল বাসুর। এক নাগাড়ে খানিক কাশল। টাগরা[illegible] জ্বালা করছিল। তা করুক, বিষে বিষক্ষয়; বাসু জেদ করেই প্রথমে কয়েকটা আস্তে আস্তে টান মেরে দমটা সামলে নিয়ে পরে জোর জোর টান মারতে লাগল।

বাইরে কাক ডেকে উঠল। জানলার দিকে তাকাল বাসু। দু পাট শার্সি, বন্ধ; বাইরের দিকের খড়খড়ি—সেটাও বন্ধ। শার্সির গায়ে গুণ চিহ্নের মতন আঠা-কাগজ আঁটা। দেখলেই মনে হয় কাচের গায়েও যেন ঘা হয়েছে। উমার গালে একটা ফোড়া হয়েছিল, ওদের সেই ডাক্তারটা ছুরি চালিয়ে কেটে গালে ঠিক এমনি করে কী যেন সেঁটে দিয়েছে। ওই গাল নিয়ে বেগুন গাছটার কী লজ্জা! বাসুকে দেখলেই গালে আঁচল চেপে ধরে।

বিড়ির এক গাল ঘন ধোঁয়া লোহার টুপির দিকে উড়িয়ে দিয়ে বাসু কেন

যেন আচমকা ভাবল, উমার মাথায় ওই রকম একটা টুপি পরিয়ে দিলে বেশ হয়। মেয়েটার আর সব আজকাল লোহা লোহা হয়ে গেছে। মাইরি!… আরও একবার কাকের কা কা শুনল বাসু, বিড়ির তেতো তেতো ধোঁয়া টানল, এবং উমাকে যেন দেখতে পাচ্ছে এমন ভাবে একটু রসাল হাসি হাসল। সেই সেদিনের পর থেকে উমা আর কথা বলে না তার সঙ্গে। বাসুকে দেখলেই শক্ত হয়ে যায়, তাকায় না মুখের দিকে। একেবারে লোহা মেরে যায়। ওপরে হয়ত মা কি আরতি বা দিদির সঙ্গে গল্প করছে, বাসু আচমকা এসে পড়ল, পাগলী সঙ্গে সঙ্গে গুম মেরে গেল, কাঠ হয়ে গেল, তারপর যে কোনো একটা ছুতো করে নীচে চলে যাবে।

শীতের দাপটে হাত পা কনকন করছিল বাসুর। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা। গায়ে কাঁথাটা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বাসু একবার ভাবল, ভাঙা ঘুম আবার করে জোড়া দিয়ে নেয়। কিন্তু বাইরে এমন করে কাক ডাকছে এখন যে মনে হয় ভোর হয়ে গেছে। কাল ঘুমটা জোর হয়েছিল, প্রথম রাতট বেহুঁশের মতন কেটেছে, এখন আর ঘুমের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হাসান সাহেবের বাড়ি থেকে শিশি ভর্তি করে ধেনো মাল নিয়ে এসেছিল নন্দী। পোস্টে বসে দু'জনে খানিকটা করে খেয়েছে। খেয়ে গা মাথা বেশ গরম হয়ে গিয়েছিল। ঘুমটাও জমেছিল ভাল।

বাসু স্টিরাপ-পাম্প আর বালতিগুলোর দিকে তাকাল। শিশিটা বালতির মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে নন্দী। শালা খুব হুঁশিয়ার। ওষুধের দাগ কাটা একটা রঙীন কাচের শিশি জুটিয়ে নিয়েছে কোথা থেকে, প্রায় রোজই খানিকটা করে মাল জোগাড় করে নেয় মাগনিতে. রাত্রে পোস্টে এসে খায়। বলে, যা শীত—জামা কাপড় নেই মালেই যেটুকু গরম লাগিয়ে নি··। আসলে নন্দীটা আজকাল মাল-সাপ্লায়ার হয়ে উঠেছে। ও শালার নানান ফিকির। কটা খদ্দের জোগাড় করেছে—কোথা থেকে পড়তি মাল জোগাড় করে বেচে। টু পাইস হয় আর কি!…কাল হাসানসাহেবকে খানিকটা ভাল জোগাড় করে দিয়েছিল, তার বদলি হাসান সাহেবের ধেনো মাল নিয়ে এসেছিল।

নন্দীর চাকরিটা যদি যায়—এই জন্যেই যাবে। দোআশলা এস. ও-টা

ফিকিরে আছে। একদিন রাত্রে এসে মালের মুখে নন্দীকে ধরতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না। তাড়াবে। নন্দীর সঙ্গে সঙ্গে বাসুও যাবে। এই শীতের রাতে নেহাত এস. ও রাত্রে টহল মারতে বেরোয় না তাই রক্ষে।

স্কুলের মাঠ ভরে কাক ডাকতে শুরু করেছে। গাছের মাথায় রকমারি পাখিগুলো ঘুম ভেঙে সমস্বরে কলরব করছে। ভোর যে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু চারপাশ বন্ধ ঘরে ভোর বোঝবার উপায়ই নেই।

বাসু উঠল। বেঞ্চিটা মচ্ করে একবার কাতরে উঠেছিল। টেবিলের ডানপাশে ছোট একটু র‍্যাকের মতন, তার মাথায় পেরেক পুঁতে ডিউটি রোস্টার ঝোলান রয়েছে, র‍্যাকের তাক কটায় অফিসের কিছু কাগজপত্র। রেশান স্লিপের কটা বই ; মাঝের তাকে এলার্ম ঘড়িটা টিকটিক করে বেজে চলেছে। এই শব্দ অন্য কোনো সময় কানে আসে না।

ঘড়ি দেখল বাসু। ছ'টা প্রায় বাজে। তবে ত ভোর হয়ে গেছে।

বাসু গায়ের কাঁথা টেবিলের ওপর রেখে দরজার কাছে গেল ; ছিটকিনি খুলে ভেতর দিকে টান মারল।

দরজা খুলে যেতেই শীতের প্রত্যুষ যেন তার সাদা ভেজা কনকনে শরীরের ঝাপটা দিয়ে ঘরের গোড়ায় পা বাড়িয়ে দিল। বাসু একটু দাঁড়িয়ে থেকে কেঁপে উঠল। গা হাত পা কাঁটা দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

স্কুলের মাঠটা ঘন কুয়াশায় ভরা। যেন মাটির তলা থেকে ধোঁয়া উঠে চারপাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্কুলের বড় ফটকটা দেখা যাচ্ছিল না, উঁচু কম্পাউণ্ড ওআলের কোথাও কোথাও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল ; গাছের গুঁড়িগুলো যেন কেউ মুছে দিয়েছে, ডালপালা ছড়ানো মস্ত মস্ত মাথাগুলো কুয়াশার ওপর চাপ চাপ ধোঁয়া মেখে ভাসছে মনে হচ্ছিল। সকালটা একেবারে সাদা—ছিটেফোঁটা দাগও কোথাও ধরে নি।

মাথায় গলায় জড়ানো মাফলার ভালো করে বেঁধে দু হাত বুকের কাছে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাসু স্কুলের পেচ্ছাপখানার দিকে চলে গেল।

ঠিক যেন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মোরমের পথটুকু ভিজে সিমেন্টের

বাঁধানো চাতালও ভেজা, পেচ্ছাপখানার ঢাকা শেডের মধ্যেও কী শীত, কলের মুখে হাত দেওয়া যায় না, কনকন করছে।

হাত যেন ঠাণ্ডায় কেটে গেল। বরফের মতন কনকনে। কোনো রকমে দু চার ঝাপটা জল দিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে নিল বাসু। তারপর প্যান্টে হাত ঘষতে ঘষতে ফিরল।

নন্দী আরও কুঁকড়ে মাথা মুখ ঢেকে ঘুমোচ্ছে। একটা মড়াকে ঢেকে রাখলে ঠিক এই রকম দেখায়।

হাত দুটো অসাড় লাগছিল ভীষণ। অত ঠাণ্ডা জল মুখে দিয়ে দাঁতগুলো ব্যথা করছে, কাঁপুনিটা আরও যেন বেড়ে গেছে। একটু আগুন পুইয়ে নিলে মন্দ হয় না।

এ আর পি মেসেজ রিপোর্টের আধখানা প্যাড ছিঁড়ে বেশ করে ছাড়িয়ে ফেলল বাসু। পাতাগুলো আলতো করে পাকিয়ে এক একটা বলের মতন করল। স্টিরাপ-পাম্প সরিয়ে বালতি নিল। বেঞ্চে বসে—পায়ের কাছে বালতি নিয়ে বালতির মধ্যে কাগজ রেখে আগুন ধরিয়ে দিল।

আগুন পোয়ানোর এই সহজ কায়দাটা নন্দী তাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

আগুনের তাতে হাত বেশ গরম হয়ে গিয়েছিল বাসুর। বালতি তেতে ওঠায় পায়েও খানিকটা তাত পাচ্ছিল। মাফলার খুলে ফেলে ওটাও আগুনে তেতে নিয়ে আবার বেশ করে মাথা কান গলা জড়িয়ে নিল।

ছাই সমেত বালতি রাখা উচিত না। কোন দিন কার চোখে পড়বে, মেসেজ রিপোর্টের আধপোড়া কাগজ যদি দেখতে পায় চুগলি কাটতে শুরু করবে। এমনিতেই ত বাসুদের ওপর এস. ও শালার আজকাল নজর খারাপ। হাসানসাহেবের দলের লোক ভাবে ওদের।

বালতি সমেত বাসু উঠে দাঁড়াল—বাইরে গিয়ে বাঁ দিকে, মাঠে, জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিল। কালো ছাইয়ের হালকা টুকরো কিছু মাটির গায়ে গায়ে উড়তে লাগল।

সূর্য উঠছে। নিরুজ্জ্বল কিরণ শীতের আকাশকে একটু যেন লাল করেছে।

ঘরে ঢুকে বালতি রেখে বাসু প্যান্টের বোতামটা ঠিক করে নিল। জুতোর ফিতে বাঁধল।

'নন্দী···এই নন্দী—!'

নন্দীর কোনো সাড়া নেই। বাসুর ঠেলা খেয়ে পাশ ফিরে আরও কুঁকড়ে ঘুমোতে লাগল।

কি একটু ভাবল বাসু। নন্দীকে জব্দ করার মতলব নিয়ে হাসল। রাজা বাদশার মতন তোমার এই ঘুম কতক্ষণ থাকে শালা দেখছি। এলার্ম ঘড়িটা র‍্যাক থেকে নিয়ে এলার্মের চাবি দিল বাসু।

স্কুলের মাঠ সারা রাতের হিমে ভিজে জল হয়ে রয়েছে। ঘাসের ওপর জলবিন্দু অভ্রের কুচির মতন দেখাচ্ছিল। মাটিও ভেজা। কুয়াশা চারপাশে পাতলা ধোঁয়ার মতন ভেসে যাচ্ছিল। আকাশের মাথায় রোদের রঙ দেখতে পেল বাসু।

আধখানা মাঠ পেরিয়ে এসে বাসুর মনে হল, স্কুলের ছোট গেট দিয়ে গেলেই হত। এতক্ষণে নিশ্চয় গেটটা খুলে দিয়েছে দারোয়ান। সবাই ত আর নন্দী নয়। নন্দীর কথায় ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পোস্টের দিকে তাকাল বাসু। নন্দীর কানের কাছে এলার্মটা ঠিক সময়ে বাজবে। ততক্ষণে বাসু হালদার লেনের চায়ের দোকানে। নন্দীটা আজ যা খচে যাবে!

মাঠে ভোরের শীত বাসুকে বেশ কাঁপিয়ে তুলছিল। কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে নিলে হয়। কী আছে, এ ত তারই পাড়া। পিঠের কাছে অল্প একটু পাটা খুলে হাঁটতে লাগল বাসু। কাঁথাটা একেবারে রদ্দি, অ্যায়সা ময়লা হয়েছে যে বাচ্চাদের পেচ্ছাপের কাঁথার মতন দেখায়। খৈনি পাতার মতন রঙ হয়ে গেছে। তার ওপর মার ছেঁড়া কাপড়ের কত যে তাপ্পি-তুপ্পি।

একটা গরম কোট কিনতে পারলে বেশ হত। গৌরাঙ্গ একটা কিনেছে। পুরো দাম দিয়ে নয়, চাঁদনি চক থেকে ঝড়তি-পড়তি মালের একটা কিনেছে শালা। একেবারে নতুনের মতন। রঙটাও জব্বর, গাঢ় খয়েরী। গৌরাঙ্গর এখন অনেক টাকা। বিশ পঁচিশ সে অনায়াসে বের করে দিতে পারে।

ফলস্ স্ট্যাম্প ঝেড়ে বেটা কেমন দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। এখন আবার রেজকির ব্যবসা করছে। বাজারে রেজকির বড় টান। চায়ের দোকান মুদির দোকান থেকে বাড়ি বাড়ি রেজকির খাই। গৌরাঙ্গর কী কপাল— এমন জায়গায় চাকরি করে যেখানে রেজকির আড়ত। দশ টাকার রেজকিতে এক সিকি করে তার পকেটে আসে। তা দিনে কম করেও টাকা দেড়েক ও বেটা শুধু রেজকি সাপ্লাই করেই কামায়। ··লাগলে কপাল এমনি করেই লাগে। গৌরাঙ্গর লেগে গেছে। শালার ফাল্গুন মাসে বিয়ে হবে। শীতটা বেহাত হয়ে গেল।

গলিতে জল। এইমাত্র হোস পাইপে করে জল ছুঁড়ে গেছে। গঙ্গাজলের পাইপের মুখে এখনও ঘোলাটে জল বকবক করে উথলোচ্ছে। উড়ে আর হিন্দুস্থানী বস্তিতে উনুন ধরানো চলেছে—তার ধোঁয়া গলিতে চাপ চাপ হয়ে কুয়াশাকে যেন আরও ভারী করে তুলছিল। গঙ্গাজলের প্যাচ খুলে থালা মাজছে দাঁতন করছে দু একজন। কাঠঅলার দোকানের সামনে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে, শীতে হি হি করে কাঁপছে, কাঠ কিনতে এসেছে বেচারী। বাসুর কেন যেন একটু মায়া হল বাচ্চাটার ওপর। রোগা টিঙ-টিঙে চেহারা, গায়ে বুঝি তার মার ছেঁড়া শাড়ির খানিকটা দোলুই করে বাঁধা. খালি পা। ছেলেটা এ-পাড়ার ; বাসু চেনে না, মুখ দেখেছে।

কাঠঅলার পাত্তা নেই। সে বান্চোত নিশ্চয় চালার মধ্যে আগুন পোয়াচ্ছে মাগের সঙ্গে।

বাসুর মেজাজটা এই ভোরে এত ঠাণ্ডাতেও চট করে একটু গরম হয়ে উঠল।

কাঠঅলার দোকানের চার ধাপ ভাঙা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বাসু খোলা দরজার দিকে চেয়ে একবার হাঁক দিল। কোনো সাড়া শব্দ নেই। অথচ খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে মানুষ আছে বোঝা যাচ্ছিল, ধোঁয়া আসছিল অল্প অল্প।

সামনেই চেলা কাঠের থাক সাজানো। দাড়িপাল্লার টিকিটা চালায় ঝুলছে।

বাসু সিঁড়ি টপকে কাঠের গাদা থেকে কিছু কাঠ তুলে নিল।

'নে রে, নিয়ে যা—।' ছেলেটাকে কাঠ এগিয়ে দিল বাসু।

বাচ্চাটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। শীতে বেটা কাঁপছে, ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুলেছে, নাক ভর্তি সর্দি ; ফ্যালফ্যাল করে বাসুর দিকে চেয়ে থাকল।

'ক্যাবলার মতন দেখছিস কি—।' বাসু ধমক দিল, 'লে বে—লিয়ে কেটে পড়।'

ছেলেটা ভয়ে হোক কি ঘাবড়ে গিয়েই হোক কাঠ নিল। সব কাঠ নয়। তার সাধ্য মত। সেরখানেক হবে বোধ হয়। কাঠ নিয়ে তার মুঠো খুলে ধরল, মুঠোয় পয়সা। বুকের ওপর জড় করা কাঠ থাকার দরুণ মুঠো খোলা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

পয়সাটা নেবে কি নেবে না করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে নিল বাসু।

কাঠঅলা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। প্রায় চেঁচাতে যাচ্ছিল, বাসুর চোখে চোখ পড়তেই লোকটা থতমত খেয়ে গেল। ভুট কম্বলে মাথা গা জড়ানো, পায়ে খড়ম ; কান জড়িয়ে কপাল ঘিরে গামছা বাঁধা। লোকটার চোখে আর্ত ইতর আক্রোশ, মুখের ভাবটাও সুবিধের নয়—তবু লোকটা বাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না।

পারবে না, বাসু জানত। এই সব ছাতুখোর-টোরগুলো আজকাল বাসুদের খুব কেনা। রেশন স্লিপ ভর্তি করার সময় বেটাদের কাছ থেকে পয়সাও নিয়েছে বাসুরা, দু একটা নামও বাড়িয়ে দিয়েছে। এনকোয়ারি ত নামমাত্র, বাসুদের মুখের কথাতেই সব ; বেশী হল্লা করেছ ত ম্যাক্ দিয়ে দেব। জেলের ভয় আছে না।

'ক্যয়া···বহুত জাড়া হায় ? ফজির নেহি হোতা হ্যায় তোমারা ?' বাসু লাটবেলাটের মেজাজ নিয়ে বলল।

'নাহি বাবু, আভি ত···' লোকটা তার খুচরো কাঠ নজর করে দেখছিল, কতটা কাঠ তার এই ভোরে লোকসান হল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল বাসু। বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করল না। 'হামারা আদমি হ্যায়, থোড়া লাকড়ি দে দিয়া···'

লোকটা নিরুত্তর। বাসু এগিয়ে গেল। খানিকটা দূরে যেতেই কাঠঅলা বাসুর দিকে ঘৃণার চোখে চেয়ে চেয়ে বলল, 'শালা চুতিয়া বাঙ্গালী...'

শীতের দিন সকালে বউবাজারের এই গলিগুলো কেমন যেন ভাড়াটে বাড়ির এজমালি কলতলার মতন দেখায়। ভেজা, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে; সারা রাতের বাসি নোঙরা আবর্জনায় ভরা। সমস্ত রাত ধরে বুড়োহাবড়া বাড়িগুলো যত হিম খায় সব যেন সকালে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গলিতে নেমে আসে। সরু সরু গলিগুলো নালির মতন সেই ঠাণ্ডা বয়ে নিয়ে বড় রাস্তায় উপচে দেয়। এখানে রোদের ফোঁটা পড়তে সেই বেলা ন'টা দশটা—যখন কি-না ট্রাম লাইনের রাস্তা শীতের রোদেও আর পিঠ রাখতে পারছে না। কার সাধ্য সকালে এই গলিতে দাঁড়িয়ে বোঝে মাথার ওপর সূর্য বলে কিছু আছে।

বাসু হালদার লেনের মোড়ে পীতাম্বরের চায়ের দোকানে এসে বসল।

পীতাম্বরের দোকানই কাছাকাছির মধ্যে সব চেয়ে আগে ভাগে খোলে। দোকানটা ছোট। খানতিনেক বেঞ্চি আর দেওয়াল সাঁটা সরু তক্তা। এক কোণে দরজা ঘেঁষে পীতাম্বর একটা নড়বড়ে চেয়ার আর কেরাসিন কাঠের দু হাত টেবিল নিয়ে বসে থাকে। টেবিলের ওপর গোটা তিনেক কাচের জারে সস্তা বিস্কুট।

পীতাম্বরের চায়ের দোকানে ছুটকো খদ্দের এর মধ্যেই জুটে গিয়েছিল। এনামেল কি কাচের গ্লাস হাতে কাছাকাছি জায়গা থেকে লোক জুটেছে। ওর মধ্যে বিড়িঅলা রিকশঅলা খাটালের গয়লা থেকে ভদ্রবাড়ির চাকর -বাকরও আছে।

পীতাম্বর নিজেই চা তৈরী করছিল। দোকানের ছোকরাটা উনুনে তখনও হাওয়া মেরে চলেছে।

দোকানের ভেতরটা ফাঁকা। বাসু বেঞ্চের একপাশে কাঁথাটা রেখে দিয়ে সরাসরি উনুনের কাছে চলে গেল।

পীতাম্বর বাসুকে দেখেছে। ছুটকোগুলোকে বিদায় করে দিয়ে বাসুবাবুর

জন্যে বড় গ্লাসে চা তৈরী করে দেবে। এ-সব কথা বাসুবাবুর বলবার বা বোঝাবার কোনো দরকারই নেই।

উনুনের ওপর চায়ের জল গরমের ড্রামটা বসানো ছিল। তোলা উনুন, মুখ ছোট, আগুনের আঁচের কিছু মাত্র বাইরে আসছিল না। বাসু পা মুড়ে বসে উনুনের ফাঁকে ফোকরে হাত রেখে একটু তেতে নিচ্ছিল।

পীতাম্বর প্রথম দফার খদ্দের ক'টাকে বিদেয় করে দিয়ে বাসুকে বলল, 'নন্দীবাবু এলেন না?'

'ঘুমোচ্ছে।' বলেই বাসুর মনে পড়ল, এতক্ষণে নন্দী শালার এলার্মের চোটে ঘুম ভেঙে গিয়েছে ঠিক। আপন মনে একটু হাসল বাসু। 'কাল শীতটা যেন আরও জোর পড়েছে বাসুবাবু।' পীতাম্বর বাসুর জন্যে একটা বড় মতন গ্লাস গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিল। গরম জলে ধুয়ে নিলে চা অনেকক্ষণ গরম থাকবে।

'শীত!…ওরে শালা—' বাসু চোখ মুখের শিহরিত হবার ভঙ্গি করল, 'কাল একেবারে আলু আপ্ করে ছেড়ে দিয়েছে।'

পীতাম্বর কথাটা ঠিক বুঝল না। চা ঢালতে লাগল।

গলি দিয়ে একটা খালি রিকশা চলে গেল। আশেপাশে কোথাও দুটো কাক ডাকছে। অন্নদা পণ্ডিতমশাইয়ের ছোট ভাই গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। আজ কোনো কারবার আছে খলিফাটার। বাসুর হঠাৎ মনে হল, সে যদি পুজোরী বামন বনে যায়—কেমন হয়! আরে আমি ত ভট্চায বামুন, ঘণ্টা নাড়ার এক্তিয়ার আমার চেয়ে কার বেশী আছে!

নিজেকে অন্নদা পণ্ডিতের ছোট ভাইয়ের মতন কল্পনা করে নিতে গিয়ে বাসু হেসে ফেলল। আই ব্বাপ্… এই ভোরে গঙ্গা চান! দরকার নেই তার ঘণ্টা নাড়া বামুন হয়ে। হলে অবশ্য চালটা ধুতিটা টাকাটা পাওয়া যায়—রোজগারটা পাকা। কিন্তু না, বাসুর ও-সব পাকাপাকি রোজগারে কাজ নেই।

পীতাম্বর চায়ের গ্লাসটা নিয়ে দেওয়াল-গাঁথা তাকের ওপর রেখে দিল। 'আপনার চা বাসুবাবু।'

বাসু উনুনের পাশ থেকে উঠে বেঞ্চে এসে বসল। গ্লাসটা হাতে ধরতেই বেশ একটা মৌজ পেল। হাতের চেটো আর আঙুলগুলো গরম হয়ে গেল।

চা খেতে খেতে বাসু সামনে তাকিয়েছিল। হালদার লেনের এইখানটা কলের বেঁকানো জয়েন্টের মতন। পশ্চিম থেকে গলিটা ছুটে এসে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়েছে দোতলা বাড়িটার সঙ্গে, ধাক্কা খেয়েই উত্তরে চলে গেছে। বাঁকের মুখে দোতলা বাড়ির বাইরের রক ছুঁয়ে গ্যাসপোস্ট। গ্যাসের বাতিটা এখনও জ্বলছে। জ্বলছে যে সেটা এমনিতে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু কাচের গায়ে রঙই কর, ঠুলি এঁটে রাখো—বাসুরা ঠিক বুঝতে পারবে। এ আর পি-র চোখ।

দু হাতে মাঝে মাঝে গরম গ্লাসটা ধরে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল বাসু আর গলিটা দেখছিল। সিগারেট এবার ধরিয়ে নিয়েছে। চায়ের সঙ্গে গরম সিগারেটের ধোঁয়া আস্তে আস্তে শরীরটাকে বেশ জুত করে তুলছিল। একটু সর্দি মতন হয়েছে। বাড়ি গিয়ে আদা দিয়ে আর এক দফা চা খেলেই সর্দিটা কেটে যাবে।

পীতাম্বরের দোকানের সামনে সেই মেয়েটা এসে দাঁড়াল। হাতে সাদা কলাই করা গ্লাস; চা নিতে এসেছে। সকাল সন্ধ্যে দফায় দফায় মেয়েটা এই ভাবে আসে। কখনও চা নিয়ে যাচ্ছে, কখনও পান বিড়ি; মুদিখানা থেকে ডালটা তেলটা, বাজার থেকে তরিতরকারিও কিনে নিয়ে যেতে দেখেছে বাসু। মেয়েটা কোন জাতের, কোথা থেকে আমদানি হয়েছে কেউ জানে না। পীতাম্বর বলে, নেপালী।

চায়ে বড় করে চুমুক দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বাসু স্থির চোখে মেয়েটাকে দেখছিল। নেপালী হতেই পারে না। বাসু ভাবছিল, নেপালীরা এরকম হয় না। এমন ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, উঁচু ছোট নাক, ফোলা ফোলা গাল নেপালীরা চোদ্দপুরুষেও দেখে নি। মেয়েটা শাড়ি পরে ঘুরিয়ে খোট্টা-মেয়েদের মতন, বিনুনি পিঠে ঝোলায়—খড়ম পরে হাঁটে। বাসু লক্ষ্য করে দেখল, এই শীতে মেয়েটা একটা লেপের ফুলকাটা বাহারী ওয়াড় গায়ে দিয়ে এসেছে, বিনুনির তলায় ফিতের ফুল বাঁধা।

চা নিয়ে ঢুলে ঢুলে চলে গেল মেয়েটা। বাসু পিছন থেকে দেখল। মলঙ্গা লেনে এমন একটা গরম মাল কোথ থেকে চলে এল বাসু কিছুতেই বুঝতে পারল না। রাস্তায় মানুষ-জন, দোকানে পানঅলা বিড়িঅলা, সব বেটা একেবারে টনকে আছে। মেয়েটা সত্যি ফাসট্ কেলাস।

'কত নম্বরে থাকে ছুঁড়িটা, পীতাম্বর?' বাসু সিগারেটের শেষটুকু চুটিয়ে টেনে নিচ্ছিল।

'নম্বর ত জানিনা বাসুবাবু—কাঠের মিস্ত্রীদের বস্তির কাছে থাকে বোধ হয়।' পীতাম্বর বলল। নিজের জন্যে খানিকটা চা করে নিচ্ছিল ও।

একটু অন্যমনস্ক ভাবে গলির দিকে চেয়ে থেকে বাসু শুধলো, 'হিন্দীতে কথা বলে, না—?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' পীতাম্বর চা নিয়ে বাসুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, 'ওর বাপ আছে।'

'কোন্ বাপ?'

পীতাম্বর আচমকা এই প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেল।

'মেয়েটা দোআঁশলা।' বাসু বাকি চাটুকু খেয়ে ফেলল, 'চেহারায় বোঝা যায়। ওর আসল বাপ কিম্বা মা বাঙালী ছিল।' বাসু এত উঁচু জোর গলায় বলল যে, ব্যাপারটা যেন সে সবই জানে।

পীতাম্বর বেঞ্চে বসল। দু ঢোঁক চা খেয়ে বাসুর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকল, আবার চা খেল সামান্য, শেষে বলল, 'আজ থেকে তা হলে চালটাল পাচ্ছি বাসুবাবু?'

'উঁ—'

'বলছি, রেশান দোকান আজ থেকেই চালু হচ্ছে তবে?'

'আলবৎ···আজই ত একত্রিশে জানুয়ারী।'

পীতাম্বর চায়ের ঢোঁক সামলে অত্যন্ত সন্দিগ্ধের মতন বলল, 'এ গবরমেণ্টের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই, বাসুবাবু—' পীতাম্বর মাথা নাড়ল প্রবীণের মতন, ''সেই পুজো থেকে আজ-না-কাল কাল-না-পরশু শুনেই আসছি। ও না পাওয়া তক্ বিশ্বাস নেই।'

'তুমি কার্ড খাতায় লিখিয়ে নিয়েছ ?'

'নিয়েছি।'

'কোন দোকান ?'

'ওই মলঙ্গা লেনের মুখে—'

'তবে আর কি, আজ থেকেই পাবে।…খুব ভিড় হবে আগে ভাগে যেও।'

'লাইন !'

'লাইন ত বটেই। চাল আনবে লাইন দেবে না!' বাসু উঠে পড়ল। 'আমার কার্ডে তিন জন ত বাড়ানো আছে, বাসুবাবু—যদি কোনো ঝামেলা হয় ?' পীতাম্বর সামান্য ভয়ে ভয়ে বলল।

। হবে…' বাসু কাঁথাটা বগলে পুরে নিতে নিতে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'তোমার নামটাম আমি লিখেছি, ধরুক না কোন বাপের বেটা ধরবে।'

পীতাম্বর সাহস পেলেও কেমন একটা দ্বিধার মধ্যে ছিল। বলল, 'কাগজে বলছে, ভুয়ো কার্ড হলে তিন বছর জেল, তাই কেমন…'

'হ্যা-ত্, জেল—! অত সস্তা জেল দেওয়া।' বাসু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বলল, 'জেলে দিতে হলে—এ শালা গোটা বউবাজার পাড়াকে জেলে নিয়ে গিয়ে ঢুকোতে হবে। সব শালা দু চার পাঁচটা নাম বাড়িয়ে নিয়েছে।'

বাসু চলে যাচ্ছে দেখে পীতাম্বর তাড়াতাড়ি ওকে একটু ধরে রাখার চেষ্টা করল, 'একটা বিড়ি হোক বাসুবাবু।'

'বিড়ি না, দুটো সিগরেট্ তবে চট্ করে আনাও।' বাসু বেঞ্চে বসল না। কাঁথাটা রেখে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে লাগল।

পীতাম্বর দোকানের ছোকরাটাকে সিগারেট আনতে পাঠাল।

'হপ্তায় কতটা করে চাল দেবে, বাসুবাবু ?'

'আড়াই সের চাল, দেড় সের গম।'

পীতাম্বর মনে মনে কি ভাবছিল, হয়ত হিসেব করছিল এক সময় বলল, 'সাড়ে ছ আনা দরে চাল দেবে শুনছি, সাত আনা সের চিনি। কি আর লাভ হল, বাসুবাবু। আবার দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে।'

বাসুর কেন যেন মনে মনে এবার পীতাম্বরের ওপর রাগ হচ্ছিল। শালার একটা পেট আর ওই দোকানের ছোকরা—লোক গুনতিতে ফাউ তিনজনের নাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু শালার তৃপ্তি নেই। চাল আটা ত তুই ব্ল্যাকে ঝাড়বি, চিনিটা আড়াই ডবল দামে বেচে দিবি, আর গুড়ের জল দিয়ে চা খাওয়াবি।

'তোমার চায়ের দোকানের জন্যে আলাদা একটা চিনির পারমিট আছে না?' বাসু শুধলো।

'আছে—সে বাবু নামমাত্র। চিনি আমায় কিনতে হয়…'

বাসু কথাটা যেন শুনল না। সিগারেট নিয়ে ছোকরাটা দোকানে ঢুকেছিল। বাসু তার হাত থেকে দুটো সিগারেটই নিয়ে পকেটে পু-

কাঁথাটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে গলিতে নেমে গেল বাসু। ভদ্রবাড়ির এই জোয়ান সমর্থ ছেলেটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল পীতাম্বর।

গলি ঘুঁজি ঘুরে মদন বড়াল লেন দিয়ে বাসু শ্রীনাথ দাস লেনে এসে পড়ল। ডান দিকে শ্রীনাথ দাস লেন বেশ খানিকটা প্রস্থ চেহারা নিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে। এই গলিটায় রোদ এসেছে, রাস্তায় নামেনি ডান হাতি দোতলা তেতলা বাড়িগুলোর মাথা ছুঁয়েছে আলগোছে। বড় রাস্তার মোড়ে অবশ্য থিয়েটারের ফোকাশ মারার মতন খানিকটা রোদ গলিতে রাস্তায় লুটিয়ে আছে। ওখানটায় বাসু ছোট মতন একটা জটলা দেখল। এবং দেখেই বুঝতে পারল, পাঁচ সাতটা লোক ওখানে এরই মধ্যে রথ দেখা কলা বেচা শুরু করে দিয়েছে। রোদকে রোদও পোয়াচ্ছে, আর নতুন যে রেশন দোকান আজ খোলা হবে তার পথ চেয়ে বসে আছে।

গলি দিয়ে রিকশা যাচ্ছিল, দু চার জন যাওয়া আসা করছে, ঠিকে ঝি চাকর বাকর সকালের জল খাবার কিনে শালপাতার ঠোঙা হাতে ফিরছে, একটা ট্রাম চলে গেল। শীতের সকালে তার ঠং ঠং-য়ে শব্দটাও কেমন ভাঙা ফোঁপরা মনে হচ্ছিল, আর ট্রামটাকে যেন ছুটে ধরবার জন্যে একটা দু নম্বর বাস হর্ন মারতে মারতে বেরিয়ে গেল। বাসটার পেছন দিকে সেই জবড়জঙ্গ

যন্ত্রটা। কাঠকয়লার ধোঁয়া ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাসটা চলে গেলে ঠুনঠুনিয়ে একটা রিকশা শ্রীনাথ দাস লেনের মধ্যে ঢুকে এল।

বাসু ডান দিকে না বেঁকে সোজা হাঁটতে লাগল। ক'পা এগিয়েই ফটিক দে লেন। গলিটা কনকন করছে। বিকেলের মতন ছায়া চার পাশে। মাথা তুললে আকাশ দেখা যায়—লম্বা তরমুজের ফালির মতন আকাশ। রোদ আকাশের নীচে উড়ছে। এখানে তলায় ভেজা দুর্গন্ধ কনকনে চাপ গলি।

বাড়ির কাছাকাছি বলাইয়ের বড়দার সঙ্গে দেখা। ভাল্লুকের মতন সোয়েটার পরেছে গায়ে, পরনে লুঙ্গি, পায়ে ক্যাম্বিসের গোড়ালি ভাঙা জুতো চটি করে পরা, হাতে বাজারের থলে। নস্যিতে নাক ঠেসে চোখ জল জল করে বলাইয়ের বড়দা বাজারে যাচ্ছিল, মুখোমুখি হতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'অ্যা-ই যে, বাসু। আরে আজ থেকে রেশন চলছে না কি?' বলাইয়ের দাদা এমন ভাবে বলল কথাটা যেন বাসু রেশনের মালিক।

'দোকানের কাছে লোক জমে গেছে।' বাসু একটু হাসল।

'এ্যাঁ—এই ভোর থেকে।'

'লাইন ত!'

'ও!' বলাইয়ের দাদা গলা দিয়ে এমন এক মোটা শব্দ বের করল যে বাসুর মনে হল, ওর গলায় কেউ বাঁশ পুরে দিয়েছে। লুঙ্গিটা একেবারে কোমর পর্যন্ত তুলে নাক মুছে নিল। 'শাঁখটাক বাজাচ্ছে না কেউ?'

শাঁখ! বাসু অবাক হয়ে চেয়ে থাকল।

বলাইয়ের দাদা হাসিতে উথলে পড়ছিল। 'অ্যা—ই রে, নতুন বউ এলে বাড়িতে শাঁখ বাজে জানো না, আর পাড়ায় নতুন রেশান দোকান খুলছে আজ শাঁখ বাজবে না—!...'

বলাইয়ের দাদা ব্যাঙের মতন লাফাতে লাফাতে বাজার করতে চলল। খুব যেন আহ্লাদ হয়েছে লোকটার।

বাসুদের বাড়ির কাছে করপোরেশানের মেথর আর দু চাকাঅলা ময়লা-বওয়া ছোট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। গলিটা জলে সপসপ করছে। মেথর

নোঙরা কুড়োচ্ছিল। শীতে মরে যাওয়া একটা বেড়ালছানা একপাশে পড়ে আছে।

সদর খোলা। নীচের উঠোনে প্রথমেই উমার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। কলতলা থেকে ফিরছে বাসি কাপড় জামা ছেড়ে। মিলের শাড়িতে গা বুক জড়ানো শাড়ির কোঁচানো দু প্রান্ত কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে ঝুলছে। গায়ে জামা নেই। বাসু উমার গোটা হাত, খানিকটা পিঠ দেখতে পেল। উমার গালে সেই গুণচিহ্নের মতন লিউকোপ্লাস্ট। আজ আর গালে আঁচল চেপে ধরতে পারল না উমা। সময় পেল না। পলকে চোখ নামিয়ে ধড়মড় করে বারান্দায় উঠে গেল।

বাসু কেন যেন সিগারেটের ধোঁয়া টানার মতন করে একটা মজার হাসি তুলে গাল গোলালো, তারপর সিঁড়ি উঠতে উঠতে নীচে তাকিয়ে হাসিটাকে ধোঁয়া ছাড়ার মতন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে লাগল। পাগলি আজ জব্দ হয়ে গেছে।

দোতলায় উঠে বাসু বেশ অবাক। রান্নাঘরের দরজায় এখনও ছিটকিনি তোলা। বাইরে না মা না দিদি, আরতিকেও দেখতে পেল না।

বাসুর ঘরের দরজাটা খোলা। কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল—তার বিছানায় আরতি ছেড়া লেপ চাপা দিয়ে কুঁকড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হাতের কাঁথাটা বিছানায় একেবারে আরতির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল বাসু।

আচমকা মুখের ওপর কাঁথাটা এসে পড়ায়, ঝাপটা খেয়ে আরতি ধড়মড় করে উঠে বসল। এলোমেলো কাপড় গুছোতে গুছোতে বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থাকল।

'কি রে, বেলা পর্যন্ত যে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিস—" বাসু বিরক্ত উঁচু গলায় বলল।

আরতি পায়ের কাপড় গুছিয়ে তক্তপোশ থেকে নামতে নামতে হাই তুলল। 'দিদির জন্যে কাল সারারাত আমরা জেগে।'

'দিদি—' বাসু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল আরতির দিকে, 'কি হয়েছে দিদির?'

'ভীষণ জ্বর।' আরতি পিঠের ওপর থেকে আঁচলটা টেনে খুব ঘন করে বুকে জড়িয়ে শীতের কাতরতা ঢাকছিল। বলল, 'কাল সারারাত আমরা ঠায় বসে। হু হু করে কেমন জ্বর এসে গেল দিদির। তার ওপর কাশি। অমন কাশি আমরা দেখি নি, মনে হচ্ছিল দম আটকে মরে যাবে।' কালকের ভয়ঙ্কর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আরতি এখনও মুখচোখ ভীত করে তুলছিল।

বাসু শুনল। কোনো কথা বলল না। নিতান্ত মামুলি কথা শুনেছে যেন। জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

আরতি যেতে যেতে হঠাৎ বললে, 'গলার পরদা চিরে একটু রক্তও পড়েছে।'

বাসু চুপ। আরতি চলে গেল।

জুতো খোলা হয়ে গেলে বাসু ভাবছিল একটু বিছানায় গড়িয়ে নেবে নাকি। আরতি পাশের ঘরে গেছে। মা উঠবে, আগুন ধরবে, কাপড়-টাপড় কাচা হলে তবে চা জুটবে একটু। অনেক দেরী এখন।

পাশের ঘরে বড়মযীর গলা শোনা গেল। বাসু বিছানায় বসল।

'দাদা—'আরতি ডাকল, 'মা ডাকছে।'

ভোরবেলায় মা যে কোন কাঁদুনি গাইবে বাসু বুঝতে পারল না। বাসি মুখেই কি গালাগাল শুরু করবে? না কি মেয়ের দরদে উথলে কান্নাকাটি জুড়বে।

বিরক্ত অপ্রসন্ন মনে বাসু উঠে পড়ল। এই সংসারটা যা হয়েছে না, করপোরেশনের ময়লাটানা গাড়ি। যত না ময়লা টানে তার চেয়ে বিশগুণ শব্দ করে।

চৌকাঠ পেরিয়ে মার ঘরে ঢুকে বাসু থমকে দাঁড়ালো। মার তক্তপোশে আজ দিদি শুয়ে। মাথার দিকের জানলা বন্ধ। ঘর এখনও ঝাপসা। দিদির গায়ের ওপর যেখানে যত কাঁথা-টাথা ছিল সব চাপানো। মা দিদির মাথার কাছে পিঠ নুইয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উস্কোখুস্কো চুল, সারারাত জাগার পর একটু হয়ত গড়াচ্ছিল দিদির পাশে।

এই ঝাপসা ঘর, দিদির গায়ের ওপর জড়ানো যত রাজ্যের কাঁথা-কম্বল, মার উদ্ভ্রান্ত শুকনো চেহারা কেন যেন বাসুর ভাল লাগছিল না।

'বাড়িতে পা দিয়েই আবার টহল মারতে বেরিও না।' রত্নময়ী শুকনো কাঠ গলায় বললেন, 'টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখ, ডাক্তার ডাকতে হবে।'

মার গলার স্বর এমন গম্ভীর ঠাণ্ডা চাপা যে বাসুর মনে হল, বাবার অসুখের সময় ঠিক যেন এই রকম ভাবে কথা বলত মা। কথাটা মনে পড়তেই আচমকা বাসুর বুকে অদ্ভুত এক ভয়ের মুঠো যেন হাত খুলল, তারপর পাঁচটা আঙুল দিয়ে গা পা মাথা হাতের সাড়টুকু টেনে মুঠোয় টিপে ধরল।

দিদির মুখ বাসু দেখতে পাচ্ছিল না। কাঁথা-কম্বলে বালিশে মাথার চুলে সে মুখ আড়াল পড়েছে, যেন কেউ ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে।

সকালের সেই সাইরেন বাজার স্বপ্নটা কেন যেন মনে পড়ে গেল বাসুর।

দুই

শীতের সকালটা এই রকমই, চোখের আড়ালে আড়ালে পালায়। সাড়ে-আটটা বাজতে চলল, বাইরের উঠোনে রোদ নামে নি। দক্ষিণের পাঁচিল ধরে পা রেখে রেখে নীচে নামছে, নামতে নামতে ন'টা বেজে যাবে। দোতলায় সিঁড়ির মুখে পাপোসের মতন রোদ পড়ে আছে কয়েক ধাপ। কলের জল যেতে আর কতটুকুই বা দেরী। কনকনে উঠোনে বসে আরতি এঁটো বাসনের ধোয়া-মাজা এই মাত্র শেষ করল। শেষ করে ঝাঁটা দিয়ে জল টেনে টেনে উঠোনটা ধুয়ে দিচ্ছিল। উমা রান্নাঘরে বসে আরতির উঠোন ধোওয়ার শব্দ শুনছিল আর আনাজের ছোট ঝুড়ি থেকে সদ্য ধোওয়া বাঁধা-কপিটা উঠিয়ে কুটতে বসেছিল। উনুনে ভাত বসেছে। উনুনের গোড়ায় চায়ের কেটলিটা ঠেকানো। ওতে একটু চা আছে। উঠোন ধোওয়া হয়ে গেলে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আরতি এক্ষুনি আসবে। চাটুকু ওরই জন্যে রেখে দিয়েছে উমা।

কপিটা বঁটিতে চিরে দু'ভাগ করে ফেলল উমা। কয়েকটা বড় পাতা খসিয়ে কুটতে বসল।

'হ্যাঁ রে এই—' নিখিল ব্যস্ত ভঙ্গিতে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালো।

হেঁট মুখে তরকারি কুটছিল উমা, গলার স্বরে মুখ তুলল। তুলে অবাক হল। বাইরে বেরুচ্ছে নাকি দাদা? জামা কাপড় পরে তৈরী।

'এই সকালে তুই কোথায় যাচ্ছিস?' উমা শুধলো।

'কাজ আছে।' নিখিল এমন ভাবে বলল কথাটা যেন কি কাজ কিসের কাজ এ-সব উমার জানার বা বোঝার নয়। 'আমায় একটা টাকা দে না—'

'টাকা—'

'খুব দরকার রে! দিবি? দে না।' নিখিল বোনের কাছে কত যেন মিনতি করে চাইল।

উমা ভাইয়ের দিকে কর্তৃত্বের চোখে চেয়ে থাকল কয়েক পলক। যেন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল টাকাটা কেন দরকার; দেওয়া উচিত হবে কি হবে না। তারপর বলল, 'তুই না সে-দিনই আমার কাছ থেকে দু'টো টাকা নিলি?'

'নিয়েছিলাম। সে ত অনেক দিন হল।' নিখিল ধরা পড়ে গিয়ে একটু বেকায়দার হাসি হাসল, 'তোর এত মনে থাকে—'

'থাকবে না কেন, আমার সব মনে থাকে।' উমা কেন যেন সামান্য খুশী হয়ে উঠেছিল। 'গত হপ্তায় কি কিনবি ব'লে নিয়েছিলি।'

নিখিলের ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, টাকা নেওয়ার বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে সে যেতে রাজী না। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি একটা টিউশনি পাচ্ছি, জানিস? তোর সব টাকা শোধ করে দেব; প্লাস তখন তোকে প্রত্যেক মাসে পাঁচ টাকা করে খরচা করতে দেব।' নিখিলের কথা থেকে মনে হচ্ছিল যেন টিউশনিটা সে আজই পাচ্ছে।

'তুই আমায় ওই লোভ দেখিয়ে টাকা বাগাতে চাস দাদা'—উমা হেসে ফেলল, 'অত বোকা আমি নই।' হাসতে গিয়ে গালের ফোড়ায় টান লাগল। উমা কাতর মুখ করল একটু।

'ধাঃ, লোভ দেখাবে কেন? তুই কি রে?......সত্যি টিউশনিটা পেলে তোকে আমি টাকা দেব। দেখিস...'

উমাকে উঠতে হল। দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'সংসার খরচা থেকে তোকে এ ভাবে টাকা দিয়ে আমায় কিন্তু মুশকিলে পড়তে হয়।'

'তোর আবার মুশকিল।' নিখিল ছেলেমানুষের মতন হাসল, 'তোর বাক্সে অনেক টাকা। তুই তো একটা ক্যাপিটালিস্ট।'

'তুই আমার বাক্স দেখেছিস?'

'আজ সকালেই দেখলাম। বাজারের টাকা বের করছিস।'

উমা কিছু বলল না। রান্নাঘর থেকে বাইরে এল, নিখিল পিছু পিছু আসছে। ঘরে এসে উমা বিছানার তলা থেকে একটা টাকা বের করল।

'তুই আজকাল হটহাট কোথায় যাস রে?' উমা প্রশ্ন করল।

'কোথায় আর—লাইব্রেরীতে যাই, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি পড়তে যাই।' নিখিল ইতস্তত করে জবাব দিল।

'তোর ওই বন্ধু-ফন্ধু ছাড়।' উমা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সকাল নেই বিকেল নেই ঘরে এসে দু'মুঠো খাচ্ছিস আর আড্ডা মারতে বেরুচ্ছিস—এ ভাল না। কাকা রাগ করে।'

'কাকা!' নিখিলের মুখ সামান্য অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। 'কি বলে কাকা?'

'কিছু বলে না।'

'তবে?'

'মুখে কিছু না বললে কি বোঝা যায় না।' উমা ভাইয়ের দিকে টাকাটা বাড়িয়ে দিল।

নিখিল কিছু বলল না। টাকা নিল। বিছানার ওপর গরম চাদরটা পড়েছিল ছড়িয়ে, তুলে গায়ে জড়ালো। ওকে অন্যমনস্ক এবং গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

'কখন ফিরবি?' উমা জানতে চাইল।

'বেলা হবে।'

'কলেজ যাবি না?'

'যাব। এগারোটায় ক্লাস শেষ করে এক ফাঁকে এসে খেয়ে যাব।'

'তাড়াতাড়ি আসিস, আমি তোর জন্যে দুপুর পর্যন্ত ভাত আগলে বসে থাকতে পারব না।'

নিখিল টেবিল থেকে একটা খাতা উঠিয়ে নিল, ফাউনটেন পেনটা পকেটে গুঁজল। যাব যাব করছে, হঠাৎ উমার খেয়াল হল কথাটা, বলল, 'এই যা, ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল বিকেলে তোর একটা চিঠি এসেছে। কাকার ঘরে পড়েছিল। মধুদার চিঠি।' উমা যেন চিঠি খুঁজতে যাচ্ছিল।

'এখন থাক এসে দেখব।' নিখিল বলল। বলে বেরিয়ে গেল। উমা ঘর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল, চটি পায়ে গলিয়ে দাদা বারান্দা দিয়ে চলে গেল।

চিঠিটা আর খুঁজল না উমা। কিন্তু কেন যেন তার খারাপই লাগল। হেতমপুরের বন্ধুদের চিঠি শুনলে দাদা আগে খুশীতে লাফিয়ে উঠত; আজকাল গরজই করে না। মধুদা কত দুঃখ করে লিখেছে: "তোকে দু'টো চিঠি

দিয়েও জবাব পেলাম না। এই শেষ চিঠি। জবাব না পেলে ভাবব, তুই কলকাতায় গিয়ে আমাদের ভুলে গেছিস।"

তা ঠিক। কলকাতায় এসে দাদা হেতমপুরের পুরনো বন্ধুদের ভুলে গেছে। আগে কত বার তাদের নাম বলত, পুরনো গল্প করত, চিঠি লিখত; আস্তে আস্তে তাদের কেমন ভুলতে শুরু করল দাদা; এখন আর নামও করে না বড় একটা। এখন শুধু কলকাতা, আর কলকাতার বন্ধু; দিনে দশবার মৃণালের নাম। হেতমপুরের কথা নিতান্ত উঠলে পুরনো বন্ধুদের সম্পর্কে কেমন একটা অবজ্ঞা প্রকাশ করে দাদা। একদিন বলেছিল, ওরা খালি খাওয়া ঘুম চাকরি আর আড্ডা বোঝে, আর কিছু বোঝে না জীবনে। দিব্যি আছে সব। হেসে খেলেই কাটিয়ে দিল। দাদা এমন ভাবে বলেছিল কথাটা যেন নিজে কত বোঝে কত উঁচুতে উঠে আছে।

রান্নাঘরে আবার ফিরে এল উমা, পিঁড়ে টেনে বসল। উঠোনে আর শব্দ নেই। আরতি বাসন রাখতে ওপরে গেছে।

আর একটা টুকরো কেটে নিয়ে উমা কপির পাতা কুচোতে লাগল। কলকাতায় এসে দাদা বেশ বদলে গেছে। আজকাল ওর দিকে তাকালেই এটা বোঝা যায়। কলেজ আর পড়াশোনার নাম করে ও কি করছে—তাও কিছু কিছু বোঝে উমা। ভীষণ একটা পাল্লায় পড়েছে, দলে ভিড়েছে। কাকাও তা জানে। কিছু বলে না। বললে ভাল হত। একদিন দাদাকে স্পষ্ট করে বলব, উমা ভাবল, বলব তুই এ-সব ছাড়, পড়াশোনাটা মন দিয়ে কর। তোর মুখ চেয়ে আমরা বসে আছি। কাকার ঘাড়ে আর কতকাল এই সংসারের বোঝা চাপিয়ে রাখবি।

আরতি এল। সকালে জল ঘেঁটে খুব শীত ধরেছে মেয়েটার। আঁচলে বুক পিঠ ঘন করে জড়িয়ে কুঁকড়ে হি হি করতে করতে উনুনের পাশে এসে বসল।

'দাও, চা দাও—' উনুনের মুখের কাছটায় হাত বাড়িয়ে দিল আরতি, 'হাত দু'টো ঠাণ্ডায় একেবারে কালিয়ে গেছে, উমাদি।'

উমা ভেবেছিল ওকেই চা ঢেলে নিতে বলবে, কিন্তু মেয়েটার জড়সড় ভাব আর হি হি দেখে নিজেই তরকারি কোটা বন্ধ করে চা ঢেলে দিতে বসল।

'তুই যে আজ অনেক বেলা করলি, নয়ত উঠোনটা আমি ধুয়ে দিতাম।' উমা বলল চা ঢালতে ঢালতে।

আরতি কিছু বলল না। উনুনের দিকে আরও একটু জুত করে বসল।

'সুধাদি এখন কেমন আছে ' উমা শুধলো। আরতির মুখে আগেই খবরটা শুনেছে সে।

'তেমনি।' আরতি আস্তে করে জবাব দিল, দিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিল।

'ডাক্তার ডাকতে বল মাসিমাকে।' উমা আবার বঁটি টেনে বসল।

'দাদাকে বলেছে মা, দাদা বেরিয়েছে।'

সামান্য চুপচাপ। উমা খসখস করে তরকারি কুটছে, আরতি চা খাচ্ছে, হাঁড়িতে ভাতও ফুটে এল। অ্যালুমনিয়ামের হাঁড়ির গা বেয়ে ফেন গড়িয়ে পড়ছিল। রান্নাঘরের ভেতর কেমন এক নীরবতা ঘনিয়ে আসছে।

'আমার কপালটাই বড় খারাপ, উমাদি।' আরতি আচমকা বলল।

উমা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, ঠিক মতন শুনতে পায় নি, বাঁধাকপির আর একটা টুকরো হাত বাড়িয়ে নেবে কি নেবে না ভাবতে ভাবতে বলল, 'কি খারাপ—?'

'কপাল, আমার কপালের কথা বলছি।'

'কার বা ভাল?

'আমার একেবারে সব চেয়ে খারাপ।' আরতি চায়ে চুমুক দিল। 'জন্ম থেকেই তুক করা আছে।'

উমা কিছু বলল না। ভাত বোধ হয় হয়ে গেছে, নামাতে হবে। উনুনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে উমা হাতাটা টেনে নিল। পাশে কড়াই হাতা খুন্তি—সব গোছ করে রেখে দিয়েছে।

'আজ দিদি মাইনে পাবে, আমার জন্যে খানিকটা উল কিনে আনবে বলেছিল। তা হয়ে গেল উল কেনা।' আরতি হতাশ স্বরে বলল। বলে সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর আরও যেন স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে বলল, 'এ-মাসের মতন ত ও-পাট চুকল। পয়সাটা ডাক্তার ওষুধেই যাবে।'

হাতার আগায় ভাতের দানা উঠিয়ে উমা টিপে দেখছিল। আর একটু হবে। কাকা শক্ত ভাত এখন আর খেতে পারে না। হাতা নামিয়ে ঘটির জলে হাত ধুয়ে উমা আবার মুখ সোজা করে বসল।

'একটা গরম কিছু না হলে সত্যি আর পারি না। বড্ড শীত লাগে।'

সব্জির ঝুড়ি থেকে আলু বাছতে বাছতে উমা বলল, 'তোকে আমি একটা ব্লাউজ করে দেব—'

'সে ত উল পেলে। উল পেলে তবে না তুমি বুনে দেবে।

'দেখ না সুধাদি কি বলে। ...ঠাণ্ডার জ্বর, আজই হয়ত ছেড়ে যাবে।'

'না উমাদি, অত জ্বর একদিনে ছাড়ে না।' আরতি কাতর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল।

'তুই জানিস?'

আরতি কিছু বলল না। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, দিদির জ্বর একদিনে ছাড়বে না এ যেন সে জানে।

উমা আলু কুটতে বসে বলল, 'আমার সেই নীল রঙের স্কার্ফটা আছে দেখেছিস না—ওটা দু'তিন বছর আগে বুনেছিলাম, ভাল হয় নি, ব্যবহারও করি না। ওর উল খুলে তোকে আমি ব্লাউজ বুনে দেব।'

আরতি নীরব। কথাটা বলার পর উমা একটু ইতস্তত অনুভব করছিল। ভেবে চিন্তেই বলেছে—তবু কেমন না বেয়াড়া শোনালো। 'শেখার সময় পুরোনো উলই ভাল বুঝলি না। তোকেও শেখানো হবে, আমারও বোনা হবে।'

আরতির চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো কাপ ধুয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল।

বাইরে—সদরের দিক থেকে মোটা গলার সাড়া ভেসে এল। গলাটা সবার চেনা এ-বাড়ির। অন্নদাপণ্ডিত এসেছেন। এ-পাড়ার একজন প্রবীণ পূজ্য মানুষ। গিরিজাপতির সঙ্গে মৌখিক আলাপ এখন ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে আসেন আজকাল। কাগজ দেখেন, গল্প করেন, কখনও কখনও তর্ক বেঁধে যায়। ধর্ম-টর্ম নিয়ে। নিখিল বলে, ধর্ম যুদ্ধ।

আরতি উঠল। 'মার পুজো-টুজো শেষ হল বোধ হয়, যাই।'

'মাছের ঝোলটা বসিয়ে আমিও যাব রে ওপরে।'

'মাছ কুটেছ।'

'না, এই এক ফাঁকে কুটে নেব।'

'আমায় বললে পারতে—এতক্ষণে কুটে দিতাম।' আরতি বলল।

'দুঃ··· তিন টুকরো মাছ কুটতে আবার তোকে বলব। ডালটা বসিয়ে দিয়েই কুটে ফেলব।'

আরতি চলে গেল।

উমা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আলু কুটতে লাগল।

আরতি মেয়েটাকে বড় ভাল লাগে উমার। বড্ড কষ্টও হয় ওর জন্যে। আগে ঠিক এমন করে কষ্ট হত না। এখন হয়। বাস্তবিক মেয়েটার কপাল খারাপ। ও বলছিল না, কপালে তুক করা আছে জন্ম থেকে, ঠিকই বলছিল। সংসারে এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে ক'জনই বা জন্মায়। না চিনেছে মা, না বাপ, জন্মে কোনোদিন দেখে নি, শোনে নি। অথচ জগতটাই এমন, এই মেয়েট কোথায় মা, কোথায় বাপ কিছু না জেনেও অন্যের কোলে মানুষ হল। বেশ ত ছিল, কিন্তু কী কপাল ওর, যখন আর কোনো দরকার নেই জানার কে মা কে বাবা তখন জানতে পারল এ সংসারের কেউ তার নিজের নয়, রক্তের সম্পর্ক নেই কোথাও। নিজের জীবনের এই গল্প আরতি নিজেই উমাকে বলেছিল। অচেনা অদেখা বাপের তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধ মিটিয়ে সারাটা দিন ফুলে ফুলে কেঁদেছে শুধু মেয়েটা। মানুষের সমস্ত দুঃখ কষ্ট শুধু মাত্র চোখের জলে হালকা করা যায় না। আরতি অনেক কেঁদেছিল, কেঁদেও যখন বুকের ভার কমে নি তখন উমার কাছে এসেছিল। তার কথা শুনবে এমন মানুষ ওপরতলায় কেউ ছিল না। মাসিমা নিজেই কেমন হয়ে গিয়েছিলেন, মুখে কথা নেই, বোবা; মুখ দেখলে মনে হত রাতারাতি বুঝি মানুষটার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছে। কারও চোখের সামনে দাঁড়াতেন না, বসতেন না। সংসারের মধ্যে একটা লোক মূর্ছিত রুগীর মতন বেঁচেছিল। খাওয়া ঘুম বন্ধ। সেই পাথরের সামনে কথা বলবে কে। সুধাদি ত আরও

গম্ভীর। এত গম্ভীর যে মনে হত, এ সংসারের' সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই, বাড়িতে কী ঘটে গেল সে জানে না। দুঃখটা যেন সুধাদিকে ভীষণ আড়ষ্ট আড়াল করে তুলেছিল। বাসুকেও প্রথম দিনটা পালিয়ে পালিয়ে থাকতে দেখেছে উমা। পরের দিন থেকে অবশ্য ওই বাসুই একটু যা স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনছিল সংসারে।

উমারা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ওপরতলার সংসারে আচমকা এমন কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল! তারা বুঝতে পারত না, কি হয়েছে, কেন এমন করছে সব, আরতির কোরা শাড়ি রুক্ষ চুল...এ-সব যে কেন কিছুই বোঝার জো ছিল না। কাকার মতন মানুষও ভীষণ অস্বস্তি এবং বিব্রত বোধ করছিল। বার বার জিজ্ঞেস করছিল উমাকে, হ্যাঁ রে তোর মাসিমাদের কি হল? আরতিটার হয়েছে কি?...কি হয়েছে উমা কেমন করে জানবে। অধৈর্য হয়ে কাকা সুধাদিকে বার কয়েক ডেকে পাঠিয়েছিল, সুধাদি আসে নি, ছুতো করে পাশ কাটিয়ে গেছে।

চোখের জল যখন আর বুকের পাথরটা তুলতে পারল না, তখন আরতি আর কাউকে তার কথা বলতে না পেরে উমার কাছে এসেছিল।

ছেলেমানুষ বলেই যা জেনেছে, যেটুকু বুঝেছে—বিহ্বল গলায় কেঁদে-কেটে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সব বলে গেল।

সেদিন উমাও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারে নি। এই জগতটা যে কত অদ্ভুত, মানুষের জীবনে কি হয় আর না হয় উমা কেবল ভেবেছে। কার নাড়িতে কে জন্মায়, কার বা কোলে মানুষ হয়—কে যে জন্মদাতা কে বা অন্নদাতা—কে ফেলে দেবে কে কুড়িয়ে নেবে—তুমি জান না। সবই ভাগ্য। নিজেদের দুই ভাইবোনের কথাও উমা ভেবেছে সেদিন। বাবাকে দেখে নি, মা-কে মনে আছে একটু একটু। দাদা দেখেছে বাবাকে। কিন্তু আজ সেই মা বাবা কোথায়। কাকাই তাদের আবাল্য মানুষ করলেন।

আরতির ওপর সেই থেকে উমা কেন যেন এক ধরনের গভীর মমতা অনুভব করেছে। এই মেয়েটাই তার একমাত্র সঙ্গী ছিল আগে, উমা ওকে

পছন্দ করত, স্নেহ করত—কিন্তু এখন এ-সবেরও বেশি কিছু করে, ভালবাসে। আগে যে-মেয়ে অনেকটা বন্ধুর মতন ছিল—এখন সে বন্ধুরও বেশি হয়ে উঠেছে। কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেয়েছে উমা তার ভাগ্যের সঙ্গে আরতির।

আরতির কথা ভাবতে ভাবতে আলু কোটা শেষ হয়ে গেল উমার।

ভাত হয়ে গেছে। কোটা তরি তরকারি সরিয়ে রেখে উমা ভাতের হাঁড়ি নামালো। উনুনের মুখে আঁচ গনগন করছে। এই ঠাণ্ডায় উমা একটু গরম তাত পেয়ে বোধ হয় আরাম অনুভব করছিল।

সকালটা বড় হুড়োহুড়ির মধ্যে কাটে। কাকা সাড়ে-দশটা নাগাদ আজকাল খেয়ে নেয়, আধ ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে প্রেসে চলে যায়। দাদার কিছু ঠিক নেই, কোনোদিন ন'টার সময় ভাত চেয়ে বসে, কোনোদিন আবার বেলা বারোটার আগে ভাত খেতে আসে না। তা হলেও দশটা এগারোটার মধ্যেই বেশির ভাগ দিন দাদাকে ভাত দিতে হয়। শীতের দৌড় দেওয়া বেলার সঙ্গে উমা যথাসাধ্য পাল্লা দেবার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে কেন যেন মনে হয়, সারাটা জীবন তাকে এই ভাবে রান্নাঘরে বসে বাইরের বেলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাটাতে হবে। কথাটা ভাবলে সমস্ত শরীর মন কেমন বিকল হয়ে আসে। ইচ্ছে করে না আর ভাতের ফেন গালতে, কি বঁটির সামনে উবু হয়ে পিঁড়েতে বসে থাকতে।

ভাতের ফেন গেলে, হাঁড়িটা বেশ করে ঝাঁকিয়ে একপাশে রেখে দিল উমা। হাত ধুয়ে ডালের জলটা বসিয়ে দিল। মাছের টুকরোটা এবার কুটে নেবে।

রান্নাঘরের এক পাশে মাছটুকু পড়েছিল। উমা আঁশবঁটি আর মাছ নিয়ে উঠোনে চলে গেল।

কাকার ঘরে দুই বুড়োয় বেশ গল্পে জমে উঠেছে। অন্নদাপণ্ডিতের গলা যেমন মোটা তেমন ভারী। উমা মাছ কুটতে বসে অন্নদাপণ্ডিতের প্রায় কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, কাকার গলাও কানে যাচ্ছে। একটা কাক সিঁড়ির রেলিঙে বসে চেঁচিয়ে চলেছে। রোদ উঠোনে পা দেবে দেবে

করছে। জল চলে গেছে কখন। অন্য দিন এ-সময় সুধাদি কলঘরে থাকে। আজ কলঘরে এক ফোঁটা জল পড়ার শব্দ নেই। দোতলার দিকে মুখ উঠিয়ে কাউকে দেখতে পেল না উমা।

গলিতে আচমকা একটা দৌড়োদৌড়ির শব্দ। উঠোনে বসেই উমা শুনতে পেল, এক পাল লোক গলি দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে যাচ্ছে, তাদের গলায় আতঙ্কে ওঠা স্বর, কেউ বা আর্ত গলায় চিলের মতন চেঁচিয়ে কাউকে ডাকছে, ডাকতে ডাকতে ছুটছে। শব্দটা এত চেনা জানা যে, মাছ কুটতে কুটতে উমা গলির মধ্যে মানুষগুলোর ছুটোছুটির চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল। পুলিসের ভয়ে হাঘরে পথের ভিখিরিগুলো পালাচ্ছে। এমনি করে এরা পালায়। সদর রাস্তায়, বড় গলির মুখে থেকে থেকে আজকাল হাঘরে ভিখিরি-ধরা-গাড়ি আসে পুলিসের। রাস্তা থেকে টেনেটুনে যতগুলো ক পারে তুলে নেয়। ধরা পড়ার ভয়ে এরা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালায়। দাদার কাছে শুনেছে, পালাবার সময় এদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। বউ ছেড়ে স্বামী পালাচ্ছে, স্বামী ছেড়ে বউ ছুটছে, বাচ্চা-কাচ্চা যেটাকে পারল টেনে হেঁচড়ে ছুটতে শুরু করল, যেটাকে পারল না নিতে সেটা থাকল। চিৎকার করতে করতে কাঁদতে কাঁদতে ছোট গলি দিয়ে সব ক'টা দৌড় দেয়। কারও ছেলে পড়ে থাকল, কারও বা পড়ে থাকল রাস্তার সংসার পেতে বসার চটের থলিটা, খেন নেবার টিনের পাত্রটা। ওইটুকু খাওয়ার জন্যেই কী কপাল চাপড়ানি তাদের।

দুঃখ হয়, ভাল লাগে না—কিন্তু দেখে শুনে উমার আজকাল বিরক্তি ধরে গেছে। মানুষের প্রাণটা কী ভীষণ শক্ত। সবাই বাঁচবার জন্যে ঝাপটে মরছে। কত ত মরল, মরছে—তবু বাঁচার জন্যে ছেঁড়া ট্যানা পরে ভাঙা মালশা হাতে হাজারে হাজারে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভগবান মানুষকে এত কষ্ট কেন দেন! এর চেয়ে জগত শুদ্ধ লোক মরে যাক না কেন। এই পাপের শাস্তি সওয়া যায় না।

মাছ কোটা শেষ করে বঁটি আর মাছের টুকরোগুলো নিয়ে কলঘরে রেখে এল উমা। কোটার জায়গার আঁশ ছাই পরিষ্কার করে উঠোনে

নালির কাছে রেখে দিল আবর্জনাগুলো। পরে স্নান করার সময় ফেলে দেবে।

চৌবাচ্চার জলে বটি মাছ ধুয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল উমা। ডালের জল ফুটছে। বাটিতে ডাল বেছে রেখেছিল আগে। হাঁড়িতে ফেলে দিল।

এখন আর ওঠা বসা নেই। ডাল সেদ্ধ হোক। মাছের টুকরোগুলো রান্নাঘরের জলে ভাল করে ধুয়ে জল ঝরালো উমা। হলুদ নুন মাখিয়ে এক পাশে রেখে দিল।

পিঁড়েতে উবু হয়ে বসে, জোড়া হাঁটুতে মুখ রেখে উনুনের দিকে চেয়ে বসে থাকল উমা। অন্য দিন হলে এই সময়ে ঘরে গিয়ে খুচরো হাতের কাজ দু'-একটা সেরে রাখত। আজ আর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। নিত্যকার সেই ঘর ঝাঁট দেওয়া, দাদার টেবিলপত্র গোছানো, বিছানা পরিষ্কার, কাপড় জামা গোছ—এ সব কাজ ত আছেই, থাকবেও কপালে বরাবর, করতেও হবে। আজ এই ভীষণ শীতের সকালে নিবিবিলি রান্নাঘরে বসে পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে যদি সংসারের কাজে দু'দণ্ড দেরি হয়, হোক। তাতে কিছু আসবে যাবে না, কেউ কিছু বলবে না।

উমার যে আলস্য লাগছিল তা নয়, কেমন একটা উদাস ঘোর লাগছিল। ভাল লাগছিল না উঠতে বসতে কাজ করতে।

উনুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা আচ্ছন্নতা ঘনিয়ে এল। কেটলিটা পড়ে আছে, হাতা খুন্তি কড়াই গুছোনো রয়েছে, মাছের টুকরো-গুলো হলুদ। উমার মনে হল, এই হাঁড়ি-কুড়ি উনুনের মধ্যে সে যেন কতকাল চুপ করে বসে আছে। তাকে বসিয়ে রেখে বাকি সংসারটা বাইরে চলে গেছে।

তারপর উমার হেতমপুরের কথা মনে হল। কেন মনে হল উমা বুঝতে পারল না। শুধু অনুভব করল, বাকি সংসারটা যেন হেতমপুরের দিকে হাঁটা দিয়েছে।

অবশেষে উমা তার পুরনো বেদনাই অনুভব করতে পারল। এই কলকাতা তার ভাল লাগছে না আর। যত দিন যাচ্ছে তত অসহ্য

হয়ে উঠছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই কলকাতা তাদের সব নেবে, সুখ শান্তি প্রীতি মমতা—এমন কি জীবনও। কাকা দেখতে দেখতে গত দেড় বছরে কেমন হয়ে গেল, এখন বেশ বুড়ো বুড়ো লাগে, মনে হয় কষ্ট পাচ্ছে ভেতরে, তাদের দুই ভাইবোনের দায়িত্ব বয়ে বেড়ানোর ভাবও আজকাল যেন কাকাকে মাঝে মধ্যে ভীষণ চিন্তিত করে তোলে। দাদাটা দিনে দিনে পালটে যাচ্ছে। যতই বলুক দাদা, উমা জানে, পড়াশোনায় আর তেমন মতি নেই, মনোযোগ নেই। পাঁচটা বন্ধুর সঙ্গে মিশে তার মাথায় এখন অন্য কিছু ঢুকেছে। ঠিক কোন জিনিসটা ঢুকেছে উমা জানে না, তবে বুঝতে পারে, কাকার মতন দেশ দেশ করে অতটা মাথা ঘামায় না দাদা, যতটা পার্টি পার্টি করে। একটা কথা বেশ স্পষ্ট বুঝে ফেলেছে উমা, কাকা এবং দাদা—এরা এক নয়, এক থাকবে না।

কলকাতায় এসে, দেড় বছরে কতখানি বদল হল তাদের। উমারও কি কিছু কম গেছে। সেই যে দেড় বছর আগে এক কোমর জল সাঁতরে ঘোড়ার গাড়িতে এই গলির মধ্যে ঢুকেছিল—তারপর আর উমার জীবনে একটা দিনও শান্তি এল না। এই শহরটাই বুঝি এই রকম। অশান্তি আর আখুট্টেদের জায়গা। কিছু একটা বেঁধেই আছে। এই আজকে ট্রাম পোড়ালো তার কাটল, কাল পুলিসে ঠেঙালো, পরশু বোমা পড়ছে। তারপরই শ্মশানকালীর মতন ভীষণ জিব বের করে দুর্ভিক্ষ আসছে। দিন রাত শুধু হাঘরে ভিখিরিগুলোর কান্না আর কান্না। পঙ্গপালের মতন আসছে, মরছে। কত ত মরল। তবু কি স্বস্তিতে কান পাততে পারবে। একটু আগেই গলির মধ্যে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল উমা তা মনে করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ডালের হাঁড়িতে একটু হলুদ ফেলে দিল উমা, সামান্য গুড়। তারপর আঙুলের আগায় করে নুন ছড়িয়ে দিল গোল করে।

কি লাভ হল কলকাতায় এসে? কেন এল কাকা? দাদাকে একা পড়তে পাঠালেই হত। এই চন্দ্র সূর্যহীন গলিতে ঢুকে পর্যন্ত শরীর মন হাঁপিয়ে গেছে তার। কোথাও বেরোয় না উমা। প্রথম প্রথম একদিন আরতির সঙ্গে রূপম সিনেমায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সারাটা পাড়া যেন উমাকে গলিতে

দেখে সাড়া জাগিয়ে তুলল। ছোট ছেলেগুলো পিছু নিল, বকাটে ছোকরার দল বাইরের রকে বসে তামাশা দেখার মতন করে শিস দিল, দু'-চারটে টিটকিরি ছুঁড়ল; ক'টা বাড়ির জানলা দিয়ে মেয়ে বউরা মুখ বাড়ালে। এমন কি বড়রাও হঠাৎ রাস্তায় উমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল। উমার মনে হচ্ছিল, সে যেন সেই মুহূর্তে মরে যায়। সিনেমা দেখবে কি, উমার মাথা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল; চোখে কিছু দেখছিল না। তারপর কখন বোধ হয় কেঁদে ফেলেছিল। আরতি এত তন্ময় হয়ে সিনেমা দেখছিল যে উমার কান্না দেখতে পায় নি।

ওই ঘটনার পর উমা আর বাড়িব বাইরে পা দিতে চায় না। মাসের পর মাস যায়, যখন আর একতলা দোতলা করে পারে না, হাঁপিয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়, তখন আরতির পীড়াপীড়িতে আবার এক দু'দিন ওই রূপম সিনেমাতেই যায়। না, আর আগের মতন ভুল করে না। পড়ন্ত বিকেলের অন্ধকারে পরদা ঢাকা রিকশায় চাপে বাড়ির সদর থেকে, সিনেমায় গিয়ে ঢোকে যখন তখন ঘর অন্ধকার। ফেরার সময় একটু মুশকিল হয় ওই হাউসটার কাছে, তারপর অবশ্য আবার রিকশা।

জীবনটা কি তার এই ভাবে অন্ধকারে অন্ধকারে কাটাতে হবে। আড়ালে। হয় উঠোনে না হয় রান্নাঘরের মধ্যে? লোকচক্ষের সামনে দাঁড়াবার অধিকারটুকু ভগবান এমন করে কেড়ে নিলেন কেন?

অথচ হেতমপুরে তার কোনোদিন এমন করে এ-সব কথা মনে হয় নি। কবে থেকে সে হেতমপুরে মানুষ উমা জানে না। কিন্তু সেখানে এমন ভাবে কেউ উমাকে দেখত না। পাশাপাশি কত বাড়িতে গেছে, পাড়ায় ঘুরেছে, বেড়িয়েছে—কই নতুন দু'-চার জন ছাড়া কেউ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখে নি। ভালুক নাচ দেখাতে এলে ছেলের দল যে ভাবে দল বেঁধে ভালুকের পিছু পিছু যায়, আর ডুগডুগি বাজানো মানুষটাকে অস্থির করে মারে—ঠিক সেই ভাবে উমার পিছু পিছু ছেলেগুলো দল করে কোনোদিন যায় নি। এই কলকাতায় কিন্তু তাই গিয়েছিল।

উমার মনে হল, এই কলকাতা বড় নিষ্ঠুর। সংসার নিষ্ঠুর, মানুষ নিষ্ঠুর।

ভাগ্যও নিষ্ঠুর। সুযোগ পেলে কেউ তোমায় ছাড়বে না। সে যেই হোক। নয়ত সব জেনে-শুনে বুঝে বাসুও কি তাকে ছেড়ে দিয়েছিল? দেয় নি। ভুল করে বোকামি করে—কেমন যেন যা না তাই বিশ্বাস করে উমা তার মুখ এই অন্ধকার আর আড়াল থেকে বের করতে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাসু সেই বেহায়া মুখ ঠোক্কর মেরে ভোঁতা করে দিয়েছে। উমা কথাটা ভোলে নি, ভুলতে পারবে না। সেদিনের দুপুরটুকুর খুঁটিনাটি সব মনে আছে তার। এখনও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পায় উমা, বাসু পশুর মতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডান হাতটা মুচড়ে ধরেছে, অমানুষের মতন মুখভঙ্গি, কী কদর্য ইতর তার গলার স্বর। কথাগুলো পর্যন্ত কানে শুনতে পায় উমা: এক থাপ্পড়ে বাপ চোদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব লেকচার ঝাড়তে এলে।…আমার মাথ ছেলের বউ নাকি তুমি। তাও যদি ভদ্দরলোকের মতন চেহারা হত।

উমা তাকিয়ে থাকল। সে উনুন দেখছে, না একটা মোটা স্থূল পাত্রের মুখ উপচে যে-ফেনা গড়িয়ে পড়ছে সেই পাত্র এবং ফেনা দেখছে বোঝা যায় না। তপ্ত কাতর আহত একটি প্রাণীর মুখ দিয়ে কষ গড়ানোর মতন ডালের গেঁজালো ফেনা পড়েই যাচ্ছিল। পোড়া গন্ধ উঠছিল।

তিন

সুধার জ্বর ঠিক মতন ছাড়ছিল না। চার দিনের মাথায় অনেকটা কমেছিল, পরের দিন ছেড়ে যাবে এই আশায় সুধা অল্প জ্বর গায়ে দুপুরের রোদে বাইরে বারান্দায় অনেকক্ষণ বসেছিল, নীচের তলা থেকে মাসিক পত্রিকা আনিয়ে পড়েছিল খানিক, তারপর রোদের আরাম গায়ে মেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলটা বড় শীত শীত করে কাটল, কেমন জড়তা লেগেছিল শরীরে। কাশিটা একটু কম ছিল; সন্ধ্যেবেলায় রত্নময়ী বুকে পিঠে লিনিমেণ্ট মালিশ করে দেবার সময় বলেছিলেন, কাল জ্বর ছেড়ে গেলে মাথার চুলগুলো একটু আঁচড়াস হাতে তেল দিয়ে, কেমন পাখির বাসা হয়ে রয়েছে। কথাটা শোনার পর সুধার খেয়াল হয়েছিল, তার মাথা কেমন ভার হয়ে আছে। দুপুরভোর মাথায় রোদ লেগেছে, ক'দিন ধরে তেল জল নেই, হয়ত তাই। সুধা তেমন গা করে নি। পরের দিন সকালে শ্লেষ্মা ওঠার সময় বুকের তলায় আবার সেই শুকনো—ছুঁচ ফোটার মতন ব্যথা শুরু হল। দুপুরে গা যেন ভেঙে আসছিল, চোখ জ্বালা করছিল। আবার জ্বর এল বিকেল করে।

নতুন করে জ্বর বাড়ায় রত্নময়ী উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন. কিন্তু তিথির হিসেব করে তাঁর মনে হয়েছিল, একাদশীর টান বলে জ্বরটা ছেড়েও ছাড়ল না, কাল ছাড়বে। লিনিমেণ্ট মালিশ করে দেবার সময় মনে হল, গায়ে বেশ তাত মেয়েটার। দমকে দমকে কাশছিল সুধা। মেয়েকে তবু ভরসা দিলেন রত্নময়ী: এ টানের জ্বর, কাল সকালে একাদশী ছেড়ে যাচ্ছে—বিকেল নাগাদ তোর জ্বর ছেড়ে যাবে।

বুকের সেই ব্যথা আর একঘেয়ে কাশিতে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল সুধা; গলার স্বর বসে গিয়ে আরও যেন তার কষ্ট বাড়াচ্ছিল। রত্নময়ী

বললেন, 'অত শ্লেষ্মা উঠছে—ব্যথা ত একটু হবে বুকে। মালিশ করে দিচ্ছি, আরাম পাবি।

পরের দিনও জ্বর ছাড়ল না। রত্নময়ী ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বেশী জ্বর বলে তিনি পথ্য থেকেই অবহেলা করেন নি। ডাক্তার বদ্যি ওষুধপত্র করেছেন। বুকে শ্লেষ্মা জমে জ্বর হয়েছিল, ওষুধে মালিশে সেই শ্লেষ্মা তরল হল, জ্বর কমল এবার কোথায় সেরে উঠবে, তা না আবার কেন ফিরে পড়ল মেয়েটা। কেন যে এ রকম হল, রত্নময়ী বুঝতে পারছেন না। বেশী দিন জ্বর চললে বড় ভীষণ ভয় হয়। সুধার বাবার কথা মনে পড়ে। সে-মানুষও এই রকম রাতারাতি ভীষণ জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ল, তারপর বাইশ দিনের মাথায়ও জ্বর ছাড়ল না, মানুষটাই তাদের ছেড়ে চলে গেল।

বাপের মতন মেয়েও কি সেই টাইফয়েড রোগে পড়ল। কথাটা ভাবতেই রত্নময়ীর ভয়ে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়, বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে। অনেক দিনের কথা, তবু সেই মানুষটার রোগের লক্ষণের সঙ্গে সুধার অসুখের লক্ষণ মিলিয়ে যেন ভরসা পেতে চান, না এ-রোগ সে-রোগ নয়। আবার কখনও কখনও ভয় তাঁকে ভাসিয়ে দেয়। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ছটফট করেন, উৎকণ্ঠা বুকের কাছে জমে ভার হয়ে থাকে।

আরও দু'টো দিন দেখে রত্নময়ী বাসুকে বললেন, 'আজ একবার কেদার-ডাক্তারের কাছে যা।

'রোজই ত যাচ্ছি।' বাসু বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

'রোজ আবার কোথায় যাচ্ছিস?' রত্নময়ী ধমকে উঠলেন।

'চোখ থাকলেই দেখতে পেতে।' বাসু বলল। উঠোনের রোদে দাঁড়িয়ে গায়ের জামা খুলছিল বাসু। খানিকটা রোদ পুইয়ে স্নান করতে যাবে। রত্নময়ী সুধার বাসি শাড়ি জামা উঠোনের এক পাশে নামিয়ে রেখে একটুকরো সাবান খুঁজছিলেন। আরতি পাঁচিলের কাছে উবু হয়ে বসে চুলের বিনুনি খুলছিল। মা সাবান দিলে দিদির বাসি কাপড়গুলো নিয়ে স্নান করতে যাবে।

'তোর মুখের বড্ড বাড় হয়েছে— রত্নময়ী ছেলের দিকে তাকালেন, 'একদিন ওই মুখে এমন করে মারব—তোর মনে থাকবে চিরকাল।'

বাসু কথাটা খুব যেন গ্রাহ্য করেছে বলে মনে হল না। উঠোনের তারে গায়ের জামাগুলো ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের শরীরটা ফুলিয়ে ফালিয়ে দেখতে লাগল।

'অন্য দিন তো দুপুর করে বাড়ি ফিরে গিলতে, আজ এত তাড়াতাড়িটা কিসের? ও পাড়ার মোড়ে ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় লোকটাকে, ঘুরে এলেই পারতে। এখন আর থাক, দুটো কথা ভাল করে গুছিয়ে বললে ঠিক মতন ওষুধ দিত।'

'তুমি ভাব, গেলে দাঁড়ালেই কেদারডাক্তার আমায় আপ্যায়িত করে দেবে।' বাসু খোঁচানো গলায় বলল।

'তোকে আবার আপ্যায়িত কি রে হতচ্ছাড়া—'

'তা হলে তুমি যাও।' বাসু বলল, বলে মার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল চট করে। 'আমি গেলে যখন তোমার মেয়ের অসুখ ঠিক মতন বলা হচ্ছে না ওষুধ লাগছে না—'

'আমার পিণ্ডি হচ্ছে—' রত্নময়ী সাবান খুঁজে না পেয়ে আরও বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, 'ঠিক মতন ওষুধ পড়বে যদি তবে আজ আট দিন ধরে মেয়েটা সমানে ভুগছে কেন।'

'চায়ের দোকানের ডাক্তারকে দিয়ে ভদ্দরলোকের চিকিৎসা হয় না।' বাসু বলল। বলে দু পা এগিয়ে আরতির সামনে থেকে নারকোল তেলের ছোট সরু শিশিটা উঠিয়ে নিল। আরতি হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে গিয়েও পারল না।

'চীনেদের জল জ্বালা হয় না—' রত্নময়ী বললেন।

'হবে না কেন—' বাসু যতটা পারল তেল নিয়ে মাথায় ঘষতে ঘষতে সুধার ঘরের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, 'ওদের অত ঠুনকো শরীর নয়, কেদারডাক্তারের দু'শিশি খেলেই সেরে যায়।'

রত্নময়ী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন না, কথা বলতে বলতে উঠোন-বারান্দা করছিলেন হাতের কাজ সারছিলেন। বাসুর কথা ঠিক মতন কানে গেল কি না বোঝা গেল না। কিছু বললেন না। সুধার খাবার আনতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

শিশিতে তেল প্রায় ছিল না। যেটুকু ছিল বাসু নিয়ে নিয়েছে। আরতি অসম্ভব খেপে গিয়েছিল দাদার ওপর। বাসু বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করল না। বরং মন্তব্য করল, 'কি গন্ধ রে.. রেড়ির তেল না কি ?' বলে খুব কায়দা করে সেলুনের মতন চুল ম্যাসেজ করতে লাগল। কেদারডাক্তারের ওপর মোটেই প্রসন্ন নয় ও। লোকটা পয়লা নম্বরের পয়সাখোর। পাড়ায় থাকে বলে লোকে আপদে-বিপদে ডাকে, নয়ত ওর আসল খদ্দের চীনেগুলো। সকাল বিকেল দলে দলে রিকশা চেপে চীনে মেয়েগুলো আসে। কী রোগ ছুঁড়িগুলোর ভগবানই জানেন।...তা কেদারডাক্তারের খুব কপাল, চীনে পাড়া একচেটে করে রেখেছে বুড়োটা; এন্তার লুটছে, ছ'ছটা মেয়ের একটার বিয়ে দিয়েছে—বাকি পাঁচটার জন্যে জমিয়ে যাচ্ছে। কেষ্টকালী মার্কা সেই মেয়েগুলো জানলা খুলে বসে থাকে, বাপ কবে বর ধরে আনবে! নন্টে একটার সঙ্গে ক'দিন খুব মাঞ্জা লড়েছিল, তারপর কেটে দিল।

'চান করে একবার দেখে আয়—'

বাসু মার গলার স্বরে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। সুধার জন্যে একবাটি সাবু, আধখানা কমলালেবু নিয়ে রত্নময়ী রান্নাঘর থেকে আসছিলেন; আসতে আসতে কথাটা বললেন।

বাসু শুনল, শুনে দু'মুহূর্ত মার দিকে তাকিয়ে থাকল। রত্নময়ী ঘরে চলে যাবার পর আরতির দিকে তাকিয়ে আচমকা বলল, 'এই বাড়িটার সবাই হুকুম মারছে। হাত্, একদিন শালা কেটে পড়ব।'

দুপুরে বারান্দা আর উঠোনের রোদে মাদুর পেতে রত্নময়ী একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। একপাশে বসে উমা আরতিকে উলের বোনা শেখাচ্ছিল। সেই স্কার্ফটা খুলে মোটা মোটা গোলা বানিয়েছে উমা উলের। এখন ব্লাউজ বোনা চলেছে নতুন করে। ওরা গল্প করছিল আর বুনছিল। শীতের রোদ ক্রমশই যেন তপ্ত গাঢ় ভাব হারিয়ে ফেলছে, ছায়া এগিয়ে আসছে রান্নাঘরের দিক থেকে, ক'টা চড়ুই বুঝি নীচের তলায় উঠোনে কিচকিচ করে চলেছে সমানে। বাসু বাড়ি নেই। খেয়ে-দেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেছে—আর ফেরে নি।

কখন ফিরবে, কেদারডাক্তারের কাছে গেছে কি না কে জানে। হৃন্নময়ী চোখের পাতা বুজে পাঁচ কথা ভাবছিলেন।

ভাঙা ভাঙা কাশির শব্দে আরতিরা তাকাল। সুধা ঘরের বাইরে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে যেন দুর্বলতা সামলে নিচ্ছিল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে মাদুরের কাছে এসে বসল।

'একটু জল দে খাবার—' সুধা আরতির দিকে তাকিয়ে বলল। উবু হয়েই বসে থাকল সুধা, গায়ে সেই ছেঁড়া শালের টুকরো। উস্কখুস্কু রুক্ষ চুল, কপালে কানে ঝুলছে। মুখটা সাদা, শুখনো, নিরক্ত; ঠোঁটে একটা ঘায়ের মতন হয়েছে। সুধা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল, যেন হাঁপাচ্ছে।

'মাথায় রোদ লাগিও না সুধাদি —এ-পাশটায় সরে বস।' উমা বারান্দার ছায়ার দিক থেকে সরে গিয়ে সুধাকে বসতে জায়গা দিল।

সুধা নড়ল না। রোদটা তার ভাল লাগছিল। এখন বোধ হয় জর অনেকটা কম, গরম তুলোর মতন এই শেষ দুপুরের শীতের রোদে খুব আরাম লাগছিল। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুধু ঠাণ্ডা আর ছায়ায় শীত ধরে গিয়েছিল, শিরশির করছিল গা, রোদে বসে বেশ আরাম লাগছে। কে জানে এই শীত শীত ভাব থেকে আবার বিকেলে জর বাড়বে কি না!

আরতি জল এনে দিল। বড় ঠাণ্ডা। দাঁত কনকন করে উঠল। গলায় সইয়ে সইয়ে কয়েক ঢোঁক ঠাণ্ডা জল খেল সুধা। টাগরার কাছে সামান্য কিরকির করে উঠল। কাশি শুরু হবে ভেবে সুধা একটুক্ষণ দম বন্ধ করে থাকল। 'ক'দিনের জরে কি রকম শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছ তুমি সুধাদি—' উমা বলল। কাঁটায় ক'ঘর উল খুলে আরতির ভুল বুনন শুধরে দিচ্ছিল উমা। 'আজ তোমার জর কত?'

'কী জানি—।' বিতৃষ্ণ বিরক্ত স্বরে জবাব দিল সুধা। মাথায় বোধ হয় রোদ লাগছিল এবার। সুধা সরল না, ছেঁড়া শালের টুকরো মাথায় তুলে দিল একটু।

'তোমায় বড্ড ভোগাচ্ছে।' উমা বলল সহানুভূতির স্বরে।

সুধা জবাব দিল না। আরতি আবার এসে একপাশে বসেছে। হৃন্নময়ী

একটু নড়েচড়ে উঠলেন। একটা কাক পাঁচিলে এসে বসে ডাকছিল। সুধার ক্লান্তি লাগছিল, উবু হয়ে বসে থাকতে পারছিল না আর। পা ঝিন-ঝিন করছে, হাঁটু আর গোড়ালিতে যেন খিল ধরে গেছে। সুধার বলতে ইচ্ছে করছিল, অথচ বলতে পারছিল না, তাকে একবার নীচে কলঘরে যেতে হবে।

'তোমাদের এ-পাড়ার ডাক্তার কোনো কাজের নয়—' উমা খানিক অবজ্ঞার স্বরে বলল, 'আট দশ দিন ধরে সমানে জ্বরেই যদি ভুগবে, তবে আর শুধু ওষুধ খেয়ে লাভ কি?'

সুধা তাকাল। উমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, পাড়ার ডাক্তারের চিকিৎসায় যে কিছু হবে এতে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। উমার মুখে অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা। ভাব দেখতে দেখতে নিজের হতাশ বিরক্ত মনোভাব আরও স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারছিল সুধা। উমা ঠিক বলেছে। বেদারডাক্তার তার অসুখ ধরতে পারছে না, ভুল ওষুধ দিচ্ছে, অযথা ভুগিয়ে চলেছে। মনে মনে সুধা হঠাৎ কেমন অধৈর্য হয়ে উঠল। 'এ-পাড়ায় ওই ত ডাক্তার—' সুধা নিস্পৃহ গলায় বলল।

'তুমি আমাদের দেবুদাকে দিয়ে দেখাও। দু'দিনে তোমার জ্বর সারিয়ে দেবে।'

সুধা কিছু বলল না, তাকিয়ে থাকল। উমার মুখে খুব একটা নিঃসন্দেহ ভাব ফুটে আছে। আরতি উলের কাঁটা অতি সতর্ক ভাবে ঘর তুলছে এক মনে।

বসুময়ী নড়েচড়ে এবার পাশ ফিরলেন। উমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের পাতা খুলে চেয়ে থাকলেন।

'শুধু শুধু কেন বিছানায় পড়ে ভুগবে বাপু—' উমা বলল, 'অযথা কষ্ট পাওয়া বই ত না।'

সুধা পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে থাকল। কাকটা উড়ে গেছে। রোদ অনেকটা নরম দেখাচ্ছে। উমা ঠিক বলেছে, অযথা কষ্ট পাওয়া। সুধা ভাবছিল, শুধু শরীরের কষ্ট না—বিছানায় পড়ে থেকে তার ক্ষতি হচ্ছে

অনেক। অফিসে কামাই হয়ে যাচ্ছে। নতুন চাকরি, এই কামাইয়ের দরুন হয়ত মাইনে কেটে নেবে, তা ছাড়া চন্দ্রসাহেব হয়ত জানতে পেরে গেছেন সুধা অফিস কামাই করছে। সুধার শরীর স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনই তার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, এ মেয়েটি রুগ্ন, ঠিক মতন চাকরি করতে পারবে না। অমলাদি লেগে না থাকলে হয়ত চাকরিটা দিতেন না চন্দ্রসাহেব। এখন, সুধার অফিস কামাই দেখে তিনি কি ভাবছেন কে জানে। অবশ্য একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে সুধা পোস্টে। গত মাসের মাইনে এখনও নেওয়া হয় নি। ও অফিসে বাসুকে পাঠানো যায় না মাইনে আনতে। অন্য কারু হাতে মাইনে দেবার নিয়মই হয়ত নেই সেখানে।

কলঘরে যাবার জন্যে সুধা আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। তার ভাল লাগছিল না। শরীরের দুশ্চিন্তার সঙ্গে যখন অফিসের চিন্তা মনে আসে তখন নিজেকে এমন অসহায় মনে হয় যে সুধা ভেবে পায় না, তার ভাগ্যে কি আছে।

ক্লান্ত দুর্বল পায়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াল সুধা।

'এক চির পান দে, আরতি' – রত্নময়ী উঠে বসলেন। আলস্যের এবং তন্দ্রার হাই তুললেন বার কয়। সুধা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে রেলিং ধরে। এলো চুল জড়িয়ে একটা ফাঁস দিয়ে নিলেন রত্নময়ী। জটের মতন দেখাচ্ছিল খোঁপাটা। আরতি মার পান সেজে আনতে ঘরে গেল।

'কথাটা তুই মন্দ বলিস নি, মা - রত্নময়ী উমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেদারডাক্তারের হাতে ফেলে রাখতে আর ভরসা হয় না। কি চিকিচ্ছে যে করছে, কে জানে।'

'আগেভাগেই দেবুদাকে বললে হত, মাসিমা। উমা বলল 'আমি ভেবেছি আপনাকে বলি, মাঝে জ্বরটা কমে গেল বলে আর বলি নি।

'আমারও অতটা খেয়াল হয় নি।' রত্নময়ী একটু যেন কৈফিয়তের স্বরে বললেন, 'নয়ত বলতাম।'

'দাদা বাড়ি ফিরে আসুক মাসিমা, ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব।' উমা বলল, 'আগে জানলে কাকাকে বলে দিতাম প্রেসে যাবার সময়।

রত্নময়ী কিছু বললেন না। কেদারডাক্তারের ওপর তাঁর আস্থা ক্রমেই

কমে আসছিল, সকালে বাসুর কথার পর মনটা কেমন ধাঁধা খেয়ে গিয়েছিল। এখন উমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল, তিনি সত্যি বড় একটা ভুল করেছেন, হাতের কাছে এমন ভাল ডাক্তার থাকতে অযথা তিনি কদারডাক্তারের মুখ চেয়ে বসেছিলেন।

আরতি ছোট্ট এক খিলি পান আর দোক্তার কৌটো এনে দিল। মুখে পান দিয়ে ব্রহ্মময়ী উমার দিকে তাকালেন। তাকানোটা যেন ভারী নরম একটু। একটা কথা বলি বলি করেও চুপ করে থাকলেন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল সুধা কলঘর থেকে ফিরে আসছে। একটা দোক্তা মুখে দিলেন ব্রহ্মময়ী, মুখে পিচ। সামান্য মুখ উঁচু করে পিচ চড়ানো গলায় বললেন 'কত টাকা নেবে মা তা ত জানি না।'

কথা শুনে উমা বেশ অবাক হয়ে ব্রহ্মময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জবাব দিল, 'দেবুদা আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয় না মাসিমা।

ব্রহ্মময়ী চুপ করে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, তোমাদের সঙ্গে তার অত আলাপ পরিচয়, টাকা নেয় না, কিন্তু আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ মা, আমার মেয়েকে শুধু হাতে কেন সে দেখবে।

সুধা ওপরে উঠে এসেছিল। ব্রহ্মময়ী পিচ ফেলতে উঠলেন।

অসুখটা ব্রংকাইটিস, একটু জটিল ধরনের। রোগটার দাপট কমে এসেছিল। ওষুধপত্র কিছু বদলে, যুদ্ধের বাজারে যা একান্ত দুর্লভ সেই বিদেশী কম্পানীর কিছু ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের অ্যাম্পুল যোগাড় করে দেবব্রত চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অসুখটা আয়ত্তে এনে ফেলল সুধার। জ্বর গেল, বুকের ব্যথা, ঘড়ঘড়ে সর্দি, একটানা ভাঙা ভিজে ভিজে কাশিটাও গেল, শুধু অবশিষ্ট থাকল খুকখুকে শুকনো একটা কাশির ঝোঁক আর অসম্ভব দুর্বলতা। সারা শীতের জন্যে গোটা দুই ওষুধ লিখে দিল দেবব্রত, খেয়ে যেতে হবে। হাতে টাকা নেই সুধাদের, অফিস না যাওয়া পর্যন্ত মাইনে আনতে পারছে না,

অগত্যা প্রেসক্রিপশনটা তোলা থাকল। একটা পাই পয়সাও নতুন ডাক্তারকে ছোঁয়ানো হয় নি, সেখানেও কিছু জমেছে।

মাঝে শনিবার প ড গেল বলে সুধা আর গরজ বধে নি। রবিবার সকালে বলল, 'মা, কাল থেকে অফিসে যাব।'

'যাস।' রত্নময়ী মাথা নাড়লেন।

'অনেক দিন কামাই হয়ে গেল।'

রত্নময়ী রান্নাঘরে, সুধা রান্নাঘরের বাইরে রোদে একটা ভাঙা মোড়া টেনে বসে আছে। আরতি ঘরদোরের কাজ সারছে। আজ সকালে হাওয়াটা কম। রোদ খুব গাঢ়।

'শরীরটা এমন হয়ে গেছে মা, পা পাততেই কেমন লাগে।' সুধা বলল।

'দুর্বলতা।' রত্নময়ী অজস্র কাঁকর এবং খদ বেছে শেষ দফায় চালগুলো হাঁড়িতে ফেলে দিলেন। 'রেশনে কী চালই দিচ্ছে হতচ্ছাড়ারা।'

সুধা পিঠ ভুইয়ে বসে পায়ের পাতা দেখছিল। এত সাদা শুকনো হাড হাড় লাগছে দেখতে। এই পায়ে কাল অফিস যাবার জোর পাবে কি না, কে জানে।

'তুই সেই অফিস থেকে টাকা ধার করেছিলি যে, শোধ হয়ে গেছে?' রত্নময়ী শুধোলেন।

সুধা মাথা তুলল না। শীর্ণ রোগা পায়ের আঙুলগুলো কেমন যেন নাড়াচ্ছিল। অস্পষ্ট অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'সব হয় নি'।

অল্পক্ষণ চুপচাপ। রত্নময়ী আনাজের ঝুড়িটা অকারণে সামনে টেনে নিলেন, আধখানা মুলো আর একমুঠো কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়া ঝুড়িতে কিছু নেই। বাসু একটু আগে বাজারে গেছে। যেতে চাইছিল না, তার কাছে পয়সাকড়ি কিছু নেই, তবু রত্নময়ী ধমকে ধমকে পাঠিয়েছেন। ধার টার করে যেমন করে হোক কিছু আনতে হবে। উপায় নেই। 'এ-মাসে কোথা থেকে যে কি করব জানি না।' রত্নময়ী উদভ্রান্ত হতাশ গলায় বললেন। মেয়ের দিকে তাকালেন না। 'এক উটকো অসুখ এসে পয়সা খেল।'

সুধা জবাব দিল না। কথাটা তার ভাল লাগে নি। মনে হচ্ছিল, মা যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছে, অসুখে পড়ে থেকে সংসারের এতগুলো টাকা তুমি খরচ করালে, এরপর কি করে চলবে সংসার তুমি বল। সরাসরি না হলেও, খুব চাপা লুকোনো এক অসন্তোষ এবং অভিযোগ যে মার মনে রয়েছে, সুধা অনুমান করে নিল।

'কেদারডাক্তারের ডাক্তারখানায় কিছু বাকি রয়েছে, নীচের তলায় ঢাকার ছেলেটিকেও এক পয়সা দিই নি' রত্নময়ী আপন মনে কথা বলার মতন করে বলছিলেন, মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন না, 'তার ওপর শেষ মুখে উমার কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে চালালাম।' একটু থামলেন উনি, মেয়ের দিকে তাকালেন এবার, 'সবই ত শোধ করতে হবে।'

সুধা সামান্য পিঠ সোজা করে বসল। সামনে পাঁচিলের ওপর ছিট তোশক রোদে মেলে দিয়ে আরতি ঝুঁকে কি দেখছিল। আজ সকালে খুব কুয়াশা হয়েছিল, কুয়াশা কেটে রোদ এত বেলায় এই যেন উঠেছে, একটু যে লাগে মান। এখনও কেমন একটা ফিকে ধোঁয়াটে ভাব মিশে আছে রোদে। সুধা নিরুপায় অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকল। আকাশের তলায় ধোঁয়ার মতন কুয়াশা ভাসছে, মেঘের আঁচড় নেই। এত স্থির নিরূপ বিষাদ এবং যে দেখাচ্ছিল আকাশটা যে সুধা যেন নিজের সঙ্গে ওই আকাশের কোথায় একটা মিল খুঁজে পাচ্ছিল।

'আমি বলি কি, অফিস থেকে যদি কিছু ধারের ব্যবস্থা করতে পারিস দেখিস একবার।' রত্নময়ী উপদেশ দেবার গলায় বললেন, 'আগের ধার ত অল্পই আছে, না দেবে কেন।'

'দেবে না। সুধা বিরক্ত, একটু বা কর্কশ গলায় জবাব দিল 'ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন ধার দেবার নিয়ম নেই।'

মেয়ের গলার ঝাঁঝে রত্নময়ী চুপ করে গেলেন। প্রথমটায় কেমন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, পরে মনে হল, সুধাকে ধার জোগাড় করতে বলে তিনি অবিবেচনার কাজ করেছেন। এ-সংসারে টাকার অভাব এখন এমন তীব্র যে উচিত অনুচিত বিবেচনার কথা মাথায় আসে না। ভুল হয়েছে, থাক

হয়েছে ; মনে মনে নিজেকে যেন শোনালেন রত্নময়ী, এবং নিচু মুখে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সুধা বসে থাকল। দূরে হালদার বাড়ির তেতলার ছাদে দু'টি বউ রোদ পোয়াতে এল। চাকর এসে বিছানা মাদুর রোদে মেলে দিচ্ছে। দুটি বউয়ের একটি বউ নতুন। দূর থেকেও নতুন বউয়ের চালচলনের ভাবটা লক্ষ্যে পড়ছিল সুধার। দুই জায়ে ছাদে ঘুরে ঘুরে গল্প করছে, হাসছে বোধ হয়। সুধা জোর করে মন আটকে রাখবার চেষ্টা করছিল।

রত্নময়ীর হাত থেকে কি একটা পড়ে গেল। ডালের কৌটো। দু' মুঠো ডাল ছিল বোধ হয়, মাটিতে ছিটিয়ে পড়ল। রত্নময়ী হাত দিয়ে টেনে টেনে তুলে নিচ্ছিলেন। মুখের ভাব গম্ভীর, অপ্রসন্ন।

মার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধা সবই বুঝতে পারল। আগেই পেরেছে। সুধা জানত, এ-রকমই হবে, বরাবর হয়ে আসছে ; যখনই মা ধারের কথা বলেছে, সুধা রাজী হয় নি · তখনই মার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। যেন এই টাকা সুধার জিম্মায় তার বাক্সে লুকনো আছে, মা চেয়েছে, সে দেয় নি! মার ব্যবহার দেখে সেই রকম মনে হয়। অফিসের ক্রেডিট সোসাইটির টাকা যে সুধার গচ্ছিত করা টাকা নয়, সে টাকা দেওয়া-নেওয়ার যে কতক নিয়ম আছে মা সে-কথা বুঝবে না। নিজের অসুখের ওপর বিরক্ত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছিল সুধা। তার অসুখে পড়াই অন্যায় হয়েছে। তার অসুখ হওয়া উচিত না ; যে-সংসারে রোগ বিরোগ হলে ডাক্তার ওষুধের পয়সা জোটে না, জোটাতে হলে হাত পেতে ধার করতে হয়, সংসারে হাঁড়ি চড়াবার উপায় থাকে না—সে-সংসারে আবার অসুখ কি! সুধার মনে হল, তার অসুখ হয়েছে, সে-অসুখের পেছনে সংসারের টাকা খরচ হয়েছে—মা এ-সমস্তের জন্যেই বিরক্ত অসন্তুষ্ট। মনে মনে সুধা ভাবল, তার ভোগ ভোগান্তি কষ্ট যন্ত্রণা—এ-সব কোনো কথাই নয়, সে অসুখে পড়ে সংসারের ক'টা টাকা খরচ করিয়েছে এটাই বড় কথা।

সুধার ভাল লাগছিল না, মার গম্ভীর ক্ষুব্ধ নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রমশই তার অভিমান প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল, এবং ক্রমেই এক তিক্ততা

ব্যক্তি অনুভব করছিল। সুধার মনে হচ্ছিল, মার এই রাগ গাম্ভীর্য অত্যন্ত স্বার্থপর প্রত্যাশার চেহারা। হৃদয়হীন নির্দয় পাওনাদারের মতন দেখাচ্ছে মাকে।

'শান্তি—' সুধা ডাকল।

পাচিলের কোণের দিক দিয়ে আরতি ঘরে চলে গিয়েছিল। ঘরে সে ঝাঁটপাট দিচ্ছিল বোধ হয়। দিদির ডাকে সাড়া দিল।

একটু দেরি হল আরতির আসতে।

'পাশে গিয়ে উমাকে জিজ্ঞেস করে আয় আজ ওদের ডাক্তারবাবু আসবে কি না।' সুধা বলল। বলে একটু থেমে থাকল, যেন বসুময়ীকে শোনাতে চায়, এমন ভাবে বলল আবার, 'আমার একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দরকার—নইলে কাল অফিসে বসতে দেবে না।'

আরতি বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক মতন বোঝে নি, বসুময়ীও মুখ তুলে তাকাল না।

'মেডিকেল সার্টিফিকেট—' আরতি দিদির সঙ্গে কথাটা ঠিক করে জেনে নিতে চাইল।

'হ্যাঁ', মাথা নাড়ল সুধা, 'অসুখ হয়েছে বললেই ত আর অফিস শুনবে না। ডাক্তারকে লিখে দিতে হবে।' সুধা পরোক্ষে বসুময়ীকে কথাটা শোনাতে চাইল।

আরতি চলে যাচ্ছিল, বসুময়ী হঠাৎ বললেন, 'কাজের কথা তুমি একটু নিজে গিয়েও ত বলতে পার।' সুধা বসুময়ীর দিকে সরাসরি তাকালো।

'ও ছেলেমানুষ, কি বলতে কি বলবে, উমাও কি বুঝবে··কোনো কাজ হবে না। তার চেয়ে নিজে গিয়ে উমার কাকাকে যা বলবার বলে আসা ভাল। ওদের ডাক্তার ছেলেটি এলে ওর কাছেই বলবে।' বসুময়ী বড় মেয়ের অবিবেচনায় যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন।

ছেলেমানুষ শব্দটা ঠিক এখন কেন যেন সুধার অসহ্য লাগল। মনে হল, মার কাছে এ-সংসারে সুধা ছাড়া আর সবাই ছেলেমানুষ, তাদের যেন কুটো কাটবারও কথা নয়, যত কিছু সব সুধার ঘাড়ে, সুধার কর্তব্য।

'সব সময় তুমি ওদের অত কচি খোকাখুকি সাজিয়ে রেখ না—' সুধা তিক্ত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে বলল, 'বয়স এমন কিছু কমে যাচ্ছে না তোমার ছেলেমেয়েদের।

রত্নময়ী মেয়ের বিদ্রূপ সহ্য করলেন। কথার জবাব দিলেন না। আরতি বাধা পেয়ে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিদির কথার পর আবার চলে যাচ্ছিল।

'থাক্, তোমায় আর যেতে হবে না।' সুধা রাগের গলায় বলল, বলে উঠে পড়ল। 'ষোলো বছরের ধাড়ি মেয়েও কচি খুকি এ বাড়িতে, আর বিশ বছরের দামড়া ছেলেও কচি খোকা··। কাজের বেলায় সবাই ছেলেমানুষ হয়ে যায়, যত দায় আমার।' সুধা স্পষ্ট রুক্ষ গলায় বলল।

আরতি বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকল। সুধা চলে গেল পাশ দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে সুধা নেমে যাবার পর আরতি রান্নাঘরের দিকে সরে এল। রত্নময়ী নীরবে এবং গম্ভীর মুখে হাতের কাজ সারছিলেন। মা যে কিছু ভাবছে আরতি বেশ বুঝতে পারল।

'অসুখ হয়ে দিদির যেন মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে।' আরতি বলল।

'রোজগার করে খাওয়াচ্ছে মেজাজ হবে না।' রত্নময়ী কাঠ গলায় জবাব দিলেন।

'সব সময় এত রাগ ভাল না।' আরতি কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে মার মুখোমুখি সুধার জায়গায় একটু বসল।

'তোমাদেরও কপাল মা—' রত্নময়ী কোনো দিকে না চেয়ে আপন মনে বললেন, 'দু বেলা উঠতে বসতে খোঁটা খেয়ে লাথি ঝাঁটা সহ্য করেও পড়ে আছ। লজ্জাও করে না। আমি কি করব···; সে মানুষটা যদি কোনো রকমে দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করে যেত আমি কি ওই মহারানীর মেজাজ সহ্য করতাম।' রত্নময়ীর সমস্ত মুখ বিষাদঘন তিক্ত হয়ে এসেছিল, 'ভগবান আমার কপালে এই লিখেছিলেন—খানায় পড়েছি, কাদা গায়ে মেখে মরতে হবে।'

আরতি যতটা না মন খারাপ করে কথা বলতে এসেছিল রত্নময়ীর কথার ভাবে-ভাবে তার দশ গুণ মন খারাপ হয়ে গেল। দিদির কথায় একটু রাগ হয়েছিল হয়ত, বয়সের খোঁটা কার না লাগে, ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সামান্য, অথবা বকুনি খেয়ে মুখ গোমড়া করেছিল অল্প—কিন্তু রত্নময়ীর সঙ্গে কথা বলতে এসে এত কথা সে ভাবে নি। বরং মার সঙ্গে দিদি কথা কাটাকাটি করে গেল বলে যেন মন হালকা করতে এসেছিল মার, দিদির ওপর রাগ ফলাতে নয়। মার কথ বার্তা শুনে কেমন চুপ করে গেল আরতি।

রত্নময়ী উনুন খুঁচিয়ে দিলেন। দু মুঠো কয়লাও আর নেই। শেষটুকু আজ সকালে খরচ হয়ে গেল। এবারে কাঠের চেলা দিয়ে উনুনে আঁচ রাখতে হবে। কাঠের ধোঁয়ায় রত্নময়ীর বুকে শ্বাস আটকে ধরে। বড় কষ্ট হয়। এই কাঠ এখন কত দিন চলবে কে জানে, কবে বাসু ধরে-করে এদিক-ওদিক থেকে কিছু কয়লা এনে দেবে রত্নময়ী জানেন না।

'দুটো কাঠ নিয়ে আয় -' রত্নময়ী বললেন।

আরতি উঠল না, কথাটা তার কানে যায় নি। ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল।

ঝকঝকে রোদ আবার একটু ঘোলাটে হল, অল্প পরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নীচে উমাদির গলা শোনা যাচ্ছে। গলিতে গৌরাঙ্গদার গলা শুনতে পেল আরতি। দাদাকে ডাকছে। দু'টো চড়ুই পাঁচিলে তোশকের ওপর বসে ঝগড়া করতে করতে উঠোনে নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ফরফর করে আরও একটা চড়ুই নেমে এসে একটার হয়ে লড়তে লাগল। আরতি ঝাপসা ভাবে দেখছিল সব, গৌরাঙ্গদার ডাক কানে আসছিল—কিন্তু কি যে ভাবছিল।

'কই রে, উঠলি—' রত্নময়ী তাড়া দিলেন।

'কি ?'

'দু'টো কাঠ এনে দে।'

আরতি উঠল। প্রথমে পাঁচিলের কাছে গিয়ে বুক ঝুঁকে গলি দেখল গৌরাঙ্গদা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে কাছে ডাকল। বলল

রত্নময়ী উনুনে কাঠ গুঁজে দিয়েছিলেন, সবে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে, মেয়ের কথা কিছু বুঝলেন না। হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকলেন, 'কি ?'

'ছবি···'

'কিসের ছবি ?' ধোঁয়ার দমকায় গলা বুজে এসেছে রত্নময়ীর।

'বুকের ছবি। নীচের ডাক্তার আমার বুকের ছাব তুলতে বলেছে।'

রত্নময়ী বিন্দু-বিসর্গ বুঝলেন না। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির আশ্চর্য তৎপরতা। সুধার কথা, গলার স্বর, তার মুখের ভাব ভাঙ্গ থেকে প্রায় পলকেই একটা সর্বনাশের ভীত চিন্তা রত্নময়ীকে আতঙ্কিত করল। হাত নেড়ে নেড়ে চাপ ধোঁয়ার আড়াল পরিষ্কার করে মেয়ের মুখ আরও স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। চোখ জ্বালা করছিল।

'কি বলছিস তুই · কে তোকে বলল ··' রত্নময়ী উৎকণ্ঠিত। বিরক্ত হয়ে ধোঁয়ার হাত এড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। 'অফিসে যাবার জন্যে লিখে দেবে না ?'

সুধা মার মুখোমুখি তাকাল। খুব ভীত অবসন্ন করুণ দেখাচ্ছিল তাকে। তবু সংসারের এই পশুর মতন প্রত্যাশার জবাব না দিয়ে পারল না। 'অফিসে যাবার কথা লিখে দেবে। তবে উমার কাকা বললেন, 'ওঁদের ডাক্তার ওঁকে আগেই বলেছিল, জ্বর জ্বালা সেরে গেলে আমার একটা বুকের ছবি নিতে হবে।'

'কি হয় সে ছবিতে ?' রত্নময়ীর গলা অসহায়ের মতন শোনাচ্ছিল।

'কি হয় ? কি হয় তুমি জান না, মা ?' সুধা কয়েক মুহূর্ত তার ভয় উৎকণ্ঠা অবসাদ যেন ভুলে গেল, মার ওপর অপরিসীম ঘৃণা বিতৃষ্ণা শত্রুতা বোধ করছিল। মনে হল, এ-সংসারে এই মানুষটার মতন স্বার্থপর নিষ্ঠুর কুটিল আর কেউ নেই। শত্রু, সুধার সব চেয়ে বড় শত্রু এই মা।

'কি হবে সে-ছবিতে—?' রত্নময়ী অধৈর্য স্বরে শুধোলেন আবার।

'আমার বুকের ভেতরটা দেখা যাবে।' সুধা শক্ত নির্মম গলায় বলল। বলে মার বসন্তের দাগ মেলানো অসম্ভব ফরসা, প্রায় সাদা পাথরের মতন ফরসা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

চার

প্রেসের কাজ-কর্ম চুকিয়ে উঠতে উঠতে আজকাল রাত হয়ে যায় গিরিজাপতির। আটটার আগে বড় একটা ওঠা যায় না। কোনো কোনো দিন আরও রাত হয়। প্রেসে কাজের চাপ দিন দিন বেড়েই উঠছে। পাঁচ-সাত মাস আগেও, গিরিজাপতি যখন আসেন, তখনও এ-অবস্থা ছিল না। তারও আগে স্কুল কলেজের চটি চটি বই, বিয়ের পদ্য, ক্যাশমেমো ছেপেই প্রেস চলত। মিহিরের কাছেই গল্প শুনেছেন গিরিজাপতি, বছর খানেক আগেও তার প্রেসের একমাত্র ভরসা ছিল বেঙ্গল ইনসিওরেন্স কম্পানীর কিছু খুচরো কাজ-কর্ম, ভাউচার মেমো টুকটাক এই সব। বারো মাসের কাজ, খুব একটা লাভ না থাক, মোটামুটি প্রেসটাকে চালিয়ে রেখেছিল। মিহিরের প্রেসের ঢিমে-তেতালা ভাবটা কাটতে শুরু করে গত পুজোর মুখ থেকে, গিরিজাপতি যখন আসেন। মিহির কিছু সরকারী ছাপানো কাজের সাব-কনট্রাকটারি যোগাড় করে এনেছিল। গিরিজাপতি এসে দেখেছিলেন, কাজ এনেও মিহিরের শান্তি ছিল না। তার ভাবনা ছিল, সরাসরি কাজ নয়, পরের হাতে পয়সা, লাভ খেতে গিয়ে না লোকসানে পড়তে হয়। মানুষ যেমন অনেক দ্বিধার পর কপাল ঠুকে একটা বড় রকম ঝুঁকি নেয়, মিহিরও সেই ভাবে ছাপার সাব-কনট্রাকটারি নিয়েছিল। কিন্তু ফলটা ভালই হল। কপালে দান পড়ার সময় এসেছিল মিহিরের। প্রথম প্রথম কটা কাজই ভালয় ভালয় চুকল, আসল লোকের সঙ্গে গোলমাল হল না; টাকা-পত্তরও আশাতীত তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল, মিহিরের মন থেকে দ্বিধা ভয় ঘুচে গেল। ওর কপালে তখন স্বয়ং লক্ষ্মী হাত রেখেছেন, ঘোরাফেরা করে প্রথমেই ও সরাসরি একটা ছাপার কাজ যোগাড় করে ফেলল, সরকারী কাজ, কাজটা সময় মতন উতরে দিল, হাজার দুয়েক টাকা লাভ হল নগদ। তারপর থেকে মিহিরের প্রেস সরকারী খাতায় নাম পেয়েছে। দেদার কাজ আসছে,

মিহিরও জুটিয়ে আনছে। এখন সমস্ত প্রেসে কেবল নানা চেহারার নানান ধাঁচের ফর্ম ছাপার কাজ। কোনোটা আয়রন কনট্রোল বোর্ডের, কোনোটা ডিরেক্টর অব মিউনিশান প্রোডাকশন ডিপোর, কোনোটা বা নিতান্ত মামুলি কিছু। গিরিজাপতিরও ধারণা ছিল না, এই ছুটো কাজের প্রাথমিক এবং আপাত-চেহারাটা যত তাচ্ছিল্যের এর ফলাফলের স্ফীত রূপটা তেমনি বিস্ময়কর। দশ বিশ হাজার ছাড়া অর্ডার থাকে না, লাভের পরিমাণও পরিণামে বেশ মোটা দাঁড়ায়। মিহির প্রথম প্রথম বলত, বেশি ময়দা মাখতে সাহসে কুলোয় না গিরিজাদা, যদি সামলাতে না পারি—সব যাবে। দেখা গেল মিহির বেশ গুছিয়ে হিসেব করেই ময়দা মাখতে পারছে এবং তার কিছুই নষ্ট যাচ্ছে না।

ছোট-খাটো প্রেসটা ক্রমশ বেড়ে চলছিল। আগে, গিরিজাপতি যখন আসেন, প্রেসের খানতিনেক ঘর আর ভেতরের ঢাকা উঠোনে যাবতীয় কাজ-কর্ম হত। বড় ঘরটায় ফ্ল্যাট মেশিন ঘর জুড়ে বসে থাকত, পাশের ছোট ঘরে ট্রেডল মেশিন আর কাগজের স্তূপ; বাকি ঘরটায় ছিল অফিস। টানা ঢাকা বারান্দার উত্তর দিকটা আড়াল দিয়ে কম্পোজিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই প্রেসের এখন এ-বাড়িতেই ছ খানা ঘর, গলির শেষে পনের নম্বর বাড়ির নীচেরতলায় আরও তিনখানা মস্ত মস্ত ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে, জায়গার তবু অকুলান। পনের নম্বর বাড়ির দু খানা ঘরই গুদামখানা, পর্বত প্রমাণ কাগজের স্তূপ। বাকি ঘরটায় আরও একটা মেশিন বসেছে ছাপার। কাগজ কাটার একটা মেশিন বসিয়ে নিয়েছে মিহির একপাশে বারান্দায়। আর খুব সম্প্রতি ওই বাড়িরই ফাঁকা চাতালের মাথায় টিনের শেড দিয়ে ইটের দেওয়াল ঘিরে কম্পোজিং সেকশান বসিয়েছে। আরও ঘর দরকার, জায়গা দরকার। দু জায়গায় ছড়ানো প্রেস এক জায়গায় গুটিয়ে নিতে পারলে সব দিক থেকে সুবিধে; চেষ্টা করছে মিহির, পাচ্ছে না। কলকাতায় এখন ঘর বাড়ি পাওয়া সহজ নয়, অলিগলি ভরে গেছে, নানা জায়গার নানান পেশার মানুষ শহরটাকে ক্রমশ ঘিঞ্জি করে তুলেছে।

প্রেসের ঘর মেশিন টাইপপত্র কম্পোজিটার যে পরিমাণে বেড়েছে সে-

পরিমাণে আরও কিছু লোক নেওয়া উচিত ছিল প্রেসের দেখাশোনার জন্যে। মিহির তা নেয় নি। অবনীকে বাদ দিলে নতুন বলতে এসেছে সুধাংশু দত্ত আর রায়মশাই। দু বাড়িতে দুই দারোয়ান রেখেছে মিহির। গিরিজাপতির অফিস ঘরে আগে একপাশে থাকত গিরিজাপতির টেবিল অন্য পাশটায় কাগজের রিম থাক করা। এখন আর কাগজপত্র থাকে না। আরও একটা টেবিল পড়েছে, গিরিজাপতির মুখোমুখি প্রায়, সুধাংশু বসে। হিসেবপত্র রাখা এবং দেখাশোনার জন্য সুধাংশুকে আনা হয়েছে। অফিস ঘরের আসবাবপত্রও বেড়েছে কিছু, একটা স্টীলের আলমারি, বেঁটে লোহার সিন্দুক, আর ফোন। অবনী আর রায়মশাই পাশের ঘরে খুপরি করে নিয়ে বসে। প্রেসের মালিক মিহিরেরই বসবার জায়গা নেই, অবশ্য দুপুর কি বিকেলের দিকে প্রেসে বড় একটা সে থাকে না, যতক্ষণ থাকে গিরিজাপতির সামনে কি সুধাংশুর চেয়ারে বসে। অন্য সময় সকাল সন্ধ্যে এই অফিস ঘরেই তার অফিস।

আজকাল শীত মরছে দিন দিন, বিকেলের দীর্ঘতাও হ্রাস পেয়েছে। তবু এখন সোয়া সাতটা। একটু আগে অফিস ঘরে দেওয়াল ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে। গিরিজাপতি হাতের কাজ সেরে এইমাত্র মুখ তুললেন। ভোলানাথ পরিষ্কার ধোয়া কাপে এক কাপ গরম চা রেখে গেছে, জলের গ্লাস শূন্য, মুখের ঢাকাটা দোয়াতদানের পাশে পড়ে আছে। টেবিলের ওপর কিছু নতুন ছাপা কাজের নমুনা। বেতের ট্রের মধ্যে একগাদা কাগজপত্র, দরকারী আর পাঁচটা টুকটাক পড়ে আছে ছড়িয়ে।

চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে গিরিজাপতি ক্লান্তির নিশ্বাস ফেললেন। চশমাটা খুলে ব্লটিং প্যাডের ওপর রেখে দিয়েছিলেন আগেই। দু চোখ বুজে থাকলেন অল্প একটু, যেন শ্রান্তি কাটাতে চাইছিলেন।

ফ্ল্যাট এবং ট্রেডল দুটো মেশিনই সমানে চলছিল এতক্ষণ; আপাতত ফ্ল্যাটটা থেমেছে। ফলে প্রেসের দিক থেকে ট্রেডেলের এবং কর্মচারীদের মিশ্রিত গলার স্বর ভেসে আসছিল। দু চারটে কথার টুকরোও। বড় মেশিনের ভারী শব্দ থেমে যাওয়ায় কেমন একটা চুপচাপ ভাব এসেছিল।

গিরিজাপতি অবসাদে চোখ বুজেই থাকলেন, এবং সর্বক্ষণের চড়া যান্ত্রিক শব্দটা কিছু লঘু হওয়ায় একটু আরাম পাচ্ছিলেন। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসছিল। এ হাওয়া শীতের নয়, বিগত শীতের, একটু বা বসন্তের উষ্ণতা আছে।

পার্টিশানের ওপাশে অবনীর গলার স্বর কানে গেল। কি যেন বলছে। মনে হল, রায়মশাই বাড়ি যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অবনী বাকি কাজটুকু সেরে যেতে বলছে। রায়মশাই এই প্রেসে পার্ট-টাইম চাকরি করেন, পাঁচটা নাগাদ আসেন, আটটায় যাবার কথা, প্রায়ই তার আগে ভাগে চলে যান। কাজটা তাঁর প্রুফ দেখার। গত বিশ বছর নাকি এই ভাবে প্রুফ দেখেই তাঁর চলছে। দুপুরে অন্য প্রেসে চাকরি করেন। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের, পঞ্চাশ ছাড়িয়েছেন। শীর্ণ রোগাসোগা মানুষ, মনে হয় বয়সটা যেন ষাটের কাছাকাছি চলে গেছে।

গিরিজাপতি চোখের পাতা খুলে সামনের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকলেন। মনে হল, দরজার বাইরে কেউ এসে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য অপেক্ষা করলেন। দরজার কাছে একটু গাঢ় ছায়া।

'কে, ভোলা না কি?' গিরিজাপতি ডাকলেন।

গাঢ় ছায়াটা সরে যাবার চেষ্টা করল, অথচ সরে গিয়েও চলে গেল না। পলকের জন্যে অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে এল।

নরেন, প্রেসের কম্পোজিটার। নরেন ধীরে ধীরে চৌকাট ডিঙিয়ে সামনে এসে একটু তফাতে দাঁড়াল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা, গায়ে গেঞ্জির ওপর একটা সুতির সোয়েটার। হাতে কালিঝুলি। কাজ করতে করতে উঠে এসেছে। গিরিজাপতির ধারণা হল, কিছু টাকার জন্যে এসেছে নরেন।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। খেয়াল হতে চায়ের কাপ হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন গিরিজাপতি।

'কি খবর, নরেন?' গিরিজাপতি শান্ত সরল গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

নরেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল একটু, পরে আধাআধি মুখ তুলল। 'আমার কথাটা বলেছিলেন বাবুকে?'

গিরিজাপতি দু মুহূর্ত নরেনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মাথায় খাটো গালভাঙা মলিন এই মানুষটার পেছনে ঘরের ঝাপসা আলো এবং দেওয়ালের মাথার অন্ধকার দুর্বোধ্য এক দীনতা রচনা করেছিল। চায়ের কাপে অল্প করে চুমুক দিয়ে কিছু অস্বস্তি কিছুটা বিব্রত ভাবে নিয়ে গিরিজাপতি দরজার মাথার দিকে তাকালেন। সুন্দর করে কুলুঙ্গি সাজানো, কাঠের ফ্রেমের মধ্যে কাচের ঢাকনার আড়ালে রুপোর গণেশ। সিঁদুরের দাগ কুলুঙ্গির মাথায়। দাগটা এখন দেখা গেল না, গিরিজাপতি অনুমান করে নিলেন।

'বলেছিলাম।' গিরিজাপতি খাটো গলায় বললেন, চুপ করে থাকলেন একটু, 'রাজী হচ্ছেন না।'

নরেন যেন জানত জবাবটা কি হতে পারে। তার মুখের পরিবর্তন বড় একটা হল না। একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, কথা বলল না।

'আরও দু একটা মাস যাক; আমি বলে কয়ে কিছু করে দেব।' সান্ত্বনা দিয়ে গিরিজাপতি বললেন।

'সবার পাঁচ দশ পনের টাকা করে মাইনে বাড়ল, আমি কোন অপরাধ করলাম ম্যানেজারবাবু, আমার এক পয়সা বাড়ল না।' নরেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট গলায় অভিযোগ করল।

গিরিজাপতি জবাব দিলেন না। চায়ের কাপে মুখ ঠেকিয়ে আপাতত এই ব্যাপারটা যেন সরিয়ে দিতে চাইলেন।

'হপ্তার অ্যাডভান্সে আমায় কখনও দশ টাকার বেশি দেওয়া হয় না।' নরেনের গলার স্বর তিক্ত, 'এমন করলে এখানে কাজ করাই মুশকিল।'

কেন যেন হঠাৎ একটু অপ্রসন্ন হয়ে পড়লেন গিরিজাপতি। 'তোমার ত অনেক আগেই এখানকার কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

নরেন তাকাল। কথাটার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে। কয়েক মুহূর্ত আহত অপমানিত অক্ষম মানুষের মতন ক্ষুব্ধ কাতর মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল, পরে ক্রমশ কেমন একটা অবাধ্য জেদী ভাব তার গলার স্বরে এবং দৃষ্টিতে প্রখর হয়ে উঠল। 'একবার দু মুঠো টাইপ নিয়েছিলাম বলে আমার মাইনে বাড়াবেন না আপনারা?'

গিরিজাপতি জবাব দিলেন না। নরেনের এতটা উত্তেজনা তাঁর ভাল লাগছিল না। ছোকরা মিথ্যেবাদী। প্রেসের অনেক টাইপ লেড্ সে চুরি করে নিয়ে যেত। ধরা পড়ার পর মিহির তাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, ছোকরা তখন গিরিজাপতির কাছে এসে অনেক কান্নাকাটি করেছে। বাড়িতে বউ বাচ্চা-কাচ্চা বুড়ো বাপ মা, চাকরিটা না থাকলে মারা যাবে। মিহিরকে রাজী করাতে গিরিজাপতির বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মিহির কিছুতেই সম্মত হয় না; বলে, লোকটা সুবিধের নয় গিরিজাদা। ওর কথা কিছু বিশ্বাস করবেন না। ওটা একটা রাস্কেল। দেশে বাপ মা বউ আছে, বাড়িতে এক পয়সাও পাঠায় না, একটা মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে সিঁথির দিকে ঘর ভাড়া করে আছে। মদ-টদও খায় শুনেছি।

নরেন সম্পর্কে ধারণা গিরিজাপতিরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু লোকটার প্রয়োজন এবং তার কান্নাকাটি অনুশোচনা দেখে মিহিরকে অনেক কষ্টে তিনি রাজী করিয়েছিলেন। অথচ নরেনের ইদানীংকার ব্যবহার দেখে মনে হয় যেন অপরাধটা মিহির এবং গিরিজাপতির, নরেনের নয়।

গিরিজাপতি কথা বলছেন না দেখে নরেন আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। 'একবার কি গোলমাল হয়ে গেছে বলে আমার দিকে কেউ তাকাবেন না—' নরেন আপন মনে কথা বলার মতন বিড়বিড় করে বলছিল, তার গলার স্বরে রাগ ক্ষোভ প্রতিবাদ এবং তিক্ততা।

'তোমার যা বলার নরেন, মিহিরবাবুকেই বল।' গিরিজাপতি চায়ের কাপ টেবিলের এক পাশে নামিয়ে রাখলেন। ঘড়িতে সাড়ে সাতটার ঘণ্টা বেজে গেল।

নরেন নড়ল না, দাঁড়িয়ে থাকল।

গিরিজাপতির হাতে আপাতত কোনো কাজ ছিল না। হাত বাড়িয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকাটা তুলে নিলেন।

'প্রেসের ক'টা ভাঙা টাইপ নিলে আমরা চোর হয়ে যাই, আর অ্যাকাউন্টবাবু প্রেসের কাগজ বেচে দেন…' নরেন বেপরোয়া উত্তেজিত গলায় বলে ফেলল।

গিরিজাপতি তাকালেন। নরেন চুপ করে গেল। কপালের ওপর দিকে ভাঁজ পড়েছে গিরাজাপতির, মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। বোঝা যাচ্ছিল না তিনি বিরক্ত হয়েছেন না বিস্ময় দমন করবার চেষ্টা করছেন।

নরেন আর কথা বলার ভরসা পেল না। অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অনেকটা সময় চুপচাপ বসে থাকলেন গিরিজাপতি। দরজা এবং দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, স্টীলের বন্ধ আলমারি এবং বেঁটে সিন্দুকটার দিকেও চেয়ে থাকলেন, অথচ বার বার তাঁর দৃষ্টি সুধাংশুর চেয়ার টেবিলের দিকে আটকে ছিল। ফাঁকা চেয়ার, তবু গিরিজাপতি যেন সুধাংশুকে দেখতে পাচ্ছিলেন। ফরসা গোলগাল চেহারা, মাথার মাঝখানে সিঁথি, ডান গালের একপাশে কান ঘেঁষে একটা আঁচিল। প্রায় গোল ফোলা ফোলা মুখের তুলনায় সুধাংশুর চোখ দুটি একটু ছোট, চোখের তারা সামান্য কটা রঙের। নাক ছোট, ঠোঁটের আগায় সব সময় হাসির ভাব। হরদম পান খায়। দু চারটে সিগারেটও না খায় এমন নয়, কিন্তু গিরিজাপতির সামনে খায় না। কেন খায় না কে জানে! হয়ত মিহির খেত না বলেই। আজকাল মিহির সামনেই খাচ্ছে।

সুধাংশু বসে বসে একমনে হিসেবের কাগজপত্র নাড়ছে, গিরিজাপতি একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে দেখছেন যেন--অনেকটা এই ভাবে সুধাংশুর ফাঁকা চেয়ারের দিকে চেয়ে থাকলেন গিরিজাপতি। ঠিক মতন কিছু বুঝতে পারছিলেন না। সুধাংশু যে খুব চালাক চতুর এবং বুদ্ধিমান সে পরিচয় গিরিজাপতি পেয়েছেন। মাস তিনেক এসেছে এখানে, কাজে-কমে তার বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়েছে। মিহিরের পূর্ব পরিচিত ; সম্পর্কে আত্মীয় হয়— এ-সব সত্ত্বেও খুব একটা মাইনে সে পায় না, কিংবা মিহিরের সঙ্গে গলায় গলায় হয়ে নেই এখানে। সুধাংশুকে অবিশ্বাস করতে বাধে, আবার পুরোপুরি তাকে বিশ্বাস করতেও এখন খটকা লাগছিল গিরিজাপতির।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে বসে থাকলেন গিরিজাপতি। নরেনের কথার এতটা গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হচ্ছিলেন।

উচিত হয় নি, নিজেকে নিজেই উপদেশ দিয়ে মনে মনে বলছিলেন, নরেন ছোকরা ভাল না, তার মতি-গতি স্বভাবও ভাল না, তার কথায় সুধাংশুর মতন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন একজন ভদ্র ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত।

নিজের অবিবেচনার জন্যে সামান্য বিরক্ত এবং অপ্রসন্ন হলেন গিরিজাপতি নিজেরই ওপর। ভাবলেন, এই প্রেসে তাঁর কর্তৃত্বের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে এই আশঙ্কায় কি তিনি সুধাংশু সম্পর্কে বীতরাগ হয়ে আছেন, নয়ত সামান্য কথায় এতটা চিন্তা করার কি ছিল।

কাগজের গুদোম ও-বাড়িতে। গুদোমের চাবি মিহিরের কাছে। সরকারী কাজের কাগজ। এ-কাগজ বেচা অসম্ভব। সুধাংশু চাবি কোথায় পাবে? তার সাহসই বা হবে কেমন করে? ও-বাড়িতে দারোয়ান আছে, কাজ-কর্ম চলছে, মানুষ-জন থাকে রাত পর্যন্ত।

নিজের কোনো দায়িত্ব কোথাও নেই এই চিন্তা গিরিজাপতিকে যেমন স্বস্তি দিচ্ছিল, তেমনি এ-রকম একটা খারাপ চিন্তা তাঁর মনে এসেছিল এই গ্লানি তিনি কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না।

'প্রবাসী'র কয়েকটা পাতা আলগোছে উলটে গেলেন। প্রেসে ট্রেডল্ মেশিনটা সমানে চলছে। খোলা জানলা দিয়ে গলি বেয়ে একটা ঘুঘনিঅলার ডাক ভেসে এল। আটটা বাজল প্রায়।

'অবনী।' গিরিজাপতি ডাকলেন।

পার্টিশানের ওপাশে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল অবনী, চেয়ার ঠেলার শব্দ কানে গেল গিরিজাপতির।

দু মুহূর্ত পরেই অবনী ঘরে এসে দাঁড়াল।

'রায়মশাই চলে গেছেন?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

'এই গেলেন।'

'তোমাদের কাজ-কর্ম শেষ?'

'আমি ওভারটাইমের হাজরিটা লিখে নিচ্ছি।'

'ও-বাড়িতে কে কে আছে?'

'ও-বাড়িতে কম্পোজিটার আজ কেউ নেই। একটা মেমোরেন্ডাম ছাপা হবে কাল, মেশিনে তৈরী করে রেখে দিচ্ছে।'

'মেমোরেনডাম?' গিরিজাপতি অবাক হলেন।

'সুধাংশুবাবুর কাজ।' অবনী সাধারণ গলায় বলল, 'উনিই কম্পোজ করিয়ে দেখে শুনে সব ঠিক করে দিয়ে গেছেন গতকাল। আজ মেশিনম্যান নিয়ে চালাতে পারি নি, রেডি করে রাখিয়ে দিচ্ছি— কাল ছেপে দেব।'

গিরিজাপতি একটু চুপ করে থাকলেন। তাঁর সামনে অর্ডারের খাতা পড়ে আছে। প্রত্যহ অন্তত দশ বার করে খাতার পাতা উলটোতে হয়, অথচ সুধাংশুর মেমোরেনডামের কথা কোথাও লেখা আছে বলে তিনি মনে করতে পারছেন না। হয়ত সুধাংশুর নিজের ব্যাপার বলে অর্ডার খাতায় লেখায় নি।

'কিসের মেমোরেনডাম হে?'

'ওর একটা কোম্পানীর, ট্রেডিং করপোরেশন। ডিরেক্টারস বোর্ডে মিহিরবাবুর নাম আছে।'

অবনীর সরল নিরীহ মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলেন গিরিজাপতি। কিছু বললেন না।

অবনী চলে গেল। কেন যেন অনেকটা সময় ভাল মতন নিশ্বাস নিতে পারলেন না গিরিজাপতি, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এই প্রেসের মধ্যে কি যেন একটা হচ্ছে, বা হবার উপক্রম হচ্ছে। কিছুদিন ধরে দু তিন জন ভদ্রলোক মাঝে মধ্যেই প্রেসে আসেন। মিহিরের সঙ্গে তাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। সুধাংশুর সঙ্গে সকলেরই বেশ পরিচয়। ওদের মধ্যে পার্থবাবুর সঙ্গে গিরিজাপতিরও সামান্য পরিচয় হয়েছে, ব্যাঙ্কের লোক, দি নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। এই প্রেসের একটা মোটা টাকার অ্যাকাউন্ট খুলেছে মিহির দি নিউ বেঙ্গল প্রেসে। যদিও বা জানা। গত মাসে এই ব্যাঙ্কে মিহির কেন অ্যাকাউন্ট খুলেছে গিরিজাপতি জানেন না। মিহিরই বলেছিল আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব আছে গিরিজাদা ওই ব্যাঙ্কে বেঙ্গলী এনজিনিয়ারস্, চিত্তদাকে চেনেন না, চিত্তদা আছেন, সেনশর্মা আছে, আরও আছে অনেক। গিরিজাপতি অবশ্য

চিত্তর নামটা মনে করতে পেরেছিলেন, বহুকাল আগের স্মৃতি থেকে মানুষটার চেহারা অবশ্য ঠিক মনে আনতে পারেন নি। গিরিজাপতিদের ঠিক সমবয়সী বা সহকর্মী ছিল না চিত্ত।

ঘড়িতে আটটা বাজল। আজ এ-বাড়িতে কাজের চাপ কম। ন'টা পর্যন্ত হয়ত মেশিনটা চলবে। কম্পোজিটারেরা কাজ-কর্ম গুটোতে শুরু করেছে, হাত ধুতে ধুতে সাড়ে আটটা বাজিয়ে দেবে, আড়াই ঘণ্টা ওভারটাইম হল আজ, আধ দিনের মজুরি। কেষ্টবাবুকে ডেকে একবার প্রেসের খোঁজ নেবেন কি নেবেন না গিরিজাপতি ভাবলেন। সান্যাল কম্পানীর বইয়ের কাজটার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। কলেজ টেক্সট ত্রিশ চল্লিশ ফর্মার বই। ইন্টারমিডিয়েট ফিজিক্স। তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছে সান্যাল কম্পানী। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল পাঁচটা ফর্মাও ছাপা হয় নি, এপ্রিলের মধ্যে যে কি করে এই ছাপা শেষ হবে কে জানে। মিহির এসব কাজে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না। বলে, বই-টইয়ের কাজ নেবেন না আর গিরিজাদা, প্রেসের অবসর কোথায়। তার উপর এই তো রেট, তিন চার মাস দিনরাত কাজ করে বই তুলে দাও, টাকার বেলা আজ পঞ্চাশ কাল ষাট—পাকা এক বছরে টাকা মেটায়। হবে-দরে পাঁচশো টাকাও প্রফিট আসে না এ সব কাজে।

আজই বিকেলে সান্যাল কম্পানীর মালিক হরিসাধনবাবু ফোন করেছিলেন। গিরিজাপতি কথা দিয়েছেন, আগামী-কাল পরশুর মধ্যে কিছু কাজ তুলে দেবেন। কিন্তু যা অবস্থা তাতে এ-সপ্তাহে আদপেই কাজ হবে বলে ভরসা নেই।

'ভোলা—' গিরিজাপতি ডাকলেন।

আশেপাশে ভোলানাথের থাকার লক্ষণ আছে বলে মনে হল না। সাড়াশব্দ নেই। পার্টিশানের ওপাশে অবনীও নেই—ও-বাড়িতে গেছে। প্রেসের মধ্যেও কেমন একটা থিতানো ভাব এসেছে, ট্রেডল মেশিনটা বন্ধ হয় নি।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন গিরিজাপতি। জানলার বাইরে মিহি

জ্যোৎস্না ফুটেছে। জবাগাছের ঝোপ আর মালতিলতার একটা কুঞ্জ হয়ে আছে জানলার পাশে ফাঁকা জমিটুকুতে। অল্প অল্প হাওয়া আসছিল। গিরিজাপতি উঠে আসতে গিয়ে জানলার সামনে এসে হঠাৎ কেন যেন দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কিছু দেখা যায় না। টিনের ভাঙা শেডের একাংশ, পাঁচিল—তারপর গলি। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলার উপায় নেই। ফালি ফালি শূন্যতার গলি ধরে সামান্য জ্যোৎস্নার আলো এসেছে, একটু বাতাস আসছে—এটুকুই যেন যথেষ্ট। তবু অন্যমনস্ক ভাবে গিরিজাপতি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পাতলা চোরা উঁকি মারা জ্যোৎস্নায় ধুলো-জমা জবাগাছের ঝোপ অত্যন্ত মলিন দেখাচ্ছিল। একটা বড় ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে, কাপড়ের টুকরোর মতনই দেখায়। দারোয়ানের গলা শোনা যাচ্ছিল, টিউবওয়েলের হাতল নাড়ছে আর শ্লোক গাইছে। লোকটা এত রাত্রে জল তুলে স্নান করে রোজ। স্নান করার সময় শ্লোক আওড়ায় এক নাগাড়ে।

গিরিজাপতি কোনো কিছুই লক্ষ্য করে দেখলেন না, কিছু চোখে পড়ল, কিছু গলার স্বর কানে গেল, এবং জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করতে পারলেন তাঁর মন বেশ ভার হয়ে উঠেছে। ইদানীং কারণে অকারণে মাঝে মাঝেই মন এইরকম ভার হয়ে যায়, মনে হয় যেন বোঝা চেপে আছে। কেন হয় গিরিজাপতি ঠিক বোঝেন না, হয়ত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায়, হয়ত কোনো অস্পষ্ট আশঙ্কায়। আজ এখন এই যে কেমন খারাপ লাগছে, মন চঞ্চল এবং চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এর যথার্থ কারণ কিছু নাই। নরেনের মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারে তাঁর কোনো হাত নেই, তার মন্দ স্বভাবের জন্যেও তিনি দায়ী নন, তবু নরেনের চিন্তা দূর করা যাচ্ছে না। মিহিরের কথাও মনে আসছে। সুদিন এবং সুযোগ তাকে পরিবর্তিত করছে বলে কেমন একটা আক্ষেপও রয়েছে গিরিজাপতির মনে। কেন থাকবে? সুধাংশুর ওপর তাঁর অপ্রসন্ন হওয়া অনুচিত, তবু কেন অপ্রসন্ন হচ্ছেন? না, অপ্রসন্ন হয়ত ঠিক হচ্ছেন না, কোথায় একটা চাপা আশঙ্কা অনুভব করছেন।

'বাবু।'

গিরিজাপতি তাকালেন। ভোলা এসে দাঁড়িয়েছে। মনে পড়ল, ভোলাকে তিনি ডেকেছিলেন একবার।

'কেষ্টবাবুকে ডাক একবার।'

ভোলা চলে গেল। পার্টিশানের ওপাশে অবনীর গলা শোনা যাচ্ছে। ও-বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে অবনী। এই ছেলেটিকে গিরিজাপতির ভাল লাগে। বিনয়ী ভদ্র নিরীহ, প্রাণপাত করে কাজ করে, পরিশ্রমী এবং সৎ স্বভাব। অবনীর সব চেয়ে বড় গুণ তার কোনো বৃত্তিই যেন প্রবল নয়। আজ চার পাঁচ মাসে গিরিজাপতি এক দিনও এই ছেলেটিকে রাগতে দুঃখ করতে শোক জানাতে অথবা আনন্দ করে কথা বলতে দেখেন নি। এত অল্প বয়সে স্বভাবের সমস্ত রাশগুলো কি করে ও আগলে রাখতে পারছে গিরিজা-পতি বুঝে পান না।

'অবনী।' গিরিজাপতি ডাকলেন।

সাড়া এল না। সাড়া দেয় না কখনও অবনী। যদি হাতে কাজ থাকে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে এসে জানিয়ে যায়, যদি কাজ না থাকে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

অবনী এল। হাতে প্রেসের হাজরিখাতা। ওভার টাইমের ঘর ভরে এনেছে। গিরিজাপতিকে সই করে দিতে হবে। প্রেসে আজকাল খুব কেতা মানা হচ্ছে। অবশ্য এই নিয়মটা ভাল, হিসেবের গোলমাল হয় না। সুধাংশু এসে এটা চালু করেছে। আগে নিয়মিত ভাবে লেখা হত না, দু চারদিন পর পর একটা আলাদা কাগজে লিখে রাখা হত।

টেবিলে আর বসলেন না গিরিজাপতি, পাশে এসে দাঁড়ালেন। অবনী খাতা নামিয়ে দিল। নীল পেন্সিলে একটা সই দিয়ে গিরিজাপতি মুখ ওঠালেন। 'তোমাদের এ-বাড়িতে কাল কাজ-কর্ম কেমন?'

'কাল একটু ফাঁক আছে।' অবনী জবাব দিল।

'সান্যাল কম্পানীর বইয়ের কাজটা ধরিয়ে দাও না।'

'ওঁদের আগের তিনটে ফর্মা ছাপা হয় নি এখনও। টাইপ খালি করতে না পারলে বেশি কাজ উঠবে না।'

'ফর্মা ছেপে ফেল। এভাবে ফেলে রাখলে ত আর চলবে না।' গিরিজাপতির কথার মধ্যে কেষ্টবাবু এলেন। বেঁটে গোলগাল মানুষ, মাথায় টাক, কানের পাশে ঘাড়ের কাছটায় অল্প কিছু পাকা পাতলা চুল। নিকেলের ফ্রেমে গোল গোল পুরু কাচের চশমা।

কেষ্টবাবু ঘরে আসতে গিরিজাপতি সেদিকে তাকালেন। 'বইয়ের কাজটা এবার ধরতে হয় কেষ্টবাবু।'

'ইংরিজী টাইপের?'

'সান্যাল কম্পানীর, যেটা চলছিল।'

কেষ্টবাবু চুপ। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ধরা সম্ভব হবে না। অবনীর দিকে তাকালেন কেষ্টবাবু, মৃদু গলায় কি যেন বললেন।

'ওদের যে কটা ফর্মা পড়ে আছে, কাল মেশিনে চাপিয়ে দেবে অবনী। আপনি এসে দু হাতে ধরিয়ে দিয়ে দিন কাজটা। যতটা ওঠবার উঠুক। তারপর ফর্মা ছাপা হয়ে গেলে—।'

'অশ্বিনী নেই।' কেষ্টবাবু গিরিজাপতির কথার মধ্যে বাধা দিলেন। 'প্রফুল্লর হাতে অ্যানুয়েলের কাজ রয়েছে।'

গিরিজাপতির খেয়াল হল অশ্বিনী কামাই করছে। তার বড় ভাই ক'দিন আগে মিলিটারি ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। 'অশ্বিনীর দাদা কেমন আছেন?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

'বাঁচবে না।' কেষ্টবাবু মুখে হতাশার ভঙ্গি করে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

হঠাৎ সব একটু চুপচাপ হয়ে থাকল। তিন জন মানুষই বুঝি একই কথা ভাবছিল, অশ্বিনীর দাদা আর বাঁচবে না। বেচারা অশ্বিনীর মুখ মনে পড়ছিল। মাস চার আগে তার মা মারা গেছে, এবার দাদার পালা।

গিরিজাপতি নিশ্বাস ফেলে মৃদু গলায় বললেন, 'নতুন কাজ নিয়ে পড়ে থাকলেই ত হবে না, পুরোনো পার্টিদের কাজগুলোও তুলতে হবে। এটা

আবার কলেজের বই।' একটু থামলেন, কি ভাবলেন যেন, বললেন, 'ইংরিজী কম্পোজের একটা লোকের ব্যবস্থা করবেন কাল, দুহাতে ধরিয়ে দেবেন।'

কেষ্টবাবু বা অবনী কোনো কথা বলল না। গোল চশমার ময়লা কাচের মধ্য দিয়ে কেষ্টবাবু আদেশ পাওয়া কর্মচারীর মতন সামান্য সময় তাকিয়ে থাকলেন। গিরিজাপতির কথায় জোর ছিল না, আদেশের গাম্ভীর্য বা কর্কশতাও ছিল না তবু সাধারণ সরল স্বরের মধ্যেও স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, কাল যেমন করেই হোক কাজটা ধরা চাই।

কেষ্টবাবু আর কথা বললেন না, ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে চলে গেলেন। সুধাংশুর টেবিলের ওপর থেকে অবনী একটা ছোট কাগজ তুলে নিয়ে চলে গেল ও-ঘরে।

গিরিজাপতি প্রেসের এই ঘরটার চারপাশ একবার দেখে নিলেন। টেবিলের ওপর তাঁর কিছু খুচরো কাগজপত্র ছড়ানো ছিল—গুছিয়ে রেখে দিলেন। প্রবাসী পত্রিকাটা ড্রয়ারে রাখলেন। চাদরটা চেয়ারের পিঠে আলগা ফাঁসে বাধা ছিল, তুলে নিয়ে বাঁধে রাখলেন।

ঘরের বাইরে আসতে অবনীর সঙ্গে দেখা। টিফিনের পয়সা দিয়ে অবনী ঘরে আসছিল।

'তোমার কি দেরি আছে না কি, অবনী?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

'আজ্ঞে না, যাব।'

'এস তবে, আমি গেটের কাছে আছি।'

ঢাকা সরু বারান্দা মতন পথটুকু পেরিয়ে ডান-হাতি প্যাসেজ দিয়ে গিরিজাপতি মেঠো জমিটুকুতে এসে দাঁড়ালেন। দশ পনের হাত ফাঁকা জমি, ডান দিকে টিনের শেড, জবাগাছের ঝোপ, বাঁ হাতে দারোয়ানের চিলতে ঘর। সামনে টিউবওয়েল। মিশির দরোয়ানের স্নান এবং শ্লোক আওড়ানো শেষ হয়েছে। তার ঘরের দরজার সামনে ছোট লোহার তোলা উনুনটা জ্বলছে। ঘরের মধ্যে মিটমিটে বাতি। মিশির বোধ হয় ঘরে। হাত কয়েক দূরে, সামনে, ভাঙা কাঠের গেটটা আধখোলা।

গিরিজাপতি আকাশমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আট ন' ঘণ্টা একাদিক্রমে বদ্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে এই দশ হাতের ফাঁকা জমিটুকুও বেশ তৃপ্তি দিচ্ছিল। উঁচু মুখে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু আকাশ দেখা, অল্প একটু বাতাস নেওয়া ছাড়া এখানে শান্তি উপশমের জায়গা নেই। আজকের ধোঁয়া কলুষিত খুব হালকা জ্যোৎস্নাটুকুর দিকে চেয়ে কেন যেন গিরিজাপতির এখন হেতমপুরের কথা মনে পড়ল।

হেতমপুরের কথা প্রায়ই আজকাল মনে পড়ে। এক একবার সাধ হয়, ক'দিনের জন্যে পুরোনো জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসতে। বিজলীবাবু সেদিনও একটা চিঠি লিখেছেন খবরাখবর দিয়ে। গিরিজাপতিকে যেতে লিখেছেন। বড় ছেলের—মণ্টুর বিয়ে এই ফাল্গুনে। নিখিল উমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। অন্তত উমাকে যেন নিয়ে যান। উমাকে খুবই স্নেহ করতেন বিজলী। বিজলীর স্ত্রী উমাকে রমা বলে ডাকতেন। উমা নামের মধ্যে নাকি কষ্ট আছে। কিসের কষ্ট উমাকে তিনি বলেন নি, কাউকেই নয়, শুধু এই রমা ডাকের কথাটুকুই গিরিজাপতি শুনেছেন।

উমার মুখ মনে পড়ল গিরিজাপতির। এ উমা অনেক আগের—শৈশবের। মানুষ যেমন স্মৃতির অনালোকিত চঞ্চল পরদায় ক্ষণিকের জন্যে একটি দুটি অস্পষ্ট ছবি ফুটতে দেখে এবং নিমেষেই সে ছবি হারিয়ে ফেলে, গিরিজাপতিও তেমনি শৈশবের একটি স্নেহপালিত মুখের ছবি দেখতে গিয়েও দেখতে পারলেন না। অবনী কাছে এসে কি একটা কথা বলল।

গিরিজাপতি অবনীর দিকে ভাল করে তাকালেন। 'কিছু বললে ?'

'আপনার চশমা ফেলে এসেছিলেন।'

গিরিজাপতির নজরে পড়ল অবনী চশমা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের পকেটে হাত দিয়ে এবার একটু হেসে ফেললেন গিরিজাপতি। পকেটে চশমার খাপটা ঠিকই আছে, আসার সময় অন্যমনস্ক ভাবে খাপ তিনি ঠিকই নিয়েছেন চশমা নিতে ভুলে গেছেন। পকেট থেকে খাপ বের করে হাত বাড়িয়ে অবনীর কাছ থেকে চশমাটা নিলেন গিরিজাপতি।

'চল।' গিরিজাপতি এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে চশমা খাপে

মুড়ে আবার পকেটে রেখে দিলেন। 'আমার আজকাল ছোট-খাট ভুল খুবই হচ্ছে, অবনী। বেশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।' গিরিজাপতি লঘু এবং সরস অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন।

গেটের বাইবে সরু গলিতে আসতেই উলটো দিকের মুখঢাকা গ্যাসের অপরিচ্ছন্ন মৃদু আলোয় চোখে পড়ল একটি রিকশা চাকা-ভাঙা হয়ে থুবড়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রিকশঅলা রিকশর পুচকে বাতি খুলে মেরামতের বৃথা চেষ্টা করছে। গলিটা আপাতত নিরিবিলি। আজকাল এই গলিতে মানুষ জনের চলাচল বড় একটা কম নয়। রাত্রে, রাত দশটার সময়ও অন্ধকার গলিটা দিয়ে কেমন নির্বিবাদে মানুষ-জন যেতে দেখেছেন গিরিজাপতি। সবই অভ্যাস।

'তুমি কখনও গ্রামে-টামে যাও নি অবনী, না?' হাঁটতে হাঁটতে গিরিজাপতি বললেন।

'আজ্ঞে না। খুব ছেলেবেলায় একবার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'তোমার দেশ না বর্ধমানে?'

'বীরভূমে।'

'বীরভূম।' গিরিজাপতি যেন ভুলটা সংশোধন করে নিলেন। 'গ্রামে-টামে ত বটেই—মফস্বল ছোট-খাট শহরেও সদর রাস্তা ছাড়া বাতি টাতি থাকে না। অথচ সেখানকার মানুষ ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাইলের পর মাইল পথ হাঁটছে দিব্যি, এতটুকু অসুবিধে বোধ করে না। আর এই কলকাতায় আলোর মধ্যে থেকে থেকে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল মানুষের ব্ল্যাক আউটের শুরুতে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারত না। এখন সব সয়ে গেছে।'

অবনী মনে মনে মাথা নাড়ল। বাস্তবিক, এখন এই মিটমিটে কলকাতাকেই যেন আসল কলকাতা বলে মনে হয়। আলোর মালা দোলানো কলকাতার সেই চেহারাই মনে করতে কষ্ট হয়।

'সবই অভ্যেস।' গিরিজাপতি আবার বললেন, 'পেলে মনে হয় দরকার, না পেলেও কাজ চলে যায়।'

গলির মোড়ে ছোট-খাট একটি দল। দু তিনটি মেয়ে, একটি ভদ্রলোক। বেশ হেসে গল্প করতে করতে আসছিল। গল্পটা সিনেমার। এরা সিনেমা দেখে ফিরছে। গিরিজাপতি এবং অবনী একটু পাশে সরে গেলেন। সামান্য দূরে একটা লোক পেচ্ছাপ করতে বসেছে, হয়ত ওই দলটারই সহযাত্রী কেউ।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের মুখে আসতে অনেকখানি বিস্তার যেন দু পাশ থেকে ছুটে এসে পথে টেনে নিল। একটা ট্যাক্সি চলে গেল। ডান দিকের গাড়ি বারান্দার তলায় চায়ের দোকানে পাঁচ-সাতজন খদ্দের, রেডিয়ো বাজছে। গান হচ্ছিল।

বড় রাস্তায় নেমে বাতাসে কেমন একটা মরা শীতের আভাস পাওয়া গেল। রাস্তায় যথেষ্ট লোক। দোকানপত্র এখনও খোলা। কিন্তু ঠুলি আঁটা আলোর তলায় সবই কেমন বিচ্ছিন্ন যোগসূত্রহীন দেখাচ্ছিল।

'তোমার ত মানিকতলায় বাসা?' গিরিজাপতি বললেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, এবার তুমি ডান দিকে যাবে ত?

'আপনাকে একটু এগিয়ে দি—' অবনী বলল।

'আরে না, এগিয়ে দিতে হবে না; তুমি যাও। আমি খানিকটা হাঁটব। সারাদিন বসে থাকি, সামান্য নড়াচড়া ভাল।'

'চলুন না, আমিও কিছুটা যাই।' অবনী বলল।

গিরিজাপতি যেন একটু খুশী হলেন। অন্য কোনো কারণে নয়, পথ হাঁটতে হাঁটতে দুটো কথা বলা যাবে। আজ কেন যেন তাঁর একজন সঙ্গী প্রয়োজন হচ্ছিল। মন যে ভার হয়ে রয়েছে এ তিনি অনুভব করতে পারছিলেন। দু একটা হালকা কথা কি আলাপে সে-ভার চাপা দেবার চেষ্টা করলেও, গিরিজাপতি বুঝতে পারছিলেন, অবনীকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর সময় তাঁর মনে একটা অন্য রকম বাসনা ছিল।

সিটি কলেজের দিকে না গিয়ে গিরিজাপতি আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে বাঁ দিকে এগুতে লাগলেন। অন্য দিন সিটি কলেজের পাশ দিয়ে গিয়ে ঠনঠনিয়ায় উঠে ট্রাম ধরেন।

সামান্য পথ নীরবে হেঁটে এলেন গিরিজাপতি। পাশে পাশে অবনী

লেছে। অবনীর গায়ে কালো রঙের ঘেয়াড়া ঝুলের গরম কোট। গিরিজাপতির পাশে গাঢ় ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল তাকে। ওর পায়ে চটি, চটির মৃদু শব্দ উঠছিল।

'তোমার পরীক্ষা দেবার কি হল?' গিরিজাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

অবনী একটুক্ষণ চুপ করে থাকল, পরে ফিকে গলায় বলল, 'দিচ্ছি না।'

'দিচ্ছ না, কেন?' গিরিজাপতি ঘাড় ফিরিয়ে অবনীকে দেখলেন।

রাস্তা বরাবর তাকিয়ে অবনী নীরবে হাঁটতে লাগল। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছে, প্রত্যুত্তরে সে কিছু বলবে এমন মনে হচ্ছিল না। খানিকটা এগিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত করে বলল, 'তৈরী হতে পারি নি।'

গিরিজাপতি মন দিয়ে যেন জবাবটা শুনলেন। সামান্য ভাবলেন মনে হল, বললেন, 'তা ঠিক; প্রেসে তোমার সারাটা দিনই চলে যায়, ক্লান্ত হয়ে পড়, ফিরে গিয়ে আর পড়াশোনা করা যায় না। তবু—' একটু থামলেন গিরিজাপতি, গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিলেন, বললেন, 'আজকাল যুদ্ধের দরুণ পরীক্ষা-টরীক্ষা বেশ পিছিয়ে গেছে, কড়াকড়ি নেই, দিয়ে দিলেই পারতে।' আবার খানিক চুপ করে থাকলেন গিরিজাপতি, 'আমি বরং মিহিরকে বলে তোমায় মাসখানেক ছুটি করিয়ে দেব।'

অবনী গিরিজাপতির দিকে তাকাল, মনে হল কিছু বলবে, কিছু বলল না, হাঁটতে লাগল।

চুপচাপ আরও খানিকটা পথ পেরিয়ে এসে এবার আমহার্স্ট স্ট্রীটের জনবিরল অংশে পৌঁছে গেলেন গিরিজাপতি। বাঁ দিকে মাড়োয়ারী হাসপাতাল, ডান দিকে সেন্ট পলস্ কলেজ। সামান্য মাত্র দূরে হাসপাতালের ছায়াটা রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে যেন। এখানটায় বেশ নির্জন। গিরিজাপতি যখনই গেছেন, দেখেছেন এই অংশটুকু প্রায় ফাঁকা নিস্তব্ধ পড়ে থাকে। এখানে অন্ধকারের ভাগটা আরও বেশী বলে মনে হয়। হাসপাতালের সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে বেফল্ ওআল খানিকটা। ফিকে চাঁদের আলোয় ইটের সেই গাঁথুনিটা কি রকম দেখাচ্ছিল।

'বি. এ পরীক্ষাটা পাস করতে পারলে তোমার সুবিধে হবে।' গিরিজাপতি বললেন।

'পরে দেব। আগামী বছরে।'

'দেখ অবনী, পড়াশোনার ব্যাপারে একবার ঢিলে দিলে আর মন বসে না।' গিরিজাপতি উপদেশ দেবার মতন করে বললেন, 'তোমার ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাসটা করা চাই। এ-বয়স থেকে প্রেসের এই উদয়-অস্ত চাকরি করলে মরে যাবে।'

'আপনারা ত করছেন।' অবনী বিনীত গলায় বলল।

'আমাদের জীবনের আর কতটুকু বাকি আছে?' গিরিজাপতি হাসপাতালের গেটের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বললেন, বলেই সুপ্ত নিস্তব্ধপ্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িটার দিকে কেমন অবশ চোখে তাকালেন।

'আমরাই বা ক'দিন বাঁচব।' অবনী অন্ধকারে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটা কথা বলল। গিরিজাপতি অবাক। ঝাপসা ঝাপসা মুখ দেখা যাচ্ছিল। ছেলেটার মুখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গিরিজাপতি বললেন, 'কি বললে?'

'আমি এমনিতেই বেশি দিন বাঁচব না।' অবনী সামান্য চুপ করে থেকে কথাটা আরও ব্যক্তিগত করে নিল।

'কে বলেছে?'

'কেউ না। আমার বাবা চল্লিশ বছরে মারা গেছেন।'

'তোমার বয়স কত, পঁচিশ—?'

অবনী নীরব থাকল।

'তোমার বাবা অল্প বয়সে মারা গেছেন বলে তুমিও বেশি দিন বাঁচবে না এ সব তোমায় কে শেখাল!' গিরিজাপতি যেন অবনীর এই ধারণা সহ্য করতে পারছিলেন না।

'আমার মাও বেশিদিন বাঁচেন নি।'

গিরিজাপতি বিস্ময়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছেলেটা বলছে কি! ক'দিন আগেও গিরিজাপতি জানতেন বাড়িতে অবনীর মা আছে। কি

বলবেন কি বলা যায় স্থির করতে না পেরে গিরিজাপতি বিমূঢ় হয়ে বললেন, 'সেদিনও তোমার মার কথা বলছিলে—'

অবনী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। তার কালো বেয়াড়া কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমার জ্যেঠাইমাকে আমি মা বলি।'

গিরিজাপতির মনে হচ্ছিল তিনি শোকে দুঃখে সংহত এক বয়স্ক ব্যক্তির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজেকে এই শীর্ণ দুর্বল নিরীহ ছেলেটির প্রায় সমবয়সী মনে হচ্ছিল। কথা বলতে পারছিলেন না।

অবনী যেন অন্য কারও গল্প শোনাচ্ছে এমন ভাবে বলল, 'আমার বাবা থিয়েটারে বাঁশি বাজাতেন। কী একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ার পর আত্মহত্যা করেছিলেন। আমার মাকে দেখেছি নানা রকম অসুখে ভুগত, শেষে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরত, এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে খেত, যার তার সামনে হাত পেতে ভিক্ষে চাইত।' অবনীর বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছিল সে যেন তার মার এই আচরণগুলি আজ আর প্রকাশ করতে কাতর নয়, অথচ তার গলার গাঢ়তা সন্তানের কাতরতা প্রকাশ করছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল অবনী, তারপর বলল, 'একদিন স্কুল বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে শুনি মা পাড়ার একটা বাড়িতে গিয়ে ভাত চেয়ে খেয়েছে। মাকে আমি মেরেছিলাম সেদিন। তারপর স্কুলে যেতাম না। আমার ম্যাট্রিক ক্লাস তখন; জ্যেঠাইমা বকত, রাগ করত। আবার একদিন স্কুলে গেলাম। টেস্ট পরীক্ষা সামনে। আমি স্কুলে, জ্যেঠাইমা দুপুরে একটু ঘুমোচ্ছিল, মা বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেল।'

গিরিজাপতি অনুভব করতে পারছিলেন তাঁর পদক্ষেপ মন্থর হতে হতে ক্রমশ পা টানার মতন হয়ে এসেছিল। অত্যন্ত ভার লাগছিল। অবনীর দিকে তাকাতে পারছিলেন না। যেন এই কাহিনী তাঁর শোনার নয়, অবনী মনে মনে কথা বলছিল, তিনি অসতর্ক মানুষের গোপন কথাটি শুনে ফেলেছেন। অস্বস্তি হচ্ছিল গিরিজাপতির। কেমন এক কাতরতা বোধ করছিলেন তিনি, প্রগাঢ় বেদনা অনুভব করছিলেন অবনীর জন্যে। কথা বলতে পারছিলেন না,

সমবেদনা বা সহানুভূতি জানাবার চিন্তাও তাঁকে কুণ্ঠিত করছিল। উন্মাদ পলাতকা জননীকে অবনী মৃত মনে করে।

মাড়োয়ারী হাসপাতালের সীমা পেরিয়ে এলেন দু জনে। রাস্তা ধরে একটা অ্যামবুলেন্স গাড়ি চলে গেল। সামনে হ্যারিসন রোড। ট্রাম বাসের শব্দ এবং এই মোড়ের একটি স্থায়ী কলরব এতক্ষণের সঞ্চারিত নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছিল। গিরিজাপতি মাথা একটু সোজা করলেন। অবনীর চটির শব্দ পাশে পাশে চলেছে। গিরিজাপতির মনে হচ্ছিল, এই শব্দের যেন জুড়ি নেই, সঙ্গী নেই, একা একটি মানুষ এই সংসারে পথে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

নিজের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা কাটাবার জন্যে গিরিজাপতি কাশির মতন শব্দ করলেন একটু। তারপর খুব সংযত সতর্ক গলায় বললেন, 'তোমায় অনেকটা পথ নিয়ে এলাম।'

অবনী নীরব। সেই একই ভাবে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেঁটমুখে চলেছে। মনেই হয় না গিরিজাপতি তার সহযাত্রী।

হ্যারিসন রোডের মুখে পৌঁছে গিরিজাপতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বললেন, 'অবনী, পরীক্ষাটা তুমি দিয়ে দাও। অনেক ঠেকে কষ্ট করে ছেড়েছুড়ে এতটা পড়েছ। দিয়ে দিতে পারলে অন্তত পরিশ্রমটাও সার্থক হবে।'

'এবারে হবে না। পরে যদি হয়—'

'এবারে দোষ কি ?'

'জ্যেঠাইমার অসুখ।'

গিরিজাপতি তাকালেন। দু মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। 'খুব অসুখ ?'

'হাঁ ; একটু ভাল আছেন ক'দিন। আমার জ্যেঠতুত বোনটা অ্যানিমিক হয়ে এখানে এসে রয়েছে, তার বাচ্চা-কাচ্চা হবে। সংসারের অনেক কাজ আমায় করতে হয়।'

গিরিজাপতি আর কিছু বললেন না। নিজেকে তাঁর হঠাৎ অপরাধী মনে হচ্ছিল। কে জানে, হয়ত এই রাত নটা সাড়ে নটার সময় ফিরে গিয়ে অবনীকে বাড়িতে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হবে।

পাঁচ

বিকেল পাঁচটা থেকে গৌরাঙ্গকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাসু। বাড়িতে ক'বারই খোঁজ করেছে, বাড়ির লোক বলে অফিস থেকে ফেরে নি এখনও। সন্ধ্যেতক জি পি ও-তে বসে কোন ধুনো পোড়াচ্ছে গৌরাঙ্গ বাসু বুঝতে পারছিল না। অন্য দিন এ সময়ে গৌরাঙ্গকে পাড়ায় পাওয়া যায়। হয় চায়ের দোকানে না হয় নন্টুদের বাড়ির বৈঠকখানায়। তাস খেলে বসে বসে। আজ খুব দরকার বলে অলিগলি রাস্তার মোড় চায়ের দোকান তাসের আড্ডা কোথাও পাওয়া গেল না। অথচ অফিস যাবার আগে সকালে ওআর্ড দিয়ে গিয়েছিল পাঁচটার সময় ফিরে এসে সোয়া পাঁচটার সময় বড়ুয়া কেবিনে আসবে। সাতটা প্রায় বাজতে চলল, বাসু অপেক্ষা করে করে সারা পাড়া চরকি মেরেও গৌরাঙ্গকে খুঁজে পেল না।

নন্দীর সঙ্গে বউবাজারের মোড়ে দেখা হয়ে যাবার পর নন্দী রূপম সিনেমা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। সেখানে বিশ মিনিট ধরে ঠায়ে দাঁড়িয়ে। বেলগাছিয়া যাবে নন্দী। এ বাস না ওই বাস, ট্রামেই চলে যাই, একটা বিড়ি ছাড় ভট্‌চায···এই করে শালা না বাসে ওঠে না ট্রামে চড়ে। রূপম সিনেমায় পুরোনো 'সাপুড়ে' বইটা লাগিয়েছে কাননবালার। ব্ল্যাক আউটের বাজারে পাচটার শোতে খুব ভিড় হয়। হাফ টাইমে পিল পিল করে লোক বেরিয়ে রূপম সিনেমার সিঁড়ি ফুটপাত জাম করে দিল। বাসুর অত ভিড় দেখে হঠাৎ মনে হল, ছেনোর মতন আজ সিনেমার কিছু টিকিট ব্ল্যাকে ঝেড়ে দিলে টাকা তিন চার পকেটে এসে যেত।

এই হাফ টাইমের ভিড়ের মধ্যেই নন্দী হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। বাসু নন্দীকে বাসে চড়তে দেখে নি, ট্রামেও নয়। কথা বলতে বলতে পাশ থেকে একটা মানুষ বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল—! তাজ্জব ব্যাপার।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাসু খুব নজর করে ভিড়ের চাকটা দেখতে

লাগল। কয়েকটা ছোকরা হাফ টাইমের সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে উলটো ফুটপাতের ইন্দোবর্মাতে চা খেতে ছুটেছে, ডান দিকের ছানাপেটির পাশের গলিতে পেচ্ছাপ করতেও গেছে কিছু, সিনেমার সিঁড়ি আর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পান চিবোচ্ছে সিগারেট ফুঁকছে ওমলেট ঝালবাদাম খাচ্ছে বাকিগুলো। এই ভিড়ের কোথাও নন্দী নেই।

নন্দীর উদ্দেশে মাঝারি একটা গালাগাল দিয়ে বাসু ভিড়ের বাইরে মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। দুপা হাঁটতেই ডান দিকে সিনেমার সাড়ে চারআনা-অলা-টিকিট বেচা গলিটার অন্ধকারে নন্দীকে দেখতে পেল বাসু। অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁস দিয়ে দাঁড়িয়ে নন্দী একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটার মুখ দেখতে পেল না বাসু। চেহারাটাও আবছা মতন দেখাল। খুব ছুঁড়ি ছুঁড়ি দেখাচ্ছে না বলে মনে হল বাসুর।

নন্দী দেখতে পাবে ভেবে বাসু ঢাল মতন জায়গাটা টপকে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হাফ টাইমের শেষ ঘণ্টি বাজছে বোধ হয়। ভিড়টা আবার যেন গুঁতো খেয়ে সিনেমার সিঁড়ির দিকে ছুটে চলল। একটু উঁকি মেরে সাড়ে চার আনা টিকিটের গলিটা দেখে নিল বাসু। এই গলিতে কিছু কিছু মেয়েরাও এসে দাঁড়ায় হাফ টাইমে বাঁ দিকে শেষ প্রান্তে তাদের কলঘর, একটা পানঅলা গলির মুখে বসে থাকে। উঁকি মেরে নন্দীকে একই ভাবে কথা বলতে দেখল বাসু। ততক্ষণে গলিটা ফাঁকা হয়ে এসেছে। আবার সব হলে ঢুকে পড়েছে। সিনেমার সামনেটাও ফাঁকা, ফুটপাতে দু এক জন বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরাঙ্গর খোঁজে যাবার জন্যে বাসু অধৈর্য হয়ে উঠছিল, অথচ নন্দীর এই খিঁচ মেরে পটানো-মেয়ের সঙ্গে রেইশ করতে যাওয়ার ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত না দেখে সে নড়তে পারছিল না। নন্দীটা খুব খলিফা। বাসুর সঙ্গে অত ভাব তার, কত কথা বলেছে, কিন্তু মেয়েছেলের কারবার চালাচ্ছে একবারও বলে নি। আজ শালা কলে পড়ে গেছে।

বাসু আবার একবার উঁকি দিল। মেয়েটা সর সর করে চলে যাচ্ছে।

বাসু অন্ধকারে মেয়েটির অপসৃত চেহারা দেখতে পেল। নন্দী হেঁট মুখে এ আর পির প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে আসছে।

গলির বাইরে ফুটপাতে পা দিতে না দিতেই বাসু পাশ থেকে খপ্ করে নন্দীর কাঁধ ধরল। 'কি নন্দী, খুব শালা বেলগাছিয়া দেখালে '

নন্দী যেন একটু চমকে উঠেছিল। ঘাড় ফিরিয়ে বাসুকে দেখে তার চমকের ভাবটা কাটল। সামান্য যেন ভয় ভয় ভাব ছিল, সে-ভয়ও আস্তে আস্তে কাটছিল। 'তুমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছ, ভটচায্?'

'হারামির মত বাত বলো না, নন্দী। তুমি আমায় টেনে এনে দাঁড় করিয়ে কথা বলতে বলতে হাওয়া মারলে আমি দাঁড়িয়ে থাকব না ত কি কেটে পড়ব।'

নন্দী জবাব দিল না। তার ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল বাসুর কথায় বড় একটা মনোযোগ তার নেই। বেশ অন্যমনস্ক এবং কিঞ্চিৎ ব্যস্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

বাসু ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি না বেলগাছিয়া যাচ্ছিলে?'

'যাব। এক্ষুণি যাব।' নন্দী চশমাটা অযথা খুলে আবার ঠিক করে নিল।

'কার সঙ্গে মাঞ্জা দিচ্ছিলে?' বাসু চোখে চোখে তাকিয়ে শুধলো।

'তুমি চেন না ভটচায।' নন্দী কেমন একটু ফিকে হাসবার চেষ্টা করল

'বেপাড়ার?'

নন্দী গলা বাড়িয়ে যেন ট্রাম বাস দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাসু হাত ধরেছিল নন্দীর। হাত ধরা না থাকলে নন্দী হয়ত পালাত।

'একটা ট্রাম আসছে, আমি চলি।' নন্দী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

'যাবেখন।' বাসু হাত ছাড়ল না, টান মেরে প্রায় গায়ের ওপর টেনে আনল, 'কার সঙ্গে অত আঁটা মেরে ছিলে বল না?'

নন্দী হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। একটা ট্রাম বাস্তবিকই ওদিকের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখুনি চার মাথা পেরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে চলে যাবে। নন্দী খুবই ব্যস্ততা দেখাল। 'ছেড়ে দাও মাইরি, ভটচায্। ·· ট্রামটা ধরি ·'

'আগে বল।' বাসু হাসছে।

'পরে বলব।'

'পট্টি মারছ?'

'মাইরি না, পরে বলব তোমায়। · সে অনেক ব্যাপার আছে।' নন্দী একটু যেন সুবিধে করে নিতে পেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল হঠাৎ। ট্রামটাও ক্রসিং পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নন্দী সোজা ছুটল, ছুটতে ছুটতে কাকে যেন ধাক্কা মেরে নিজেও পড়ে যাচ্ছিল আর কি। সামলে নিল কোনো রকমে, নিয়ে ছুটতে ছুটতে রূপম সিনেমা ছাড়িয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে লাফ মেরে উঠে পড়ল। বাসু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ব্যাপারটা। আর একটু হলেই নন্দীটা একটা কাণ্ড করত, শালা ট্রামের পেছনে গিয়ে পড়ত মুখ থুবড়ে। খুব বেঁচে গেছে। যে-মেয়েটা এখন বসে বসে সিনেমা দেখছে তার নাম ধাম কিছু না জানা থাকলেও বাসু সেই মেয়েটাকে উদ্দেশ করে হাসল, হেসে বলল, তোমার পয়ে শালা বেঁচে গেছে!

বাসু আর দাঁড়াল না। নন্দী অনেকটা সময় তার বেফায়দা খরচ করিয়ে দিয়েছে। ফুটপাথ ধরে সোজা বাড়িমুখো এগুতে লাগল বাসু। ট্রাম লাইন পেরিয়ে হেঁটে চলল। গৌরাঙ্গ আজ তাকে খুব ভোগাল। সারাটা সন্ধ্যে মাটি করে দিল শালা। এমন জানলে বাসু থোড়াই এই রাস্তা ঘাট চক্কর মেরে বেড়াত।

ভূপতি ময়রার দোকান পেরিয়ে এসে বড়ুয়া কেবিনের সামনে দাঁড়াল বাসু। ওই যে, বাবু খুব মেজাজ নিয়ে চেয়ারের ওপর আসন-পা করে বসে আছে। গৌরাঙ্গর বুক সোজা করে পা তুলে তার বাপ জ্যেঠার মতন বসে থাকার ভঙ্গিটা দেখে রাগে গা জ্বলতে লাগল বাসুর। গায়ে আবার সুতির চাদর। এক হাতে নিজের পায়ের পাতা বোলাচ্ছে, অন্য হাতে সিগারেট।

দোকানে ঢুকে পড়তে পড়তেই বাসু চেঁচিয়ে উঠল, 'কি রে—?'

গৌরাঙ্গ চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে চেয়ে থাকল। চোরা হাসল একটু। গোঁফের পাশ দিয়ে খেলিয়ে খেলিয়ে ধোঁয়া বের করতে লাগল।

গৌরাঙ্গর সামনে চেয়ার ছিল, বাসু বসল না। দোকানে এখন লোকজনও কম। গৌরাঙ্গর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাসু বলল, 'এই তোর ওআর্ড ··'

সিগারেটের মুখে ছাই ছিল না, তবু ছাই ঝাড়বার মতন করে হাতটা নামাল গৌরাঙ্গ। প্রথমটা নজরে পড়ে নি, খেয়ালও করে নি বাসু, কিন্তু গৌরাঙ্গর আঙুল নাচিয়ে যে ভাবে ছাই ফেলার চেষ্টা দেখাচ্ছিল তাতে চোখ ঠিক জায়গায় পড়ল। গৌরাঙ্গর আঙুলে আংটি। আনকোরা একেবারে; সোনার পালিশ ঝকমক করছে. মাঝে মিনের কাজ।

বাসু দু মুহূর্ত কেমন থমকে চেয়ে থাকল, তারপর কিছুটা বিস্ময় কিছুটা লুব্ধ গলায় বলল, 'খুব যে আংটি লাগিয়েছিস!'

'তৈরী করালাম।' গৌরাঙ্গ হাসল।

'করাগে যা। ···শালা বেনে।' বাসু চেয়ার টেনে বসে পড়ল, 'আমি তোর কারবারটা দেখছি, মাইরি। আমায় সারাটা বিকেল পেলা দিয়ে রাখলি— !'

বাসুর মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে থাকল একটু গৌরাঙ্গ। 'তুই খচে যাচ্ছিস যে আমি বুঝতেই পারছিলাম। কিন্তু একটা দান লেগে গেল, মাইরি। ছাড়তে পারলাম না।'

'দান— !' বাসু অবাক চোখে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

'বলছি। ···চা খাবি না?'

'আলবাৎ খাব।'

'আর কিছু খাবি?' গৌরাঙ্গ বেজায় খুশীতে বন্ধুকে একটু বেশি রকম আপ্যায়িত করার ঝোঁকে বলল, 'তুই যা খাবি খা, তোকে আজ আমি খাওয়াব।'

অন্যদিন হলে বাসু বিন্দুমাত্র ঘাবড়াত না। গৌরাঙ্গ যেচে খাওয়াবার কথা বলছে এটা এক রকম নতুন হলেও, গৌরাঙ্গর পয়সায় তার বিন্দুমাত্র সম্মতি অসম্মতির ধার না ধেরেই বাসু খেয়ে এসেছে। এটা তাদের বন্ধুত্বের বোধ হয় সরল বোঝাপড়া। বরং গৌরাঙ্গর পয়সায় বাসু যত খায়, গৌরাঙ্গ তত চেঁচায়, এটাই বরাবরের। আজ গৌরাঙ্গর এতটা প্রাণখোলা মেজাজের

জন্যে বাসু মোটেই অবাক হচ্ছিল না, অবাক হচ্ছিল গৌরাঙ্গর প্রকাণ্ড দিল-দরিয়া ভাবটা দেখে।

বাসু কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। হাঁ করে বন্ধুর মুখের দিয়ে চেয়ে থাকল খানিক। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শালা একেবারে পাকা স্যাকবার মতন হাসছে—মথুরবাবুর মতন। শেষে বাসু বলল, 'তবে একটা কাট্‌লিজ্‌ বল।' কাটলেট শব্দটার এই অদ্ভুত উচ্চারণ করবার সময় হাসবার ভাব করল বাসু।

দু কাপ চা এবং কাটলেটের জন্য হাঁক দিয়ে গৌরাঙ্গ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। 'নে, ধরা।'

সিগারেটের প্যাকেটটা নতুন ধরনের, সিগারেটও নতুন। বাসু এই মার্কা সিগারেট আগে দেখে নি। প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখল। 'এটা কি সিগারেট রে?'

'নতুন। খা, একদম কড়া নয়।'

'গ্রেজ্‌ ' বাসু সিগারেটের প্যাকেটের নাম পড়ে মুখ ছুঁচলো করে জিব দাঁতে লাগিয়ে 'জ'-এর শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে রাখল। একটা সিগারেট বের করে দেখতে লাগল।

'গ্রেজ এলিজি।' গৌরাঙ্গ খুব কায়দা করে ইংরিজী বলল।

'কি?'

'তুই বুঝবি না। আমাদের ম্যাট্রিক ক্লাসে সিলেকটেড্‌ পোয়েমস-এ একটা কবিতা ছিল, গ্রেজ এলিজি। খুব কোশ্চেন আসত।'

'লে বে লে ··' বাসু সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। প্রথম টানটায় মৌজ হয় নি। ধোঁয়া উড়িয়ে এক পাশের গাল চোখ নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কুঁচকে বলল, 'খুব আমায় ম্যাট্রিক দেখাচ্ছিস। ফেল মেরে আবার রোওয়াব।'

কথাটা গৌরাঙ্গকে আহত করল। হতে পারে সে ম্যাট্রিকটা আর পাশ করতে পারে নি, তবু ওই ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াই যা কিছু কম না কি! তাদের বন্ধুদের মধ্যে আর কে পড়েছে, কোন বেটা ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির ছাপ

যারা এডমিট কার্ড পেয়েছে? ··বাসুর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে গৌরাঙ্গ চুপ করে থাকল।

সিগারেটটা সত্যিই নরম। গলায় লাগে না। বাসু গলা ভরতি করে করে ধোঁয়া টেনে গিলছিল। তিন চারটে পর পর টান মেরে একটু কাশল বাসু। গৌরাঙ্গর মুখের দিকে তাকাল। 'কি রে, বল '

গৌরাঙ্গ নীরব। বাসুর দিকে প্যাকেটটা পড়ে ছিল, সেটা নিজের দিকে টেনে নিল। দরজার দিকে চেয়ে বিরস মুখে বসে বসে ওদের দেখছিল—ওই দেওয়াল-ঘেঁষে-বসা দুই মাঝবয়সী ভদ্রলোককে। ওরা বসে বসে চা খাচ্ছে আর যুদ্ধের গল্প করছে। তাদের দু চারটে টুকরো কথা কানে আসছিল গৌরাঙ্গর। লেনিনগ্রাড প্রায় সবটুকু উদ্ধার করে নিয়ে জার্মানীকে কেমন জবাবের মতন জবাব দিয়েছে রাশিয়া তারই গল্প চলছিল। সেই সঙ্গে খাটো গলায় সুভাষ বোসের কথা।

'যাঃ শা—লা!' বাসু বলল, 'খোচে বোম মেরে গেলি যে-- ' বলে বাসু হাত বাড়িয়ে গৌরাঙ্গর চাদর ধরে টান মারল।

চাদর ছাড়িয়ে নিল গৌরাঙ্গ। 'তুই বড় আণ্টসাণ্ট কথা বলিস।' ক্ষুব্ধ স্বর গৌরাঙ্গর।

গৌরাঙ্গর একটু গম্ভীর ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে বাসু হঠাৎ হেসে ফেলল; 'আই ব্বাপ্ !' খুব যেন মজা পেয়ে গেছে বাসু, সামনের দিকে ঝুয়ে পড়ে গৌরাঙ্গর জাঙের ওপর থাপ্পড় মারল একটা, 'শালার মানে লেগেছে। লে বে লে, মান-ফান ছাড়। আমি কি তোর বউ, তোয়াজ করে কথা বলতে হবে।'

'তোর তোয়াজে আমি মুতে দি।'

'দে না .দ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দে · '

বাসু যেন সত্যি সত্যি গৌরাঙ্গকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

গৌরাঙ্গ বাসুর টানা হেঁচড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিল। বাসু জোর গলায় হাসছিল।

রেস্টুরেন্টের ছোকরাটা টেবিলের ওপর কাটলেট নামিয়ে দিয়ে গেল। বাসু হাত বাড়িয়ে নিজের দিকে টেনে নিল প্লেট।

'তুই কাটলিজ খাওয়াবি জানলে ইন্দোবর্মায় গিয়ে বসতাম। এ দোকানটায় রদ্দি মাল তৈরী করে।' বাসু চামচে তুলে নিয়ে বলল, 'বেটারা ছুরি-ফুরিও রাখে না, কি যে ব্যবসা চালাচ্ছে মাইরি।'

'একেবারে বাসু ভট্টচাযের মতন।' গৌরাঙ্গ টিপ্পনি কেটে বলল।

কাটলেটের টুকরো চামচেতে তুলে বাসু গৌরাঙ্গর দিকে তাকাল। যেন বোঝবার চেষ্টা করল কথাটা। বুঝল না। বিন্দুমাত্র আর মাথা না ঘামিয়ে মুখে পুরে দিল টুকরোটা। এবং বা হাতের আঙুলে আলগোছে খানিকটা পেঁয়াজকুচি তুলে হাঁ-করা গালে ফেলে দিল।

গৌরাঙ্গ বসে বসে বাসুর খাওয়া দেখতে লাগল। অমন জুতের কথাটা বাসু বুঝতে না পারায় একটু যেন ক্ষুণ্ণ ও।

গালের মধ্যে মাংস এবং পেঁয়াজ যখন ফুরিয়ে এসেছে প্রায়, বাসু বলল, 'তুই আমায় হ্যাটা করলি যেন শালা।'

'করলাম।' গৌরাঙ্গ মাথা ঝাঁকল একটু, 'তোর মাথায় ঢোকে নি কিছু।'

'পেরেক ঠুকে দে, রে।' বাসু আবার হাসল, হাসতে হাসতে আরও খানিকটা কাটলেট বাইয়ে মাখিয়ে তুলে নিল। ঝুটঝামেলা ছেড়ে এবার আসল বাত বল গৌরে। ...তুই না মাইরি এখন থেকে যেন ফুলশয্যার রাত্তিরের প্র্যাকটিস দিচ্ছিস। যত ফালতু বাত।' বাসু কাটলেট মুখে তুলল।

গৌরাঙ্গর ক্ষুব্ধ ভাবটা কেটে এসেছিল। বাসুকে একটা কায়দা মতন ঠোক্কর দিতে পেরে একটু ভালও লাগছিল। তা ছাড়া এটা তার স্বভাব, রাগ ফোটেই খিঁচিয়ে থাকতে পারে না, বাসুর ওপর ত আদপেই নয়। তবু সরাসরি হালকা হয়ে যাবার আগে খানিকটা গাম্ভীর্য বজায় রাখল গৌরাঙ্গ। বাসুর ঠাট্টার কোনো জবাব না দিয়ে আবার একটা সিগারেট বের করল।

চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে গেল ছোকরাটা। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ দেখতে দেখতে গৌরাঙ্গ সিগারেটটা টেবিলে বার কয়েক ঠুকে নিল।

'আজ কি হয়েছে বলছিস না যে।' বাসু শুধলো, 'মোটা রকম কিছু খিঁচে নিয়েছিস, না রে?' শেষ কথাটা এমন ভাবে বলল বাসু যেন সে এ-ব্যাপারে প্রায় নিঃসন্দেহ।

'তুই পেটে কথা রাখতে পারিস না।' গৌরাঙ্গ বয়স্ক ব্যক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'তোকে কিছু বলা মুশকিল।'

'এই সব পিঁয়াজীর বাত-চিত আমার কাছে করিস না, গৌরে।' বাসু রীতিমত সতর্ক করে দেবার ভাব নিয়ে জবাব দিল, 'আমার কাছ থেকে কোন্ শালা তোর একটা কথাও শুনেছে, বল?'

'নন্টাকে তুই আমার বউয়ের ছবির কথা বলে দিয়েছিস।'

'যা বাব্বা—।' বাসু চোখ কপালে তুলল, 'তোর বউয়ের ছবি তোর কাছে আছে—এটা কি সিক্রেট কিছু?'

'আলবাত সিক্রেট।'

বাসু একটুক্ষণ বোকার মতন চেয়ে থাকল গৌরাঙ্গর দিকে। তারপর হতাশ গলায় বলল, 'তবে ত তোর বউটাই সিকরেট।' বলে বাসু হেসে উঠল।

কাটলেট শেষ হয়ে এসেছিল। শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেটের সবটুকু রাই চেঁচে নিয়ে বাসু মুখে ফেলে দিল, পিঁয়াজ কুচি আর ছিল না, খুব তাড়াতাড়ি পুরো মুখ খুলে বাসু চিবিয়ে নিচ্ছিল, দেখলে মনে হয় তার এখনও বেশ খিদে আছে।

গৌরাঙ্গ চায়ে চুমুক দিল। ডান হাতের আঙুলে সিগারেট। বাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাটলেট শেষ করে বাসু এক চুমুকে জলের গ্লাস প্রায় শেষ করে ফেলল। আরামের একটা শব্দ তুলে চায়ের কাপটা টেনে নিল।

'তোকে আমি আমার সব সিক্রেট কথা বলেছি—' বাসু গৌরাঙ্গর চোখে চোখে তাকিয়ে বলল। তার দৃষ্টি থেকে বোঝা যাচ্ছিল, গৌরাঙ্গ নিতান্ত স্বার্থপর এবং চালাক না হলে ন্যায়ত বাসুকে তার সব কথা বলা উচিত।

বাসুর কথা গৌরাঙ্গ অস্বীকার করতে পারল না। মনে মনে যেন এই বিষয়টা মেনে নিয়ে নিজেকে কিঞ্চিৎ চতুর মনে হল। অবশ্য, গৌরাঙ্গ যে বাসুকে গোপন কথা কিছু বলে না তা নয়, অনেক কথা বলেছে। দু চারটে কথা বলা হয় নি, গৌরাঙ্গ বলতে পারে নি। যেমন···যেমন···

'আংটি কিনতে কত টাকা লাগল রে?' বাসু শুধলো।

'একাত্তর টাকা।' গৌরাঙ্গ অন্যমনস্ক গলায় বলল।

'এ-কা ত্তর · আই ব্ল্যাস—' বিস্ময়ে বাসুর চোখ অপলক হয়ে থাকল। অত টাকা দিয়ে গৌরাঙ্গ কিছু কিনতে পারে বাসু যেন কল্পনা করতে পারছিল না। গৌরাঙ্গকে হঠাৎ বেশ বড়লোক মনে হচ্ছিল বাসুর।

গৌরাঙ্গ দু চুমুক চা খেয়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সিগারেট ধরাল।

'তুই আজকাল দু হাতে কামাচ্ছিস, গৌরে।' বাসুর গলার স্বর কেমন ক্লিষ্ট ক্ষুণ্ণ।

'দু হাতে না · ' গৌরাঙ্গ ঈষৎ তাচ্ছিল্যের গলায় বলল।

বাসুর গলার মধ্যে চায়ের ঢোকটা কেমন আটকে গেল। খাদ্যনালীর মধ্যে ফোড়ার টাটানির মতন ব্যথাও অনুভব করল বাসু। গৌরাঙ্গর মুখের দিকে অপরিষ্কার চোখে চেয়ে থাকল। এই গৌরাঙ্গ ক'দিন আগেও বাসুর পয়সায় পাশিংশো সিগারেট খেত, নীলকণ্ঠর দোকানে চা খেত, সিনেমা দেখত রূপমে। স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে আজ ক'মাসে কেমন কপাল ফিরিয়ে ফেলল। আজ ও একাত্তর টাকা দিয়ে সোনার আংটি কেনে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরে, পায়ের ওপর পা উঠিয়ে লায়েকের মতন পায়ের পাতায় হাত বোলায়। বাসু এখন বেশ অনুভব করতে পারছিল, গৌরাঙ্গর সঙ্গে তার পুরোনো বন্ধুত্ব তেমন গলায় গলায় প্রাণে প্রাণে আর নেই। যেন একই সঙ্গে দৌড়তে শুরু করে এক সময় বাসু দেখছে, গৌরাঙ্গ তাকে ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে গেছে, নাগালের বাইরে।

গৌরাঙ্গ অন্য কথা ভাবছিল। একাত্তর টাকা দিয়ে আংটিটা অবশ্য সে বাস্তবিক কেনে নি। আংটিটার দাম একাত্তর টাকা হলেও, গৌরাঙ্গ মাত্র পঁচিশটা টাকা দিয়েছে, এবং তেরিশটা টাকা খরচা করেছে নাগমশাই। ওটা চোরাই মাল। অফিসের ছুটির পর নাগমশাই তাকে ধরে-পাকড়ে একটু চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সোনাগাছির গলির মধ্যে এক স্যাকরার কাছে। এই আংটি সেখান থেকে নিয়েছে গৌরাঙ্গ, নাগমশাই এক রকম জোর করে গছিয়ে দিয়েছে। কারণ আছে গছাবার। নাগমশাই

ফলস্ স্ট্যাম্পের আড়ৎ। ইদানীং গৌরাঙ্গ বড় একটা কারবার করছিল না নাগমশাইয়ের সঙ্গে। মাসখানেক আগে একবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়ার পর গৌরাঙ্গ বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছিল। নাগমশাইয়ের বিজনেসে ঘাটতি যাচ্ছে দেখে এই আংটিটা এক ধরনের ঘুষ। তিরিশটা টাকা হাতে দেবার চেয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওটা আংটিতে ঢেলে দিয়েছে।...কিন্তু কথাটা আংটি কেনা নিয়ে নয়, আংটি রাখা নিয়ে। গৌরাঙ্গ আসলে আংটিটা কিনেছে তার বউয়ের জন্যে। ফুলশয্যার দিন বউকে দেবে। এই আংটি লুকিয়ে বাড়িতে কোথাও রাখে এমন জায়গা নেই গৌরাঙ্গর। সোনার জিনিস যেখানে সেখানে রাখা যায় না। তার ওপর বিয়ের নাম করে এখন থেকেই গৌরাঙ্গর বাড়িতে দিদি মাসি মেসো এদের বড় যাতায়াত শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেলে বেইজ্জতি ত বটেই, উপরন্তু বাবার কাছে গৌরাঙ্গকে হাজারো রকম কৈফিয়ত দিতে হবে। আর বাবা যদি একবার জানতে পারে গৌরাঙ্গ কি ভাবে উপরি রোজগার করছে তা হলে কি আর রক্ষে রাখবে। ভয়ে হয়ত হার্টফেল করবে।

গৌরাঙ্গ তার বাবার এই ভীরুতা পছন্দ করল না। এক সময় সেও তার বাবার মতন ভীতু প্রকৃতির ছিল। ক্রমশ এই ভীতু ভাবটা কমতে কমতে এখন যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠেছে গৌরাঙ্গ। আজ বিকেলেই নাগমশাই বলছিল, আরে ভাই, আজকের দিনে এ রকম ভয় ভয় করলে কি বাঁচা চলে! দেখছ না কত বড় যুদ্ধটা চলছে, গোলাগুলি বোমা মারামারি কাটাকাটি—এর মধ্যে সাহস না করলে বাঁচা যায়। আজকের দিনে সাহস করে দাঁড়িয়েছ কি বেঁচেছ, ভয় করলে মরবে। ভয়-ফয় যারা করছে না, দেখ না, তারা লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। নাগমশাইয়ের কথাটা গৌরাঙ্গর মনে দাগ কেটেছে। সত্যি বলতে কি, এই যুদ্ধের বাজারটাই বেপরোয়ার, সাহসীর, চতুর মানুষের বাজার—ভীতু টিতুর নয়।

এত কথা ভাবতে ভাবতে গৌরাঙ্গ চায়ের কাপ প্রায় শেষ করে সিগারেটটা ছোট করে ফেলল। তারপর বাসুকে আরও একটা সিগারেট দান করে বলল, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি ?'

'দিব্যি কর আগে।'

'ঠাকুরের নামে ? কোন ঠাকুর, বল ?' বাসু অক্লেশে বলল।

'না, ঠাকুর দেবতার নামে নয়। তুমি শালা ও-সব ঠাকুর-কাকুর মানো না। কালীপুজোর টাকা খিঁচ মেরেছিলে।' গৌরাঙ্গ হুঁশিয়ারের মতন বলল।

'দিব্যি-ফিব্যির কথা তুই শালাই ত তুলছিস। আমি ওআর্ড দিচ্ছি তাতে তোর বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

গৌরাঙ্গ একটু কি ভাবল বাসুর চোখে চোখে তাকিয়ে; নিজের হাত বাড়িয়ে দিল, বলল, 'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।'

বাসু শপথ করল।

'এই আঙটিটা আমার নয়।'

'তোর নয়! কার তা হলে ?' বাসু অবাক।

'শোভার জন্যে কিনেছি।...দেখছিস না কত সরু, আমার এই আঙুলে পরেছি—' গৌরাঙ্গ তার মধ্যমা দেখাল।

'তোর বউয়ের জন্যে!' বাসু রীতিমত বিহ্বল হয়ে একবার গৌরাঙ্গ আর একবার তার হাতের আঙটির দিকে তাকাতে লাগল।

'ফুলশয্যার দিন দেব, বুঝলি না।' গৌরাঙ্গ ঈষৎ লজ্জিত বোধ করলেও কাজটা যে কত কৃতিত্বের এ-রকম একটা ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল।

বাসু বন্ধুর লজ্জা সুখ এবং খুশী-খুশী মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল।

'আমাদের বাড়িতে মাইরি আজকাল বড্ড লোক-জন—' গৌরাঙ্গ সিগারেটের ঘন ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বের করল, 'নিজের জিনিস দু' একটা লুকিয়ে রাখব তার জায়গা নেই।. তার ওপর সোনা ত, বুঝলি না বাসু, যেখানে সেখানে রাখাও যায় না।'

'তোর মার কাছে রাখ।' বাসু বলল।

'ধাঃ শালা, মার কাছে বউয়ের আঙটি রাখব কি—!' গৌরাঙ্গ বাসুর

মূর্খতার যেন কূল পেল না, 'তুই একেবারে বুদ্ধু!···এ-সব প্রাইভেট জিনিস কি মা-ফাকে জানানো যায়। ভাববে ছেলেটা বিয়ের আগে থেকেই বউয়ের ভেঁড়ুয়া হয়ে গেছে। বেইজ্জতি বে···।' একটু থামল গৌরাঙ্গ, তারপর বোঝাবার মতন করে বলল, 'তুই সংসারের কিচ্ছু জানিস না। বিয়ের পর মা বাপ আর বউ দু দিকে তাল মেরে থাকতে হয়।'

বাসু এতক্ষণে গৌরাঙ্গর দেওয়া সিগারেটটা ধরাল। তার চায়ের কাপ শেষ হয়ে এসেছে। গৌরাঙ্গ বউয়ের প্রেমে উথলে উঠে একটা আংটি করিয়ে এখন গাড্ডায় পড়ে গেছে। কে জানে কেন বাসুর মজা মজা লাগছিল।··· হঠাৎ বাসুর মনে হল, গৌরাঙ্গ কি আংটিটা তার কাছে রাখতে চায়? কথাটা মনে পড়তেই বাসু কেমন বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত বোধ করে গৌরাঙ্গর মুখের দিকে তাকাল।

গৌরাঙ্গ তার হাতের সিগারেট নিবিয়ে ফেলে দিল। 'এই আংটিটা তোকে রেখে দিতে হবে।'

বাসু বন্ধুর মুখের দিকে একই ভাবে তাকিয়ে থাকল, বিমূঢ় বিস্মিত। তারপর তার অজ্ঞাতেই যেন মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল, 'আমি রাখব—?'

'আরে মাত্র ত দশটা দিন। গৌরাঙ্গ সাহস যোগাল।

'রাখব কোথায়—?' বাসু বলল, 'মা দিদির চোখে পড়ে গেলে আর বাড়ি ঢুকতে হবে না; ঠিক ভাববে আমি চুরি করেছি।'

'তুই কাজের সময় খুব ডাঁট দেখাস, বাসু।' গৌরাঙ্গ অপ্রসন্ন হয়ে বলল, 'এত দিন এত মাল ঝেঁপে নিয়ে রাখলি আর আজ একটা আংটি রাখতে পারবি না...?'

বাসু কথা বলল না, চিন্তিত মুখে সিগারেটের ধোঁয়া চায়ের কাপ লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। তারপর বলল, 'অন্য মাল ঝেঁপে একটা না একটা পট্টি দিয়ে রাখা যায়, কিন্তু শালা তোমার সোনা ঝেঁপে আমি কোন পট্টি দেব।···কেউ বিশ্বাস করবে না।'

গৌরাঙ্গ সামান্য ভাবল। কথাটা সে আগেও ভেবে রেখেছে। বলল, 'তুই আরতিকে দিস, সে ঠিক লুকিয়ে রেখে দিতে পারবে।'

'আরতি ?' বাসু তাকাল, 'আরে ব্বাস, তুই বলছিস কি রে! সেও ত জেনে যাবে।'

'তা জানুক। আরতিকে না হয় তুই বলিস ব্যাপারটা।' গৌরাঙ্গ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'মেয়েরা লুকোনো-টুকোনোর ব্যাপারে এক্সপার্ট। আরতি ঠিক লুকিয়ে রাখতে পারবে।'

বাসু কথা বলল না। খুব অভিজ্ঞের মতন ব্যাপারটা যেন সে চিন্তা করে নিচ্ছিল।

'আরতিকে আমিও দিয়ে আসতে পারতুম, বুঝলি—' গৌরাঙ্গ একটু লাজুক হাসি হেসে বলল, 'কিন্তু লজ্জা করে মাইরি। হাজার হোক ছোট বোনের মতন ত, তাকে এ-সব কথা নিজে বলতে কেমন লাগে।'

গৌরাঙ্গর দিকে কয়েক পলক চেয়ে বাসু এবার বলল, 'তা দিস তবে, আরতিকেই রাখতে বলব।'

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গৌরাঙ্গকে বেশ খুশী দেখাচ্ছিল। একটু চুপচাপ থাকার পর গৌরাঙ্গ শুধলো, 'আংটিটা বেশ হয়েছে, না রে?'

বাসু মাথা নাড়ল একটু, বেশ ভালই হয়েছে গোছের।

'অনেকগুলো টাকা চলে গেল, মাইরি।' গৌরাঙ্গ বলল।

'তোর আবার টাকার অভাব—' বাসুর গলায় ঈর্ষা।

'তুই ভাবিস কি রে আমাকে?' গৌরাঙ্গ অসন্তুষ্ট হবার মতন করে বলল, 'আমি কি নোট ছাপার কারবার করছি!'

'দু হাতে লুঠছিস' বাসু গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

'সব শালাই লুঠছে। মওকা পেলে তুই ছাড়তিস?'

'আমার মওকাই নেই।'

'বড় মওকা নেই, ছোট মওকা যা পেয়েছ তাতেই বা কোন ধম্মপুত্তুর ছিলে বাজা তুমি।'

'ধম্মপুত্তুর থাকতে বাসু ভট্চাযের বয়ে গেছে।' বাসু বলল, বলে খুব লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল।

বেশ একটু চুপচাপ। গৌরাঙ্গ পকেট থেকে সুপুরির কুচো বের করে

চিবোচ্ছিল, বাসু কখনও নতমুখে বসে, কখনও দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। এই গম্ভীর ভাবটা কেন যে আজকাল এসে যায় দু বন্ধুর মধ্যে দু-জনেই বুঝতে পারে না। কিন্তু দু জনেই খেয়াল হবার পর ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে।

'এতক্ষণ ত নিজের কথা শোনালি, আমার ব্যাপারটার কি হল, বল?' বাসু বলল, বলে গৌরাঙ্গর দিকে চেয়ে থাকল।

'তোর কোনটার—?'

'দু'টারই।'

'ঝামেলায় পড়ে আজ আর টাকা তুলতে পারি নি। পাঁচটা টাকা আমার কাছে আছে, তুই নে।' গৌরাঙ্গ জামার বুক পকেট থেকে টাকা বের করতে লাগল।

'তুই যেন ভিক্ষে দিচ্ছিস রে—' বাসু চটে উঠল, 'পাঁচটা টাকার জন্যে আমি তোর পায়ে দু দিন ধরে তেল মাখাচ্ছি না।'

গৌরাঙ্গ ততক্ষণে টাকা বের করে দিয়েছে। পাঁচ টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই তোর বড় দোষ, বাসু, দুড়াম করে চটে যাস। আমি পাস বই নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

বাসু অত্যন্ত হতাশ বিরক্ত চোখে কয়েক মুহূর্ত গৌরাঙ্গর দিকে চেয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে নোটটা নিল। 'আমার বেলায় শালা তোর যত ভুল হয়, বউয়ের আংটি কিনতে হয় না'

'আমি তোকে আরও পাঁচটা টাকা পরে দেব।'

'কবে?'

'নিস, পরশু।'

'না, পরশু না, কাল।'

গৌরাঙ্গ বাসুর জবরদস্তি ভাবটা লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'তুই এমন করিস যেন আমি তোকে টাকা ধার দিই না।...আজ পর্যন্ত কত ধার দিয়েছি তোকে বল।'

বাসু জবাব দিল না, দেবার আগ্রহও অনুভব করল না। হাত বাড়িয়ে

গৌরাঙ্গর সামনে থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। একটি মাত্র সিগারেট অবশিষ্ট ছিল প্যাকেটে। সিগারেটটা বাসু নিল, প্যাকেটটা তুলে নিয়ে গৌরাঙ্গর কোলে ছুঁড়ে মারল। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে হাতের আড়ালে সিগারেট ধরাল।

'মল্লিকদের বড় ভাইটার সঙ্গে দেখা করিস নি ত!' বাসু শুধলো।

'রাস্তায় দেখা হয়েছে।'

'কি বলল?'

'কিছু বলে নি, পরে দেখা করতে বলেছে।'

গৌরাঙ্গর মুখের দিকে খুব সতর্ক চোখে তাকিয়ে থেকে বাসু বলল, 'তুই গুল মারছিস, গৌরাঙ্গ।'

'গুল! মাইরি না, অফিস থেকে ফেরার পথে লণ্ড্রীটার সামনে দেখা হয়েছে।' গৌরাঙ্গ গলায় জোর দিয়ে জবাব দিল।

বাসু আর কিছু বলল না, সিগারেটের ঘন ধোঁয়া গিলতে লাগল। উর্ধ্ব নেত্রে কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল, বড়ুয়া কেবিনের রান্নাঘরের দিকে চোখ ফেরাল পরে, তারপর মুখ সোজা করে গৌরাঙ্গর দিকে তাকাল। 'হাবুল বলছিল, মল্লিকরা আর লোকজন নেবে না।'

গৌরাঙ্গ জানে মল্লিকরা লোকজন নেবে, এও ভাল করে জানে বাসুকে নেবে না। সুধীরদা, মল্লিকদের বড় ভাই, গৌরাঙ্গকে সে কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। বাসুকে তারা তাদের ফার্মে নেবে না। প্রথমত বাসু কোনো কাজ জানে না, দ্বিতীয়ত—একবার বাসু মল্লিকবাড়ির সেজ ভাইকে মারতে গিয়েছিল। দোষ বাসুর নয়, মল্লিকবাড়ির সেজ ভাইয়েরই: বাসুকে আলতু-ফালতু বাত বলেছিল। কিন্তু এই সত্য কথাটা সরাসরি বাসুকে বলতে পারল না গৌরাঙ্গ। বরং একটু চুপ করে থেকে আরও জোরালো গলায় বলল, 'হাবুল কি মল্লিকদের ফার্মের মালিক নাকি?... কি জানে সে শালা।...সুধীরদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে অন্তত দু তিন দিন।' গৌরাঙ্গ হাবুলের কথা যেন সরাসরি নাকচ করে দিয়ে ডান হাতের আঙুল তুলে বলল, 'তুই জানিস, দমদম এরোড্রোমের ওখানে যে কাজ হচ্ছে তার

দেড় লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে মাল্লকরা; আগানলোলেও মোটা টাকার কাজ পেল সেদিন, ছুটোছাটা ত আছেই লেগে। এখন ওদের বিস্তর লোক দরকার।

বাসু বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল বলে মনে হল। শুনে গৌরাঙ্গর মাথার ওপর দিয়ে ধোঁয়ার একটা চাকা ছুঁড়ে দিয়ে এক দৃষ্টে চাকাটাকে দূরে সরতে এবং বড় হয়ে হয়ে ভেঙে যেতে দেখছিল। গৌরাঙ্গর মাথার ওপাশে গিয়ে ধোঁয়া যখন মিলিয়ে গেল, বাসু আচমকা ভীষণ শুকনো আন্তরিক গলায় বলল, 'আমার কিছু হবে না, গৌরে, · লাক্ খারাপ।'

গৌরাঙ্গ নীরব থাকল। তার বলার কিছু ছিল না। বাসুটার কপাল সত্যিই খারাপ। যুদ্ধের বাজারে এত লোকের একটা না একটা কিছু লেগে যাচ্ছে, ও বেচারীর লাগছে না। এ আর পি-র চাকরিটা আছে বলে কোনো রকমে টিকে আছে, নয়ত মরে যেত। ওদের বাড়ির অবস্থাও এখন বোধ হয় খুব খারাপ। সুধাদির চাকরিটা যাব যাব করছে বোধ হয়, নয়ত কিছু দিন আগে আরতি তাকে অমন করে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা বলত না। গৌরাঙ্গর ইচ্ছে হচ্ছিল একবার বাসুকে তাদের বাড়ির কথা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করে। আরতির চাকরি চাওয়ার কথাটা বলে। কিন্তু কিছু বলল না গৌরাঙ্গ। আরতি বারণ করেছে বলতে, গৌরাঙ্গ কথা দিয়েছে বলবে না কাউকে কিছু। · না, গৌরাঙ্গ কিছু বলল না।

'উঠবি।' গৌরাঙ্গ শুধলো; ক্লান্ত গলায়।

'কটা বাজল?' বাসু জিজ্ঞেস করল।

'নটা হবে।'

'বোস আর খানিক। বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই ত মার সঙ্গে খেচাখেচি। একটু রাত হলেই ভাল।'

'আঙটিটা তবে নিয়ে রাখ্।'

'দে।' বাসু পা টান করে মেঝেতে ছড়িয়ে দিল।

গৌরাঙ্গ আঙটি খুলছিল। বাসু দেখছিল। তার চোখে আঙটির মিনের কাজ যেন ছুঁচের মতন ফুটছিল। মীহুদি এমনি মিনে করা আঙটি পরত।

বাসুকে একদিন পরিয়ে দিতে চেয়েছিল মজা করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরা হয় নি। মীনুদি কি কলকাতায় ফিরেছে? এত লোক কলকাতা ছেড়ে পালালো আর ফিরল, মীনুদি কি আর ফেরে নি! নিশ্চয় ফিরেছে। বাসু একদিন ক্রীক রো-এ গিয়ে দেখে আসবে।

কিন্তু . , বাসু নিজের মনেই একটু মাথা নাড়ল; মীনুদি ফিরে এলেও তার কি লাভ! তাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না। ও সব চালু মাল মেয়েরা এই রকমই। বাসু জানে। এই দুনিয়াটায় লভ্ টভ্ বলে কিছুই নেই। যে যতটা চাললু সে ততটা আরাম করে নেয়। দিদিটার অবস্থা দেখলে বাসুর এখন নিজের কথাই মনে পড়ে। আগেই বাসু জানত, ঠিক এই রকম হবে, ওই সুচারু শালা কেটে পড়বে, আর দিদি ক্যাবলার মতন বসে থাকবে। আরে, হাজার হোক বাসুরই ত দিদি, ওদের কপাল এক রকম।

'নে রে—' গৌরাঙ্গ আঙটি বাড়িয়ে দিল, 'সাবধানে রাখ।'

আঙটিটা হাতের তালুতে নিয়ে বাসু আঙুল দিয়ে কেন যেন একটু সোনা আর মিনের কাজ ঘষে নিল। নিজের কড়ে আঙুলে গলাবার চেষ্টা করল একবার। তারপর বলল, 'তুই বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিস, গৌরাঙ্গ; বউ-ফউ পাকা করে নিয়ে তবে আঙটি গড়িয়েছিস।' বাসু একটু থেমে আঙটিটা আঙুল থেকে খুলে নিল, 'আমাদের হলে শালা আঙটিটাই হত, বউ আর হত না।' বাসু কথাটা শেষ করে হাসবার চেষ্টা করল। হাসি ফুটল না।

ছয়

অফিস ছুটির অনেকটা আগেভাগেই সুধা বেরিয়ে পড়েছিল। আজ নীচের হলে মিটিঙ্‌; শোকসভা। এই কম্পানীর এক বিদেশী মালিক স্বদেশে মারা গেছে পরশু, কাল তার এসেছে, আজ কলকাতার অফিসে শোকসভা। নীচের হলটা দুপুর থেকেই সভার আয়োজনে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কাজকর্ম বন্ধ, বেয়ারা চাপরাশির সঙ্গে দু'চার জন বাবু আর ছোট অফিসার মুদিসাহেব হল সাজাতে ব্যস্ত, জুটের কার্পেট আর চেয়ার পড়েছে, লম্বা টেবিলের ওপর ধবধবে সাদা চাদর, মৃত মালিকের বাঁধানো ফটো, একরাশ ফুল। আয়োজনের ব্যস্ততার মধ্যে গুঞ্জন আছে, কলরব নেই, কে বুঝি অগুরু ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল দেওয়ালে দেওয়ালে, এই ছিম-ছাম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন গম্ভীর অফিসের বাতাস ধূপের গন্ধ নিয়ে শোকের আবহাওয়া রচনা করছিল।

সুধার মাথা আরও ধরে আসছিল। কেন, সুধা জানে না। আজকাল প্রায়ই দুপুর কি দুপুরের শেষ থেকে তার মাথা ধরে ওঠে। কোনো কোনো দিন এত বাড়ে যে, অফিস থেকে ফেরার সময় মনে হয় জ্বর আসছে, না এসেছে। চোখ জ্বালা করে, মুখের মধ্যে ভীষণ বিস্বাদ লাগে, হাই তুললে মনে হয় খানিকটা দুর্গন্ধ – গ্লানির উষ্ণ বাতাস শরীর থেকে বেরিয়ে এল।

আজ দুপুরের আগেই মাথা ধরে গিয়েছিল সুধার। চন্দ্রসাহেবের কামরায় ভুল করে কিসের একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছিল, বিরক্ত হয়ে নীচে ফোন করেছিলেন তিনি, হংসকুমারীকে। হংসকুমারী আবার ধমকে দিল সুধাকে। অপমানটা লেগেছে সুধার। সেই থেকে, ভাবতে ভাবতে ক্রমশ মাথা ধরে উঠল।

সভার আয়োজনের ফাঁকে সুধা অশোকবাবু প্রবোধ দত্ত আরও দু-চার জনকে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে দেখল। সুধারও ইচ্ছে করছিল না

অফিসে থাকতে। শোকের বক্তৃতা শোনার উৎসাহ আগ্রহ তার ছিল না। এই সভা, ওই মৃত বৃদ্ধ কোনো কিছুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে বলে সুধার একবারও মনে হল না। বরং, অফিস এক রকম ছুটি হয়ে যাবার পর অকারণে অপ্রয়োজনে মাথা ধরা নিয়ে বসে থাকতে তার বিরক্তি হচ্ছিল।

পুষ্পাকে একটু আড়ালে ডেকে সুধা বলল আমার খুব মাথা ধরেছে, পুষ্পা। আমি বরং চলে যাই। পুষ্পা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল, আরে চলে যাও, মিটিংমে তো আভি শির দুখা যাতা হ্যায়। সুধা যাব যাব করছে, পুষ্পা কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সতর্ক গলায় শুধলো, 'ফের কি বিমার হবে তোমার ?'

মাথা নাড়ল সুধা, না। পুষ্পার সন্দেহ তাকে বিমর্ষ করছিল। অফিসের সহকর্মিণীদের মধ্যে পুষ্পার সঙ্গেই তার কিছু অন্তরঙ্গতা আছে। মেয়েটা ভাল, গুজরাটী, সুধাকে পছন্দ করে। পুষ্পার আশঙ্কা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। সুধার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। এক সময়ে একটু সরে গিয়ে হংসকুমারীকে দেখল। হংসকুমারী আর প্রীতি সোম গল্প করছে বসে বসে একপাশে। সুধাকে কেউ দেখছে না। সামান্য সময় অপেক্ষা করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সুধা।

অফিসের সামনের পথটুকু একটু দ্রুত হেঁটে পেরিয়ে এল সুধা। বলা যায় না কে দেখছে, কার মুখোমুখি পড়ে যায়। গির্জেবাড়ির মোড় ঘুরে আর দ্রুত হাঁটতে হল না, এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত, কেউ তাকে দেখছে না। সামনের রাস্তাটা মাঠের মতন চওড়া, উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো, মাঝ-ফাল্গুনের রোদ তাই পুবের বাড়িগুলোর বুক পর্যন্ত উঠেছে। রাস্তার পাশে একটা নব-পল্লবপর্ণ উঁচু-মাথা গাছের দিকে চোখ পড়ল সুধার অপরাহ্ণের রোদে উজ্জ্বল, বাতাসে চঞ্চল। এই গাছটাকে শীতের সময় কেমন দেখেছিল সুধা একবার মনে করবার চেষ্টা করল, অকারণেই।

ছায়া ধরে মন্থর পায়ে সুধা হাঁটছিল। বাতাস বেশ গরম, এই আসন্ন বিকেলেও রোদ তপ্ত। কেমন একটা শুকনো উষ্ণ ভাব চারপাশে। এবার বোধ হয় চৈত্র থেকেই বেশ গরম পড়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে মাথা ধরার ভাবটা একটু ভুলে থাকতে চাইছিল সুধা। সম্পূর্ণ ভুলতে পারছিল না। একটু ভুল হয়েছে, অফিসে থাকতেই বেয়ারাকে দিয়ে স্যারিডন কিনে এনে খেলে ভাল হত। আজকাল বড্ড স্যারিডন খাচ্ছে সুধা। কে যেন বলেছিল অত ও-সব খাবেন না, হার্ট দুর্বল হয়ে যাবে।

কথাটা রবীনবাবুই বলেছিলেন। রবীনবাবুর সঙ্গে আজ একবারও দেখা হল না অফিসে। আসেন নি হয়ত। বিয়ে করে ভদ্রলোক আরও নিশুকে হটগুলে হয়ে উঠেছেন। রবীনবাবুর বিয়েতে যেতে না পারায় সুধাকে এমন অপ্রস্তুতে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক ; ছি ছি। কথাটা মনে করতে পারল সুধা, 'দেখুন, বিয়ে শুধু আমি একলাই করলাম না, আপনিও করবেন, তখন এ-অফিসের একটা লোককেও আমি আপনার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে দিচ্ছি না। লোকসানটা তখন বুঝতে পারবেন।'

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সুধা। সেখানে নির্মলবাবু দাঁড়িয়ে, পাশে পুষ্পা আর প্রীতি সোম। নিজের অপরাধ কাটাবার জন্যে আগেই অনেক রকম কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করেছিল বলে রবীনবাবুর শেষ কথার পর তার আর কিছু বলবার বা প্রতিবাদ করার ছিল না। চুপ করে ঘাড় মুখ গুঁজে দাঁড়িয়েছিল সুধা, আর অন্যরা হাসছিল।

ঠাট্টাই করেছিলেন রবীনবাবু, কিন্তু এই সরল হাসি-তামাশার কথা না ভেবে সুধা অন্য কথা ভাবছিল। মানুষের সব কথা সবাইকে বলা যায় না। রবীনবাবুর মত বিবেচক ভাল মানুষটাকেও সুধা বলতে পারে নি, আমার যাবার উপায় ছিল না। আপনার বউভাতের নেমন্তন্নে এভাবে কি করে যাই বলুন, একেবারে খালি হাতে কেউ কি যেতে পারে—আমাদের বাড়িতে সেদিন মাত্র এগারো আনা পয়সা ছিল, একটা রুপোর জল করা সিঁদুর কৌটো কিনতেও চারটে টাকা লাগে। তা ছাড়া, এভাবে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগে না। না একটা ভাল শাড়ি, না বা ব্লাউজ ; হাত খালি, কানে দুটো আদ্যিকালের ফুল আর গলায় এক ভরির একটা সুতোর মতন হার, তাও আমার নয়, আরতির ; আমার গলায় যেন ফাঁসের মতন লেগে

আছে।...আমি কোথাও যাই না, কোথাও নয়। আজ ছ বছর কারও কোনো উৎসবে যাই নি।

ট্রাম রাস্তার মুখে মুখে এসে সুধা একটু দাঁড়াল। আগত কোনো ট্রামের শব্দ যেন তার শেষ ভাবনার ধারাকে ক্রমশ তীব্রতর করে হঠাৎ চকিত করে তুলল। ফুটপাথের গা ঘেঁষে একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে। এত অন্যমনস্ক ছিল সুধা, পথে নামলে বাসটা হয়ত তার গায়ে এসে পড়ত। ড্রাইভার কি একটা কথা বলল। হয়ত সুধাকে হয়ত সুধাকে নয়। সুধা অপ্রস্তুতের মতন ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

দু একজন কে নামল সুধা লক্ষ্য করে দেখে নি। বাসটা চলে গেলে পথে নামবে বলে অপেক্ষা করছিল।

'এই সুধা—!'

সুধা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অমলাদি।

'কি রে, তুই?' বাস থেকে নেমেছে অমলা। এগিয়ে এল ত্বরিত পায়। 'আমি তোর অফিসেই যাচ্ছিলাম।'

'আমি অফিস পালিয়েছি।' সুধা সামান্য হাসল।

'তোদের আবার অফিস পালানো আছে নাকি!' অমলা কৌতুকের চোখ করে বলল, 'সে আমাদের। আমাদের পালানোটাই কাজ, যে যত পালায় তার তত রেকর্ড ভাল হয়।' অমলা স্বভাব মতন হাসল শব্দ করে।

অমলার মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে থাকল একটু সুধা। মুখে কেমন একটা দাগ ধরেছে যেন অমলাদির। হংসকুমারীর মতন একগাদা লিপস্টিক ঠোঁটে। পাউডারের একটা খোসা যেন গালের ওপর লেগে আছে।

'এতই যদি অফিস পালাও ত আমার অফিসে মাঝে-মধ্যে দেখা করতে আস না কেন?' সুধা বলল।

'কেন আসব? তুই যাস আমার কাছে?'

'আমার সময় কই, অমলাদি। আমার অফিস থেকে পালানো যায় না।'

'আজ মিটিঙ বলে পালাচ্ছিস।'

সুধা অবাক। অমলার চাপা হাসি এবং চঞ্চল চোখের দিকে দু পলক তাকিয়ে থাকল। 'তুমি কি করে জানলে আজ আমাদের অফিসে মিটিঙ?'

'ওই ত, আমি জানি অনেক কিছু জানি। ..অমলা রাস্তায় পা বাড়াল, 'চল্ তোর সঙ্গেই খানিক সময় কাটিয়ে আসি।'

সুধাও রাস্তায় নামল। অমলাদির কথা থেকে তার মনে হল, অমলাদি যেন আর কারও সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। 'তুমি আমার কাছে আস নি?'

'আসছিলাম। তোর কাছে এবং অন্য একজনের কাছেও।' অমলা ঠোঁট টিপে বলল।

'চন্দ্রসাহেবের কাছে?' সুধা কেমন একটু খাটো গলায় শুধলো।

'না।'

'তবে?'

'আছে একজন, আরেক সাহেব—' অমলা তুচ্ছ করার মতন গলা করল, তা সে সাহেব থাকুক গে, তোর সঙ্গেই কাটাই।'

কিছু নয়, তবু সুধা কেন যেন সামান্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। অমলাদি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ভেবে খুব সঙ্গোপনে যে খুশী জমে উঠেছিল তার কোথায় যেন একটা ছিদ্র আবিষ্কার হয়েছে দেখে মন খুঁত খুঁত করে উঠছে। একটু চুপ করে থেকে সুধা বলল, 'তোমার যদি কোনো কাজ থাকে—'

'কাজ, কার সঙ্গে?'

'সেই সাহেবের সঙ্গে।'

'তেমন জরুরি কোনো কাজ নেই। গরজ থাকলে সে নিজেই সন্ধ্যেবেলায় আমায় খুঁজে বের করে নেবে।'

রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের ফুটপাথে উঠে অমলা হাঁটছিল। সুধা পাশে পাশে। অমলা কোথায় যাচ্ছে কোথায় যাবে কিছু জানা নেই সুধার।

'কোথায় যাবে অমলাদি?'

'যেখানে খুশি চল্।'

'আমার কোনো খুশি নেই।'

'নেই সে ত জানি।' অমলা হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে সুধার মুখ একবার দেখে নিল। বলল, 'তোর খুশী এখনও ওআরক্রপ্টে।'

প্রথমটায় সুধা বোঝে নি, তারপর বুঝতে পারল। এই কাঁটা তাকে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষ কত বার যে বিঁধিয়ে দেয়। রবীনবাবু সেদিন যখন বিয়ের কথা বলেছিলেন, 'আপনারও যখন বিয়ে হবে,' তখনও কাঁটাটা বিধেছিল। অবশ্য রবীনবাবু অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে বিঁধিয়েছিলেন।

'চল, আমরা কোনো নিরিবিলি দোকানে ঢুকে চা খাই' অমলা বলল, 'এসপ্লানেডে যাবি?'

'আবার এসপ্লানেড, অনেকটা হাঁটতে হবে।' সুধা কাতর মুখ করল।

'অনেকটা কোথায় রে ওই ত' অমলা ব্যাগ সমেত হাতটা একটু এগিয়ে দিয়ে দূরত্ব দেখাল। কয়েক পা হেঁটে আবার বলল 'রিকশায় উঠবি?' বলতে না বলতেই অমলা রিকশা ডেকে বসল।

সুধা সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বলল, 'দুজনে মিলে রিকশা, তার চেয়ে ট্রাম বাসে উঠলেই হত।'

'আমি তোকে ট্যাক্সি চড়াতেই পারতাম, কিন্তু এটুকু পথ ট্যাক্সিতে নেবে না।' বলে অমলা সুধার মুখের দিকে চেয়ে যেন তার সাধ্যের দৌড়টা রঙ্গ করেই বোঝাতে হাসল। 'নে, ওঠ।' সুধা উঠতে ঠাট্টা করে বলল, 'তোর লজ্জা করে ত পরদা ফেলে দে বাপু।'

ফাল্গুনের পড়ন্ত রোদের উজ্জ্বলতা ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে। ওপাশে লালদিঘী। গাছের মাথায় রোদ চলে আছে, দক্ষিণের ছায়া দীর্ঘ হয়ে এদিকের রাস্তাটা জুড়ে বসেছে। ট্রামগুলো গোল হয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলে যাচ্ছে, আসছে, বাসগুলো ডালহাউসির গায়ে গা ঘষছে ঘন ঘন, অফিসপাড়ার ছুটির ঘণ্টা এখনও বাজে নি, তবু কিছু পলাতক কেরানী, কিছু উকিল মুহুরী কিছু দালাল-টালালের ভিড়ে জায়গাটা ক্রমশ ভিড় হয়ে উঠেছে।

'অফিসে মিটিঙ বলে বুঝি পালিয়ে এলি?' অমলা শুধলো।

'হ্যাঁ,' সুধা মাথা নাড়ল, 'আমার বড্ড মাথা ধরেছে। বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম।'

'বললি না কেন আগে। চল্, তোকে দুটো অ্যাসপিরিন খাইয়ে দি, এখ্খুনি মাথা ছেড়ে যাবে।'

রিকশাঅলা একটু বাঁয়ে সরে একটা বাসকে গা ঘেঁষে এগিয়ে যেতে দিল। বাসটা পেরুতে না পেরুতেই মোটর বাইক ছুটিয়ে এক জোড়া এম পি. চলে গেল সোজা, আর তারপরই এসপ্লানেডের দিক থেকে একটা মিলিটারী ট্রাক মত্তের মতন ছুটে এসে লালদিঘীর রেলিঙে ধাক্কা মেরে বসল।

সুধারা পিছু ফিরে তাকায় নি বলে এই ধাক্কা মারাটা দেখতে পেল না। কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পেল।

'এই কলকাতাটা দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে না রে, সুধা।' অমলা বলল।

'বিশ্রী' সুধা ছোট করে জবাব দিল।

'আমার ওসব সুশ্রী বিশ্রী মনে হয় না, আমি দেখি অন্য জিনিস।'

'কি?'

'শহরটা যেন খোঁচা খাওয়া ভীমরুলের চাক…। গত বছর থেকে এ বছর পর্যন্ত কত লোক বেড়েছে জানিস?'

'অ-নেক।'

'অ-নেক কি রে, দু গুণেরও বেশি, আরও বাড়ছে। সিভিল সাপলাই করবেটা কি ও জানিস, আমি সিভিল সাপলাই ছেড়ে দিচ্ছি।' অমলা বলল।

'ছেড়ে দিচ্ছ?' সুধা অমলার মুখের দিকে তাকাল।

'বিয়ে করছি।' অমলা এমন ভাবে ঠোঁট চেপে, চোখ আড় করে খানিকটা হাসি খানিকটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে কথাটা বলল যে সুধা বুঝতে পারল না, অমলাদি ঠাট্টা করছে না কি সত্যিই বিয়ে করছে।

সুধা একটু সময় চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল অমলার, হেসে বলল, 'তবে ত সুখবর। কবে করছ?'

'আগে জিজ্ঞেস কর কাকে করছি।' অমলার গলায় তরল কৌতুক।

সুধা নিজেই যেন এই ধাঁধার একটা সমাধান করবার চেষ্টা করছে এমন

চোখে চেয়ে থাকল। অমলাদি কাকে বিয়ে করতে পারে! মিশন রো-র অফিসে থাকতে একজনের গল্প শুনেছে সুধা, সেই ওকালতি পাশ করা ভদ্রলোক, বোমার ভয়ে যে দেওঘরে পালিয়ে গিয়েছিল। সে নয়; অমলাদি সেই ভদ্রলোকের নাম নিয়ে কত রকম ঠাট্টা তামাশা করেছে। তার বুঝি বিয়েও হয়ে গিয়েছিল।

সুধা অযথা অনুমানের চেষ্টা করল; খানিকটা সময় কাটল, কারও নাম তার মনে এল না। 'কাকে করছ?' সুধা জিজ্ঞেস করল।

'নাম শুনবি। না তার পেশা শুনবি?' অমলা রঙ্গ করে বলল।

কথাটার অর্থ ধরতে পারল না সুধা। অমলাদির রকমই ওই। সব কথাতেই হাসি ঠাট্টা। কাকে বিয়ে করছ মানুষ সে-খবরটাই আগে চায়, তারপর না বর তোমার কি করছে কোথায় থাকে!

'নামটাই আগে বলো, পেশাকে ত আর বিয়ে করছ না।' সুধা হালকা গলায় অল্প হাসির ছোঁয়া দিয়ে বলল।

'কি বলিস তুই—' অমলা কাঁধে কাঁধে সুধাকে একটু ঠেলে দিল, চোখে বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, 'আমাদের বিয়ে ত পেশার সঙ্গে, চল্লিশ টাকার একটা মেদামাড়া কেরানীকে তুই বিয়ে কর না দেখি, লজ্জায় গলায় দড়ি দিবি।' এক মুহূর্ত থামল অমলা, আবার বলল, 'অথচ চারশো টাকার একটা চাকরিঅলা তা সে গুঁফো গোবদা টেকো যাই হোক বিয়ে করলে তোর একেবারে দেমাক দেখিস।'

রিকশা পথ ছোট করে নিয়েছিল। বাঁ হাতি ওয়াটারলু স্ট্রীট দিয়ে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে পড়ে প্যারাডাইস সিনেমার কাছাকাছি আসতেই অমলা রিকশা থামিয়ে দিল। 'এখানেই নামি, আয়।'

ভাড়া মিটিয়ে ফুটপাথে একটু দাঁড়িয়ে থাকল অমলা। বলল, 'তোকে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাব না, নয়ত লিণ্ডসে স্ট্রীটে ফাঁকা নিরিবিলি বসবার জায়গা ছিল।…চল, ওই দোকানটায় বসি।' দু চার পা হেঁটেই হঠাৎ কি ভেবে ডান দিকের একটা স্টেশনারী দোকানে ঢুকে পড়ল অমলা। সুধা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল।

রোদের রঙ এখন খুব হালকা, দেখলেই অনুভব করা যায় তাপ তাত উজ্জ্বলতা কিছু নেই, বিকেলের ছায়া সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু অতিক্রম করে উলটো দিকের বাড়িটার মাথার ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে। বেণ্টিক স্ট্রিটে ভিড় বেড়েছে, একটা জল দেওয়া ট্রাম গাড়ি এসপ্ল্যানেডের গুমটির দিকে চলে গেল। এখানে গাড়ি ঘোড়া মানুষ দোকান-পশার এবং যাবতীয় শব্দের এক মিশ্রিত গুঞ্জনের মধ্যে সুধা অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কি ভাব ও ভেবে কোন কথা ভাবছিল তাও তার খেয়াল ছিল না। অমলাদি কাকে বিয়ে করছে, সত্যি সত্যি কি বিয়ে করবে এই ভাবনা যেন জল দেওয়া ট্রাম গাড়িটার মতন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে এই মৃত দিনান্তে নগর গুঞ্জনের মধ্যেও সচাংকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অস্পষ্ট বিযুক্ত কয়েকটি স্মৃতি মনের অর্ধআলোকে স্বপ্নের মতন দেখা দিল, বিচ্ছিন্ন হল আবার যেন অনেকটা মাঝখানে ফেলে রেখে জোড়া লাগিয়ে দিল। সুচাংকর সঙ্গে এই অঞ্চলটার আশে পাশে চায়ের দোকানে এসে কবে কবে সুধা বসেছিল, দিন মাস সময়—সব যেন সুধা এই মুহূর্তে মনে করতে চাইছিল। বসন্তের উন্মাদঋ চঞ্চল হাওয়া সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর বুক থেকে একটি দুটি শুকনো পাতা খড়কুটো এনে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটের ধুলো নিয়ে ফুটপাতে আবিরের মতন ছুঁড়ে দিল। আর সবই আচমকা সুধার চোখে পড়ল, চিৎপুরের ট্রামে যেতে যেতে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের পা দানিতে দাঁড়িয়ে রঙ লাগা জামা গায়ে দু তিন জন বেহারী ট্রামের পিছনে বাতাসে আবির উড়িয়ে দিচ্ছে। পরশু দোল।

অমলা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গা ছুঁয়ে ডাকল, 'চল্।'

অন্যমনস্ক ভাবেই সুধা পা বাড়াল।

'দোকানের বাহারটা দেখেছিস, সুধা?' অমলা চলতে চলতে বলল।

সুধা কিছু দেখে নি। অজ্ঞের মতন জবাব দিল, 'না—, কিসের বাহার?'

'তুই একেবারে ঘাড় গুঁজে পথ হাঁটিস—' অমলা বিরক্ত হবার ভাব করে বলল, 'ভগবান যে কেন তোকে চোখ দিয়েছেন।'

'দায়ে পড়ে বোধ হয়—' সুধা কি ভেবে ঠাট্টা করে বলল।

অমলা কথাটা শুনল না, নিজের মনেই বলে চলল, 'এই দোকানটা আগেও

দেখেছি, তোর মনে আছে সুধা, মিশন রো-র অফিসে চাকরি করবার সময় আমরা এই দোকানটায় এসে ডালমুট কিনতাম মাঝে মাঝে। আজকাল সেই দোকানের কি ব্যাপার। না আছে এমন জিনিস নেই, কি সাজিয়েছে ভেতরটা, তার ওপর কেমন সাজিয়ে গুছিয়ে মেয়ে সেলসম্যান রেখেছে একটা।

সুধা অমলার মুখের দিকে তাকাল। 'মেয়ে সেলসম্যান?'

'ওমা, জানিস না। বর্তমানে চৌরঙ্গি পাড়ায় আজকাল এটাই তো ফ্যাশান যে। অনেক দোকানেই দেখবি, একটু সাজাতে গোছাতে পেরেছে কি একটা করে উর্বশী এনে বসিয়ে দিচ্ছে।'

সুধা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছু দিকে তাকাল একবার।

কাছাকাছি রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল অমলা। জায়গার অকুলান তবু তারই মধ্যে যতটা সম্ভব সাজানো গোছানো, পিছন দিকে ছোট ছোট দুটো কুঠরি, পর্দা গোটানো। অমলাদের দেখেই রোগা গায়ে বেয়ারাটা গুটোনো পর্দা আরও তুলে ধরল।

পাঁচিলের দিকে পিঠ রেখে এগুলো অমলা। চেয়ার নেই, দু-মানুষের মতন হেলান কাঠ দেওয়া সরু বেঞ্চ, মাঝে টেবিল অন্য পাশেও একই রকম বেঞ্চ। টেবিলের ওপর হাতের কালো ব্যাগ ফেলে দিয়ে অনায়াস সহজ ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে অমলা বসল। সুধা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আঁচল এবং কাপড়টা ঠিক করে তার ঝোলানো ব্যাগ কাঁধ থেকে খুলছে।

'কি খাবি তুই?' অমলা শুধলো।

'কিচ্ছু না।' সুধা ব্যাগ নামিয়ে রেখে বসল। চশমা খুলে রাখল।

'তোমাদের দোকানে মিষ্টিটিষ্টিও আছে দেখলাম—' অমলা বেয়ারাটাকে বলল।

'সব টাটকা, দিদিমণি' বেয়ারাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন শপথ করার সুরে বলল, 'একটু আগে এলে খাস্তা কচুরি পেতেন, গরম, পাশেই আমাদের মাল তৈরী হয়। মাছ মাংসের কিছু দেব, কাটলেট চপ পরোটা...' বেয়ারাটা মিষ্টির দিকে যেতে চায় না বলেই যেন খুব সতর্ক ভাবে চপ কাটলেটে চলে এল।

'মিষ্টি কি আছে বল ?' অমলা হাসি মুখে বলল।

'রাজভোগ, চমচম, ছানার জিলিপি, মুগের নাড়ু...'

'তুই চমচম আর ছানার জিলিপি খা, সুধা; আমি মুগের নাড়ু খাব।' অমলা সুধার দিকে তাকাল না।

'না না, সত্যি বলছি অমলাদি আমি কিছু খাব না এখন—' সুধা তাড়াতাড়ি আপত্তি জানাল।

অমলা কথা কানে তুলল না। খাবারের অর্ডার দিয়ে বেয়ারাটাকে বলল, 'বেশ গরম লাগছে, তোমাদের ফ্যানটা খুলে দাও। আর শোন, খাবার জল দিয়ে যাও ত আগে।'

বেয়ারাটা পর্দা ফেলে বেশ করে টেনে দিল। বাইরের আলোটুকু ঢাকা পড়ে গেল। দু হাতের কুঠরিটা ঝাপসা এবং নিভৃত হয়ে এল। অমলা হাতের মুঠো থেকে অ্যাসপ্রোর প্যাকেটটা বের করে সুধার দিকে এগিয়ে দিল। 'ভাগ্যিস দোকানটায় পেয়ে গেলাম নয়ত আরও হাঁটতে হত।'

সুধা বুঝতে পারল না, অমলাদি অ্যাসপ্রো পাওয়ার কথা বলছে, না অন্য কিছু কেনার কথা বলছে। হয়ত অ্যাসপ্রোর কথা, হয়ত অমলাদির কিছু কেনার ছিল পেয়ে গেছে। সুধা তেমন কোনো কৌতূহল বোধ করল না। অ্যাসপ্রোর প্যাকেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অমলা খানিক চুপ করে থাকল। ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে ফ্যানের ব্লেড দেখছিল। কাঠের ব্লেড। বেশ পুরোনো কালের ফ্যান। হাঁড়িটাও বাহারী। ধোঁয়ায় ধুলোয় তেলে এখন কোনোটারই আর শোভা নেই, পুরোনো জিনিস দেখার সাধারণ কৌতূহল ছাড়া চোখের অন্য কোনো আগ্রহ নেই। পাখাটা ঘুরছে, আর খুব চিকণ ক্লান্ত একটি শব্দ হচ্ছে বিরতির মাত্রা রেখে।

সুধা অমলাকে অন্যমনস্ক ভাবে দেখছিল। অমলাদিকে বেশ ক্লান্ত উস্কো-খুস্কো দেখাচ্ছে। মুখটা কেমন হয়ে গেছে অমলাদির, স্নো পাউডারের খোসাটা যেন মরা চামড়ার মতন তুলে নিলে অন্য একটা মুখ বেরিয়ে পড়বে। ...আশ্চর্য, অমলাদি কেমন মোটাসোটা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, চোখের কোলে

বয়স আছে বলেই যেন সমস্ত মুখে কেমন একটা শাসন দিয়ে এই সত্যটাকে অমলাদি বেঁধে রাখতে চাইছে।

'তোমার বিয়ের কথা বললে না ?' সুধা কথা শুরু করল।

'বিয়ে—' অমলা সুধার দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক, বলল, 'বিয়ে ত করছি।' বলে অমলা সহজ স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে তার অভ্যাস মতন হাসল।

'কবে করছ, কাকে করছ তা ত বলছ না।' সুধাও মৃদু হাসল।

'বলছি, দাঁড়া আগে কিছু খেয়ে নি।' যেটুকু গম্ভীর ক্লান্ত নিঃসঙ্গ ভাব এসেছিল অমলার তা যেন কাটিয়ে উঠে আবার সে তার স্বভাব মতন হয়ে উঠেছে।

পরদা নড়ল। জল রেখে গেল বেয়ারা। অমলা হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস টেনে নিয়ে পিপাসার্তের মতন জল খেল। খেয়ে তৃপ্তির মৃদু একটা শব্দ করল নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে।

'ওটা খেয়ে নে।' অমলা বলল

'কটা বড়ি খাব ?'

'দুটোই খা একসঙ্গে।'

সুধা দুটো বড়িই খেয়ে নিল। জলের গ্লাস রেখে বলল, 'মাথা ধরা আমার একটা পাকাপোক্ত রোগই হয়ে দাঁড়াল, অমলাদি।'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না অমলা। সুধার দিকে কেমন অলস চোখে চেয়ে থাকল। শেষে বলল, 'তোর এই সব রোগের একটা চিকিৎসা করাবি কবে ?'

'এর আর কি চিকিৎসা আছে বলো। ..আগে ভাবতাম চোখের জন্যে হয়, চশমা নিয়েছি কবে, কই কিছুই হল না।' সুধা বিরক্ত হতাশ।

অমলা তার ব্যাগ কাছে টানল, কালো চামড়ার ওপর আঙুল ঘষল, আবার একটু তফাতে সরিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, 'দেখ সুধা, তোর রোগ শুধু মাথা ধরার নয়। না না করেও কিছু একটা রোগ তুই পুষে যাচ্ছিস। এই তিন মাসে অফিসে তোর কত কামাই হয়েছে ?'

সুধা খুব অবাক এবং কিছু বিহ্বল হয়ে অমলার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'জর জ্বালা ব্রঙ্কাইটিস মাথা-ধরা সর্দিকাশি—এই করে করে একুশ দিন কামাই করেছিস। করিস নি?' অমলা স্থির চোখে চেয়ে থাকল।

'তুমি কি করে জানলে?' সুধা শুকনো ভীত গলায় বলল।

'জানব কি করে, তুই কি আর জানিয়েছিস, আমায় জানতে হয়েছে।'

'চন্দ্রসাহেব বলেছেন—?' সুধার মুখ বিবর্ণ, উৎকণ্ঠায় গলা কাঠ হয়ে এসেছে।

'বলেন নি, শুনিয়েছেন—' অমলা বেঁকা স্বর টেনে বলল, 'ক্যাজুয়েলি আমায় কথাটা কদিন আগে তিনি শুনিয়ে রাখলেন।'

সুধা নীরব। অমলা নিজের নিশ্বাসের স্পর্শ পেল হাতে। পাখাটা যথারীতি ঘুরছে শব্দ করছে, বাইরে বুঝি খদ্দের ঢুকল দু এক জন, বেন্টিক স্ট্রীটের ট্রামের চাকা কর্কশ ছড় টেনে শব্দটাকে দূরান্তে নিয়ে যাচ্ছে। সুধার বুক ধকধক করছিল, উৎকণ্ঠায় তার চোখও কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

'কি শোনালেন চন্দ্রসাহেব?' সুধা অপরাধীর মতন গলা করে মৃদু স্বরে শুধলো।

'ওরা সব এটিকেটের মানুষ, হাজার দেড় হাজারের অফিসিয়ালস, একটি দুটির বেশী কথা বলেন না।' অমলা বলতে বলতে থামল। পর্দা সরিয়ে বেয়ারাটা দুটি প্লেটে খাবার এবং চামচ দিয়ে সরে যাচ্ছিল, অমলা চায়ের তাগাদা দিয়ে দিল।

সুধার কোলের কাছে প্লেটটা আরও একটু ঠেলে দিয়ে অমলা নিজের প্লেট টেনে নিল। 'নে, খা—'

সুধা হাত ওঠাল না, চুপ করে বসে থাকল।

অমলা চামচে করে মুগের লাড্ডু ভেঙে মুখে দিল। চিবোতে চিবোতে সুধার দিকে চেয়ে থাকল।

'কই খা, বসে রয়েছিস যে...' অমলা তাগাদা দিল আবার, হঠাৎ সুধার হাতের ওপর চামচে করে মারল, হেসে বলল, 'এই যে মিষ্টি খাচ্ছিস না, এই আমার বিয়ের খাওয়া। বুঝলি! নে, খেয়ে নে।'

চামচ তুলে সুধা প্লেটের চারপাশে অন্যমনস্কের মতন নাড়ল, মুখ নীচু, ওর নিশ্বাসের মন্থরতা ধরা পড়ছিল—অনেকটা থেমে থেমে বুকের কাছটা ওঠা নামা করছে।

'তোর অত ভয় পাবার কিছু নেই।' অমলা বলল 'চন্দ্রসাহেব কালকেই তোর চাকরি খেয়ে দিচ্ছে না।'

সুধা এক টুকরো ছানার ঝিলিপি কাটল। 'কি বললেন উনি ?'

'বললাম ত, এক টু কথার মানুষ ওরা। ওই বলল, তোমার বন্ধু সেই সিকলি মেয়েটি অমলা—প্রায় অফিস কামাই করে। তিন মাসে একুশ দিন।' অমলা চন্দ্রসাহেবের গাম্ভীর্যের মোটামুটি একটা নকল করে বলল।

সুধা চামচ মুখে তুলল। ঠোঁটের কাছেই ধরে থাকল একটু। কথাটা মিথ্যে নয়, অহেতুক নয়। তবু চন্দ্রসাহেবের ওপর কেমন ক্ষুব্ধ না হয়ে পারল না। মনে হল, অমলার কাছে চন্দ্রসাহেব খুব সংক্ষেপে সুধার সম্পর্কে এমন একটা মন্তব্য করেছেন যার গুরুত্ব কম নয়। সুধা আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক ভাবে খেতে লাগল।

'তোর ব্যাপার কি ?' অমলা অনেকটা পরে বলল বলে সুধার দিকে চেয়ে থাকল।

'কিসের ?' সুধা মৃদু গলায় শব্দ করল।

'এই এত কামাই—। অসুখ বিসুখ কি হচ্ছে তোর এত ?'

'একবার শীতের সময় খুব জ্বরে পড়েছিলাম সে ত তুমি জান, পরে চিঠি লিখেছিলাম তোমায়।' সুধা বিষণ্ণ কাতর গলায় বলল, ছোট্ট কুঠরির মধ্যে আলো এখন অত্যন্ত ঘোলাটে—পেনসিলের সিসের মতন রঙ ধরে আছে সুধার মুখ এই নিষ্প্রাণ রঙের মধ্যে আরও রুগ্ন নির্জীব দেখাচ্ছিল। 'সে-বারের জ্বরেই ত হপ্তার বেশি কামাই হয়ে গেল—' সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, থামল একটু, আবার বলল 'তারপরেও দু বার দু এক দিন করে কামাই হয়েছে।'

অমলা মন দিয়ে সব কথা শুনছিল। সুধার মুখের দিকে একই ভাবে তাকিয়ে।

চা এল। চা খেতে খেতে অমলা জিজ্ঞেস করল, 'ঘুরে ঘুরে এই যে অসুখে পড়ছিস, ডাক্তার কি বলছে?'

সুধা নীরব। গ্লাসের বাকি জলটুকু খেয়ে চায়ের কাপে মুখ ঠেকিয়ে থাকল। অমলা মুখ দেখতে পারছিল না সুধার, মাথার চুল এবং অপরিচ্ছন্ন সরু সিঁথি দেখছিল।

'ডাক্তার দেখাস নি?' অমলা সুধার নীরবতায় সন্দেহ করল, মেয়েটা বুঝি ডাক্তার ডাক্তারও দেখায় নি।

'দেখিয়েছি।' সুধা অতি মৃদু গলায় জবাব দিল।

'কেমন ডাক্তার, ভাল?'

'জানি না, এম বি।'

'কি বলছে?'

সুধা সামান্য চুপ করে থাকল, মুখ তুলে অমলার চোখে চোখে চেয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'এক্সরে করাতে বলেছিল বুকের।'

অমলা সেই স্তিমিত বিষণ্ণ-স্বভাব অন্ধকারে সুধার মুখ স্পষ্ট করে দেখবার আশায় দৃষ্টি তীব্র করে তুলল। অথচ অমলা অনুভব করতে পারছিল, দেখবার মতন তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও সে স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে না, নিস্ রঙের অন্ধকার যেন তার চোখ থেকে সুধাকে আড়াল করে ফেলেছে। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছিল, অনেকক্ষণ পরে আবার একটু বাতাস এবং পুরোনো যন্ত্রটার সেই চিকণ ক্লান্ত শব্দ অমলা অনুভব করতে পারল। বাইরের ট্রাম বাস জন কোলাহলের অস্তিত্ব সম্পর্কে হঠাৎ যেন খানিকটা সচেতনতা সক্রিয় হল। রেস্টুরেন্টে যে জনা কয়েক এসে বসেছে, কথা বলছে, অমলা বুঝতে পারল। ...অল্পক্ষণের মতন জাগ্রত ইন্দ্রিয়ের এই ভাসমান অবস্থা এবং মনের বিহ্বলতা থাকল। ক্রমশ এই প্রাথমিক চাঞ্চল্য হ্রাস পেয়ে এলে নিজের উদ্বেগ বিস্ময় এবং আশঙ্কা অনুভব করতে পারল।

'এক্সরে করতে বলেছে?' অমলা বিস্ময়ে আশঙ্কায় বলল।

সুধা নিরুত্তর। ছোট্ট কেবিনটা অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় থমথমে হয়ে উঠেছে।

'এক্সরে কেন ?' অমলা অন্যমনস্ক অথচ উদ্বিগ্ন।

'জানি না—' সুধার গলায় শব্দ যেন ফুটছিল না, 'বুকের অসুখ টসুখ ভাবছে হয়ত।'

অমলা এই প্রথম অনুভব করতে পারল সে ভয় পেয়েছে, গলা শুকনো এবং ঠোঁটের গোড়া কাঠ হয়ে আসছিল। 'এক্সরে করিয়েছিস ?' কোনো রকমে অমলা শুধলো।

'না।' মাথা নাড়ল সুধা।

'করালি না কেন ?' অমলা জলের গ্লাসের তলানিটুকু এক চুমুকে খেয়ে ফেলল।

সুধা জবাব দিল না। টেবিলের ওপর ডান হাত রেখে আঙুল এবং নোখ দেখছিল।

অমলাও কিছুক্ষণ নীরব থাকল। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুধার ডান হাতের মণিবন্ধ এবং বাহু পর্যন্ত নিজের হাতের তালুতে বার কয়েক পরীক্ষা করল। 'তোর কি রোজ বিকেলের পর জর আসে ?'

'জানি না।' সুধা জবাব দিল, 'শেষ বিকেল থেকে চোখ জ্বালা করে বড্ড, মাথা ধরে।'

'কাশিটাশি নেই ?'

'নেই আবার, ওটা ত নিত্য সঙ্গী, বাড়ে কমে। আজ ক'দিন একটু কম আছে।' সুধা ছাড়া ছাড়া করে বলল, হতাশ বিষন্ন গলায়।

'রাত্রে ঘাম হয় ?'

'হয় বোধ হয়…'

অল্পক্ষণ দু জনেই নীরব থাকল। সুধা পর্দার দিকে চেয়ে চেয়ে অন্ধকারের আড়ষ্টতা দেখছিল, অমলা সুধার দিকে তাকিয়ে এই মেয়েটার নিস্পৃহতা এবং অজ্ঞানতা দেখছিল।

'সুধা!' অমলা ঘন গাম্ভীর্যের স্বর যথা সম্ভব স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে ডাকল।

'বলো।'

'তুই · তুই আর শরীরের অবহেলা করিস না। এক্সরেটা করিয়ে নে।' অমলার কথাগুলো এত নিবিড় মমতাময় স্নিগ্ধ এবং আন্তরিক যে সুধার মনে হল তার সমস্ত জীবনে এমন ক'রে বড় একটা কেউ কথা বলে নি।

আশ্চর্য, এই আন্তরিক কয়েকটা কথার তলায় যে অপরিসীম উদ্বিগ্নতা লুকোনো ছিল, সুধা হঠাৎ সেই উদ্বিগ্নতার স্পর্শ পেয়ে কেমন ভীত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত কাটল। সুধা অনুভব করতে পারছিল, বুকের তলায় কে ধব নর আড়ষ্টতা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, হৃদপিণ্ড দ্রুত, এবং পরিশ্রম করে সে নিশ্বাস নিচ্ছে। ভয়, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার ফাঁস লেগে গলা দিয়ে আর স্বর ফুটছে না—এমন স্বরে ও বলল, 'আমার কি হয়েছে অমলাদি?'

কি হয়েছে অমলা জানে না। যা হতে পারে সেই সন্দেহটা তখন অমলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ সময় ছোটমামির কথা অমলার কেন মনে পড়ছিল কে জানে। আর সুধার দিকে তাকিয়ে থাকলেও অমলা নিজের শূন্য দৃষ্টির দুরান্তে ছোটমামির মুখ দেখতে পাচ্ছিল। মরবার সময় অমলা ছোটমামিকে দেখতে যায় নি, শুনেছিল হাসপাতালের বিছানায় বালিশের কোল গড়িয়ে ছোটমামির মাথা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, শরীর বেঁকে পা গুটোনো ছিল, আর আশ্চর্য সেদিন বিছানায় খুব অল্প একটু রক্তের ছিটে ছিল, বিছানার মাথার কাছে কলাইয়ের গামলায় এক বিন্দুও রক্তের দাগ কেউ দেখে নি।· রোগটা হবার পর পুরো এক বছরও ছোটমামিকে সময় দেয় নি, ধরা প'ড়ল যখন তখন শেষটুকু জ্বলছে সলতের।

ছোটমামির মুখ বিস্মৃত হওয়া এখন সম্ভব হল না। অমলার মনে হল, অনেকক্ষণ সে স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে পারে নি, তার বুকে—ফুসফুসে প্রতিবারের অবশিষ্ট বাতাস জমে জমে বুক কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। খুব সতর্ক হয়ে এই ভার কিছু হালকা করবার আশায় মুখ হাঁ করল অমলা, নিশ্বাসের দীর্ঘ শব্দ সে সুধাকে শুনতে দিতে চায় না।

'কি আর হবে'—অমলা খুব স্বাভাবিক গলায়, যেন সে বিচলিত নয়, কিছু সন্দেহ করছে না, উৎকণ্ঠা নেই, এমন স্বরে বলবার চেষ্টা করল, 'হবে আর কি

তোর, কিছু না।' বলে সুধার দিকে চেয়ে চেয়ে একটু অবহেলার ভাব এনে বলল, 'তবু ডাক্তার যখন বলছে তখন একবার করিয়ে নে এক্সরে।'

'অযথা—?' সুধা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের মতন স্বর করে বলল।

সামান্য ভাবল অমলা। 'অযথা—না ঠিক অযথাই বা কেন! বলছি না তোর কিছু হয়েছে, তবু যখন ডাক্তার বলছে তখন করিয়ে নেওয়াই ভাল।...তা ছাড়া, বুঝলি না, সর্বক্ষণের দুশ্চিন্তার চেয়ে, একটা শেষ বেশ জেনে নেওয়া ভাল, মনের স্বস্তি থাকে, শান্তি পাওয়া যায়...'

'মনের স্বস্তির জন্যে টাকা খরচ করব সে-অবস্থা আমাদের কই, অমলাদি—' সুধা কৃশ হাসি হাসল, তার ঠোঁটের পাশে সেই হতাশ বিষণ্ণ হাসিটুকু দেখা যেত না যদি না রেস্টুরেন্টের বাতি জ্বলে উঠত সে-সময়। অমলা হাসিটুকু দেখল, নিবন্ত প্রদীপের সলতের মতন জ্বলছে। 'বরং ...' সুধা অন্যমনস্ক, চোখের পাতা ফেলল বার কয়েক, অমলার দিকে তাকাল, 'বরং এই ভাল, অমলাদি। রোগ হয়েছে জানলেও আমাদের করার কিছু নেই যখন তখন কিছু না জানাই ভাল। জানলে আরও অশান্তি, ভয়...'

অমলা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ছোটমামি একবার বলেছিল, এ-অসুখের কথা না জানলে আরও কিছু দিন বাঁচতাম, জানার পর মরণ আমার মাথার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'সুধা—' অমলা নিজেকে সংযত করল, ভাল মন্দের বিবেচনায় তার আবেগ বোকার মতন কাজ করুক এ ক্ষেত্রে অন্তত অমলা তাতে সায় দিল না। তার মনে হল, সুধার পক্ষে ডাক্তারের কথা শোনা উচিত, কেন না চিরকাল অজানা থাকার মতন ব্যাধি এটা নয়। সুধা জানে না, এই সংসারের মজা এই, সারাক্ষণ সহস্র ব্যাধ শিকার করে বেড়াচ্ছে, আজ না হলে কাল, কাল না হয় পরশু, একদিন তোমায় তারা খুঁজে পাবে।

'সুধা—' অমলার গলার স্বর ঘন নিবিড়, 'শোন, একটা কথা বলি। চাকরি করেই তোকে খেতে হবে, সংসার প্রতিপালন করতে হবে। কিন্তু, সেই চাকরিতেই যদি এত কামাই হয়, দু দশ দিন অন্তর অসুখে পড়িস,...শেষ পর্যন্ত যে চাকরিটাই যাবে।' অমলা একটু চুপ করে থাকল, তার কথাটা যে

কত সবল এবং কতটা সত্য সুধাকে তা অনুভব করতে দিল, তারপর আবার বলল, 'তুই যেখানে চাকরি করিস . সে অফিসের ব্যাপার ত জানিস, নানান কড়াকড়ি। একদিন যদি চন্দ্রসাহেব অফিস থেকে তাদের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেয় তোকে, সেটা ভাল হবে ?'

সুধার পলক পড়ল না। স্থির বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সুধা যেন চন্দ্রসাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এইমাত্র নির্দেশটা শুনল। শুনে ভীত বিচলিত সমস্ত শরীর কাঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অমলার মনে হল, শেষ কথাগুলো না বললে হত, সুধা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু না বলেই বা কি উপায় ছিল অমলার। চন্দ্রসাহেব বাস্তবিকই এ-রকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুধাকে সরাসরি অমলা তা বলে নি, বলতে চায় নি।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। পরস্পরের দিকে কেউ তাকাল না। রেস্টুরেন্টের বাইরে অচেনা অজানা গলার কত টুকরো কথা ভেসে এল, ধর্মতলায় সন্ধ্যা নামছে, এই কেবিনের মধ্যে বসেও এ যেন বোঝা যাচ্ছে।

'কি রে, খুব ভাবনায় পড়লি না কি ?' অমলা হাত বাড়িয়ে সুধার হাতের ওপর রাখল।

সুধার গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটু শব্দ হল, দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল।

'অত ভাববার কিছু নেই।' অমলা সান্ত্বনার চেয়েও বেশি, কিছুটা আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল, 'তোর চাকরি হুট করে যাবে না। চন্দ্রসাহেব মানুষটা এমনিতে কিন্তু ভালই। তা ছাড়া 'অমলা চুপ করে গেল। আনমনা হয়ে কি ভাবল মৃদু স্বরে বলল, 'আমার ওপর একটু মায়া আছে।'

'তোমার ওপর মায়া মমতা থাকা আর আমার চাকরি থাকা এক নয়, অমলাদি ?' সুধা বুঝতে পারল না, হঠাৎ কেন চন্দ্রসাহেবের ওপর তার বিরক্তি এসে গেছে।

'বেশ, যদি চাকরি যায় তোর, আমি সিভিল সাপলাইয়ে তোর একটা চাকরি করিয়ে দেব। কথা দিচ্ছি।'

'এতকাল তুমিই ত দিয়েছ।' সুধা বলল, বলতে বলতে তার গলা ভার হয়ে কেমন করুণ চাপা শোনাল, চোখে জল এসে পড়ল।

অমলা কিছু বলল না। সেই কবে একটা স্কুলে দু জনে মাস্টারী করতে গিয়ে আলাপ, তারপর মিশন রো-র অফিস, এই নতুন অফিস—যেন হাত ধরে ধরে হিঁচড়ে এক চড়াই থেকে আরেক চড়াইয়ে টেনে এনেছে অমলা এই মেয়েটাকে। তার শক্তিতে বাস্তবিক কতটা পথ সুধাকে এনেছে অমলা জানে না, তবে নিজের কপালে সুধা এসেছে। আরও ত কত বন্ধু ছিল অমলার, অনেক পুরোনো অনেক চেনা জানা, কই কাউকেই অমলা এমন করে টেনে আনে নি কেন? অমলা আজও সঠিক ভাবে জানে না, কেন?

এই মেয়েটাকে কেন সে ভালবাসে। কেন? কখনও কখনও অমলার মনে হয়েছে, সুধার কাছে যেন সে কিছু সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে বলে নিজের স্বার্থে সুধাকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। অথচ কোন সম্পদ করে কখন রাখল জিজ্ঞেস করলে অমলা জবাব দিতে পারবে না। দেওয়া মুশকিল। এ-কথা অমলার এখনও স্পষ্ট করে বোঝে না যে, নিজের জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য বঞ্চনা ভালবাসা হতাশার মধ্যে সত্যি সত্যি কি আগলে রাখবার চেষ্টা করেছিল অমলা, অথচ শেষ পর্যন্ত পারে নি। হৃদয় না নৈতিক পবিত্রতা, নিষ্ঠা না এই প্রতিকূল সংসারে ক্ষীণ শক্তি নিয়ে শেষাবধি যুঝে যাওয়া –অমলা কি পারে নি, অথচ পারতে চেয়েছিল, সুধা যা পেরেছে, পারছে। হয়ত সুধার কাছে অমলার সেই স্পৃহা ও আন্তরিক স্বপ্নগুলি লালিত হয়ে আছে।

এখন, এই স্তিমিত আলোকে এবং একান্ত কক্ষে, মুখোমুখি বসে, এই নীরবতা যা বৃষ্টিধারার মত ঝরে চেতনাকে সময় স্রোত থেকে হঠাৎ পৃথক করে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, অমলার অকস্মাৎ মনে হল, সে সুধার কাছে এক পলাতকা জননীর মতন বসে আছে। এবং এই নিভৃত সাক্ষাতে সুধার কাছে বসে অমলা তার পরিত্যক্ত সন্তানদের কুশল শুনছে, কারণ সুধা তাদের লালিত মাতা।

অমলার আবেগ ঘনীভূত হয়ে কর্কশ পাথরের খোঁচার মতন কণ্ঠনালীর কাছে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। কোনো রকমে নিজেকে সংযত করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল;

শব্দটা উভয়েরই কানে গেল। সুধার হাত থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অমলা তার চামড়ার কালো ব্যাগটা টেনে নিল। ক্লিপ খুলে টাকা বের করছে, এই ভাবে ব্যাগের ভেতর হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, 'দিয়েছি যখন দিয়েছি, তোর সময় হলে আমায় দিস।' কথাটা যে সব কিছু স্বাভাবিক সহজ হালকা করার জন্যে বলা গলার স্বরের করুণ চেষ্টা থেকেই তা বোঝা গেল।

সুধা জবাব দিল না, যেন বাতাস দেখছে এমন করে চেয়ে থাকল।

ব্যাগ থেকে টাকা বার করল অমলা। এবং টাকা পাশে রেখে আবার ব্যাগের মধ্যে খুব ব্যস্ত হয়ে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে বলল 'তোদের অফিসের হীরেন সেনগুপ্তকে চিনিস?'

'সেলসের এজেন্ট?'

'হ্যাঁ, ঠিক তোদের অফিসের নয়—ওই অ্যাটাচ্‌ড আর কি।...ভদ্রলোক আমায় বিয়ে করছেন।'

সুধার মনে হল, অমলাদি কালো ব্যাগটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ শুধু লুকোচ্ছে না, যেন পারলে ওই ব্যাগের মধ্যে তার সর্বাঙ্গ লুকিয়ে ফেলত।

পাখার মৃদু হাওয়ায় দশটাকার নতুন নোটটা সরে সরে অমলার কোলের কাছে গিয়ে পড়ল।

সাত

বৈশাখের দুপুর বাইরে বিশাল চিতার মতন জ্বলছিল। সেই আগুনের ঝাঁঝ ঘরের মধ্যে বসেও অনুভব করা যায়। আজ গরমও যেন এ কদিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। উমা অন্যান্য দিনের মত রোদ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, আবার একটু বেলায় বেশী করে জল দিয়ে ঘর মুছেছে, বারান্দার দিকে দরজাও আধ ভেজানো করে রেখে দিয়েছিল কখন থেকে তবু দুপুরটা সহ্য হচ্ছিল না। গা-টা যেন খসখসে চিরুনির মতন সর্বাঙ্গ আঁচড়ে জ্বালা ধরিয়েছে। এই বাড়ি আর এই গলির রকমই কেমন বেয়াড়া। এইটুকুন গলি, কতটুকু আর রোদ, তবু দুপুরবেলায় ঠিক দেখ ডলাদের বাড়ি। জানলার দিকে রোদের মুখ, গলিটা হাত পা বাঁধা মুখ থুবড়ে পড়া কয়েদীর মতন পড়ে আছে। কি রকম গরম তা বোঝা যায় গলির শুকনো পিচের দিকে তাকালে। একটুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলে মনে হবে গলির পিঠ বেয়ে তাপ উঠছে, উনুনের আঁচের ওপর যেমন ঝলসানি থাকে তেমনি। পাড়াটা খাঁ খাঁ করে, চড়ুইগুলো ছায়া দেখে অন্য উঠোনে গিয়ে বসে, তৃষ্ণার্ত কোনো কাক আতপ্ত মধ্যাহ্নে মাঝে মাঝে ডেকে উঠে এই গ্রীষ্মের অসহ্যতা আরও স্পষ্ট করে তোলে।

আজ গরমটা শরীরের মধ্যে থেকে যেন জল শুষে নিচ্ছিল রাক্ষসের মতন, গা পিঠ বুক জ্বালা করছিল, নিশ্বাস গরম, চুলের বোঝা রাখা যাচ্ছিল না আর, সমস্ত চুল ঘাড় কান কপাল থেকে উঠিয়ে টেনে চুড়ো করে মাথার ওপর বেঁধে রেখেছিল উমা। কাকার ঘর বন্ধ করে শেকল তুলে দিয়েছে, রান্নাঘরের দরজা বন্ধ; নিজের ঘরে মেঝেয় শুয়ে হাতপাখার বাতাস খাচ্ছিল, আদুল গা সিমেন্টের স্যাঁতসেঁতানিটুকু গায়ে লাগিয়ে যেটুকু শান্তি। গলার তলায় বুকে ঘাড়ের পাশে এবং মধ্যে ঘামাচি হতে শুরু করছে, এখনও সামনে লম্বা গরম

পড়ে আছে, ঘামাচিতে ভরে যাবে সর্বাঙ্গ, সেই দুর্দশার কথা ভেবে উমার এখনই যেন কান্না পাচ্ছিল।

ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। ফাঁক-ফোকর দিয়ে পেনসিলের সীসের মতন সরু গোল গোল আলো আসছে; ঘোলা অন্ধকার, চোখের পাতা খুললে উমা অস্পষ্ট ভাবে প্রায় প্রত্যেকটি স্থূল জিনিস ঠাওর করতে পারে। দেওয়ালে আলনা ঝুলছে, দাদার জামা কাপড়, একপাশে উমার শাড়ি সায়া জামা রাখার ব্যবস্থা, তক্তপোশ, দাদার পড়ার টেবিল বইয়ের র‍্যাক, জলচৌকির ওপর ওদিকে নিজের বিছানা গুটিয়ে তুলে রেখেছে উমা, দরজার দিকে জলের কুঁজো বেতের মোড়া আরও কত টুকটাক জিনিস। এই ঘরটা বেশ চাপাচাপি হয়ে উঠেছে, বাক্স বিছানা চেয়ারে ভরে গেলেছে প্রায়। দাদার বইপত্র এটা ওটাই কিছু কম নাকি। আরও একটা ঘর হলে বেশ হত, ছোট মোট হলেই চলত, দাদার জন্যে থাকত।

গরমের দুপুরে আলস্য বড় বেশী। খাওয়া দাওয়া সেরে হাঁড়ি হেঁশেলের কাজ চুকিয়ে ঘরে এলে শরীর যেন আর বসতে দাঁড়াতে চায় না, চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। প্রায় দিনই ঘুমিয়ে পড়ে উমা, কলে জল এলে ওঠে, আবার কোনোদিন ঘুমে আলস্যে শরীর ভেঙে এলেও ঘুমাতে পারে না, ঘুম আসে না, কানের কাছে আরতি বক বক করে, গরমে ঘেমে নেয়ে সারাক্ষণ ছটফট করতে হয়। আজ শোওয়ার পর পরই বেশ গাঢ় তন্দ্রার মতন এসেছিল, গরমে ঘুমটুকু কেটে গেল। তারপর থেকেই উমা ছটফট করছে। আরতি থাকলে এতক্ষণ দুজনে গল্প করত। আজ আরতি আসে নি। যে-রকম ভ্যাপসানো গরম তাতে নীচে নেমে লাভ নেই, ওপরতলায় তবু একটু হাওয়া আছে। এ বাড়ির দোতলাই ভাল। রাত্তিরে ওরা ফাঁকা উঠোনটুকুতে শোয়—মাসিমা আর আরতি, বাসু বাড়ি থাকলে সেও শোয়। রাত্তিরের ডিউটি থাকলে বাসু বাড়ি থাকে না, তখন উমাও ওপরে মাসিমাদের উঠোনে গিয়ে শুয়ে থাকে।

আজকের দিনের গরম দেখে রাত্রের কথা ভাবছিল উমা। ওপরে গিয়ে শুতে পারবে কি না বুঝতে পারছিল না। বাসুর রাত-ডিউটি না দিন-ডিউটি কে জানে! ক'দিনই নীচে শুতে হচ্ছে উমাকে।

উমা পাশ ফিরে শুয়ে পিঠের ঘাম শুকোতে লাগল পাখার বাতাস দিয়ে। কাঁধের তলায় বোধ হয় ঘামাচি হয়েছে, চুলকোচ্ছে খুব, পাখার আগা দিয়ে জোরে জোরে পিঠ চুলকে নিল উমা।

ভরা দুপুরের এই খাঁ খাঁ সময়টা এমন যে, ঘুম না এলে একা থাকলে উমার কত রকম কথা মনে পড়ে।

শুয়ে শুয়ে উমা গতকালের বিকেলের কথা ভাবছিল। কাল বিকেলে এই গলির মধ্যে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, পাড়ার একটি মেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল রিকশা চেপে বাড়ির লোক দেখতে পেয়ে ধরে ফেলেছে। যে-ছেলেটার সঙ্গে পালাচ্ছিল সে গলির মধ্যে না ঢুকে রিকশা পাঠিয়ে দিয়ে ট্রাম রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। জানতে পেরে পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরতে ছুটে গেল। ছেলেটা পালাতে পারে নি, চেষ্টা করেছিল, পালাতে গিয়ে ছুটন্ত বাসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। বেচারী মরে গেছে না কি বেঁচে আছে এখনও কে জানে।

মেয়েটাকে উমা গলি দিয়ে যেতে আসতে দেখেছে, বয়স কম, স্কুলে না কি পড়ত। আরতি চেনে, ভাবও আছে। আরতির কাছ থেকেই ব্যাপারটা সব শুনেছে উমা। মেয়েটার নাম হাসি, বাপ মা নেই, বড় ভাই আছে দু জন। ছেলেটা যেন কোন সিনেমায় চাকরি করে। হাসির সঙ্গে ভাব হয়েছিল সিনেমা দেখতে গিয়ে।

ছেলেটার জন্যে খুবই কষ্ট হচ্ছিল উমার। হাসির কপালের কথাও ভাবছিল। যদি, ভগবান না করুন, ছেলেটার একটা কিছু হয়ে গিয়ে থাকে, সারাজীবনের মতন হাসির বুকে মস্ত এক কাঁটা ফুটে থাকল।

এই সংসার যে খুবই নিষ্ঠুর করুণাহীন, কিছু দেখে না চেয়ে, উমা আবার মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করে নিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকের ভার হালকা করেছে একটু, দরজায় খুট খুট শব্দ।

ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই দরজার দিকে তাকাল উমা। আরতি। এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, এবার গল্প করতে এসেছে।

উমা উঠল। গায়ে জামা নেই, শাড়ির আঁচলটা কোন রকম একটু গায়ে

টেনে দরজা খুলতে গেল। ছিটকিনিতে হাত যায় না উমার, কাঠের আগলটাই সাধারণত তুলে দেয়। উমা দরজা খুলল।

আরতি নয়; বাসু। উমা কল্পনাও করতে পারে নি। দরজার একটা পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের চোখে-লাগা আলো অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাবে ঝাপসা ঘোলাটে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। উমা ত্রস্ত, ত্বরিত হাতে গায়ে কাপড় ঘন করে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। বোবা, আড়ষ্ট, বিমূঢ়।

বাসু ঘরের মধ্যে একটা পা বাড়িয়ে দিয়েছিল আগেই। খুব একটা বিব্রত বলে মনে হল না, বরং নির্বিকার ভাবেই উমার দিকে তাকিয়ে একটু দেখল তারপর পুরোপুরি ঘরে ঢুকে পড়ল।

বন্ধ পাল্লার পাশে উমা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে। চিবুক যেন কণ্ঠায় ঠেকে যাচ্ছিল, অগুছোলো আঁচল বুকে গায়ে চেপে লজ্জায় কাঠ, চোখ মুখ কান গরম করে দাঁড়িয়ে। বুক ধক ধক করছিল, পা কাঁপছিল। মেঝের ওপর দিয়ে বাইরের যে আলোটুকু গড়িয়ে গেছে অর্ধ-চেতনের মতন উমা সেই আলোটুকু দেখছিল।

বাসু কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার দিকে চেয়ে আছে কি না উমা লক্ষ্য করল না, বুঝতেও পারল না, শুধু বাসুর কথা কানে গেল: 'ঘুমোচ্ছিলে— ?'

উমা বেশ বুঝতে পারছিল তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে, চোখে জ্বালা, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কি করবে উমা বুঝতে পারছিল না। ছোটলোক অসভ্য ছেলেটাকে চিৎকার করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল উমা, পারল না, রাগের আক্রোশে আচমকা নিজেই ঘর থেকে চলে গেল।

বাইরে বারান্দায় ছায়া, উঠোনে কলঘরের দিকে মধ্যাহ্নের প্রখর রোদ ঝলসে রয়েছে, চোখ রাখা যায় না; আলো এত বেশী উজ্জ্বল যে উঠোন এবং বারান্দার ছায়া ফিকে হয়ে আছে।

বারান্দায় এসে বিমূঢ়ের মতন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল উমা। নিজের উত্তেজনা অনুভব করতে পারছিল। সমস্ত শরীর জ্বালা করছে, বাইরের বাতাস এত গরম যে উমার মনে হচ্ছিল মুখের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।

দোতলার সিঁড়ির দিকে একবার তাকাল। কেউ কোথাও নেই, ফাঁকা ওপরে কোথাও একটু শব্দ হচ্ছে না, নীচে উঠোনে একটা চড়ুই পর্যন্ত এখন নেই। চারপাশের এই নিস্তব্ধতা থেকে মনে হচ্ছিল, বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে, ফাঁকা, উমা এবং বাসুকে কেউ দেখছে না, দেখবে না।

বেহুঁশের মতন অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উমা কলঘরে চলে গেল।

কলঘর অনেকটা ঠাণ্ডা, ছায়া ছায়া, টিনের দরজাটা বন্ধ করে দিল উমা। আরও একটু নিবিড় ছায়া হল। চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর মগে করে জল উঠিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে ফেলল। ঠাণ্ডা জলে একটু আরাম পাচ্ছিল। আবার জল তুলল মগে, কুলকুচো করল, ডান হাতের আঁজলায় জল নিয়ে ঝাপটা দিতে লাগল চোখে। দু তিন মগ জল ঢালার পর চোখ কপাল কান বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল, মুখ সিক্ত, আরও দু মগ জল তুলে পায়ের পাতায় আস্তে আস্তে ঢেলে দিল উমা।

প্রথম উত্তেজনা এবং অসহিষ্ণুতা কমে এলে উমা এবার ভাববার চেষ্টা করল, বাসু কেন এই দুপুরে চোরের মতন তার কাছে এসেছে? কেন? সেই বিশ্রী ঘটনার পর থেকে উমার সঙ্গে বাসুর কোনো সম্পর্ক নেই। উমা ওর সঙ্গে কথা বলে না, মুখের দিকে তাকায় না; এমন কি বাসু যতক্ষণ ওপরে থাকে হাজার দরকার থাকলেও উমা দোতলায় যায় না। তবু, সব জেনেশুনেও বাসু এ-ভাবে মাঝ দুপুরে তার কাছে কেন এসেছে?

কপাল গাল গড়িয়ে গড়িয়ে জলের ফোঁটা নেমে আসছিল। ঠোঁটে দাঁতে জলের স্বাদ। বাসুর এ-ভাবে আচমকা ঘুমন্ত ফাঁকা বাড়িতে তার ঘরে এসে ঢুকে পড়ার একটা কারণ অনুমান করতে পারছিল উমা। কিছুদিন ধরে ওই অসভ্য ছেলেটার হাব-ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল উমার সঙ্গে আবার ও ভাব পাতাবার চেষ্টা করছে। মুখোমুখি পড়ে গেলে বাসু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, হাসত, মুখভঙ্গি করত, আপন মনে দু একটা কথা বলত।

জলের ফোঁটা গলায় কানের পাশে ঘাড়ের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছিল। উমার কেমন একটু গা শিরশির করে উঠল। আঁচলের কোনা দিয়ে মুখ মুছে নিল উমা।

ছেলেটা বাস্তবিকই অসভ্য। উমাকে অমন অবস্থায় দেখেও তার লজ্জা সঙ্কোচ নেই, দিব্যি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হয়ত উমাকে দেখেছে। বিরক্ত হল উমা। সামান্য মাত্র সভ্যতা জ্ঞান নেই দেখে রাগ হচ্ছিল বাসুর ওপর। ··ঠিক তখন সেই মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলে ভাল হত। উমার সে রকম ইচ্ছে হয়েছিল কি না—উমা এখন ভাববার চেষ্টা করল। হয়েছিল, উমা মনে মনে মাথা নাড়ল, বাসুকে ত তাড়িয়ে দিতেই যাচ্ছিল, কিন্তু নিজের অবস্থাটা তখন এমন যে লজ্জায় আড়ষ্টতায় উমা কিছু ঠিক করে বলতে পারে নি, পালিয়ে এসেছে।

কলঘরের টিনের দরজার ফাঁক দিয়ে চওড়া পাড়ের মতন এক ফালি রোদ্দুর কলের মাথার ওপর দিয়ে দেওয়ালে গিয়ে পড়েছে। ওই দেওয়ালের ও-পাশে উমাদের রান্নাঘর। উমা রোদের ফালির দিকে চেয়ে থাকল। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, বাইরের ঝাঁঝালো তীব্র রোদ যেন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কলঘরের বাইরে পড়ে আছে, চৌবাচ্চার কাছে মুখ আনতে পারছে না।

চৌবাচ্চার পাড়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল উমা।

পুরোনো ঘটনাটা তার বার বার মনে পড়ছে। মানুষ যেমন একান্তে বসে থাকলে এবং আচমকা তার পুরোনো শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ে চোখ পড়লে সেই ক্ষত দেখে, ভাবে, হাত বোলায়—উমাও কিছুতেই ঘটনাটা থেকে মন সরিয়ে নিতে পারছিল না, এবং সেই ক্ষতে মন বোলাচ্ছিল। পুরোনো অপমান এখন যেন এই মুহূর্তে নতুন হয়ে দেখা দিল। উমার সমস্ত মন রুক্ষ তিক্ত হয়ে উঠছিল। দু কান গরম, মাথার মধ্যে ঝাঁঝ ঝলসে উঠছে। সমস্ত শরীর কেমন কঠিন হিংস্র হয়ে উঠল উমার। কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছিল। সে-দিনের অপমান, আজকের চতুরতা এবং অসভ্যতার জবাব দেবার জন্যে উমার ঠোঁট কাঁপছিল। আক্রোশ প্রচণ্ড হয়ে উঠে তাকে জ্ঞানহারা করে তুলেছে।

কলঘর থেকে দ্রুত অধৈর্য পায়ে বাইরে এসে উমা এক মুহূর্ত চারপাশে তাকিয়ে কি যেন দেখে নিল। বারান্দার দড়িতে নিত্যকার মত দু একটা

শুকোতে দেওয়া ধুতি গামছার সঙ্গে তার ব্লাউজ ঝুলছে। উমা বারান্দায় উঠে ব্লাউজটা টেনে নিল।

রান্নাঘরে এসে গরম খসখসে ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়ে নিল উমা। বাসুকে কি বলবে, ঠিক কটা গোনা কথা, কেমন গলায় কত নির্দয় রূঢ় ভাবে বলবে মনে মনে ঠিক করে ফেলল। যদি দরকার হয় উমা আজ ভীষণ চেঁচিয়ে কথা বলবে, দোতলা থেকে যাতে মাসিমারা নেমে আসে।

গায়ে আঁচল টেনে উমা শক্ত পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। পা কাঁপছিল উমার, নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছিল, বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল উমা নিজেই।

বাসু নিখিলের বিছানায় বসে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। উমা চৌকাটে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল, বাসুর চোখে চোখ পড়তেই মুখ নীচু করে নিল। উমা ভেবে পেল না, মানুষ এত নির্লজ্জ কি করে হয়? এ-ঘরে এসে দিব্যি বিছানায় বসে আছে। ওর যদি লজ্জা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত ওর চলে যাওয়া উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গেই, উমা ঘর থেকে চলে যাবার পর পরই। যায় নি, চুপ করে বসে আছে, যেন জানে উমা আসবে, আসতে বাধ্য।

বাসু কি করে ভেবে নেয় উমা আসবে, আসতে বাধ্য। কোনো আশ্চর্য অথচ জটিল অনুভূতিতে উমা নিজেকে পরাজিত ভেবে সহসা যেন এই পরাজয় থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। বাসুর দিকে তীক্ষ্ণ হিংস্র চোখে তাকাবার চেষ্টা করল।

'আরে ব্বাস্, মুখ ধুতে তোমার এত টাইম লাগে?' বাসু সাধাসিধে গলায় ঠাট্টা করে বলল। ওর কথা থেকে মনে হয়, যেন উমার সঙ্গে তার কখনো কোনো বিরোধ হয় নি।

উমা বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকল। বাসু এ-ভাবে এত অনায়াসে কথা বলবে উমা ভাবতেই পারে নি। কোনো গা নেই, গ্রাহ্য নেই, উমার সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্কের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। উমা কথা বলতে পারল না।

বাসু হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে বসল। 'খুব গরম আজ, গা ফা জ্বলে যাচ্ছে।'

উমা কোনো রকমে একটু সাহস করে নিল। 'মাসিমাকে ডাকব?'

মা-কে ডাকবে। কেন—?' বাসু যেন উমার কথা বুঝতেই পারে নি—এমন ভাবে বলল।

কেন? উমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। 'আমি ওপরে গিয়ে মাসিমাকে ডেকে আনছি।' ধমক এবং শাসনের গলায় কঠিন স্বরে উমা বলল।

বাসু উমার মুখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থাকল। 'তুমি মাইরি ফালতু রাগ করছ। আমি কি করেছি· '

'অসভ্য। উমা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, বলে ঘাড় তুলে বাসুর দিকে তাকাল।

বাসু রাগ করল না, হাসল না; যেন কথাটা সে কানে শোনে নি। একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল, 'আমি যেন মেথর টেথর···তুমি ঘরেই ঢুকছ না।'

উমা চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে পুরো করে পা দেয় নি। খোলা কপাটের দিকে পিঠ, অন্য পাটটা তখনও ভেজানো। উমা ঘর এবং ঘরের বাইরে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছিল যাতে দোতলার সিঁড়ি দেখা যায়। বাসুর মুখোমুখি না দাঁড়ানোয় তার সুবিধে হচ্ছিল, নিজের মুখ বাসুকে পুরোপুরি দেখতে দিচ্ছিল না, তা ছাড়া ওর সমস্ত ভাব ভঙ্গির মধ্যে বাসুর ওপর ঘৃণা এবং বিরক্তিও যেন এতে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল।

'আমি এবার মাসিমাকে ডাকব—' উমা বাসুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে চাইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন বাসুকে সে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে না, সত্যিই সে দোতলায় গিয়ে রত্নময়ীকে ডেকে আনবে।

বাসু উঠল না, উঠব উঠব ভঙ্গি করে বলল, 'আমি কি বাঘ না ভালুক? তোমায় কি করেছি কি?' পা টেনে হাঁটুর ওপর হাতের ভর রেখে ঝুঁকে বসল। 'আমার সঙ্গে তোমরা সকলে এমন ব্যবহার করো যেন আমি শালা আর মানুষই নই।' বাসুর গলায় অকৃত্রিম ক্ষোভ।

'নিজের ব্যবহারটা কে দেখে—' উমা বিদ্রূপ করে বলল, তার বয়স্ক পুরন্ত মোটা গালে বিদ্রূপের বাঁকা রেখা অত্যন্ত হিংস্র দেখাচ্ছিল।

বাসু বিদ্রূপটা না বুঝল এমন নয়। বলল. 'আমায় লোকে নালি-নর্দম, ভাবে, যার যা খুশি করে নেয়।'

উমার কানে কথাটা বিশ্রী এবং অসভ্যের মতন শোনাল। কিন্তু যে আক্রোশ তার স্নায়ুতে উত্তপ্ত গলিত হয়ে ফুটছিল তার কিছুটা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উমা অন্য বিষয়ে মন দিতে পারছিল না। বাসুর দিকে আবার তাকাল উমা, এবারে অনেকটা স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছিল। 'যে যেমন লোক তাকে সেই রকম ভাবে।' কঠিন গলায় উমা বলল।

'তবে ত কত খচড়া লোককে মানুষ সাধুপুরুষ ভাবে—তারা সাধুপুরুষ সব।' বাসু বলল। গলার স্বরে বোধ হয় একটু ব্যঙ্গ ছিল।

বাসুর কথাবার্তা এত ছোটলোকদের মতন যে উমা ধরেই নিল এ-সব তার কানে তোলার মতন নয়। অযথা কথা কাটাকাটি না করে উমা বলল, 'কে সাধুপুরুষ কে বদমাস আমার তা জানবার দরকার নেই, বেহায়ার মতন দুপুরবেলায় কেন এসেছ তুমি এ-ঘরে?'

বাসু কয়েক পলক হাঁ করে তাকিয়ে থাকল উমার দিকে। 'যা বাব্বা, দুপুরবেলায় এলাম ত কি হল! আমি কি তোমায় চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছি, না ভাগিয়ে নিয়ে যাব।'

উমার ইচ্ছে হচ্ছিল, বাসুর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়, ইতর অসভ্য কোথাকার! দু কান গরম আগুন হয়ে গেল উমার। 'মাসিমা—' উমা যতটা চিৎকার করে ডাকবে ভেবেছিল তত জোরে ডাকতে পারল না।

'মা নেই।' বাসু মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, আরতিকে নিয়ে ঝুনুদের বাড়ি গেছে।' বাসুর বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছিল সে বেশ মজা পেয়ে গেছে।

বাড়িতে কেউ নেই, সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা। উমা বিশ্বাস করতে পারছিল না। দরজায় দাঁড়িয়ে স্তম্ভিতের মতন দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল। কখন গেল মাসিমারা? কই আরতি ত তাকে কিছু বলে নি! মিথ্যে কথা, মাসিমারা যায় নি। মাসিমা কোথাও কখনও যায় না। পুজো-আচ্চার জন্যে শিবতলা, মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির কি বড় জোর কালীবাড়ি ছাড়া

...সমা কোথাও পা দেয় না। ·· অবিশ্বাসের চোখে বাসুর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে উমা মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাসু বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল উমা ওকে অবিশ্বাস করছে। বলল, 'ঝন্টুর বাবার কাল শ্রাদ্ধ, কাল যাবে না বলে আজ দেখা করতে গেছে।'

খুব একটা অবিশ্বাস আর করতে পারল না উমা, হতে পারে। কিন্তু কখন গেল মাসিমারা? যাবার আগে অন্তত উমাকে বলে যেত। খুব সম্ভব, শুতে এসে প্রথমে যে খানিকটা তন্দ্রা মতন এসেছিল উমার, তখন চলে গেছে, উমা জানতে পারে নি। আজ বাড়িটা দুপুরে কেন এত নিঃঝুম নিঃশব্দ, দোতলায় সাড়া শব্দ নেই, ফাঁকা ফাঁকা লাগছে উমা এতক্ষণে যেন জানতে পারল।

নিজেকে উমার হঠাৎ খুব অসহায় দুর্বল লাগছিল। বাড়িতে কেউ নেই, বাসু সব জেনে শুনে বুঝে এই সুযোগের সুবিধেটুকু নিতে এসেছে। বাসুর মতিগতির মধ্যে কেমন খারাপ নোঙরা অভিসন্ধির গন্ধ পেয়ে উমার সমস্ত মুখ ঘৃণায় বিশ্রী হয়ে উঠল। ছেলেটা যে এত বড় ধূর্ত বদমাস উমা ভাবতে পারে নি।

কি করবে এখন, কি করলে ইতরটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় উমা বুঝতে পারছিল না, ভাবতেও পারছিল না। বাইরের গরম যেন আরও তপ্ত অসহ্য লাগছে, গলা মুখ হাত ঘামাছিল অনেকক্ষণ থেকে, এখন মনে হচ্ছিল ঘামের জল তাকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। উমা ফাঁকা উঠোনের দিকে তাকিয়ে জলন্ত কয়লার মতন রোদটুকু দেখতে দেখতে হঠাৎ তীব্র তিক্ত ঘৃণ্য গলায় বলল, 'ফাঁকা বাড়ি পেয়ে মেয়েছেলের গা চাটতে এসেছ?'

বাসু বোধ হয় এ-রকম রূঢ় কথা শুনবে আগে ভাবে নি। পাগলীর যে খুব তেজ আছে, খুব চোটঅলা মেয়ে ও বাসু জানে, কিন্তু একেবারে বিছুটি মেরে কথা বলবে জানত না। 'গা চাটা' শব্দটা বাসুর কানেই খারাপ শোনাল, পটলার মাসি সোনার বোন-টোনরা এ-সব কথা বলে। উমাও বলল শেষ পর্যন্ত। বউবাজার পাড়ার মেয়ে বনে গেছে তা হলে!

অন্নের জন্যে ইতস্ততা অনুভব করেছিল বাসু, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে. কেটে গেল। 'এক ভেবে এলাম, তুমি মাইরি আরেক ভেবে নিচ্ছ।'

উমা জবাব দিল না। নিজেকে তার অত্যন্ত অবসন্ন লাগছিল। এ-ভাবে কতক্ষণ সে একটা লোকের জবরদস্তি সহ্য করে। ছেলেটা বেহায়া শুধু নয় ভীষণ নিষ্ঠুর, উমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মজা করতে এসেছে। বিরক্ত বিতৃষ্ণ গলায় উমা বলল, 'কে কি ভেবে এসেছে আমার জেনে দরকার নেই।'

বাসু যেন আজ কোনো কিছুতেই গা করবে না, উমার সব কথা হেসে ঠেলে দেবে। খুব হালকা হাসির গলায় বলল, 'তুমি মাইরি সব সময় ফণা তুলে আছ। দিদির মতন।' বলে খুব বিচক্ষণের অভিমত জানাচ্ছে এমন গলায় শেষটা যোগ করল, 'সব মেয়েদেরই এক হালচাল।'

উমা ক্রমশই হাল ছেড়ে দিচ্ছিল। বাসুর ব্যবহার কথাবার্তা এমন যে তার কোনো রকম লজ্জা সঙ্কোচ ভয় ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অপমানও গায়ে মাখছে না। হতাশ অপ্রসন্ন নিরুপায় হয়ে উমা ভাবছিল. এই ঘর ছেড়ে সে চলে যাবে কি না।

'আমার সঙ্গে তোমার যে কী শত্রুতা,...দেখলেই তেরিয়া হয়ে ওঠ।' বাসু বলল।

'যে যেমন হবার মতন কাজ করে।' উমার গলার স্বর পড়ে গেল।

'আমি কিছু করি নি।' বাসু মাথা নাড়ল, 'কবে একদিন মেজাজ খারাপ করে কি শালা বলে ফেলেছি, তুমি মাইরি সেইটেই ধরে রাখলে।' বাসুর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, উমা যেন অন্যায় অনুচিত ভাবে বাসুর ওপর চটে আছে।

'ধরার কথা মানুষ ধরে।' উমা অসতর্ক হয়ে পড়ছিল। এমন জায়গায় ঘা পড়ল যে বলবে না বলবে না করেও উমা বলে ফেলল।

'না—' বাসু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'আমাদের কথা কেউ ধরে না। আমাদের মুখের ঠিক নেই।'

উমা ঘাড় ফিরিয়ে এই প্রথম বাসুকে ভাল করে লক্ষ্য করল। একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না এমন মুখ করে বাসু বসে আছে। উমার মনে হল, সত্যিই এদের মুখের ঠিক নেই, ঠিক থাকে না।

'আমার কাজ আছে।' উমা সামান্য চুপচাপ থেকে বলল, 'ঘর দোর পরিষ্কার করতে হবে।'

বাসু কানে তুলল না কথা। বরং এমন কৌতুকের মুখ করে তাকাল যেন, এই ভরা দুপুরে উমা যে কত ঘরের কাজ করে তা ওর জানা আছে। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং অগ্রাহ্য করে নির্বিকার ভাবে বাসু বসে থাকল।

দুপুরের আবছা অন্ধকার ঘর, দরজার একটি পাট খোলা, উঠোন বারান্দা ফাঁকা, সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, দূরে কোথায় কোন পাঁচিলে বসে একটি অসহিষ্ণু কাক চিৎকার করে চলেছে। বাসু উমা দুজনেই চুপচাপ, উমা বাইরে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে, বাসু আধপোড়া সিগারেটটা বের করে আবার ধরিয়ে নিয়েছে।

এখনকার আবহাওয়া আরও অস্বস্তিকর। উমার মনে হচ্ছিল, তার আর কোনো শক্তি নেই, কেমন অপরিচ্ছন্ন এক চেতনা ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। নিজেকে ঠিক মতন ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল উমার। অন্যমনস্ক নির্বাক নিশ্চল হয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল উমা, এবং চোখের পরদায় সিঁড়ির স্থূলতা, কাঠিন্য কেমন নরম অস্পষ্ট হয়ে আসছিল।

'তুমি অ্যায়না বিগড়ে রয়েছ, . একটা জিনিস দেখাতাম।' বাসু বলল।

উমা তাকাল না, কিন্তু তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল।

'ফার্স্ট্ ক্লাস জিনিস।' বাসু আরও গলায় জোর দিয়ে বলল, যেন উমাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করল প্রাণপণ।

উমা তাকাল। খুব সাধারণ দৃষ্টি, কৌতূহল অথবা আগ্রহ সুস্পষ্ট নয়।

বাসু কোমরের কাছে লুঙ্গির গোটানো ভাঁজ খুলে কাগজে মোড়া কি যেন বার করল। খুব দামী কিছু বার করছে এমন ভঙ্গিতে কাগজ খুলে উমার দিকে তাকাল। 'এ-সব জিনিস বাজারে হরদম পাবে না।' বাসু হাত বাড়িয়ে ধরল।

উমা দরজার কাছে থেকে নড়ল না। বাসুর হাতে কি আছে দেখতেও পাচ্ছে না। চোখের ভ্রূ এবং দৃষ্টিতে ঈষৎ কৌতূহল।

বাসু নিজেই উঠল। উমার মুখোমুখি এসে হাত বাড়িয়ে জিনিসটা মেলে ধরল। কানের দুল।

উমা অবাক। দু মুহূর্ত পাথর বসানো সোনার দুল দুটো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ডালিমের দানার মতন রঙ পাথর দুটোর। জিনিসটা যে দেখতে সুন্দর মনে মনে উমা স্বীকার করে নিল।

'আরে বাব্বা, তা হাতে নিয়েই দেখ—' উমার নিস্পৃহতা বাসুকে অধৈর্য করে তুলছিল।

উমা মাথা নাড়ল, না সে হাতে নিয়ে দেখতে চায় না, কোনো দরকার নেই দেখার।

বাসু ঘাড় নীচু করে এক দৃষ্টে উমার মুখ দেখছিল। বলল, 'খুব সস্তায় ঝেড়ে দিচ্ছে। নিয়ে নাও না—।'

'না, আমি নেব না।' উমা অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে জবাব দিল।

'চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মাল পনের বিশ টাকায় পেয়ে যাবে, তুমি মাইরি এই দাঁও ছেড়ে দিচ্ছ।' উমার বিবেচনায় কত যেন বিস্মিত হয়েছে বাসু এমন ভঙ্গি করে বলল, বলে একটা জিবের শব্দ করল জোরে, যেন বোঝাতে চাইল এ-রকম বোকামি কি কেউ করে।

উমা নীরব। বাসু তবে এই কানের দুল বেচবার জন্যে তার কাছে এসেছে। অন্য কিছু ভেবে আসে নি! অল্প আগে উমার ক্রমশ ধারণা হয়ে আসছিল, বাসু আবার করে তার সঙ্গে ভাব পাতাতে এসেছে, এখন সে-ধারণা ভেঙে গেল। অস্পষ্ট ভাবে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই উমার মনে যে কোমলতা সঞ্চারিত হচ্ছিল, তা ফিকে হয়ে আসতে লাগল।

'কি আলতু ফালতু ভাবছ, নিয়ে নাও।' বাসু গলায় জোর দিয়ে বলল।

'না।'

'তোমায় এটা পরলে খুব বিউটিফুল দেখাবে, মাইরি।' বাসু মাথা নাড়তে নাড়তে একটা চোখ কুঁচকে নীচের ঠোঁটে দাঁত চেপে ইতর ধরনের শব্দ করে বলল, যেন উমাকে কানের দুল পরা অবস্থায় দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

উমা ঘাড় সোজা করল, বাসুর মুখ তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করল দু পলক। খুব আচমকা একটা হিংস্র স্পন্দন তার বুকের তলা থেকে ওপরে এসে পড়েছে, ফস্ করে বারুদ জলার মতন তার চেতনাও যেন জ্বলে গেল। তিক্ত কটু আবেগ উমাকে অতৃপ্ত অশান্ত করে তুলেছে। ওর ঠোঁটের মাংস কাঁপছিল, গলা ফুলে যাচ্ছে, চোখ বাইরের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মতন তাপিত ও তীব্র। গলা দিয়ে স্বর ফুটল উমার, কঠিন হিংস্র স্বর, 'আমি ত তোমার মার ছেলের বউ নই যে দুল পরে সুন্দর দেখাতে হবে।'

বাসু প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারে নি। বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে থাকল। পরক্ষণেই উমার বাঁকা বিদ্রূপ ভরা কথাটা সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারল। বুঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এই প্রথম উমার অপমান তার গায়ে লেগেছে আজ। বাসুর রাগ হচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সে যেন চারপাশে বাঁধা অবস্থায় দেখে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ বোবা হয়ে থাকল।

উমাকে কড়া কড়া দু চারটে কথা শোনান যেত, বাসুর মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল কথা, কিন্তু বাসু আজ কিছু বলল না। একটা ধমক দিলে, কিংবা গলা ছেড়ে একবার শাসালে ওই মেয়েটার মেজাজ ধুয়ে যেত, বুলি পেটে ঢুকে যেত। তবু যেন উপায় নেই বলে সব সহ্য করতে হল বাসুকে। গোলমাল করলেই, এই মেয়েটা যা, মাকে গিয়ে সব বলে দেবে। তারপর দিদি শুনবে। তখন আরও ঝামেলা। কার দুল, কোথায় পেলি, কার চুরি করেছিস হারামজাদা! না, বাসু ও-সব ঝামেলা বাড়াতে চায় না। আসলে এ দুল দুটো সোনারই নয়, রোল্ড্ গোল্ডের, ইন্দোবর্মার পাশে পঞ্চার মামার দোকান থেকে হাতিয়ে নেওয়া, আজকাল এন্তার এ-সব বিক্রি হয়। বাসু ভেবেছিল উমা যদি দশটা টাকা দিয়েও কেনে, তবু মা-কে টাকাটা দিতে পারবে। এ-মাসে এ-আর-পি-র মাইনে পায় নি বাসু। এস. ও দোআঁশলাটার সঙ্গে লড়ালড়ি করতে গিয়ে তাদের দুজনের—তার আর নন্দীর এই হাল। মস্ত এক রিপোর্ট ঠেলে দিয়েছে শালা কনট্রোলারের কাছে। হাসানসাহেব বলেছেন, রিপোর্টটা খুব খারাপ, এস. ও বেটা লিখেছে, এরা ফাঁকিবাজ, কাজ করে না, পোস্টে ডিউটি দিতে এসে মাল খায়, বিশ্বাসী লোক নয়,

অগাস্ট মুভমেন্টের সময় বাসুকে গোলমালে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল।… কনট্রোলারের কাছ থেকে এখনও চিঠি আসে নি, কিন্তু এস. ও শালা তাদের সাসপেণ্ড করে রেখেছে। বাসু পনের দিনের মাইনে পাবে, দেয় নি। মা-কে একটা কথাও বলে নি বাসু। শুনলে এখুনি বাড়ি মাথায় করবে। তিরিশ টাকার চাকরি তাও হাত ছাড়া হলে কে পুছবে।

গুলপট্টি মেরে ক'দিন বেশ চালিয়ে এসেছে বাসু। পোস্টে যাচ্ছে বলে ধরাচুড়ো পরে বেরোয় রোজ কিন্তু এবার মাকে বিশ বাইশটা টাকা না দিলে আর আস্ত রাখবে না। অনেক ভেবে চিন্তে একটা প্যাঁচ করেছিল বাসু, তাও ভেস্তে গেল।

বাসুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। উমা দুলটা কিনবে এই আশা নিয়ে এসেছিল বাসু। এত তোয়াজ করল, সব শালা গঙ্গার জলে গেল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাসু মুখ উঠিয়ে দেখে উমা দরজার কাছে আর দাঁড়িয়ে নেই।

দুল দুটো কাগজে মুড়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে বাইরে চলে এল বাসু। উমা রান্নাঘরের দিকে ছোট বারান্দায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। একবার বাসুর কেমন যেন ইচ্ছে হল, উমাকে সব কথা খোলাখুলি বলে। কেন যে এই ইচ্ছে হল বাসু জানে না, জানার চেষ্টাও করল না।

কিছু বলল না। এই মেয়েটাও মা দিদির মতন লোহা হয়ে গেছে। বাসুর কেমন যেন কষ্ট এবং দুঃখই হচ্ছিল।

আট

আকাশ ঘনঘোর, পুঞ্জীভূত মেঘে থমথম করছিল। শেষ অপরাহ্নের স্বাভাবিক স্তিমিত রূপটি কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। আলো মরে গেছে, প্রতি মুহূর্তে শূন্যের রঙ অন্ধকারে আবৃত হয়ে আসছিল। চিল কাক এবং কিছু উড্ডীন পাখি মাথার ওপর নেমে এসেছে। বিচলিত কলস্বরে তারা বৃক্ষশাখা ও গৃহাশ্রয় খুঁজে নিচ্ছিল। সাবু গাছগুলোর মাথা দুলতে শুরু করেছে, দেবদারু এবং আমগাছটার মাথায় অজস্র পাখি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পশ্চিমে শীর্ণ বাঁশঝোপ শিহরিত হয়ে শব্দ তুলছিল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তরের ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে গিরিজাপতি আর একবার উদ্বেগের দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘের তলায় মেঘ জমতে জমতে গাছের মাথা ছুঁয়ে ফেলেছে যেন। একটি নিবিড় অভেদী অন্ধকার আসন্ন দুর্যোগের ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে। চারপাশ থেকে বিশৃঙ্খল সন্ত্রস্ত ধ্বনি ভেসে আসছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ফাঁকা, দুটো ট্রাম পর পর অন্ধকার এবং দুর্যোগের প্রতি যেন দৃষ্টি রেখে দ্রুত চলে গেল।

দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হবার সময় গিরিজাপতি প্রতি মুহূর্তে ঝড়ের আবির্ভাব প্রত্যাশা করছিলেন। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে, ফুটপাথ ধরে গিরিজাপতির মতনই অনেকে ছুটে চলেছে, অনেকে লোহার দোকানগুলোর মধ্যে উঠে পড়েছে। ডান দিকের চায়ের দোকানটায় বেশ ভিড়।

ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে সামান্য পথ এগিয়ে আসতেই ঝড়ের প্রথম ঝাপটা রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। ধুলো ময়লা জঞ্জালের আচ্ছন্নতায় সামনের রাস্তা অত্যন্ত আবিল হল, ঘোলাটে পরদার মতন দেখাচ্ছিল সামনেটা, গিরিজাপতি কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। একবার মনে হল, কোনো দোকানে উঠে পড়েন। অথচ আর সামান্য কয়েক পা এগিয়ে বাঁ দিকের

গলিতে ঢুকে পড়লে এই ঝড় এতটা বিব্রত করতে পারবে না। গলিপথ ধরে সামান্য কিছুটা পথ ভাঙলেই বাড়ি, আপাতত এই ঝড়ের শুরুতে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া ভাল। গিরিজাপতি হাঁটতে হাঁটতেই অপেক্ষা করার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করে হাঁটতে লাগলেন। লোহার দোকান-গুলো শেষ হল, তারপর গাড়ি বারান্দাঅলা একটা বাড়ি। বাড়ির তলায় কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই হল, প্রচণ্ড একটা আঁধি উঠেছে, কার ছাদের ওপর থেকে ফুলের টব রাস্তায় ছিটকে পড়ল। ভিড়ের গলা আঁৎকে উঠল।

সম্ভবত গত দু সপ্তাহের মধ্যে এটা তৃতীয় কালবৈশাখী। আগেও বুঝি দু একবার হয়ে গেছে। আঁধি কেটে গিয়ে সামান্য পরিচ্ছন্নতা দেখা দিয়ে-ছিল। কালবৈশাখীর হিসেব করতে করতে গিরিজাপতি ভিড়ের গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। বর্ষার শুরু হতে এখনও কিছু দেরি আছে, আরও কয়েকটা কালবৈশাখার অপেক্ষা করতে হবে। আজ হয়ত এক পশলা বৃষ্টি হবে।

ঝড়ের প্রথম দমকার পর রাস্তাটা একটু পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল, শূন্যে ধুলোর আচ্ছন্নতা। জানলা আঁটা একটা বাস মন্থর বেগে চলে গেল, অনেকক্ষণ আর ট্রামের শব্দ নেই। গিরিজাপতি গলির মুখে এসে জনহীন, যানবাহন-শূন্য রাস্তাটা এক পলক অর্ধ-জ্ঞানে অভ্যাস মতন দেখে নিলেন। সমস্ত কলরব এখন কেমন মৃত মনে হল, আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিকতায় নাগরিক মুখরতা ভীত শিশুর মতন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গলির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ভয়ংকরভাবে মেঘ ডাকতে শুনলেন গিরিজা-পতি, গলির রাস্তা আরও অন্ধকার, যেন সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে, পাড়ার মধ্যে ছোট পার্কটা খাঁ খাঁ করছে। আকাশ চোখে পড়ল গিরিজাপতির, কে যেন ভয়ঙ্কর পুরু বিশাল একটা মেঘের ছাতা পাড়াটার মাথার ওপর মেলে ধরেছে। বড় রাস্তায় ঝড়ের পালা এবার নতুন করে শুরু হল। বাতাসের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। এই গলিতে এক ফোঁটা বৃষ্টিও ধূলিমলিন মেঘাবৃত আকাশ থেকে খসে পড়ল।

বাড়ি ঢুকতেই দেবুর গলা কানে গেল।

দেবব্রত এসেছে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উমার সঙ্গে জোর গলায় গল্প করছে। গিরিজাপতির কানে গেল, দেবব্রত বলছে, 'দাঁড়াও না, এবার কাগজে একটা পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়ে গেঁট হয়ে বসে থাকব। আমার ভাই অর্ধেক রাজত্ব এবং পুরোপুরি একটা রাজকন্তে চাই।' দেবব্রত হাসছিল। জবাবে উমা বলল, গিরিজাপতি শুনতে পেলেন, 'ওই ঠাট্টা করেই কাটান, তারপর বুড়ো হয়ে গেলে দেখবেন কপালে ছাই জুটেছে।'

গিরিজাপতির পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল দেবব্রত। 'এই ঝড়ের মধ্যে কোথায় বেরিয়েছিলেন?

'আর বলো না।' ঝড়ের বিপত্তিকে যেন ছেলেমানুষের উপদ্রব বলে মনে হয়েছে তাঁর, সেইরকম এক উপেক্ষা ভরে মৃদু হাসলেন। তুমি কতক্ষণ এসেছ?' দোরগোড়ায় জুতো রেখে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

ঝড়ের মুখেই এসে পড়েছি।' দেবব্রত ঘরের দিকে এগিয়ে এল।

ঘরে পা দিয়ে অন্ধকারে গিরিজাপতিকে সামান্য হাতড়ে সুইচ্ টিপতে হল। ঝড় ওঠার পর উমা জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছিল। ঘরের মধ্যে বদ্ধ বাতাসের একটা গুমোট এবং গন্ধ অনুভব করলেন গিরিজাপতি, বাইরের ঝড়ে বাতাসে যে শীতলতা ছিল—অকস্মাৎ যেন সেই শীতলতা হারিয়ে ফেলায় বেশ অস্বস্তি লাগছিল।

দেবব্রত চৌকাঠের গোড়ায় জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখল, গিরিজাপতি গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছেন। জানলার ছিটকিনি খুলে বাইরের অবস্থাটা দেখছেন।

বাইরে গ্যাসের বাতি জ্বলে উঠেছে। ঝড়ের দাপট এখন কমে আসছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সোঁদা গন্ধ আসছিল।

জানলা দুটো খুলে দিলেন গিরিজাপতি। সান্ধ্য বর্ষণের পুঞ্জ অন্ধকার জানলার বাইরে প্রসারিত হয়ে আছে। গলিতে বৃষ্টির শব্দ, খুব মিহি আলোর রঙ লেগে আছে অন্ধকারে।

'আজ বোধ হয় একটু বৃষ্টি হবে, দেবু।' গিরিজাপতি জানলার আংটা

লাগিয়ে সরে এলেন। 'তুমি একটু বসো, আমি মুখে হাতে জল দিয়ে আসি। রাস্তায় খুব ধুলো খেয়েছি।'

দেবব্রত কিছু বলল না, বলার প্রয়োজন ছিল না। গিরিজাপতি চলে গেলেন। অভ্যাস মতন ঘরের কোণ থেকে ক্যাম্বিসের চেয়ারটা টেনে নিতে গিয়ে দেবব্রত হঠাৎ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোলাটে অন্ধকারে ফিকে একটু আলোর মিশেল দেওয়া শূন্যের দিকে তাকিয়ে দেবব্রত যেন এই সরব বৃষ্টির বিস্তার অনুভব করবার চেষ্টা করল। প্রথমে তেমন মনোযোগ ছিল না, এবং বৃষ্টি নিতান্ত তৃপ্তিদায়ক একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল। পরে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন ক্রমশ এই বারিধারার অন্তর্লোকে প্রবেশ করছিল। দেবব্রত ক্রমশ কেমন বিষণ্ণ সূত্রচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা বোধ করছিল। এবং একটি ক্লেশকর চিন্তা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল :

বৃষ্টি জোর হয়েছে, বাতাসের এলোমেলো দমকায় কখনও কখনও গায়ে ছাট লাগছে, পাড়াটা শান্ত, এবং এই গলি আপাতত আর গলি বলে মনে হচ্ছে না। বৃষ্টির জলে এই অপরিসর দীন গলির রূপ কেমন বদলে গেছে। ম্লান আলোর প্রসাধনে গলিটার গা কোথাও কোথাও পিচ্ছিল দেখাচ্ছিল, উলটো দিকের বাড়ির দরজার কাছে একটা ফিটন গাড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, তার মাথার আচ্ছাদনের তলায় একটি মহিলা বসে আছে, গ্যাসের আলোর মৃদু আভায় বধূটির পায়ের কাছে একটি স্যুটকেস চোখে পড়ছে, ঘোড়া দুটো পা ঠুকছে, ধুলো বালি চুন সুরকি খসা বাড়িগুলোর ভেজা গা থেকে কেমন এক গন্ধ উঠেছে, ঠাণ্ডা বাতাসের দমকা আসছে থেমে থেমে। দেবব্রতর মনে হচ্ছিল, কলকাতা শহরের এই একটা গলি যেন সমস্ত অলি-গলির হয়ে একটি বিষণ্ণ রূপ উদ্ভাসিত করে তুলেছে। কে একজন, ছাতা মাথায় দিয়ে কি বলতে বলতে ফিটন গাড়ির সামনে এসে ছাতা বন্ধ করে উঠে পড়ল, দেবব্রত অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল মানুষটিকে, বউটির স্বামী নিশ্চয়, গাড়িটা শব্দ তুলে নড়ল চড়ল, তারপর ঘোড়ার খুরের পায়ের শব্দ এবং কোচওয়ানের হাঁক কানে আসছে—গাড়িটা চলে গেল। আড়াল সরে গেলে সামনে বাড়ির দরজা চোখে পড়ল। মাথায় বুঝি চটের বস্তা, অন্ধকারে

ভৌতিক ছায়ার মতন কে একজন দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাশছে। কাশির শব্দটা দেবব্রতকে চকিতে তার পুরোনো ক্লেশকর চিন্তার আবর্তে ফেলে দিল।

গিরিজাপতি ফিরে এসেছেন। তার পায়ের শব্দ এবং গলা শুনে দেবব্রত জানলা থেকে মুখ ফেরাল।

'বৃষ্টি বেশ ভালই নেমেছে দেবু, কি বল?' গিরিজাপতি পরিতৃপ্ত গলায় বললেন। ব'লে নিজেই এগিয়ে গিয়ে দেবব্রতকে ইজিচেয়ারটা টেনে এনে দিচ্ছিলেন। দেবব্রত বাধা দিয়ে চেয়ারটা ঘরের মাঝামাঝি টেনে আনল।

'মাঝে মাঝে কলকাতার এই সব গলিঘুঁজি বেশ লাগে।' দেবব্রত যেন অকারণ কৈফিয়তের সুরে বলল 'বৃষ্টি দেখছিলাম। বেশ লাগছিল।

গিরিজাপতি তক্তপোশের ওপর বসলেন। দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। দু চার ফোঁটা এই জল দেখলে তোমাদের মন জুড়োয়। আমাদের জুড়োয় না।'

দেবব্রত জবাব দিল না। যেন কতখানি মন জুড়িয়েছে, ভেবে দেখছিল।

'আমাদের ওদিকে বর্ষা দেখবার মতন—' গিরিজাপতি গল্পচ্ছলে বললেন, 'ফাঁকা জায়গা, যতদূর চোখ যায় মাঠঘাট ধূ ধূ করছে, গাছগাছালি—ক্ষেত মাঠে ধানের চারা বেড়ে উঠলে ত কথাই নেই, সেখানে বৃষ্টি নামলে যে কী সুন্দর দেখাত।' গিরিজাপতি স্মৃতি-সুখ অনুভব করছিলেন, দৃষ্টি ঈষৎ নরম হয়ে এসেছিল। 'বর্ষার দিনে আকাশ যখন সাজত, চারপাশ সাদা করে বৃষ্টি নামত, সে এক দেখার জিনিস। সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারে বসে ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝির ডাক শুনতেও যে কী আরাম লাগত দেবু, তোমায় বোঝানো মুশকিল।' গিরিজাপতি পুরাতন দিনের সেই স্বাদ অতি ক্ষীণ ভাবে অনুভব করছেন এমন গলা করে বলছিলেন, শেষের দিকের কথাগুলো বলার সময় তাঁর গলায় সকৌতুক আনন্দ এবং হাসি ছিল।

গিরিজাপতির এই সারল্য স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস দেবব্রতর ভাল লাগছিল। সংযত, গম্ভীর, তার্কিক, কর্তব্যপরায়ণ এবং স্থিতধী এই প্রবীণ মানুষটি ঋতু বা প্রকৃতির মধ্যেও ভাল লাগা মন্দ লাগার বৃত্তিকে দমন করেন না, এ যেন

দেবব্রতর জানা ছিল না। প্রসন্ন গলায় দেবব্রত বলল, 'আপনিও কি চোখ চেয়ে ঝড় বৃষ্টি দেখেন?' বলে সকৌতুক হাসল।

'মানে -' গিরিজাপতি স্থির চোখে দেবব্রতর সহাস্য মুখ কয়েক পলক দেখে নিলেন, 'দেখ দেবু জল মাটি, গরম বর্ষা-বাদল শীত—এ-সব গায়ে মেখে আমরা যত মানুষ তোমরা তত নও। গিরিজাপতি যেন নির্দ্বিধায় দেবব্রতকে প্রকৃতি থেকে সম্পর্কহীন শহুরে ছেলের প্রতিনিধি মনে করে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ধারণা যে কত নির্ভুল তা প্রমাণ করবার জন্যে প্রশ্ন করলেন, 'বলো ত কোন মেঘে বৃষ্টি হয়?'

'জলভরা মেঘে।' দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, গম্ভীর মুখ করে।

গিরিজাপতি হেসে উঠলেন। অনাবিল সশব্দ হাসি। মনে হল, এই হাসি যেন তাঁর প্রাণের কোনো তারুণ্য থেকে উদ্গত। সংসার, জীবন, রাজনীতি, বর্তমানের সমস্যা, খবরের কাগজের সংবাদ, এই সদ্য বিগত মন্বন্তরের জ্বালা— এ-সমস্ত পরও প্রাণের এই সবল সুরটুকু কোথাও সুপ্ত হয়ে আছে। দেবব্রত অপলকে গিরিজাপতির সৌম্য সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষটির হৃদয়ের সুস্বাস্থ্য লক্ষ্য করছিল।

'বেশ জবাবটি দিয়েছ।' গিরিজাপতি হাসি থামাতে থামাতে বললেন, 'এ-জবাব সেই আমাদের নিখিলের মতন হল। ছেলেবেলায় একবার ওকে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, কাঁঠালপাতা আর বটপাতার মধ্যে তফাৎ কি বলো ত? সঙ্গে সঙ্গে নিখিল জবাব দিয়েছিল, কাঁঠালপাতা ছাগলে খায়।' কথাটা শেষ করে গিরিজাপতি আরেক দফা হেসে নিলেন। 'তোমরা এ-সব জানো না, দেবু। উত্তরের মেঘে কখন বৃষ্টি হয়, পুবের মেঘে কখন বৃষ্টি হয়—আকাশের অবস্থা কেমন দেখালে ঝড় উঠতে পারে বলে মনে হবে—কিছু জানো না। গাছ লতাপাতাও চেন না। বল ত বকুল আর শিউলি ফুলের মধ্যে তফাৎ কি?'

দেবব্রত বকুল ফল দেখেছে, কিন্তু আচমকা প্রশ্নে এখন আর তার যথার্থ রূপ মনে করতে পারল না। শিউলিও সে দেখেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক খেয়ালে আনতে পারল না ফুলটা কি রকম দেখতে। দুইই তার কাছে

সাদা বলে মনে হচ্ছে এই যা। সলজ্জ হাসি হেসে দেবব্রত জবাব দিল, 'হাসপাতাল রুগী আর নাড়ি টিপতে টিপতে সব ভুলে গেছি।'

গিরিজাপতি দৃষ্টি স্নিগ্ধ রেখে নীরবে হাসলেন এবার।

উমা চা নিয়ে এসেছিল। দেবব্রতর জন্য অল্প কিছু ভাজা। বাড়িতে বেসম ছিল, বেগুন ছিল, বৃষ্টি দেখে বেগুনি ভেজে এনেছে। গিরিজাপতি চায়ের কাপ তুলে নিয়ে মুখে দিলেন, দেবব্রত খুশী হয়ে বেগুনি খেতে লাগল, তার চায়ের কাপটা বেতের ছোট গোল টেবিলটার ওপর। এ ঘরে বেতের টেবিলটা নতুন। উমা সাদা কাপড়ের ওপর ছুঁচের কাজ করে একটা সুন্দর ঢাকা করে দিয়েছে। অত্যন্ত গরম হলেও দেবব্রত জিব পুড়িয়ে আঙুল জ্বালিয়েও এই উপাদেয় বস্তুটি খাচ্ছিল। খেতে খেতে বলল, 'আমাদের উমা একেবারে খাঁটি বাঙালী গিন্নী। মুখ ফুটে বলার আগেই সব বুঝতে পারে।' বলে দেবব্রত উমার দিকে চোখ করে স্নেহের হাসি হাসল, 'খাসা হাত তোমার। শ্বশুরবাড়িতে খুব নাম-ডাক হবে।'

উমা চলে যাচ্ছিল। দেবব্রত গিরিজাপতিকে বলল, 'আপনি যাই বলুন বৃষ্টি দেখার চেয়ে বেগুনি-টেগুনি খাওয়ায় অনেক আরাম আছে।' বলে দেবব্রত হাসল। ঠিক বোঝা গেল না, এই পরিহাসের মধ্যে উমার প্রতি কোনো ইঙ্গিত ছিল কিনা।

উমা দাঁড়াল। সামান্য খুঁটিয়ে যেন দেখল দেবব্রতকে। বলল, 'আরও কিছু চাই আর কি। বললেই পারেন।'

'দিলে আর কে না খায়।' দেবব্রত চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বেগুনি চিবোতে লাগল।

'এনে দিচ্ছি।' উমা হেসে ফেলে চলে যাচ্ছিল।

'আরে না না, সত্যি তা-বলে আর-এক ঝুড়ি এনে হাজির কর না। আমার আজ আবার একটা নেমন্তন্ন আছে।'

'অল্প করেই আনি।'

উমা চলে যাচ্ছে, দেবব্রত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'আজ আর নয় ভাই, আবার একদিন হবে। সামনে গোটা বর্ষা পড়ে আছে, কত খাওয়াবে

তুমি, আমি হরদম রেডি থাকব।' বলে তরল পরিহাসের গলায় দেবব্রত হাসল।

গিরিজাপতি চা খেতে খেতে শুনছিলেন। কেন যেন এই মুহূর্তে মানুষটিকে আর ঠিক আগের মতন প্রশান্ত আনন্দিত সহাস্য দেখাচ্ছিল না। কদাচিত তাঁর এমন খোলামেলা রূপটি চোখে পড়ে, আজ যেন দৈবক্রমে আরও বেশি একটি সতপ্রাণের রূপ ধরা দিয়েছিল সামান্যক্ষণ আগে, এবং এখন আবার অভ্যাসমত তিনি শান্ত সংযত গম্ভীর হয়ে আসছেন।

দেবব্রত চায়ের কাপ উঠিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে কয়েকটা চুমুক দিল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ মৃদু হয়ে এসেছিল কখন, আবার তার বেগ বেড়ে শব্দটা জোর হয়ে ওঠায় দেবব্রতর যেন কানে গেল। জানলার দিকে তাকাল একবার। 'আমাদের পাড়ায় বৃষ্টির দিনে দেখেছি খুব স্কুল ছেঁকে যায়,' দেবব্রত বলল। যেন এ-পাড়ায় এতক্ষণে এই ধরনের একটা হাক সে আশা করছিল। হাতের প্লেটে তখনও একটা বেগুনি রয়েছে, চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আবার বেগুনি খেতে শুরু করল।

'তুমি এসে ভালই হল গিরিজাপতি কী ভাবছিলেন, নিশ্বাস ফেলে আচমকা বললেন এবার, 'আমিও কদিন ধরে তোমার কাছে যাব যাব ভাবছিলাম।'

'মধ্যে আমার আসা হয় নি। আজ চলে এলাম।' দেবব্রত একটু যেন গুছিয়ে বসল। কোনো কথা তার বলার আছে, বলবে মনে হচ্ছিল।

গিরিজাপতি অন্যমনস্ক থাকায় দেবব্রতর মুখভাব লক্ষ্য করেন নি। দরজার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার কাছে একটা পরামর্শ নেব ভাবছিলাম।'

নীরব থাকল দেবব্রত, চায়ের কাপ উঠিয়ে নিল আবার। অপেক্ষা করল সামান্য। গিরিজাপতির দিকে তাকিয়ে থাকল। উনি কিছু বলছেন না দেখে দেবব্রত বলল, 'আপনার কথা শুনি আগে, আমারও একটা কথা ছিল।' দেবব্রতকে ঈষৎ অন্যমনস্ক দেখাল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর গিরিজাপতি কেমন মৃদুস্বরে বললেন, 'উমার সম্পর্কে আজকাল আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়।'

দেবব্রত চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রুমাল বের করে হাত মুখ মুছল। গিরিজাপতির মুখের একপাশে ঘরের টুলি পরানো বাতির হালকা ছায়া মাঝে মাঝে দুলে উঠছিল। বাইরের বাতাসের দমকা জ্বলন্ত বাতিটাকে দোলাচ্ছিল। দেবব্রত উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে।

সম্ভবত শেষ দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে গিরিজাপতি নিশ্বাস ফেললেন, দেবব্রতর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'উমার যদি বিয়ে-থা দি, খারাপ কিছু হতে পারে?'

দেবব্রত অপলক তাকিয়ে থাকল, কথাটা সে বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা করে নি। সবিস্ময় বিমূঢ়তা তাকে গিরিজাপতির প্রশ্নের জটিলতাও অনুমান করতে দিচ্ছিল না।

'কিছুদিন ধরে কথাটা আমি ভাবছি, দেবু—' গিরিজাপতি অন্তরঙ্গ কোনো মানুষের কাছে নিজের সমস্যা এবং চিন্তার কথা বলছেন, বলা উচিত মনে করছেন, এমন আত্মীয়তার স্বরে বললেন, 'কিন্তু পুরোপুরি ভরসা পাচ্ছি না।' সামান্য সময় জানলার দিকে কেমন চিন্তিতের মতন তাকিয়ে থাকলেন গিরিজাপতি, দেবব্রতের দিকে মুখ ফেরালেন পরে, 'ভাবছি যদি এই বিয়ের ফলে খারাপ কিছু হয়—'

'কিসের খারাপ?'

'আমি জানি না, তুমি বলতে পার।' গিরিজাপতি দ্বিধা প্রকাশ করলেন, 'এ-ধরনের বিয়ের ফলে যদি ওদের বাচ্চাকাচ্চারাও ওই রকম......' গিরিজাপতি কথাটা শেষ করতে পারলেন না। দেবব্রত লক্ষ্য করল, কোনো অপ্রকাশ্য বেদনা আপ্রাণ সহ্য করলে মানুষের মুখ যেমন শক্ত সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে গিরিজাপতির সমস্ত মুখ তেমনি শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের তারা অবনত।

সমস্যার সূত্র খুঁজে পেয়ে স্বস্তি পেল দেবব্রত। উমার সন্তানরা উমার মতন হতে পারে কিনা গিরিজাপতি সেটা জেনে নিতে চান! অল্পক্ষণ

দেবব্রত ভাবল, তার অর্জিত বিদ্যার কোথাও এর নিঃসংশয় উত্তর সে পেয়েছে বলে মনে পড়ল না। তা ছাড়া ঠিক এই পুরুষানুক্রম সৃষ্টি-রহস্য তার জ্ঞানের বাইরে।

'আমি সঠিক করে কিছু বলতে পারব না।' দেবব্রত চাপা নিশ্বাস ফেলে আস্তে গলায় বলল 'তবে সম্ভবত আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'নেই?'

'জোর করে কিছু বলা মুশকিল, আমি এ-ব্যাপারে কিছু জানি না।' দেবব্রত উদ্বিগ্ন কর্তাকে বোঝাবার মতন কোমল গলায় বলল, 'এ নিয়ে যাঁরা খোঁজখবর করেন তাঁদের কাউকে আমি চিনি না। মনে হয় না, এখানে এ-সবের চর্চা হয়। তবু দু-এক জনকে আমি জিজ্ঞেস করব।'

গিরিজাপতি নীরবে বসে থাকলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, দেবব্রতর কাছ থেকে যেন পরিপূর্ণ আশ্বাসের প্রত্যাশা তিনি করেছিলেন, হয়ত অজ্ঞাতেই এই আশা তিনি লালন করছিলেন—সে-আশ্বাস না পেয়ে বেদনা অনুভব করছেন।

'একটা কথা বোধ হয় ঠিক, এ-সব ক্ষেত্রে' দেবব্রত ভেবে ভেবে বলছিল, 'এ-সব ক্ষেত্রে একটা অ্যাবনর্মাল গ্রোথের মানুষের সঙ্গে নর্মাল গ্রোথের কারুর বিয়ে-থা দিলে বাচ্চাকাচ্চাদের পুরোপুরি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ হবার আশঙ্কা কম। একেবারে নর্মাল হলেও হতে পারে।'

একাগ্র মনে গিরিজাপতি কথাগুলো শুনছিলেন। তার নিজের ধারণা, সৃষ্টির বিরাট রহস্যের মধ্যে এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো আকস্মিক ভাবেই ঘটে যায়। যথার্থ কোনো কারণ হয়ত এর নেই। তবু তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ বা নিশ্চিন্ত নন। দেবব্রতর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, পুরুষানুক্রম রহস্যেরও হয়ত একটা বিজ্ঞান আছে।

'আপনাদের পরিবারে আর কারও এ-রকম—?' দেবব্রত আচমকা জিজ্ঞেস করল।

গিরিজাপতি প্রস্তুত ছিলেন না, প্রশ্নটা যেন কানে যায় নি শূন্য চোখে চেয়ে থাকলেন।

দেবব্রত আবার বলল, জবাবে গিরিজাপতি মাথা নাড়লেন, না ছিল না।

'দু তিন পুরুষের কথা আপনি জানেন? উমার মা-র দিক থেকেও?'

'তা জানি না।'

দেবব্রত আর কিছু বলল না। ভাবছিল। গিরিজাপতিও নীরব। বৃষ্টির শব্দ কখন থেমে গেছে গলিতে সামান্য জল দাঁড়িয়েছে, লোক চলাচল শুরু হয়েছে, কারও যেন খেয়াল ছিল না। বাইরে দুটি ছোকরা গলি দিয়ে যেতে যেতে গলা ছেড়ে আজে-বাজে গান গাইছিল, সেই বিরক্তিকর শব্দে মন যেন হঠাৎ বাইরের দিকে আকৃষ্ট হল। বৃষ্টি থেমেছে, মেঘ ডাকছে চাপা ডাক দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

গিরিজাপতি ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমাদের প্রেসে একটি ছেলে কাজ করে, অবনী নাম। ভাল ছেলে, সভ্য ভদ্র, দুঃখ শোক সহ্য করে মানুষ হয়েছে। আমার খুবই পছন্দ।'

'দেখেছি ছেলেটিকে।' দেবব্রত মাথা নেড়ে বলল, 'একদিন আপনার চিঠি নিয়ে আমার ডিসপেনসারিতে গিয়েছিল, রোগা মতন আধ-ফরসা...'

'হ্যাঁ, ওর হাত দিয়ে একবার তোমায় একটা খবর পাঠিয়েছিলাম।' গিরিজাপতি ঘটনাটা মনে করতে পারলেন। 'বড় ভাল ছেলে...'

দেবব্রত কি ভাবছিল। শুধলো, 'উমাকে কি সে দেখেছে?'

'দেখতে পারে, -ঠিক জানি না। মাঝে মাঝে কাজে-কর্মে আমার বাড়িতে তাকে আসতে হয়েছে।'

'তাহলে দেখেছে।'

'না—না -' মাথা নাড়লেন গিরিজাপতি, 'তুমি যেভাবে বলছ সেভাবে দেখার কোনো কারণ নেই, দেবু। আমার কাছে কেউ এলে—এক তুমি বাদে—মেয়েরা কখনো এ ঘরে আসে না, আমিও আসতে বলি না।' গিরিজাপতিকে ব্যথিত ও উদাস দেখাচ্ছিল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তবে এখানে যেতে আসতে যদি দেখে থাকে সে-কথা আলাদা।'

অল্প সময় দু জনেই নীরব। ঘরের আবহাওয়ায় বাদলের বিমর্ষতা যেন নেমে এসেছিল আগেই, এখন সেই বিষণ্ণ একাঙ্গীভূত শূন্য অনুভবকে বুঝি

উভয়েই স্পর্শ করতে পারছিল। দেওয়ালের গায়ে একটা ক্যালেণ্ডারের পাতা বাতাসের ঝাপটায় দীর্ঘ নিশ্বাসের মতন শব্দ তুলছে। দেবব্রত প্রায়ান্ধকার সেই দীর্ঘপত্র ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আচমকা বলল, 'আপনি তার সংসার—আত্মীয় স্বজনের কথা ভেবেছেন নিশ্চয়।' দেবব্রতর গলার দ্বিধা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই বিয়েতে ছেলের পক্ষ থেকে আপত্তি থাকবে বলে তার মনে হচ্ছে।

'ভেবেছি। আত্মীয় স্বজন বলতে তার তেমন কেউ নেই; এক জ্যেঠাই-মা আছেন—ওকে মানুষ করেছেন; আর এক জ্যেঠতুতো বোন আছে, বিয়ে হয়ে গেছে তার।' ধীরে ধীরে বললেন গিরিজাপতি। মনে হল, বিষয়টা তাঁকে অনেক দিন ভাবিয়েছে, এবং সংশয় সন্দেহ থেকে একেবারে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি।

দেবব্রত এ-বিষয় নিয়ে কথা বলতে ক্লেশ অনুভব করছিল। তবু শেষ-বারের মতন বলল, 'ছেলেটির দিক থেকে যদি আপত্তি না ওঠে—এ-বিয়ে আপনি দিন।'

গিরিজাপতি জবাব দিলেন না। মনে হল, তাঁর মন অন্য কোনো সমস্যায় মগ্ন। ক্লান্ত কাতর দেখাচ্ছিল তাঁকে। রান্নাঘরের দিকে উমা আর আরতি কথা বলছে, তাদের গলা ভেসে আসছিল।

'তোমাকে একদিন ছেলেটির কথা বলব; শুনলে তোমারও মনে হবে, এই ছেলেটি আমার এ-উপকার করতে পারে।' উপকার শব্দটা গিরিজাপতি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, মনে হল, তিনি যেন তাঁর ভিক্ষা প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, এবং এই প্রার্থনার মালিন্য অথবা গ্লানি তাঁকে পীড়ন করছে না। সামান্যক্ষণ নিজের চিন্তার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেন তিনি, তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'যদি ছেলেটি রাজী না হয় দেবু, আমি অভিযোগ করব না। মানুষ সংসারে সকলের সব উপকার করবে এমন কথা নেই।'

এই আলোচনা দেবব্রতর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। গিরিজাপতির মতন তার আশা বা ভরসা হচ্ছিল না, বরং দেবব্রতর ধারণা হচ্ছিল, ছেলেটি ভদ্র ভাল নিরীহ বিবেচক হওয়া সত্ত্বেও এই বিয়ের ব্যাপারে সম্মত হবে না।

হওয়ার যথার্থ কোনো কারণ নেই। কোনো পুরুষ অক্লেশে এই বিকৃতাঙ্গ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হবে না। বোধ হয় রূপও তেমন বিবেচ্য নয়, যতটা স্বাভাবিকতা। অবশ্য, সাধারণ মানুষের স্বভাব এই, সে বাইরেটা আগে দেখে, দৃশ্য জগতের অন্তঃস্থলে কি লুকানো আছে, কোন গুণ কোন তৃপ্তি তার বিবেচনা পরে। হয়ত এই অন্তলোকে প্রবেশের তাগিদই সে কখনও অনুভব করবে না। এই সংসারের মানুষ আপাত সুখের দাসত্ব করে স্থায়ী শান্তির নয়।

'একটু জল খেয়ে আসি- ' দেবব্রত উঠে পড়ল। ঘরের এই আবহাওয়া তার কাছে অস্বস্তিকর, ক্লেশকর মনে হচ্ছিল। মন ভার হয়ে আসছিল। বস্তুত, জল খেয়ে আসার নাম করে নিজেকে যেন এই আবহাওয়া থেকে সে সরিয়ে নিতে চাইছিল।

গিরিজাপতি একলা বসে থাকলেন। বৃষ্টির পর ঘরের বাতাস শীতল হয়েছে, আর্দ্রতা অনুভব করা যাচ্ছিল। গলিতে মানুষের যাওয়া আসা, ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠছে, জলঝরা মেলা কাপড়ের মতন অন্ধকার জানলার পাশে কেউ যেন মেলে দিয়ে গেছে।

কোনো কোনো সময় মানুষ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করে তার এক একটি দায় দায়িত্ব দুঃখ অধিকার অথবা সুখ সম্পূর্ণ করে অনুভব করতে চায়। গিরিজাপতি এই মুহূর্তে সমস্ত চিন্তাকে স্বাভাবিক ভাবে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর স্নেহের তারটিতে যেন ধ্বনি তুলছিলেন। এবং এই ধ্বনির গুরু ও সূক্ষ্ম ঝঙ্কারগুলি অনুভব করায় একাগ্র হয়ে উঠছিলেন। উমার হৃদয়ের ব্যর্থতা এই মেয়েটির সুগভীর যাতনা বঞ্চনা তিনি এমন করে কদাচিত উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিশ্বের কোনো হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পরিহাস উমাকে শরীরের দিক থেকে খর্বকায় ও অস্বাভাবিক করে তার হৃদয়কে স্বাভাবিক মানুষের ছাঁচে ঢেলে রেখেছে। সেবা স্নেহ কর্তব্য সহনশীলতা আনন্দ দুঃখ – সাধারণ যে কোনো মানুষের অনুভূতি ও বৃত্তিগুলি তার হৃদয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। কেন? কেন হৃদয় এবং দেহ পরস্পরের যোগ্য হল না? গিরিজাপতি অদৃশ্য কোনো বিবেচনাহীন নির্মমের প্রতি বিরক্ত

ক্রোধান্বিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, উমা এই অদ্ভুত খামখেয়ালি জগতের যুক্তিহীন কাঠগড়ায় অসহায় আসামীর মতন দাঁড়িয়ে আছে।

দেবব্রত ঘরে এসেছিল। তার গলার স্বরে গিরিজাপতির গভীর আচ্ছন্নতা ঈষৎ পরিচ্ছন্ন হল। ময়লা কাচের গায়ে অনুজ্জ্বল আলোয় মানুষ যেমন শূন্য চোখে প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়—গিরিজাপতি সেই ভাবে দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ঘোলাটে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল দেবব্রতকে। গিরিজাপতি মনোযোগ দিয়ে এই ঘরের দ্বিতীয় মানুষটিকে দেখতে পারছিলেন না।

ঘরের ঘন অস্বস্তিকর আবহাওয়া লঘু করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেবব্রত এসেছিল। গিরিজাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, এখনও এই মানুষটি স্বাভাবিক হতে পারেন নি। এখনও সেই মানসিক উদভ্রান্ত অবস্থা বিরাজ করছে।

'খবর দেখেছেন—' দেবব্রত প্রায় অসহায়ের মতন কথাবার্তা অন্যপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল, 'আজকের খবর আমার খুব বিশ্রী লেগেছে।

গিরিজাপতি জবাব দিলেন না। চোখের পাতা পড়ল। দীর্ঘ নিশ্বাস নিলেন। অন্যমনস্ক ভাবেই ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার দেবব্রতর দিকে তাকালেন। ক্রমশ যেন তাঁর চোখের সামনে থেকে কুয়াশা কেটে দেবব্রতর চেহারা ফুটে উঠছিল।

'ঢাকায় আবার রায়ট শুরু হয়েছে—' দেবব্রত খুব নিবিষ্ট চোখে গিরিজাপতিকে লক্ষ্য করছিল, এবং আশা করছিল, হয়ত রাজনীতির কথায় উনি ক্রমশ আগের বিষয়টা ভুলে যেতে পারবেন। ক্যাম্বিসের চেয়ারটা সামান্য টেনে নিল দেবব্রত অকারণে, বুক পিঠ ঝুঁকিয়ে বসল, আবার বলল, 'ঢাকার কোন আমানিটোলা পার্কে ছেলেরা খেলা করছে, হঠাৎ কোথায় কিছু নেই। রায়ট বেঁধে গেল—এ-সব আমি বিশ্বাস করি না। সমস্ত ব্যাপারটা পেছন থেকে তৈরি করানো—।'

গিরিজাপতি সামান্য নড়লেন, পায়ের ভর ঠিক করে ডান পাশে হেলে বসলেন। দেবব্রত উৎসাহ বোধ করল না। গিরিজাপতির দৃষ্টি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি কথাগুলো মোটেই আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন না।

কোনো রকম আকর্ষণও উনি বোধ করেছেন বলে মনে হল না। দেবব্রত বুঝতে পারছিল, তার কথাগুলো এ-ঘরে এখন মোটেই মানাচ্ছে না, কাঁচা প্রহসনের মতন কৃত্রিম ও হাস্যকর শোনাচ্ছে। তবু, দেবব্রত অসঙ্গত ভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে পারল না। মনে হল, তাহলে যেন তার এই ছেলে ভোলানো খেলাটা আরও নগ্ন কদর্য ভাবে চোখে পড়বে।

নিজেকে এখন ভীষণ অসহায় লাগছিল দেবব্রতর, কেমন গুমোটের মতন অস্বস্তি লাগছিল। তারপর প্রায় ঝোঁকের মাথায় অসংলগ্নভাবে অনেকগুলো কথা বলে গেল, ঢাকার দাঙ্গা, বাংলার লাটসাহেবের স্ট্রোক, কলকাতায় সেদিন ভুল করে সাইরেন বেজে ওঠার কথা—অবশেষে গান্ধী প্রসঙ্গে এসে এখন জুহুতে গান্ধীজীর শরীর স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছে, হুকওআর্ম ইনফেকশান পাওয়া গেছে ··এত কথা বলে দেবব্রত ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল।

গিরিজাপতি নীরব। কাদের বাড়িতে সদরে কড়া নাড়ার শব্দ আসছিল। নিখিল এখনও ফেরে নি। কখন ফিরবে কেউ জানে না। মাঝে মাঝে এত রাত করে ফেরে গিরিজাপতি ঘুমিয়ে পড়েন, আলগা তন্দ্রার মধ্যে বুঝতে পারেন নিখিল ফিরেছে।

দেবব্রত ঘরের চারপাশে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। দেওয়াল মলিন করে যে ছায়া নিশ্চল হয়ে আছে, মনে হচ্ছিল—এই ছায়া যেন গিরিজাপতির এই পরিণত জীবনকে চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। সমস্ত ঘর, প্রতিটি বস্তু অসাড় অচেতনের মতন দেখাচ্ছিল। উভয়েই নীরব। উমার ঘরের দিক থেকেও শব্দ আসছে না। এই নীরবতাকে হঠাৎ যেন দেবব্রতর কোনো মৃতের কক্ষের শূন্যতা এবং নীরবতা বলে মনে হল। কী দীর্ঘ, গভীর, প্রসারিত এবং শোকাহত নীরবতা।

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে কে নামছে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, একটা বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে যেন কি ভেবে আবার চৌকাটের ওপারে চলে গেল, গলিতে রিক্শা ঢুকেছে, উমার গলা শুনতে পেল দেবব্রত: 'খুব সাবধান মাসিমা কলতলায় ভীষণ পেছল হয়েছে।'

চেতনা ফিরে পেল দেবব্রত। সামান্য বসে থেকে হঠাৎ উঠে পড়ল।

ঘড়ি দেখল না। বিদায় নেবার মতন করে বলল, 'আজ চলি, রাত হয়ে আসছে।'

'যাবে, ক'টা বাজল ?'

'আটটার বেশিই হবে বোধ হয়।' দেবব্রত সাহস করে ঘড়ি দেখতে পারল না, 'দিদি আবার নেমন্তন্ন করেছে, যাই, খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ফিরতে রাতই হবে।' দেবব্রত চেয়ার সরিয়ে জায়গা মতন রেখে দিল।

'তুমি যেন কি বলবে বলছিলে, দেবু ?' গিরিজাপতি তক্তপোশের ধার ঘেঁষে সরে এসে পা ঝুলিয়ে দিলেন। দেবব্রতকে বিদায় দেবার জন্যে যেন উঠে দাঁড়াবেন।

'আজ থাক। পরে হবে—'। দেবব্রত বিব্রত চোখে গিরিজাপতির দিকে তাকাল।

'খুব দরকারী কিছু নয় ?'

'না—' দেবব্রত মাথা নাড়ল, 'না, তেমন কিছু নয়।' ব্যাপারটা যে মোটেই প্রয়োজনীয় কিছু নয় গলার স্বরে প্রাণপণ সেই উপেক্ষার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল দেবব্রত।

গিরিজাপতি বোধ হয় দ্বিতীয়বার কিছু বলতেন, কিন্তু তার আগেই বাইরে এসে দেবব্রত চৌকাটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে জুতো পরতে লাগল।

নয়

গলির মধ্যে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না, ট্রাম রাস্তায় এসে দেবব্রত আকাশের দিকে তাকাতে পারল। নিবিড় অন্ধকার, শূন্য থেকে সেই অন্ধকার তার বিশাল দেহ ছড়িয়ে ঘরবাড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কচিৎ কদাচিত আকাশে বিদ্যুৎ চমক দেখা যাচ্ছিল, মেঘের গুরুধ্বনিও ভেসে আসছিল। রাস্তা ভিজে, গাড়ির আলো পড়লে কালো পিচ্ছিল দেহটা চকচক করে উঠছে। রাস্তার লাইট পোস্টগুলো কেমন ক্লান্ত বিরক্ত ফৌজদারের মতন দাঁড়িয়ে আছে। কৃপণের মতন একটু আলো দেওয়া ছাড়া তার সঙ্গে এই মানুষ পথ ঘরবাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। ওয়েলিংটনের ট্রাম বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। বউবাজার শিয়ালদা ধরে ট্রামগুলো জল-কাটার শব্দ করে যাচ্ছে আসছে। বৃষ্টি হয়ে গেলে ট্রামের চাকা যেন আরও শব্দ করে। কিংবা বৃষ্টির তাড়না রাস্তাঘাটকে অনেকখানি নির্জন করে বলেই শব্দটা কানে লাগে।

বাস পাওয়া যাবে। দেবব্রত মোড়ে সামান্য অপেক্ষা করছিল। পথ চলতি একটা সর্বাঙ্গ সিক্ত ফিটন তাকে ডাকল, কি মনে ভেবে ফিটনে উঠে পড়ল দেবব্রত।

দিদির বাড়ি সেই ক্যাম্বেল স্কুলের কাছাকাছি। গাড়িটা শিয়ালদার রাস্তা ধরে চলল।

দেবব্রত ভাবছিল, আজ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। এক ভেবে সে গিয়েছিল, অন্য এক মন-ভাব নিয়ে সে ফিরছে। গিরিজাপতিকে এতটা দুবলতা প্রকাশ করতে সে কখনও দেখে নি। উনি যেন তাঁর স্বভাব সংযম থেকে অনেকখানি আলগা হয়ে গিয়েছিলেন। দেবব্রত অবশ্য এই ভাবপ্রবণতায় কোনো দোষ দেখে নি। বরং এক সময় তার মনে হয়েছিল, গিরিজাপতি এ-রকম দুর্বল ক্ষেত্রেও বিচার বিবেচনা সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখতে

পারছেন না। তাঁর কাছে যেন এ-বিবাহের প্রাথমিক শর্ত ভবিষ্যতের ফলাফল।

মনে মনে গিরিজাপতির সিদ্ধান্ত সমর্থন করে দেবব্রত ভাবছিল, বস্তুত মানুষ এক সুখের জন্যে—কিংবা আপাত শান্তির জন্যে—বর্তমানের জটিলতাকে ভবিষ্যতে আরও জটিলতর করে তুলতে পারে না। সে-অধিকার তার নেই। বিকৃতির কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়ত মানবধর্ম নয়। হয়ত সে অশান্তি আরও কষ্টকর অসহ্য হয়ে পড়বে।

উমা, দেবব্রত যেন যথাসাধ্য উমাকে অনুভব করবার চেষ্টা করে ভাবছিল, উমা এই জীবনে নিজেকে নিয়ে নিশ্চয় সুখী সন্তুষ্ট নয়। ভাগ্যের বঞ্চনা তাকে পীড়ন করে, এবং এই অশোধনীয় ব্যর্থতার শূন্যতা তার সমস্ত সত্তাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলে রেখেছে। ওপর থেকে এ-জিনিস বোঝার নয়, দেখারও নয়; কিন্তু একটি হীনমন্য চেতনা এই মেয়েটিকে সংসারের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে যে নিভৃতে সরিয়ে রেখেছে, একাকী করে রেখেছে—সতর্ক যে কোনো মানুষেরই সেটা চোখে পড়বে। একদিন, দেবব্রতর মনে পড়ল, উমার গালে যখন ফোড়া হয়েছিল, দেবব্রত প্রথমে ছুরি চালাতে চায় নি, বলেছিল, পুলটিস দাও, নিজের থেকে ফেটে যাবে। উমার খুব কষ্ট তখন ফোড়া নিয়ে, যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না, ভীষণ জোর জবরদস্তি শুরু করছে, বলে—আপনি বাপু কেটে দিন, পুঁজ রক্ত বেরিয়ে যাক, আরাম পাব।

'গালে ইয়া এক দাগ হয়ে যাবে কিন্তু?' দেবব্রত হেসে বলেছিল।

'দা—গ!···আমার দাগে কিছু এসে যাবে না।' উমা এত রুক্ষ কর্কশ উপেক্ষার গলায় জবাব দিয়েছিল যে দেবব্রত বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। এমন স্বরে কখনও কথা বলে নি উমা। কথাটা বলার পর নিজেই কেমন বিমূঢ় হয়ে সে চলে গেল সামনে থেকে। দৃশ্যটা স্পষ্ট এখন মনে পড়ল দেবব্রতর, এমন কি উমার সেই স্বরও যেন শুনতে পেল। আর ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ এখন আচমকা দেবব্রতর কানে উমার কথার পুনরাবৃত্তির মতন শোনাল।

শিয়ালদার মোড়ে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটা মাতাল ট্রাম লাইনের ওপর টলে টলে পড়ছে, অন্যজনে তাকে সামলে অন্য পারে নিয়ে

যাবার চেষ্টা করছে। কোলেবাজারের কাদায় রাস্তাটা প্যাচ প্যাচ করছিল, মুটে-মজুর সব্জির ঝুড়ি নিয়ে যেন এক অন্ধকার থেকে এসে আরেক অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। গোটা কয়েক লরি দাঁড়িয়ে। বিশ্রী এক গন্ধ বাতাসে। শিয়ালদা থেকে এঞ্জিনের শ্বাস শোনা গেল।

সার্কুলার রোডে যখন পাক মেরে গাড়িটা ক্যাম্বেলের দিকে এগিয়ে চলল আবার, দেবব্রতর হঠাৎ মনে হল মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা ছোকরা যেন বেলফুল বিক্রি করছে। বেলের মালা। এই গুমোট জায়গায়, কোলে-বাজারের উৎকট গন্ধের মধ্যে ছোকরাটাকে বড় বেমানানদেখাচ্ছিল।

গাড়ি এগিয়ে যাওয়ায় দেবব্রত আবার বাঁয়ে অন্ধকার এবং ডাইনে ঝাঁপ ফেলা দোকান দেখতে পেল। দোকানপত্র বন্ধ হয়ে আসছে।

উমার কথা আপাতত যেন জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখে দেবব্রত অন্য কথা ভাবতে চাইছিল। আজ গিরিজাপতির কাছে এক সমস্যা নিয়ে গিয়েছিল দেবব্রত। বলা হল না। অথচ এ-সমস্যাও কঠিন, উপেক্ষা করার বা ফেলে রাখার মতন নয়। দেবব্রত কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কি ভাবে কেমন করে কথাটা প্রকাশ করা যায়।

সুধার মুখ এবং সেই মুখের মালিকের বুকের ভৌতিক ছায়াচ্ছন্ন ছবিটা একই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল দেবব্রতর। অত্যন্ত অবসন্নের মতন, কাতর ভাবে মাথা নাড়ল দেবব্রত, চুলের আগা মুঠো করে টানল, আঙুলের ফাঁকে জড়ালো, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'বেচারী···!'

সুধার বুকের এক্স-রে প্লেটের ধূসর ছায়া যেন দেবব্রতর চোখের দৃষ্টি জুড়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই ছায়া-শ্বেত হৃদয়ের গোপনতম কক্ষ থেকে নির্বিকার মৃত্যুর কয়েকটি বিন্দু ছিটিয়ে পড়েছে। কোনো খড়্গধারী নৃশংস বুঝি তার কসাইখানার সংগ্রহ-ঘরে তার বলি চিহ্নিত করে রাখছে। যথাসময়ে সুধাকে গ্রহণ করবে।

আর একটু হলেই ঘোড়া ছুটো পড়ে যেত মুখ থুবড়ে। তাদের একটার খুর পিছলে গিয়ে গাড়িটা ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ রাস্তার ঢাল নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। দেবব্রত চমকে উঠেছিল। কোচোয়ানের সতর্ক কর্কশ স্বর ঠিক

মতন বোঝার আগেই গাড়িটা আবার সোজা হয়ে গেল। সামান্য মন্থর গতিতে চলতে লাগল, আপনমনে কোচোয়ান কি যেন বকে যাচ্ছে।

প্রাথমিক বিমূঢ়তা কেটে যাবার পর দেবব্রত ভাবতে পারল, এ-সমস্যার মীমাংসা করা তার পক্ষে দুরূহ। সুধাকে এ-কথা বলা যাবে না: আমার ধারণা আপনাকে যক্ষ্মায় ধরেছে। ডিসপেনসারিতে মুখোমুখি যেমন বসে থাকতে দেখেছে সুধাকে—সেই ভাবে তাকিয়ে থাকল দেবব্রত, মনে মনে দেখছিল, শীর্ণ শুষ্ক একটি মুখ, নিষ্প্রভ দুটি চোখ, কাতর ক্লান্ত। ভাল করে তাকাতে পারে না, উদ্বিগ্ন, ভীত। যেন দেবব্রতর মুখের কথার ওপর তার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে।

সুধার সম্পর্কে দেবব্রত যতটা জেনেছে, তাতে এই মেয়েটি ওদের সংসারের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয় তা বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবার কারণ নেই। সম্পূর্ণ সংসারটাই তার মুখাপেক্ষী—বিধবা মা ছোট বোন, ভাই। সুধা নিজেও নিজের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়। মানুষ যে-ছাদের তলায় বাস করে, যদি বলা যায় সেই ছাদ ধ্বসে যাচ্ছে, যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, তবে আশ্রিত লোকগুলির যেমন অবস্থা হয়—সুধার ব্যাধির কথা শুনলে তাদের পরিবারেরও সেই রকম অবস্থা হবে। তারা মাথার ওপর ছাদ পাবে না, পায়ে মাটি পাবে না—এবং চারদিকে নিরাশার বিস্তীর্ণ মরু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।

গিরিজাপতিদের ওপরতলার সংসারের ভয়ঙ্কর চেহারাটা দেবব্রত অনুমান করতে পারে। এ-দৃশ্য বা অভিজ্ঞতা তার একেবারে অজ্ঞাত নয়। এই শহর কলকাতায় আরো কয়েকটি এমন পরিবার দেখবার দুর্ভাগ্য তার হয়েছে। যে-মুহূর্তে মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, গোটা সংসার একটা অদ্ভুত ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে কোথায় যেন কে ভেসে গেল। সেই রিক্ততা দুঃসহ, আগুনে পোড়া ঘরের মতন তার চেহারা যে কী মর্মান্তিক হতে পারে দেবব্রত দেখেছে।

অথচ, কোনো কূলকিনারা দেখতে না পেয়েও দেবব্রত অনুভব করতে পারছিল, এ-জিনিস চিরকাল গোপন করার নয়। শারীরিক নিরাপত্তার জন্যেও কথাটা রত্নময়ীর জানা দরকার, তাঁর আরও দুটি সন্তান আছে।

কিন্তু কি করে, কেমন করে—সুধা জানবে না—রত্নময়ী আকস্মিক ভীত আঘাতে বিহ্বল পঙ্গু হয়ে পড়বেন না অথচ সতর্ক হবেন—এমন উপায়ে এই ভয়ঙ্কর খবরটা দেওয়া যায়? দেবব্রত চায় না, সুধা তার আয়ুর শমন নিজে হাত পেতে গ্রহণ করুক। সে আরও শোচনীয় ও সর্বনাশের কারণ হবে। তার চেয়ে, যতদিন পারা যায়, সুধা জীবনের আশা নিয়ে থাকুক, ওর জ্ঞান এবং দৃষ্টির আড়ালে মৃত্যুর ফাঁস ক্রমশ শক্ত হয়ে আসুক—অবশেষে একদিন যখন মনে হবে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, হাত দিয়ে সে ফাঁসটা অনুভব করতে পারবে সেদিন হয়ত বুঝতে পারবে কোথায় এসেছে। কিন্তু তারপর কি আর খুব বেশী দিন সে-যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে সুধাকে!

ক্যাম্বেল স্কুলের মাঝামাঝি এসে গাড়োয়ান গলির নাম জানতে চাইছে। দেবব্রতর হুঁশ হল। সুরী লেন।

সুরী লেনের হদিশ বলে দিতে দিতে দেবব্রতর মনে হল, দু চার দিনের মধ্যেই প্রেসে গিয়ে গিরিজাপতির সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। বাড়িতে হবে না। বাড়িতে নানান বিঘ্ন।

সামনে একটু বাগান, পুরনো বাড়ি, ঘুটঘুটে অন্ধকার নীচেটা। দেবব্রত গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। ভাড়া মিটিয়ে, কাঠের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। দিদিদের বাড়ির এই নীচের তলাটা যক্ষপুরীর মতন মনে হয়। আলো নেই, গুহার মতন মাটি-ঘর থেকে অন্ধকার আর কোন প্রাচীন গন্ধ ভেসে আসে। যেতে যেতে দেবব্রত কেমন মিশ্রিত এক গন্ধ পেল। ফুলের গন্ধ। বাগানের লতাপাতার অন্ধকার থেকে গন্ধটা ভেসে এসেছে।

ঘ্রাণের ঈষৎ তৃপ্তি নিয়ে দেবব্রত যখন কাঠের মস্ত সিঁড়িটায় পা দিয়েছে, উঠছে, শব্দ হচ্ছে পা ফেলার—হঠাৎ দেবব্রতর কি মনে পড়ায় কেমন হাসি পেল। এ দুজনেরই বা তফাত কোথায় গিরিজাপতি কি জানেন, তিনি কি বলতে পারবেন একজন উমা এবং একজন সুধার মধ্যে তফাত কি? উনি পারবেন না। দেবব্রতও পারবে না। ফুল না চেনার জন্যে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করছিল না দেবব্রত—এবং কেমন কঠিন পায়ে কাঠের সিঁড়িতে বিশ্রী শব্দ করতে করতে ওপরে উঠছিল।

দশ

রেশনের দোকানে এই মাত্র একটা তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল। যে-লোকটা রসিদ কেটে টাকা নেয়, তার নাক দিয়ে তখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে; অন্যজন, হিসেবপত্র আর খাতা-লেখার কাজ করে যে, তার জামা ছিঁড়ে গায়ের ময়লা চিট গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে, কেউ বুঝি বেশ জোর এক চড় কষিয়েছিল গালে, আঙুলের দাগ বসে গেছে, মালপত্তর-ওজন-করা কুলিটা পালিয়েছে। এত ভিড় জমে গেছে গলিতে না রিকশা না ঠেলা কিছুই ঢুকতে পারছিল না। থলি হাতে তখনও বিশ পঁচিশ জন লোক ঠায় দাঁড়িয়ে, আরও কিছু জুটছিল ক্রমে ক্রমে।

কি ব্যাপার? আরে মশাই যত শালা চোর আর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের কারবার। এদের টুঁটি ছিঁড়ে নিতে হয়। যেমন চোট্টা গবর্নমেণ্ট, বাপের রাজত্ব পেয়েছে সব, দিনকে রাত করে চালিয়ে দিচ্ছে শুয়ারের বাচ্চারা।

দোকানের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি একটা মোটা থপথপে লোক তখনও হাত তুলে আছে, তার গা ঘেঁষে কৃশ চেহারার এক প্রায়-প্রবীণ লোক, দু চার জন পাড়ার মুখচেনা সিভিক গার্ড ছোঁড়া রেশনের দোকানের ভেতরটা যেন আগলে রাখার মতন ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এবং দোকানের চৌকাটের বাইরে চোর-ধরা ভিড়।

ভদ্রলোকের নাম বিনোদ, বিনোদ গুঁই। পাড়ার লোক বিনোদ কড়াই বলে ডাকে, কলেজ স্ট্রীট বাজারে তার হাতা খুন্তি কড়াইয়ের দোকান। কৃশ চেহারার লোকটি কর্পোরেশানের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার, বংশী চক্রবর্তী, পাড়ার লোকের মুখে শুধু মাস্টার।

বিনোদ কড়াই ভিড়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে উগ্র উত্তেজিত গলায় বলল, 'কেউ গিয়ে মল্লিকদের অফিস থেকে একটা ফোন করে দাও গে হে। একেবারে থানায়।'

ফোন করতে কেউ এগুচ্ছিল না। কি হবে ফোন করে, ওখানেও এই কারবার। ,সরকারী দোকান, সরকারী থানা—একই গোয়ালের গরু সব। মাস্টার ভিড়ের মানুষদের মুখের দিকে জনে জনে চাইছিল, যেন কে ফোন করতে যাবে দেখছিল।

সিভিক গার্ড ছোঁড়াদের একজন বলল, 'ঝুট ঝামেলা করে কি হবে দাদা, বেশ ত সেঁকে দিয়েছেন, এবার ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব ? কেন, ছেড়ে দেব কেন—?' বিনোদ কড়াই মারমূর্তি হয়ে উঠল, 'ছেড়ে দেবার জন্যে ধরেছি শালাকে—'

ভিড়ের একদম পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল, 'আই বাপ, তোর ওপর খুব রোওয়াব লিচ্ছে রে লিতাই।'

সিভিক গার্ড নিতাইয়ের কানে কথাটা গেল, বিনোদ কড়াইও শুনতে পেয়েছে। 'কে বলল, কোন শালা বলল—' বিনোদ কড়াই দোকান থেকে রাস্তায় নেমে এল, 'বাপের বেটা যদি হোস, ত বেরিয়ে আয়।'

কথাটা বলেছিল, সে ততক্ষণে অবস্থার গরম দেখে ভেগে পড়েছে। বিনোদ ভিড়ের মধ্যে খানিক হাঁক ডাক ছেড়ে আবার দোকানে উঠে এল।

দোকানের অবস্থাটা এখন একটু অন্য রকম। যে ক'টা সিভিক গার্ড ছোঁড়া দোকান আগলাচ্ছে তাদের সঙ্গে নিতাইয়ের চোখে চোখে যেন কথা হয়ে গেছে।

'পুলিস ফুলিস যা করতে হয়, আপনি করুন ; দোকান ছেড়ে দিন—' নিতাই দোকানের চৌকাটের দিকে এগিয়ে গেল দুপা, 'লাইনে বহু লোক রেশন নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। রেশনের থলি হাতে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অফিসের বাবু, বেকার আড্ডাবাজ ছোকরা, স্কুলের ছাত্র, বাড়ির ঝি চাকর—না আছে কে! এই উড়ো হাঙ্গামা কেউ কেউ আর ধৈর্য ধরে দেখতে পারছিল না, অফিস কাছারির বেলা বয়ে যাচ্ছে, কখন রেশন পাবে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তারপর স্নান খাওয়া আছে, ট্রাম-বাস ধরা আছে

আর আজকাল ট্রাম-বাস ধরা মানে ফাতনা ফেলে মাছ ধরা; কপালে কখন একটু জায়গা জুটবে কে বলতে পারে।

'খাটি কথা, আগে আমাদের রেশনটা নিয়ে নি গুঁইমশাই, তারপর আপনি পুলিস কাছারি করবেন।' এক অফিসবাবু লাইনটাকে ঠেলে দিলেন, 'নাও হে এগোও।'

'কিসের র‍্যাশান—' বেকার ছোকরা গলা তুলল, 'এখন র‍্যাশান নিলে ব্যাপারটা সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আগে একটা ফয়সালা হোক মোশাই।'

একদল রেশান নেবে, অন্যদল আপাতত নেবে না—একটা হেস্তনেস্ত হোক—তারপর নেবে। তাদের তাড়া নেই।

বিনোদ কড়াই নিতাইয়ের চোখে চোখ রেখে শাসিয়ে উঠল, 'তুমি এখানে কর্তামি করবার কে, যাও নিজের চরকায় তেল মারগে যাও।'

'এটাও আমার চরকা।'—নিতাই রুখে উঠল, 'আপনি বেশী বড় বড় কথা বলবেন না।'

'অ্যাই, মুখ সামলে—' বিনোদ কড়াই হাতের ভঙ্গিটা এমন করল যেন, এখুনি একটা চড় কষিয়ে দেবে নিতাইয়ের গালে।

নিতাইও হাত গোটাল। কে একজন ছেলে ভিড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ক্যালা, বাচ্চুদাকে একটা খবর দিয়ে আয় বে।'

হাতাহাতি হয়ত আবার বেঁধে যেত, কপালগুণে এ আর পি পোস্টের হাসান সাহেব নন্দী অনিল এসে হাজির। কথাটা পোস্টে বসেই শুনেছে, তারপর খানিকটা বা কৌতূহল বশে, খানিকটা বা পরোক্ষ দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ছুটে এসেছে। ভিড় ঠেলে টুলে তিন জনে দোকানে উঠল।

'কি, ব্যাপার কি—?' হাসান সাহেব জানতে চাইল।

'ব্যাপার আবার কি, মশাই; এ-সব ত আপনারাই চালাচ্ছেন।' বিনোদ কড়াই রাগে ফুলছিল।

'আহা, মাথা গরম করছেন কেন আগে থেকে, কি হয়েছে বলুন না।' হাসান সাহেব শান্ত গলায় বিনোদকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করল।

'কি হয়েছে?' বিনোদ হাত বাড়িয়ে মাস্টারের পায়ের কাছ থেকে

রেশনের থলে উঠিয়ে নিল, 'নিন না, মাল মেপে নিন রসিদের সঙ্গে·· সের প্রতি দু ছটাক করে মারে—' বিনোদ রেশনের দোকানে লোকগুলোর দিকে ঘৃণার সঙ্গে তর্জনী বাড়াল, 'যত শালা চোট্টার আমদানি...'

'গালাগাল দিচ্ছেন কেন!' অনিল বলল, 'আপনি বলছেন মারে—কই আর কেউ ত বলছে না।'

'তুমি শুনেছ কানে কে বলছে আর কে বলছে না!. সবাই বলছে।' বিনোদ কাউকে যেন গ্রাহ্য করল না 'কে অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে সব সময়, কার অত সময়! আর, ওই যে একটা কুলি আছে ওজন করে তার ত সেই শ্মশানের কাঠ ওজন করা, চড়াচ্ছে আর নামাচ্ছে, দেখতেই দেয় না।'

'আপনি—' হাসান সাহেব বেকায়দায় পড়ে বলল, 'আপনি দোকানের নম্বর আর ওঁদের নাম নিয়ে একটা কমপ্লেন করুন। এখন এই ভিড় গণ্ডগোল হঠান. আর দশটা লোকের রেশান নেবার আছে।'

'র‍্যাশন নেবে? কি নেবে মশাই—' বিনোদ কড়াই মুখ নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে হাসান সাহেবের মুখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখাল, 'নেবার কিস্সু নেই।···এই ত চাল,'—মাস্টারের থলিতে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো চাল তুলে নিল বিনোদ, 'দেখুন না - কি বাহার চালের! যত শালা গুদোম পচা কাঁকর মেশান ভাঙা খুদ মেশান চাল, কী পচা গন্ধ! মানুষে খায় এ সব! এই খেয়ে খেয়ে বাড়ি সুদ্ধ লোক আমাশায় ভুগছি।'

মাস্টার ছোট থলি থেকে মুঠো করে গম তুলল, দেখাল, বলল, 'গমটা আরও খারাপ।'

'ও বোধ হয় সেই পাঁচশো মণ পচা গম কোথায় যেন ধরা পড়েছে—সেখান থেকে আমদানি—' দোকানের নীচে থেকে এক কেরানীবাবু বলল।

'বঁড়শের গুদোমে রে বাপ, মাড়োয়ারীর গুদোম—'অন্য একজন জুড়ে দিল।

'কী মুশকিল।' হাসান সাহেব হয়রান হয়ে জিবের একটা শব্দ করল, 'খারাপ মালের জন্যে ত এরা দায়ী নন; যেমন এসেছে দিচ্ছে।'

'না, দিচ্ছে না।' নিখিল বলল। নিখিল এই ভিড়ের মধ্যে রেশান নিতে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা বলতে বলতে বেশ উত্তেজনার মাথায়

সে এগিয়ে এল। 'কাল বিকেলে আমি এসেছিলাম, দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে রেশান পাই নি। কিন্তু কালকের রেশানের চাল অন্য রকম ছিল।'

সবাই কেমন হঠাৎ চুপ করে গেল। নিখিলকে দেখছিল অনেকে।

'এটা নতুন বস্তা।' দোকানের রসিদ-লেখা ছোকরা কথা বলল, এই প্রথম কথা তার।

'রাতারাতি বস্তা নতুন হয়ে যায়। এ-সব আমরা জানি।' নিখিল জবাব দিল।

বিনোদ কড়াই মনের মতন সমর্থক পেয়েছে বলে আরও যেন জোর পেয়ে বলল, 'চোর. সব শালা চোর, এ-সব কারবার আমরা বুঝি, মায়ের পেটের খোকাটি ত নই।'

নন্দী অনেকক্ষণ থেকে বিনোদকে দেখছিল, লোকটাকে সে বিলক্ষণ চেনে। বলল, 'গুঁইমশাই রেশান তুলেছেন নাকি আজ?'

'তুলেছি। তুলেছি বলেই ত বাড়ি গিয়ে আবার মাপালাম সব। তারপর মাস্টারকে নিয়ে এলাম।' বিনোদ কত বুদ্ধি ধরে, যেন তার পরিমাপ দেখাল। 'আরে ভাই, এভরি ডে এই চুরি চলছে।'

নন্দী বিনা দ্বিধায় একটা হাত বিনোদের দিকে এগিয়ে দিল, 'আপনার রেশান কার্ডটা দিন ত দেখি।'

বিনোদ হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে গেল। নন্দীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর কপাল কুঁচকে বলল আচমকা, 'আমার কার্ড তোমায় দিতে যাব কেন?'

'দিন না কার্ডটা! বের করুন। এই কার্ড এ-দোকানে জমা রেখে যাব। তের চোদ্দ জনের নাম লিখিয়েছেন আপনি। ইন্‌স্‌পেকশন হবে বাড়িতে—তারপর আবার কার্ড পাবেন।' নন্দীকে ভীষণ ধূর্ত এবং দৃঢ় দেখাচ্ছিল।

বিনোদ কড়াইয়ের গলা হঠাৎ ফুলে গেল, মুখ চোখ কেমন মার খাওয়া কুকুরের মতন দেখাচ্ছিল, কি বলবে কি বা বলবে না কিছু ঠিক করতে না পেরে দোকানের চৌকাঠের দিকে পা বাড়াল. 'আচ্ছা, এ-সব সাঁটের ব্যাপার

আমি বুঝি! থানায় যাব আমি…! বড়বাবুকে নিয়ে আসব। দেখি, এর একটা হিল্লে হয় কি না।'

বিনোদ কড়াই থানার ভয় দেখাল, কিন্তু সে আর যাবে না—এ যেন সবাই জানত।

'আরে যাঃ—!' নন্দী হাত তুলে অবহেলা এবং উপেক্ষার শব্দ করল: 'রেশান কার্ডে লোক বাড়াবার বেলা বাবুরা সব কত যুধিষ্ঠির, অন্তের বেলা যত রোওয়াব।'

মাস্টার তার থলি তুলে যাচ্ছিল। বিনোদ কড়াইয়ের মতন তার ভুয়ো নাম খুব বেশী নেই, তবে দু চার জন আছে। না নাম বাড়িয়ে উপায় কি, কতটুকু দেয় এই রেশান-দোকান—কতটুকু দেয়? চারটে লোকের দুবেলা পেট ভরবার মতন নয়। তার ওপর বাচ্চা হবার পর বউটা রাক্ষসের মতন গিলছে। এই দুর্গন্ধ পচা গমের রুটিই খায় দশখানা করে। তাকে দুধ ঘি বা একশিশি প্রসূতির ওষুধ খাওয়াবার সামর্থ্য যখন নেই, তখন এই চাল আর গম খেয়ে শরীর সারিয়ে নিতে হবে। মাইয়ে যদি দু ফোঁটা দুধ না জমে কচিটা খাবে কি, মাস্টার কি আর এখন তিনটে বছর দুধ কিনে খাওয়াবে বাচ্চাকে!

মাস্টার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে পালাচ্ছিল। হাসান সাহেব দেখছিলেন সব। নন্দী বুকে হাত উঠিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন এই যুদ্ধে তারা জয়লাভ করেছে।

'আমি কিন্তু ব্যাপারটা এখানে মিটিয়ে ফেলছি না।' নিখিল বলল। নন্দী এবং হাসান সাহেবের দিকে নির্ভয় প্রতিবাদের মতন তাকাল, 'এই রেশান আমি নেব না। পুলিসে আমি ফোন করব এখুনি।'

নন্দী এবং হাসান সাহেব তাকিয়ে থাকলেন। নন্দী ঠিক খেয়াল করতে পারল, এই ছেলেটি বাসুদের বাড়ির একতলার ভাড়াটে। বাসু বলে, বিস্তের বাঁশগাছ মাইরি, হাওয়া মারলে কাত হয়ে যাবে বই কই দিয়ে সার ঢালছে কি না!

নিখিলকে চিনতে এবং জানতে পেরেও নন্দী কিছু বলতে পারল না। নন্দী

জানে, বাসুই বলেছে, নীচের তলায় বুড়োটার খুব ভাঁট। বাসু কার্ড করাবার সময় নিজে থেকেই লোক বাড়িয়ে নেবার কথা বলেছিল, জবাবে বুড়ো এক ধমক দিয়েছিল বাসুকে।

নিখিল চলে যাচ্ছিল, নন্দী দেখছিল। ফোন ও করবে। রেশন-দোকানের ভদ্রলোক দুজনের অবস্থা খারাপ হল আর কি! এই দুর্দিনের বাজারে চাকরিটা হয়ত যাবে ওদের।

নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছিল নন্দীর। এ-পাড়ার ওই একটা বাড়ি সব ভেস্তে দিল। নন্দী অনুভব করতে পারছিল, নিখিলদের বলার অধিকার এত স্পষ্ট ও খাঁটি যে সে-অধিকার অন্য কারও নেই এ-পাড়ার। অথচ ওই একটা বাড়ি সব কটা জোচ্চোরকে ডামাডোলের বাজারে ফাঁকিতে সাধু বলে চালিয়ে দিল।

রেশানের দোকানে আবার আস্তে আস্তে লোক উঠে আসছিল। রসিদ-লেখা ভদ্রলোক অসহায় চোখে হাসান সাহেবের দিকে তাকিয়ে, খাতাপত্রের হিসেব করা লোকটাও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তারা যেন জানে, এরপর পুলিসে আসবে, আসবেই।

ভিড়ের পিছু থেকে কে একজন বলল, 'লে বে লে—দু চার দিন আরও করে লে। হুড়কো ত আসছেই।'

'কার হুড়কো রে, চেঁদো—?

'ইংরেজদের বাপের।...এই নবাবি আর চলবে না।' গলার স্বর ঈষৎ খাটো করে 'সায়গন রেডিয়ো শুনিস, বুঝবি কেমন পেলা দিয়েছে সাদা চামড়াদের।'

হাসান সাহেবের দিকে তাকিয়ে নন্দী হঠাৎ বলল, 'চলুন, আমরা যাই।'

ভিড়ের বাইরে এসে কয়েক পা এগিয়ে হাসান সাহেব বললেন, 'এই দোকানটা রয়ে সয়ে চুরি চালাতে পারলে টিঁকত হে, নন্দী। একেবারে পুকুর চুরি চালাতে গেল!'

নন্দী কোনো কথা বলল না, পকেট থেকে এক আনা পয়সা বের করে বিড়ি কিনতে সামনে এগিয়ে গেল।

এগারো

ক'দিন ধরে টানা বৃষ্টি চলেছে। এখন শ্রাবণ মাস, শ্রাবণের শুরু। আকাশ সর্বক্ষণই অপরিষ্কার, জলের গুঁড়িতে যেন শূন্য ভরে আছে। মেঘলার মালিন্য ; কদাচিত কৃপণের মতন একটু আলো ফুটলেও সে-আলোয় রোদের স্বাদ নেই। দিনগুলো সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়েছে, বিরক্তিকর লাগে এখন। সেই সোমবারে দুপুর থেকে বৃষ্টি নেমেছিল—প্রথম দিনেই শহর ভেসে গেল, তারপর মাঝে একদিন গুমোট আর মেঘলা আর ইলশেগুঁড়িকে বসিয়ে রেখে পরের দিন আবার অবিশ্রান্ত বর্ষণ; পিচের গায়ের কাদা তখনও শুকোয় নি, বাড়িগুলোর গায়ের জল ঝরে নি—নতুন করে বৃষ্টি নেমে আবার সব ভসিয়ে দিল। বৃহস্পতিবার থেকে আজ আর-এক সোমবার —সেই বিরক্তিকর বর্ষা ঝিপ ঝিপ করে লেগে আছে, হয় হয়-না, আবার আসে, চলে যায়। তবু যদি আকাশ থেকে মেঘ সরত। এত মেঘ কোথায় ছিল, সারাদিন সমানে ভেসে যাচ্ছে—ফুরোয় না। মনে হয় কোনো প্রাচীন ঐশ্বরীয় পুরুষ যেন তার মেঘ-মেষের পাল আকাশ দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যেও কলকাতা শহর গৃহবাসী হয়ে বসে নেই। বরং জলে কাদায় দুর্গন্ধে মাছি আর মরা আলোয় তার যেটুকু অপ্রসন্নতা সব যেন পরকলা ফুর্তির মধ্যে পুষিয়ে নিচ্ছে। সিনেমা থিয়েটারে দেদার ভিড়, রেস্টুরেন্টে ফাঁকা জায়গা জোটানো অসম্ভব, ট্রাম বাসে গিজগিজ করছে লোক। কিছু ট্যাক্সি আজকাল চোখে পড়ে, নতুন নতুন রিকশা এসেছে ঢের। এই ট্যাক্সি মধু মণ্ডপে ছোটে, আর রিকশাগুলো অলিগলিতে।

আসলে এ-কথা দৃশ্যত বোঝা যায় নি যে, বাংলাদেশের ত বটেই পূর্ব ভারতের এই বদান্য-শহরের আশ্রয়লোভে কত মানুষ ছুটে এসেছে।… একদিন, মাত্র আড়াই তিন বছর আগে, এই শহরকে হয়ত মৃত্যুপুরী মনে

হয়েছিল ; বছর পুরতে না পুরতে বোঝা গেল, যতখানি ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল শহরটাকে—ততটা ভয়ঙ্কর সে নয়, কারণ মফস্বলের জল বাতাসেও অন্নাভাব, রোগ, অস্বাস্থ্য, মৃত্যু সেখানেও মহাজনের মতন খাতা খুলে বসে আছে। আবার পরিত্যক্ত শহরে সসঙ্কোচে আসতে লাগল তৎপর নাগরিকরা ; বোমা পড়তে আবার ছুটল, ছত্রাকার হল ; তারপর এই শহরই আবার পলাতকদের টেনে নিল। কিন্তু, চোখ চেয়ে কেউ লক্ষ্য করে নি, এই শহর যুদ্ধের অন্তঃস্রাবী রসে যে নব শরীর লাভ করেছে তার আকর্ষণ প্রতিদিন চুম্বকের মত কত পতঙ্গকে এখানে টেনে আনছে।

যুদ্ধের কলকাতা দশভূজা প্রায়। জীবনের সকল প্রাপ্য এখানে মিটবে। চাকরি চাই—চল কলকাতা ; মিলিটারি রিক্রুটিং সেণ্টারই এখানে আট দশটা, তা ছাড়া সরকারী বেসরকারী হরেক রকম চাকরি, সাপ্লাই আছে—কণ্ট্রোল আছে—দপ্তরের ছড়াছড়ি আজকাল, চাকরি পায় না কোন গর্দভ! সরকারী চাকরি জুটল না, বেশ ত একবার বেসরকারীর বহর দেখ—কত ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে দিন দিন—কত তাদের ব্রাঞ্চ অফিস—কত রকম ডেভেলাপিং স্কীম—; আছে ইনসিওরেন্স, আছে ম্যানুফ্যাকচারিং, কত ওষুধ আর অ্যাসিড কোম্পানী খুলেছে তার হিসেব আছে, ফড়েগিরি আর দালালিতে কত লোক ভিড়ে আছে—তার খোঁজ রাখেন! বস্তুত, বেকার আর মধ্যবিত্তের অন্ন আজ কলকাতায়। সহস্র পথ আছে ওই মহানগরীতে। মহানগরী নিশ্চয় —সে উনচল্লিশের কলকাতা আর নয়—তার সকল অঙ্গে এখন যে পরিপুষ্টি তাতে বৃহত্তর কলকাতার জন্ম ; এই বৃহত্তর কলকাতা মিলিটারি ব্যারাক, ইট কাঠের গুদোম, ফ্যাক্টরি, নানান ধরনের কলকারখানা নিয়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই দুর্গতির দিনে দুর্গতদের জন্যে এখানে মাপা অন্ন আছে। শ্রমিক মজুর কিছু কি কম এসেছে শহরে? এমন কি কৃষকও। হাজার হাজার। কৃষক এখন শ্রমিক—দিন মজুর। দুর্ভিক্ষের ডামাডোলে চরণামৃতের মতন পাওয়া জমিটুকু কবে বেচে দিয়ে শহরে অন্নের কাঙ্গাল হয়ে এসেছিল আজ আর কে সে জমির ভরসা করে। নতুন আইন করে এই জমি আবার ফেরত দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কে যাবে সে জমি নিতে? কি আছে অন্ন,

বিলাস রহিমের সেখানে? মাথা সমান ধার দেনা, লাঙল গরু জোতদারের কাছে, ম্যালেরিয়া আর আমাশার মড়ক চলেছে গ্রামে, তা ছাড়া বাবুমশায়, গত বছর অকালে এই শহরে এলুম, বউটা পথ থেকে হাবিশ হয়ে গেল, বোনটা পুলিসের গাড়িতে চেপে কোথায় গেল জানি না কো, মা-টা মরল, ছেলেটা —ওর মা-র ট্যাঁকে বাদুড় ছানার মত লেপ্টে ছিল—এখন সেটাও মরেছে। ই শহরই ভাল, গতর দিলে মেলা কাম। রাজমজুরি করলে দিন পাঁচসিকে দেড়টাকা, কারখানায় দু টাকা আড়াই টাকা, চাল গম পাই হপ্তা হপ্তা।

যদিচ এই শহর যুদ্ধক্ষেত্র নয়, তবু যুদ্ধের জোয়ার ভাঁটার ঢেউ গুনতে এখানে বসতে হবে। বসলে দেখা যাবে, শুধু পেটের অন্ন, পরিবারের দায়ভার বহন করতে মানুষজন ছুটে আসছে না; এখানে না এলে এই সুদিনের সুযোগটুকু গ্রহণ করা যায় না বলে ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবীও প্রচুর এসেছে। মেলায় যেমন ব্যাপারীর ভিড়, এদের ভিড়ও সেই রকম। এবং যে যতটা সুবিধে করতে পারছে, বাগাতে পারছে, ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেনের কেরামতি করতে পারছে তত ফুলছে। তিন পুরুষ পরিশ্রম করলে যে অর্থ জমানো সম্ভব—এরা এক পুরুষের এক চতুর্থ জীবনে সেই অর্থ সঞ্চয় করছে। কণ্ট্রোল, পারমিট আর লাইসেন্স, কনট্রাক্ট টেণ্ডার আর ঘুষ; হোর্ডিং ফড়ে আর প্রকাশ্য খয়রাতি —ঈশ্বর কৃপায় অর্থ তোমার করপুটে আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়বে।

'কলকাতায় কত বেশ্যা আজকাল বলতে পারিস, পরিতোষ?'

'সাম থাউসেণ্ডস···' পরিতোষ নামক ছেলেটি জবাব দিল।

'তুই একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফুল! দু চার হাজার বরাবরই ছিল। কলকাতার সেই প্রিমিটিভ আমল থেকে এরা ইনহ্যাবিট করছে—বংশ পরম্পরায় বাড়ছে—' প্রথম জন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের মতন বলল, 'তুই লাইফের কিছু দেখিস নি, কলকাতারও নয়। হ্যাভ ইউ এভার বিন টু হাড়কাটা?'

'এসব ডিসকাশান আপাতত থাক, বিনয়বাবু।' নিখিল বলল, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সে অস্বস্তি এবং লজ্জা বোধ করছে।

'থাকবে! কেন থাকবে, মশাই?' বিনয় চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে ছিল, সামান্য সোজা হল, 'এরাও ত এক ধরনের—কি বলে আপনাদের ভাষায়—লেবার ইং। লেবারারস।'

হাতের সিগারেট ছাইদানে গুঁজে দিল নিখিল। আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে, এই সব বাজে অপদার্থ সতীর্থদের হাত থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। বাইরে এখনও বৃষ্টি পড়ছে, ওআই এম সি এ-র এক কাঠের চৌকা ঘরে বসে তারা। কেন যে বৃষ্টির মধ্যে দেখা হয়ে গেল বিনয় আর পরিতোষদের সঙ্গে। তারাই জোর করে টেনে এনেছে চা খেতে। নিখিল বাইরে তাকিয়ে থাকল। আশে পাশে সামান্য কিছু ভিড়ও আছে—তবে তেমন নয়, একটি গুঞ্জন ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঘরের মধ্যে।

'আমি পনের বছর বয়স থেকে হাড়কাটা দেখেছি, সোনাগাছি ঘুরেছি আঠারো উনিশ বছর বয়সে, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট আর কড়েয়া রোডেও কম ঘুরিনি—মশাই।' বিনয় এমন স্বরে বলেছিল যেন তার কাছ থেকে এ-সব জেনে শুনে নেওয়া উচিত, 'আমি বলছি, একেবারে প্রফেশনাল বেশ্যা এখন কয়েক লাখ। আর অ্যামেচার প্রসটি · '

'প্লিজ···' নিখিল বিব্রতভাবে সামনের দিকে চেয়ে এক তরুণীকে দেখল, এবং তাদের কেবিনের পাশে অর্ধস্ফুট মহিলা কণ্ঠ শুনতে শুনতে বিনয়ের দিকে মিনতির চোখে তাকাল, 'প্লিজ বিনয়বাবু। আফটার অল এটা পাবলিক প্লেস্···'

'মাই গড্! আরে মশাই, আমরা পাবলিক ফাংশানের কথাই বলছি।' বিনয় আরও যেন তার যুক্তির ভার চাপাতে চাইল। 'স্যার পি সি রায় নিজে চলে গেলেন, কিন্তু আপনাদের রেখে গেলেন মশাই, এই যা আপশোস।'

পরিতোষ পরিপাটি করে তার ওমলেট খাওয়া শেষ করে জল খেল। ভরা নিশ্বাস ফেলে তাকাল নিখিলের দিকে, তারপর বিনয়ের দিকে, বলল, 'আপনাদের রাশিয়ায় ত বেশ্যা নেই।'

'না।' নিখিল বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'আমাদের ইণ্ডিয়ায় আছে।' পরিতোষ গম্ভীর হয়ে বলল, 'নিজের দেশের প্রবলেম ডিসকাস করায় লজ্জা কি?'

'একে ডিসকাশন বলে না।' নিখিল রুষ্ট এবং ঘৃণার চোখে তাকাল পরিতোষের দিকে, 'ভালগার টক্‌স্ বলে।'

বিনয় চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে একটু পিছন দিকে হেলার চেষ্টা করল, সিগারেট ধরাল। 'দেখুন মশাই, আমি প্রবলেম ফ্রবলেম বুঝি না। যা দেখেছি, বলছিলাম।' ধোঁয়া উড়িয়ে নিখিলের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল বিনয়, 'আমার কথা ছিল, আজকাল কলকাতায় এনজয়মেন্ট সাপ্লাই কি রকমে বেড়েছে, তাই আর কি—। এভরি ফোর্থ গার্ল আউট অফ ফাইভ এখন ফ্লেশ-হকার।' বিনয় যেন ভেতর থেকে খুব নিদারুণ এক পরিহাস করল, 'তুই যে কবিতাটা লিখেছিলি পরিতোষ তাতে এটা অ্যাড্ করে দিতে পারিস…'

পরিতোষ বার বার চারটে কাঠি নষ্ট করল সিগারেট ধরাতে পারল না। বিনয়ের কথার দিকে তার মন ছিল কি না বোঝা গেল না। পঞ্চম কাঠি জ্বালাবার আগে সে স্বগতোক্তির মতন করে আবৃত্তি করল, 'সাম ডে আই মে বার্ন মাই ল্যাম্প, দি ল্যাম্প নাউ ডার্ক অ্যাণ্ড ডেড্…।'

নিখিল কথাটা শুনল। ইচ্ছে করে নয়, কান দিল—পাশে একটা লোক কথা বলছে, তাই কানে গেল। অথচ, বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা উৎসাহ বোধ না করে, সামনে ভবানী দত্ত লেনের দিকে তাকিয়ে থাকবার সময় বৃষ্টি তাড়িত দোকানাশ্রিত মানুষগুলোর বিক্ষিপ্ত নকশার মধ্য দিয়ে, কেমন করে যেন তার চেতনা এই সাধারণ একটা কথাকে অনুসরণ করে চলল।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে পরিতোষ বলল, 'আমার একটা কবিতার কি দশা করেছে 'মহাকালে' দেখেছিস বিনু?'

'কি নাম রে কাগজের বাবা, মহাকাল।' বিনয় চোখ ভুরুতে ঠেকাল, গাল ফোলাল। 'কি কাগজ সেটা?'

'দ্বি-মাসিক!'

'আজকাল আবার ডুমাস অন্তরের কাগজ চালু হয়েছে। বাঃ!'

'কাগজের স্কেয়ারসিটি যা।' পরিতোষ জবাব দিল।

সাম ডে আই মে বার্ন মাই ল্যাম্প···দি ল্যাম্প নাউ ডার্ক অ্যাণ্ড ডেড্।··· সাম্ ডে···। নিখিলের মনের ঘরে যেন একটা ভ্রমর এসে পাক দিয়ে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, কখনও আস্তে কখনও দূরাগত হয়ে কখনও খুব নিকটে সে গুঞ্জিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

'কি লিখেছিলি কবিতায়?' বিনয় অদূরের তরুণীর দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তোদের সেই আধুনিক কবিতা ত···মানে, স্তনচূড়া সম চুলের কাঁটারা সব ছাগপাল সম কামাতুর··· কিংবা ধর সেই সব মার্ভেলাস কয়েনিং, অন্তরের জরায়ু; বলাৎকার, গরুর মাংসের মতন নিঃস্ব রাত্রি···' বিনয় হা হা করে হাসছিল।

'হোয়াই ডু ইউ লাফ?' নিখিল হঠাৎ, প্রায় যেন অন্ধকার থেকে তার গলার ক্ষিপ্র এবং শানিত স্বর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিনয় প্রথমটায় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ের পরে সকৌতূহলে নিখিলকে দেখল, তারপর অত্যন্ত উপেক্ষাভরে বলল, 'আই লাফ, বিকজ আই ডু লাইক টু লাফ্।'

নিখিল মুখের ওপর এই নির্বিকার তাচ্ছিল্য ব্যঙ্গ এবং ভাঁড়ামি (নিখিলের তাই মনে হল) সহ্য করতে পারল না। রাগ যেন মাথায় চড়ে গিয়েছিল সহসা, বলল, 'দেন লেট মি কল ইউ এ বাফুন!'

বিনয় রাগ করল না, গ্রাহ্য করল না, চোখের কোণ দিয়ে তার বিপক্ষের উত্তেজিত মুখ লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'আমি জানতাম না—আমার হাসার অধিকার মার্কসের পাঁজিতে ছকা আছে।'

'ননসেন্সের মতন কথা বলবেন না!' নিখিল আর-একটু হলে একটা চায়ের কাপ ভাঙত, 'যে শব্দের বানান জানেন না তার উচ্চারণ নাই বা করলেন।'

'বানান মশাই আপনিও অনেক কিছুর জানেন না—যেমন ধরুন একটু আগে···'

'ধ্যাত্, তোরা—' পরিতোষ বাধা দিল, 'তোরা কি বাজে ঝগড়া শুরু করলি। বানান জানা না-জানায় কি আসে যায়। বায়রন বলেছিল, মাই গ্রামার মে বি রং, বাট অ্যাম আই রং ইন মাই প্যাশান ? সেই রকম, বানানে কি তোর যায় আসে, তোর বলার কথা যদি ভুল হয় তবে না হয় বুঝি।'

বিনয় চুপ করে গেল। বস্তুত, পরিতোষের কথা আর তার কানে তেমন যাচ্ছিল না, কারণ এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে যে মেয়েটি উঠে এল দোকানে, বিনয় তাকে বিলক্ষণ চেনে, যুথিকা—যুথিকা—চ্যাটার্জি, তাদের ইয়ারের অন্যতম সুন্দরী সতীর্থনী।

যুথিকা ছাতা থেকে জল ঝেড়ে গুটিয়ে নিচ্ছে, তার কমলারঙ শাড়িতে বর্ষার জলবিন্দু, চোখের চশমার ফ্রেমে চুল জড়িয়ে গেছে। একেবারে একলা যুথিকা।

'এই পরিতোষ, তোরা বোস। যুথিকা চ্যাটার্জি এসেছে—কথা বলে আসি!' বিনয় যেন সমস্ত ব্যাপারটা অক্লেশে ভুলে গিয়ে চলে গেল।

পরিতোষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, নিখিলও উপহাসের চোখে সামান্য দেখে নিল। তার দৃষ্টি যেন বলছিল, এত খেলো সস্তা একটা ছেলে, যে ইউনিভারসিটির সিঁড়ি ভাঙতে আর দোকানে ঢুকে চা খেতে গল্প করতে এবং মহিলাদের দেখা মাত্র লালায়িত হয়ে উঠতে পারলে ধন্য হয়ে ওঠে—সেই ছেলের সঙ্গে তাকে বসে বসে চা খেতে এবং কথা বলতে হয়েছে এটা যেন নিতান্ত মর্যাদা হানিকর।

'আপনি কবিতা লেখেন—কবি, ভাবতেই আমার অবাক লাগে।' নিখিল পরিতোষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল।

'কেন—' পরিতোষ বিস্মিত, আমি কবিতা লিখতে পারি না?'

'না, তা নয়। আমি বলছিলাম, বিনয়বাবুর মতন ছেলের সঙ্গে দিনরাত ঘুরে বেড়ান, অথচ কবিতা লেখেন—! আশ্চর্য!'

'বিনু আমার ছেলেবেলার বন্ধু।' পরিতোষ ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিল।

'কি করে বন্ধু হয় সেটাই আশ্চর্য!...একটা সিলি ভালগার বড়লোকের ছেলে—ওর না আছে জীবন না জীবনের চিন্তা।' নিখিল বলছিল, 'আর

আপনি, শত হলেও আপনি অনেকটা সিরিআস, আপনাকে জীবন দেখতে হয় ভাবতে হয়...'

'বিনু আমার জীবনের বাইরে এ-কথা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন মশাই, ও আমার জীবনের অঙ্গ।'

'কি যা তা বকছেন...' নিখিল হাসবার চেষ্টা করল।

'যা তা বকিনি, আই অ্যাম সিরিআস—' পরিতোষ এই যেন প্রথম অন্তর থেকে অনাবৃত হয়ে উঠল, তার কথা এবং দৃষ্টিতে এক ধরনের শক্ত স্পষ্ট অনুভূতি ছিল, বলল, 'আপনি কি করে বুঝলেন ও আমার জীবনের অঙ্গ নয়।'

'খুব সহজেই।'

'যেমন ?'

'যেমন আপনার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি আর ও দুজনে আলাদা শ্রেণীর মানুষ।'

পরিতোষ গলা এবং নাক দিয়ে এমন একটা শব্দ করল, যার অর্থ, এই সব মামুলি কথা সম্বল করে আপনি কথা বলতে এসেছেন! কি আশ্চর্য মশাই, কি অদ্ভুত ব্যাপার।...'শ্রেণী বিচারের ওপর আমার কোনো মোহ নেই। বুঝলেন নিখিলবাবু, আমার ওতে কিছু আসে যায় না।'

'আসে যায় না, অথচ আপনি কবিতা লেখেন!' নিখিল ঠাট্টার আঘাত হানল, 'আপনি বিড়বিড় করে বলেন, সাম্ ডে আই মে বার্ন মাই ল্যাম্প...'

'অফকোর্স। কেন নয়। কেন আমি আশা করতে পারি না একদিন আমার এই মৃত অন্ধ হৃদয় জ্বলে উঠবে—'

'আশা করুন, কে বারণ করছে। কিন্তু কার জন্যে জ্বলবে ?'

'আমার জন্যে। আমার হৃদয় আমার জন্যে জ্বলবে, আপনার জন্যে নয়।'

'আপনার হৃদয় জ্বললে আমার কি লাভ ?'

'আপনার লাভের জন্যে ত আমার হৃদয় জ্বলছে না, আমার লাভের জন্যে জ্বলছে।'

নিখিল বুঝতে পারল কথাটা এখন বেশ কঠিন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। শিল্প কার জন্যে, তোমার জন্যে না আমার জন্যে? আমার এই অনুভব কার

জন্যে, তোমার জন্যে না আমার জন্যে? পরিতোষ বলবে—তার জন্যে, তার শিল্প তার অনুভব অভিজ্ঞতা, তার হৃদয় সবাই তার; আর নিখিল বলবে, না তা নয়, তোমার শিল্প তোমার সৃষ্টি হতে পারে—কিন্তু সেই সৃষ্টিতে আমার অংশ আছে, সমাজের অংশ আছে। যদি আমার কাজে না আসে, তবে তোমার শিল্প জাতিচ্যুত, ওকে আমি শিল্প বলি না। সমাজের অংশ স্বীকার করলেও পরিতোষ ওই 'কাজ' শব্দটাই মাথা নাড়বে। বলবে, না। কিছুতেই নয়।

যে কোনো কারণেই হোক নিখিল ঠিক এই যুক্তির মধ্যে তার আন্তরিক বিশ্বাসকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। কিন্তু, স্বীকার করে নিলে তার পরাজয় ঘটে এ-বোধ তার ছিল। বলল, 'তা হলে আমি বলব আপনি বিলাসী. কবিতা আপনার শখ, খেয়াল বই কিছু নয়। বুর্জোয়া আর্ট আমার কাছে আর্ট নয়।'

পরিতোষ সরল শিশুর মতন হেসে ফেলল। তার হাসিতে উপহাস ছিল না, ধিক্কারও নয়; সে প্রতিবাদও যেন করল না। বলল, 'রুটি গুড়ের শিল্পকে আমিও শিল্প বলে মনে করি না। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে কি লাভ, ভবিষ্যৎ পড়ে থাকল—আপনার আমার ধারণার বিচার হবে।'

নিখিল অস্বস্তি বোধ করছিল। পরিতোষ যত সহজে এই আলোচনার ওপর জল ঢেলে দিয়ে শান্ত হয়ে গেল নিখিল অত সহজে শান্ত হতে পারছিল না, তার মনের কোথায় যেন পরাজয়ের বোধ কাঁটার মতন বিঁধছিল। বলল, 'একদিন আপনি আমাদের ওখানে আসুন।'

'কোথায়?'

'সে আছে; সাহিত্য শিল্প নিয়ে আলোচনা হয়। অনেকে আসেন।'

'মাপ করবেন, আমি এ-ব্যাপারে ভয়ঙ্কর দাম্ভিক। কোথাও গিয়ে আমায় শিখে আসতে হবে কবিতার চেয়ে শীতের দিনে আমার দু জোড়া বুট ভালো—তাতে আমার রুচিও নেই, আগ্রহও নেই।'

নিখিল অনেকক্ষণ আর কিছু বলল না। পরিতোষও চুপ করে বসে থাকতে থাকতে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে নিয়ে নিজে একটা ধরাল, অন্যটা নিখিলকে দিল। তারপর দুজনেই আবার নীরব।

অনেকক্ষণ পরে নিখিল প্রশ্ন করল, 'তবে আপনার মৃত অন্ধ হৃদয়ের জলাটা কি ? কোন আলোয় জলবে ?'

'জলবে, জলবে।' পরিতোষ শান্ত শিষ্ট ঠোঁটে হাসছিল, চোখ তার দীর্ঘ হয়ে এসেছিল, বলল, 'মশালের আলোয় নয় মশাই—প্রেমের আলোয়, প্রেম এবং অনুভবের আলোয়।'

আবার নীরবতা। এক সময় বৃষ্টি-মিশ্রিত পথের গুঞ্জন, এই রেস্টুরেণ্টের ঝাপসা আলো আঁধারের মধ্যে, টুকরো কথা, কাপ পিরিচ চামচের শব্দের মধ্যে পরিতোষ বিড় বিড় করে বলল : আই অ্যাম নট গোয়িং টু লিসন টু এনি বডি সার্টিফাইয়িং দি হিউমান এক্সিসটেন্স।

গিরিজাপতির প্রেসের ঘরে বেশ একটা আড্ডা জমে উঠেছিল। বাইরের বাদলা এবং ক্লান্তিকর বৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় ছোটাছুটি করা কারও ভাল লাগছিল না, সন্ধ্যের দিকে ও বাড়ি থেকে মিহির এ বাড়িতে এসে বসল, ব্যবসার কাজকর্মের কথা-বার্তা হতে হতে এক সময় দেখা গেল, মিহির খুব আয়েসী হয়ে বসে গল্প জমিয়ে তুলেছেন। তারপর আস্তে আস্তে পবিত্রবাবু এবং চিত্তবাবু ও বাড়ি ঘুরে এ বাড়ি এসে হাজির হলেন।

পুরনো বাড়িতে গিরিজাপতির ঘর—আজকাল তিনি একাই বসেন। সুধাংশুকে ও-বাড়িতে যেতে হয়েছে, তার টেবিল খাতাপত্র সব ওখানে। বলতে কি, এ-বাড়িতে নামমাত্র অফিস ঘর, নতুন বাড়িতেই আসল অফিস। ওখানে মিহিরের বসার একটা আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে, একেবারে আলাদা; সন্ধ্যের পর তার বন্ধু বান্ধবরা আসে, ব্যবসার কাজ এবং গল্পগুজব দুইই চলে। তবু এ বাড়িতে সাবেকি দিনের মত, গিরিজাপতির টেবিল চেয়ার লোহার আলমারির এক পাশে মিহিরের একটা আসন ঠিক করা আছে॥ দিনান্তে এক আধবার এসে বসেন মিহির, কথাবার্তা বলেন, চলে যান।

আজ এই ঘরেই মিহির জমিয়ে বসলেন, ও-বাড়িতে যারা নিত্যকার সান্ধ্যসঙ্গী—তারা ওখানে এলে এ বাড়িতে আনিয়ে নিলেন। সন্ধ্যা ঘন হয়ে রাত হচ্ছে যত ততই যেন জমে আসছে গল্প গুজব। দামী কাপে সুন্দর করে চা এসেছে, লোক পাঠিয়ে হ্যারিসন রোডের হোটেল থেকে ফাউল কাটলেট আনানো হয়েছে, দামী সিগারেটের নতুন টিন।

গিরিজাপতি হোটেল ফোটেলের জিনিস খান না বলে মিহির ভাল মিষ্টি আনাতে চেয়েছিলেন, গিরিজাপতি আনতে দেন নি, বলেছেন, 'না না, এখন এক টুকরো কিছু মুখে দিলে রাত্রে খেতে পারব না, হজম না হয়ে বড্ড কষ্ট হবে সারা রাত।'

দ্বিতীয় দফার চা এল যখন তখন প্রায় সাড়ে সাত। এ-বাড়িতে প্রেসের ঘরে বড় একটা সাড়া শব্দ নেই। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, বারিপাতের সেই মৃদু শব্দ কখনও কখনও শ্রুত হয়, কখনও হয় না।

আপাতত প্রসঙ্গটা যুদ্ধে এসে থেমেছিল, ইওরোপের যুদ্ধ প্রসঙ্গে। পবিত্র-বাবু বললেন, 'এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ডিফিট অফ জার্মানী মিনস্ এণ্ড্ অফ জার্মানী।'

'এখনও বুঝতে চান—!' চিত্ত পবিত্রবাবুর দিকে তাকালেন। 'যুদ্ধ প্রায় শেষ ধরে নিতে পারেন। সেকেণ্ড ফ্রন্টের প্রেসার জার্মানীর পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়।' চিত্ত সিগারেট ধরালেন মিহিরের নতুন টিন টেনে নিয়ে।

'তোমার আবার বেশী বেশী আশা, চিত্তদা—' মিহির বলল, 'জার্মানীর এখন পর্যন্ত তেমন অবস্থা হয় নি।'

'হয় নি! ছ বছর ধরে একটা দেশ যুদ্ধ করছে—তার আর বাকি আছে কি?' চিত্ত পরিপূর্ণ অনাস্থার গলায় বললেন।

'সে ত সবাই করছে।'

'না, সবাই কোথায় করছে। আমেরিকা নামল কবছর ওয়ানে। রাশিয়া...'

'আরে বাবা, চার বছর ছ বছর একই হল।' মিহির বাধা দিলেন, 'তুমি যদি তাই বল তবে জাপানেরও চার বছর...। তা ছাড়া আজকাল যুদ্ধটা সময়ের নয়, মাথার—'

গিরিজাপতি সামনে থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে সহাস্য মুখে মিহিরদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'তোমরা দুজনে ফোরকাস্ট কর, আমি লিখে রাখি। এ তর্কের শেষ হবে না।'

চিত্ত হাসলেন। বললেন, 'গিরিজাদা, আমাদের মিহিরের অবস্থাটা সেই লক্ষীকান্তদার মতন। ফোরটিনের ওআর কবে থেমে গেল, লক্ষীকান্তদা আটাশ সালেও চেঁচাত, জার্মানী ঠিক জিতত হে যদি আর একটু মাথা খাটাতে পারত।'

'এই যুদ্ধটা মাথা খাটানো ছাড়া আর কিসের খেলা, আপনিই বলুন, গিরিজাদা।'

'গিরিজাদা আবার কি বলবে! তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছ না, জার্মানী প্রথম দিকে তার যা কিছু জমানো মজুত ক্ষমতা ছিল ব্যয় করেছে, জিতেছে। কিন্তু এই জেতার জন্যে তাকে কী পরিমাণটা দিতে হয়েছে? ম্যান পাওয়ার কমে গেছে, মালখানা কমে আসছে, ওদিকে তার এফিসিয়াণ্ট ওএল্ ট্রেনড সৈন্য সামন্ত ছিল তারা হয় মরেছে, না হয় প্রিজনার অফ ওয়ার। এখন ত নবিশ দিয়ে যুদ্ধ চালানো।' চিত্ত বললেন, 'বাচ্চা ছেলেগুলোকে ধরে আনছে, পাইকারী হারে কদিন ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। কি করে সামলে উঠতে পারবে ওরা? সব জিনিসেরই একটা সম্ভব অসম্ভব দেখবে ত।'

মিহির মন দিয়ে শুনছিলেন। চিত্ত থামতে বললেন, 'এই লোকসান কি ব্রিটেনের হয় নি, না আমেরিকার বা রাশিয়ার?'

'কথাটা ঠিক।' পবিত্রবাবু সায় দিলেন, 'রাশিয়ার অবস্থাও ভেতরে ভেতরে খুব একটা সুবিধের নয়।'

'জার্মানীর তুলনায় মোটেই ওদের অবস্থা অত খারাপ নয়।' চিত্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'জিনিসটা আপনারা কেউ ভাল করে ভেবে দেখছেন না। এখন জার্মানীর অবস্থা কি? ইটালী শেষ, রুমানিয়া হাঙ্গেরীও মর মর, ফিনল্যাণ্ডের কথা বাদ দাও—তাব াকদা এমন আছে আজ? উলটো দিকে দেখ, এক রাশিয়ার ওয়ার ফ্রন্ট ছাড়া অ্যালায়েড ফোর্সের তেমন কোনো

ক্ষতি হয় নি। আফ্রিকা আর ইটালীতে বাস্তবিক কতটা লোকসান হয়েছে বাপু তাদের ?

'যথেষ্ট।' মিহির মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু জার্মানীর তুলনায় নয়।'

'এসিয়ান ফ্রণ্টে ?'

'সে ক্ষতি সামলে নিয়ে এখন যে বাবা দশগুণ গতর আর বল বাড়িয়ে নিয়েছে।'

'কাগজে দেখছিলাম—' গিরিজাপতি বললেন, 'নর্থ ফ্রান্সে ব্রিটেন একাই পাঁচলাখের উপর সৈন্য নামিয়েছে। আমেরিকাও তার সমান সমান।'

'তবে ?' চিত্ত বললেন, 'এই হেভি প্রেসার জার্মানী ঠেকাবে কি করে ?'

'কি করে ঠেকাবে তা কি আমরা জানি, তবে ঠেকাচ্ছে।' মিহির জবাব দিলেন।

'আর ঠেকাচ্ছে!' চিত্ত যেন পরিহাস করলেন, 'একদিকে এই দশ বিশ লখের গুঁতো, অন্য দিকে রাশিয়ান ফ্রণ্টে বেদম মার খেতে খেতে আজ জার্মানী ঘরের ছেলের মত প্রায় ঘরে ফিরে আসছে।'

'যতই বল তুমি - আমি এখনও তোমার মতন মেনে নিতে পারছি না— জার্মানীর অবস্থা শেষ হয়ে এল,' মিহির বললেন, 'জাতটা বড় ডেসপ্যারেট ; মাথায় অসম্ভব বুদ্ধি।·· দেখছ না কোথ্‌ থেকে এক ফ্লাইং বোম্ব ছাড়তে শুরু করল। আরও কি না কি লুকিয়ে রেখেছে কে তার খবর রাখে।'

'হিটলার আগেই বলেছে তার হাতে সিক্রেট উইপেন আরও আছে।' পবিত্রবাবু সায় দিলেন।

'দেখা যাক্ কি আছে! কি বের করে হিটলার তার ঝুলি ঝেড়ে।' চিত্ত পা তুলে নিলেন, এলিয়ে বসলেন, ঠাট্টার গলায় বললেন, 'এ যেমন ফ্লাইং বোম্ব ছাড়ছে, ও তেমনি হিউম্যান টর্পেডো ছাড়ছে। সিক্রেট উইপেন যে একা জার্মানী বের করেছে তা ত আর নয়।'

গিরিজাপতি অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন। বললেন এবার, 'না মিহির, চিত্ত যা বলছে তা তুমি উড়িয়ে দিতে পার না। জার্মানীর অবস্থা খুবই খারাপ।

তিনদিক থেকে ঘিরে ধরেছে এরা—বলতে কি তিনটে ফ্রণ্টে লড়তে হচ্ছে এদের—পুব পশ্চিম দক্ষিণ—তিন দিক থেকে য়ুরোপের মাটিতে এই লড়াই সামলাবার ক্ষমতা জার্মানীর আছে বলে আমারও মনে হয় না। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া-!' মিহির পুনরাবৃত্তি করল।

'জার্মানীর ভেতরের অবস্থাও ভাল না। অ্যাণ্টি-হিটলার একটা ফোর্স মাথা তুলছে।'

'হিটলারের সামনে মাথা তুলবে। কি বলছেন আপনি!' মিহির সবিস্ময়ে বলল, 'না গিরিজাদা, এ আমায় কেউ বিশ্বাস করাতে পারবে না।'

'বিশ্বাস কি আমরাই করতে পেরেছি আগে। কিন্তু এখন অবস্থা দেখলে তাই মনে হয়। দেখছ না, ফ্রণ্ট থেকে আজ একে সরাচ্ছে কাল ওকে সরাচ্ছে —রাইখ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।...আজকের কাগজের খবরটা দেখেছ, রুনস্টেডকে সরিয়ে ক্লুগকে লাগানো হয়েছে।'

'তাতে কি? রুনস্টেড্ পারছে না বলেই সরানো হয়েছে।'

'জানি না। তবে রুনস্টেড্ খুব একটা প্রো-হি লার নয়।'

'রোমেলের সঙ্গে আদায় কাঁচকলায় রুনস্টেডের—' চিত্ত বললেন।

'গুজব সত্যি কি না কে জানে—তবে রুনস্টেড বুঝতে পেরেছে জার্মানীর হার আর আটকানো যাবে না, বুঝেই নরম্যাণ্ডির আগে একটা সন্ধি করার চেষ্টা করেছিল—এটা অসম্ভব নয়।'

'এ-সব পলিটিকাল ধাপ্পা আর ওআর ডিপার্টমেণ্টের প্রোপাগাণ্ডা আপনি বিশাস করেন, গিরিজাদা? সব বাজে। একেবারে বেসলেস।' মিহির বিন্দু মাত্র যে বিশ্বাস করেন না তার প্রমাণ দিতে চাইলেন।

পবিত্রবাবু বোধ হয় য়ুরোপের দীর্ঘ ভূখণ্ডের সমর সজ্জা তেমন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না। একটু ফাঁক পেতেই অন্য কথা পাড়লেন, 'আমাদের বর্মাটর্মায় কি রকম মনে হচ্ছে? এ-বেটারা রোজ কাগজে আর রেডিয়োয় আজ এত মারলাম, কাল অত ধরলাম, এটা দখল করলাম—এ-সব দিব্যি বলে যাচ্ছে। আসলে করছে কতটা—?'

প্রশ্নটা বোধ হয় এত আচমকা যে য়ুরোপ ডিঙিয়ে এশিয়ায় আসতে অন্যদের সময় লাগল।

'কিছু নিশ্চয় সত্যি।' চিত্ত বললেন, সময় পেয়ে সামলে নিয়েছে। এখন এদিকের অবস্থা দেখে বুঝছেন না কী রকম চালাও সাজ করছে।'

কথাটা কারও না বোঝবার নয়। তবু মিহির বললেন, 'ও যতই সাজ করুক, তোমার জার্মানী হারে হারুক, জাপানকে অত সহজে হারাতে হচ্ছে না।'

'সহজ কে কাকে পাবায় ভাই, তবে জাপানকে হঠতে হচ্ছে এটা ত সত্যি।' চিত্ত হাই তুললেন, আড়মোড়া ভাঙলেন, 'মনিপুর ছাড়তে হচ্ছে, খাস জাপানে আমেরিকা বোমা ফেলে এসেছে—এ-সব খুব সুলক্ষণ নয়।'

মিহির কিছু বললেন না। পবিত্রবাবু পানের দোনা থেকে একটা পান নিয়ে মুখে দিলেন, পকেট থেকে জরদা বের করে মুখে ফেললেন।

'আমাদের সুভাষবাবুর আর কোনো খবর শুনতে পাচ্ছি না কদিন—' চিত্ত নিজের থেকেই বললেন, বলে গিরিজাপতির দিকে তাকালেন।

পবিত্রবাবু এক মুখ পিচ নিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না, জানলার কাছে উঠে গিয়ে পিচ ফেলে এলেন। গিরিজাপতি নীরব। মিহিরও কোনো কথা বলছে না।

'আমি পরশু রেডিয়ো সায়গন ধরেছিলাম।' পবিত্রবাবু বললেন, 'আই এন এ এখন ইম্ফলের কাছাকাছি বসে আছে। ভীষণ বর্ষায় কিছু করতে পারছে না।'

চিত্ত দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, মিহির অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট পুড়িয়ে যাচ্ছেন, গিরিজাপতি নীরব। এই আকস্মিক নীরবতার কোনো অর্থ ধরা যায় না। অথচ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এই নীরবতা ক্লান্তির বিরক্তির অথবা নিস্পৃহতাজনিত নয়। প্রত্যেকেই মনে মনে কিছু ভাবছিল, বলছিল না যেন বলার অর্থ হয় না, মিহির যা বলবেন চিত্ত জানেন, চিত্তও যা বলবেন গিরিজাপতির অজানা নয়।

পবিত্রবাবু সম্ভবত এই নীরবতার কারণ বুঝতে পেরে মৃদু গলায় বললেন,

'প্রথম প্রথম বিশ্বাসই হত না। তারপর যখন বিশ্বাস হল তখন খুব একটা আশা হয়েছিল, বুঝলেন। এখন আবার ডিসাপয়েন্টেড্ হয়ে পড়ি—' পবিত্রবাবু সামান্য থেমে কী ভেবে নিলেন; 'তবে এও একটা গর্বের ব্যাপার। সুভাষবা এই অবস্থায় আর্মি গড়েছেন বিদেশের মাটিতে ভাবাই যায় না, মশাই। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বুঝেছে, গুলি বন্দুক হাতে পেলে আমরাও লড়তে পারি।'

চিত্তর কেন যেন কথাটা খুব পছন্দ হল না। বললেন, 'এটা নতুন কথা নয়। আমরা কি পারি আর না পারি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট অনেক আগেই তা জেনেছে পবিত্রবাবু। কি বলুন, গিরিজাদা?' গিরিজাপতির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে চিত্ত কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকলেন, তারপর বললেন, 'ছেলেবেলায় সেই যে পড়েছিলাম—ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন ইউ উইল সাকসিড এট্‌লাস্ট—রবার্ট ব্রুসের গল্প—, এখন বুড়ো বয়সে সেই 'ট্রাই' টাকে ভীষণ নেমকহারাম মনে হয়।'

গিরিজাপতি চিত্তর হৃদয়ের অন্তরতম আবেগ নিজেও অনুবভ করতে পারছিলেন। যত বয়েস হচ্ছে তত কি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছেন তিনি। কেমন লাগে আজকাল! কেমন যেন লাগে মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক কোনো উন্মাদনা অথবা আবেগের কথা শুনলে। আর চেষ্টা,···চিত্ত যেন ঠিকই বলেছে, চেষ্টাকে নেমকহারাম বলেই মনে হয় আজকাল।

অনেকটা সময় কেউ আর কোনো কথা বলল না। চুপচাপ। বাইরে বুঝি বৃষ্টি থেমে আছে, প্রেসের ঘরে কোনো শব্দ নেই। একটা ইঁদুর ঘরের কোথাও কাগজ কাটছিল বোধ হয়।

চিত্ত আবার হাই তুললেন, মিহিরের দিকে তাকিয়ে কেমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে বললেন, 'উঠবে নাকি?'

মিহির দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেললেন, 'হ্যাঁ, চলুন। ও-বাড়িতে কাজ আছে আপনার সঙ্গে।'

পবিত্রবাবুও চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন। 'গিরিজাবাবুর উঠতে বোধ হয় দেরী আছে?'

'না; আমিও উঠব এবার।' গিরিজাপতি ম্লান হেসে জবাব দিলেন।

'তুমি তা হলে এতটা রাত করলে কেন!' গিরিজাপতি অনুশোচনার স্বরে বললেন, বিব্রত বোধ করছিলেন, 'ট্রামে উঠে ঘুরে যাবে, না বাস ধরবে—ওই মোড থেকেই ওঠ। ···বরং একটা রিকশা করেই সোজা চলে যাও, আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে গেলে তোমার তাড়াতাড়ি হবে।'

'আপনি বরং একটা রিকশা নিন, আমি বাসে করে চলে যাব।'

'ওই ত একটা বাস আসছে···দেখ ত কত নম্বর ?' গিরিজাপতি ব্যস্ত গলায় বললেন।

শিয়ালদা মুখো আসছিল বাসটা। ঘাড়ে এসে না পড়া পর্যন্ত নম্বর দেখার উপায় নেই। ব্ল্যাক আউটের কানুন মেনে বাসের মাথার নম্বরটা যেন নেহাত পোড়া সলতের মতন জ্বলছে।

অবনী উঠল না। বাসটা বালিগঞ্জের। দু তিন জন যাত্রী নামিয়ে চলে গেল।

কাছাকাছি রিকশা দাঁড়িয়েছিল একটা। গিরিজাপতিকে তুলে দেবার জন্যে অবনী রিকশাটাকে ডাকল।

রিকশা কাছে আসছে, অবনী বলল, 'মিহিরবাবু আমায় নতুন বাড়িতে গিয়ে বসতে বলছিলেন।'

রিকশা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। গিরিজাপতি অবনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'আপনাকে কিছু বলেন নি ?'

'না'। গিরিজাপতি মাথা নাড়লেন। 'হঠাৎ নতুন বাড়িতে কেন ?'

'জানি না। কাজকর্ম দেখার সুবিধে হবে হয়ত।'

গিরিজাপতি কিছু বললেন না, রিকশায় চেপে বসলেন। আরও একটা বাস দেখা যাচ্ছিল দূরে। রিকশঅলাকে কিছু বলার আগে গিরিজাপতি অবনীকে বললেন, 'এবার তোমার বাসই আসছে বোধ হয়। ·· আচ্ছা, আমি চলি।' তারপর রিকশাঅলাকে বললেন, 'বউবাজার।'

ট্রাম লাইন টপকে রিকশাটা আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে সোজা চলল। রিকশা-অলা বুড়ো, ছুটতে পারছিল না। টেনে নিয়ে চলেছিল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের

সামনে একটা কিছু ঘটেছে, কিছু লোক, পুলিসও দেখা গেল। কি হয়েছে কে জানে! পকেটমারও হতে পারে, অ্যাকসিডেণ্টও হতে পারে। কলকাতা শহরের পথে ঘাটে না হয় এমন কিছু নেই আজকাল। গিরিজাপতি ভাববার চেষ্টা করলেন না। যুদ্ধের জারকে এই শহর এখন জারিত, তার বিচিত্র স্বাদ পদে পদে গ্রহণ করতে চায়।

অবনীর কথাই বার বার মনে পড়ছে। ছেলেটিকে আজ আরও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে চিনলেন গিরিজাপতি। বর্তমান কালের আর-এক প্রতিনিধি। কত নিরক্ত নিস্পৃহ শান্ত সহনশীল। অথচ হতাশাবাদী, ভাগ্যবাদী। জীবন এদের কাছে যেন নিরন্তর দুর্যোগের সমষ্টি, এবং এরা জেনে ফেলেছে এই দুর্যোগে দুঃখে কোনো রকমে বেঁচে থাকাই সার কথা।

ভাবতে ভাবতে আচমকা, একেবারে অকস্মাৎই গিরিজাপতির কথাটা মনে এল: অবনী যদি উমাকে বিয়ে করে। কথাটা মনে আসবার পর অল্পক্ষণ কেমন বিহ্বল হয়ে থাকলেন গিরিজাপতি, তারপর এই অপ্রত্যাশিত চিন্তা যেন অনুচিত বিবেচনা করে দূরে সরাবার চেষ্টা করলেন।

রিকশা একই গতিতে চলেছে। জ্যোৎস্নার ঘোলাটে ভাব সামান্য পরিষ্কার হয়েছে বোধ হয়। পিচের রাস্তা শ্যাওলার মতন দেখাচ্ছিল। ডান দিকে কয়েকটা কাঠগোলা। ফাগুয়ার গান শুরু হয়েছে। পথ প্রায় ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে আলোর শীর্ণ একটি ধারা ফুটপাতের কোলে বসে এই পথকে যেন জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল।

গিরিজাপতি আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষের চিন্তাটা মন থেকে সরাতে পারছিলেন না। উমার জন্যে এমন করে তিনি আগে ভাবতেন না, আজকাল যেমন ভাবেন। এক সময় যেন স্থির ছিল, উমাকে নিখিলের দায়িত্বে রেখে দিয়ে তিনি শান্তিতেই যেতে পারবেন। এখন মনে হয়, নিখিলের দায়িত্বে আর সব রাখা যায়, একমাত্র কর্তব্য ছাড়া। নিখিল স্নেহ প্রীতিতে কোনো দিন অকুলান হবে না হয়ত, কিন্তু বোনের প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে পারবে না।

বউবাজার স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়েছিল রিকশা। গিরিজাপতি ডানদিকে ঘুরতে বললেন। চোখে পড়ল, এক শব যাত্রা চলেছে।

'চলি গিরিজাদা—' চিত্ত বিদায় নিলেন, 'তা তুমি একদিন আমাদের অফিসে এস। কোথাও যাও না, চুপচাপ এই প্রেসের মধ্যে পড়ে আছ।'

'যাব একদিন সময় করে।' গিরিজাপতি সৌজন্যবশে বললেন।

'আর তোমার সময় হয়েছে!··ওই সময় খুঁজতে খুঁজতে একদিন দেখবে শেষ সময় হয়ে গেছে।' চিত্ত হাসলেন, 'আর কি সময় আছে গিরিজাদা আমাদের? বল?'

'আমার নেই।' গিরিজাপতি চিত্তর চোখে চোখে তাকালেন, 'তোমার আছে ভাই।'

চিত্ত মনে মনে খুশী হলেও মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদের ভাব করে হাসল একটু। তারপর ওরা চলে গেল—মিহির চিত্ত পবিত্রবাবু।

গিরিজাপতি বসে থাকলেন। এরা কোথায় গেল গিরিজাপতি জানেন। নতুন বাড়িতে মিহিরের ঘরে বসে এইবার এরা মদ খাবে, তাদের ব্যবসাপত্রের ফন্দি আঁটবে, টাকা ওভার ড্রাফট্, ব্যাঙ্কের টাকায় মফস্বলে জমি ধরা, কনট্রাক্ট ধরা—আরও কত কি ধরার জাল বুনবে।

গিরিজাপতির ধারণা আজকাল ক্রমশই বদলে আসছে। এই প্রেসবাড়ির নতুন নতুন ব্যবস্থা, একে একে সব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, একটা ফ্ল্যাট মেশিন আর বাজ্যের বুক কম্পোজিং এখানে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে—নতুন বাড়িতে সরকারী ছাপাছাপির কাজ আর মেশিনপত্র কাগজগুদোম তুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা যেন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। এখান থেকে সুধাংশুকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, অবনীকেও। একেবারে হালে এক আধ-বুড়ো এসেছে এ-বাড়িতে খুচরো কাজগুলো করে, একেবারে অপদার্থ। গিরিজাপতির এখন কর্তৃত্ব বলতে কিছু নেই, পুরোনো বাড়ি আগলে বসে থাকাই যেন তাঁর কাজ। অথচ আজও নামে তিনি ম্যানেজার। প্রয়োজনে কিছু সইপত্র করতে হয়। মিহির যেন গিরিজাপতিকে এক রকম পালন করে যাচ্ছে।

নতুন বাড়িতে কি হয়—ক্রমে ক্রমে কানে আসছে গিরিজাপতির। কাগজপত্রের চোরা ব্যবসা, সরকারী ছাপার কাজের নকল বিলি-ব্যবস্থা—এ-সবও হচ্ছে; আবার ওই নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পবিত্রবাবু এবং

সেক্রেটারী চিত্ত মিহির সুধাংশুর সঙ্গে মিলেমিশে যে লিমিটেড কোম্পানী খুলেছে ট্রেডিং করপোরেশান নাম দিয়ে—সেই কোম্পানী হরেক রকম ব্যবসা করছে। গিরিজাপতি শুনেছেন, কাপড় জমি কিছু মেশিনারী আরও নানান জিনিসের ব্যবসা চলছে। সব ত ট্রেড্। টাকার ভাবনা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের।

এখানে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। গিরিজাপতি অনুভব করতে পারছেন, এইবার তাকে চলে যেতে হবে মিহিরের প্রেস থেকে। না, মিহির তাড়িয়ে দেবে না। তিনি নিজেই যাবেন। তাঁর যাওয়া উচিত। সারা জীবন তিনি সৎ ছিলেন, সৎ থাকতে চেয়েছেন, আজ এই অসৎ আবহাওয়ার মধ্যে অন্ন সংগ্রহ তাঁকে পীড়া দেয়।

মুশকিল এই যে, ট্রেডিং করপোরেশান কি করছে না করছে তার অজুহাত তুলে তিনি চাকরিটা ছাড়তে পারেন না। কেননা তার সঙ্গে গিরিজাপতির কোনোরকম সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রেসের দুর্নীতির প্রমাণ পেলে তিনি অনায়াসে মিহিরকে বলতে পারেন, তোমার দুর্নীতির সঙ্গে আমায় জড়িয়ো না। আমি যাই, যা খুশি তোমার কর।

অথচ মিহির এমন চালাকি করেছে যে, প্রেসে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানবার সম্ভাবনা গিরিজাপতির একেবারে রাখে নি। এই ঘরে খাতা-পত্র অর্ডার চালান ডেলিভারী অ্যাকাউন্ট কিছু আর থাকে না। শুধু পুতুলের মতন বসে থাকেন গিরিজাপতি। আর কোন বই কতটা কম্পোজ হল, ছাপা হল তার খোঁজ নেন। তা ছাড়া আর কি বা তাঁর কাজ? মনে হয় মিহির যেন আস্তে আস্তে তাকে অসাড় পঙ্গু করে দিয়েছে।

বড় অশান্তির দিন যাচ্ছে। ভাল লাগে না, সুখ পান না, তৃপ্তি নেই আর।

গিরিজাপতি উঠে পড়লেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, এ এক অদ্ভুত পৃথিবীতে তিনি বসে আছেন। সংসারের চেহারাটা কেমন বদলে গেছে তাই দেখছেন। মিহির আর চিত্তর মতন মানুষ আজ অর্থের লোভে লালায়িত। এক সময় এরা দেশের কাজে জীবন পণ করেছিল, ত্যাগ করেছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সয়েছে, আদর্শের জন্য মুখের রক্ত তুলেছে। অথচ আজ এরা পাকা ব্যাবসাদার, অর্থ-

গৃধ্র, স্বার্থপর, ঠগ। চোর সাধু হয়—এ ছিল পূর্বের প্রবচন, এখনকার দিনে সাধু চোর হয়।

এই সব মানুষ যে কি করে এতক্ষণ সুভাষ বোস আর দেশের পাঁচ রকম অবস্থার কথা নির্বিবাদে বলে গেল—গিরিজাপতি বুঝতে পারছিলেন না। কি যায় আসে এদের দেশের ভাল মন্দে? যুদ্ধ থামুক না থামুক কি লাভ ওদের? বরং যুদ্ধ যতদিন চলে তত সুবিধে ওদের—তত মঙ্গল। যুদ্ধ না থাকলে মিহির বা চিত্ত আজ ফাউল শেষ করে মদের বোতল ধরবার জন্যে ও-বাড়ি যেত না।

প্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকেই একটু শাসন করলেন গিরিজাপতি। না, এটা রীতিমত অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখে না দেখে তিনি মিহিরদের ওপর এমনভাবে রায় দিতে পারেন না। ব্যবসা করে বলেই তারা অসৎ হবে এমন কোনো অর্থ নেই। লাভ জমছে বলেই ওরা জোচ্চোর হবে এ-কথা বলা অনুচিত।

গিরিজাপতিকে অপেক্ষা করতে হবে এবং শ্রুতি ও গুজবের মধ্যে কান পেতে দিয়ে একেবারে অভ্রান্ত ধারণা গড়ে নেওয়া উচিত না।

রাস্তায় নেমে ছাতা খুললেন গিরিজাপতি, ইলশেগুঁড়ির মতন বৃষ্টি পড়ছিল।

বারো

আজ রবিবার। সুধা অনেকটা বেলা করে বিছানা ছেড়ে উঠল। আজকাল এই রকম হয়, শেষ রাত থেকে ঘুম সমস্ত শরীর গ্রাস করে রাখে, চেতনা যেন কোনো নেশায় অবশ হয়ে থাকে। রোদ উঠে যায়, রত্নময়ী গা নেড়ে দেন, আরতি দফায় দফায় ডেকে দিয়ে যায়, সুধার ঘুম ভাঙলেও আর উঠতে ইচ্ছে করে না। চোখ মেলে সকালের ফরসাটুকু দেখার পরও মনে হয়, আরও খানিক শুয়ে থাকি, এখনও ঘুম মেটেনি। শরীরে অবসাদ, মুখে এক বিস্বাদ আর জ্বোরো গন্ধ, চোখে জ্বালা, ফাঁপা ঝিমঝিমে মাথা নিয়ে সুধা যখন শেষ পর্যন্ত ওঠে, তখন কলের জল যাই-যাই করছে। হাতের মাপা সময়টুকু নিয়ে সুধাকে তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়, চোখে দু ঝাপটা জল দিয়ে একটু চা গলায় ঢেলে চুল খুলতে বসে, আর বসতে না বসতে উঠতে হয় কলঘরের জামা কাপড় নিয়ে। দু গ্রাস ভাত মুখে তোলবারও সময় হয় না মাঝে মাঝে, ঘড়িতে সাড়ে ন-টা বেজে যায়, কোনোরকমে অফিসের সাজটুকু সেরে ছুটতে হয়, ছোটার সময় সুধা স্পষ্ট অনুভব করতে পারে তার পা কাঁপছে, সমস্ত শরীর গ্লানিতে মাখামাখি হয়ে আছে, তার ঘুম পাচ্ছে। নিজেকে তখন জোর করে টেনে নিয়ে যেতে হয়। সুধা অনুভব করেছে, তার প্রায়ই আজকাল মনে হয়, সে-সুধা অফিসের পথ ধরেছে সেই সুধা এবং সে এক নয়, যেন কোনো অনিচ্ছুক, অক্ষম, কাতর, ক্লান্ত ও বীতস্পৃহ একটি অন্য মানুষকে ঠেলে ঠেলে ধাক্কা মেরে টেনে হিঁচড়ে শাসন এবং তাড়না করতে করতে সে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।

এতখানি অনিচ্ছা, ক্লান্তি, ক্ষোভ ও বীতস্পৃহা তার আগে ছিল না। এক সময়, যখন চাকরির জন্যে প্রথমে পা দিয়েছিল তখন তার আনন্দ ছিল; সংসারকে সে প্রতিপালন করবে—এই মোহ এবং কর্তব্যজ্ঞান তাকে এক ধরনের সুখ দিত। পরে এটা ক্লান্তিকর হলেও এত অসহ সর্বভুক বলে মনে

হয় নি। এখন সুধা তার জীবনের এই অপচয়কে ঘৃণা করে, তার সমস্ত মন তিক্ত বিরক্ত ক্ষুব্ধ। এখন তার প্রায় নিত্যই মনে হয়, এই অপচয় অর্থহীন। সংসারের আর ক'জন মানুষের জন্যে সে তিলে তিলে মরবে, সকালে দু'দণ্ড শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না, অর্ধেক দিন স্নান হবে না, দু-মুঠো অন্ন মুখে তুলতে পারবে না, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি অপনোদন নেই, লাগাম আঁটা বেত খাওয়া ঘোড়ার মতন শুধু ছুটবে—অন্যের ভার এবং বোঝা হয়ে শুধু ছুটে মরবে—এতে কি লাভ ? কেন সে এই বোঝা বইবে ? কেন ?

নিজের সুখ এবং শান্তির চিন্তা সুধা আর করে না, করে লাভ নেই, কিন্তু নিজের স্বস্তি এবং একটু আরাম, সামান্য ক্লেশ লাঘবের কথা তার এখন চিন্তা না করে উপায় নেই। আমি আর পারছি না, মা ; আমার শরীরে আর কুলোচ্ছে না। কী দুর্বল ক্লান্ত আমি তোমরা বুঝবে না। রুগ্ন ঘোড়ার মতন আমি ধুঁকছি, আমার আর পা বাড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু তোমরা আমায় দেখছ না।

এই সংসার এইরকম। কেউ দেখে না। কেউ দেখবে না, তোমার জীবন থেকে যতটা ক্ষয় করার শক্তি আছে তারও কত বেশী তুমি ব্যয় করেছ। তারা বিবেচনা করবে না, এই ব্যয়ের মাত্রা আর বাড়ালে তুমি মরবে।

সুধার ধারণা, সংসার তার এই নিঃশেষ হবার ব্যাপারটায় গা দিচ্ছে না। মা দেখছে না, সুধার শ্বাস ফুরিয়ে এসেছে, সে আর পারছে না, পারবে না।

এক-একদিন হতশ্বাস এবং হৃতশ্বাস হয়ে সুধার ইচ্ছে করে মা-র পা জড়িয়ে ধরে বলবে, আমায় এবার ছেড়ে দাও মা, দয়া করে ছেড়ে দাও, আমি আর পারছি না। আমি মরতে বসেছি।

সুধা জানে, এই সব কান্নাকাটি হাহাকার গলা ফাটিয়ে করা যায় না ; করে লাভ নেই। কেউ তাকে ছাড়বে না, ছাড়তেও দেবে না। বস্তুত সে এক পারিবারিক দায় এবং দায়িত্বের বন্ধনে দৃঢ় করে বাঁধা আছে। যদি এই দায় ও দায়িত্ব সে ভুলতে পারত, অস্বীকার করতে জানত, এই ভীষণ বোঝা না বয়ে সে বেঁচে যেতে পারত। গায়ে না মাখলে বাঁচা যায় বই কি। অনেকে এমন করে বেঁচে থাকে, সুধা দেখেছে, অফিসের নীরেনবাবু যেমন। ধারে

ডোবানো মাথা নিয়েও ভদ্রলোক সিল্কের জামা চকচকে পামশু মিহি ধুতি পরে ঘুরে বেড়ান। সুধা শুনেছে, মাইনের একটা পয়সাও সংসারে যায় না ওঁর, রেসের মাঠ মদ আর জুয়োয় উড়ে যায়। অথচ বাড়িতে স্ত্রী এবং বাচ্চা-কাচ্চা মিলে ছ'সাত জন লোক। মাইনেও খুব কম পান না, স্টোরের লোক বলে কিছু উপরিও আছে। অফিসের অনেকেই ধিক্কার দেয় নীরেনবাবুকে. শ্বশুর নাকি একাধিকবার চন্দ্রসাহেবের কাছে চিঠি লিখেছে অভিযোগ জানিয়ে। নীরেনবাবুর গ্রাহ্য নেই, কোনো কিছুই কানে তোলেন না। বরং বেশ রসিকতা করেই বলেন, আমি ত মশাই চন্দন কাঠ নই যে গায়ের গন্ধ বিতরণ করে অন্যকে সুখ দেব। নিজের সুখ আরাম আগে, নয়ত মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন, কুকুর হয়ে জন্মে অন্যের বেগার খাটলেই ত হত।

এই জগতের এটাই নিয়ম। গ্রাহ্য না করলে, গ্রহণ না করলে তোমার কোনো কিছুতেই বন্ধন নেই। অনুভব করো না, ভেব না, তোমার বোঝা বয়ে বেড়ানোর বালাই থাকবে না।

এরকম অমানুষ স্বার্থপর হতে সুধা পারে নি, চায়ও নি কখনো। শুধু কি এই জন্যে ওরা ধরে নিয়েছে, সুধার সামান্য স্বার্থও কেউ দেখবে না। মা-র কি দেখা উচিত নয়, সুধা এখন বিকল যন্ত্রের মতন ; স্বভাবে ও শক্তিতে সে চলছে না, তাকে জোর করে চালানো হচ্ছে। বাসু কি বুঝবে না, দিদি আর পারছে না, দিদি মরছে। আরতিও বা কেন এই দুর্দিনের সংসারে মা-র আঁচল ধরে ধরে দিন কাটাবে ? নৌকো ফুটো হয়ে ভরা নৌকোয় জল যখন উঠেছে তখন আর সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, একা সুধা জল ছেঁচে ফেলবে এ হয় না, এমন চরম স্বার্থপরতা সুধা সহ্য করতে পারবে না।

সুধা চাইত, আজকের সংসারে ওরা কেউ আর যখন ছেলেমানুষ নয় তখন এই সর্বগ্রাস বিপদটা সকলে অনুভব করুক, এবং বিবেচনা করে দেখুক সুধা সাধ্যাতীত করেছে। এই জোয়াল তার কাঁধ থেকে এবার তুলে না নিলে সে মরবে।

সুধা যা চায় তা হচ্ছে না হবেও না। কেউ দেখছে না তারা যাকে প্রাণপণ শুষে নিচ্ছে তার অবস্থা কেমন। সুধার এই গভীর ক্লান্তি, অবসাদ,

অক্ষমতা, শরীর এবং মনের ভোগের দিকটা ওদের দেখা উচিত। তোমাদের সমবেদনা সহানুভূতি যদি না থাকে তবে আমারই বা কোন দায়!

এই অকৃতজ্ঞতা অবিবেচনা স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যে সংসারের ওপর সুধা আজ বীতরাগ, ক্ষুব্ধ। তার ঘৃণা প্রবল হয়ে উঠেছে। বস্তুত, আজ তাই আত্মব্যয়কে তার অপচয় ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। নিরানন্দ জীবনপাত তাকে এক শূন্যতার যন্ত্রণায় কাতর করে রেখেছে। নিজেকে এখন সুধার সর্বক্ষণ পীড়িত ও পরিত্যক্ত মনে হয়।

রবিবার বলে সুধা আজ অনেকটা বেলা করে উঠল। ঘুম ভাঙার পরও সে চোখ বুজে অনেকক্ষণ শুয়েছিল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। অন্যদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়তে হয়। আজকের সময় মাপা নয়—কেউ তার চোখের সামনে ছক করা ফর্দ ফেলে দেয় নি, ঘড়ির কাঁটার ঘর হিসেব না করেও সুধা চুপ করে শুয়ে থাকতে পারল।

গভীর আলস্য তাকে তখনও শিথিল করে রেখেছে, অবসাদ যেন সামান্য জ্বরের বেদনার মতন সমস্ত শরীরে মাখানো। ভিজে চুলে ঘুমিয়ে পড়লে যেমন মাথাটা ভার হয়ে ওঠে সেই রকম ভার লাগছিল। এ-সব নিত্যকার লক্ষণ। সয়ে গেছে। সুধা নিজের গা নিজেই একবার পরখ করে নিয়ে উঠে পড়ল। না, জ্বর নেই।

জানলার বাইরে বেশ রোদ। বর্ষার মেঘ টুটে আলো হয়ে আছে। একটানা ঝিপঝিপে বাদলার পর এই পরিষ্কার রোদ এবং আলো দেখে সুধার মন সামান্য প্রসন্ন হল।

তক্তপোশের ধারে বসে সুধা জানলা দিয়ে সামনের বাড়ির গা এবং রোদের আভা দেখতে লাগল। নীচের গলি দিয়ে রিকশা যাচ্ছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদ কি আলসের বসে কাক ডাকছে। পাড়াটা সকালের মৃদু কলরবে পূর্ণ। হালদারবাড়ির তেতলা ছাদ এখান থেকে দেখা যায় না, বিছানার মাথার দিকে সরে গিয়ে কোণাকুণি তাকালে একটু আকাশ

দেখা যায়। সুধার মনে হল, আকাশটা বোধ হয় আজ নীল হয়ে গেছে। বর্ষার এবার যাওয়ার সময়।

অগোছালো চুল কপাল এবং গাল থেকে দু হাতে মুছে সরিয়ে ঘুমের অপরিচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে একটু পরিষ্কার করে নিল সুধা। উঠে দাঁড়াল। এলোমেলো আলগা শাড়ি গুছিয়ে গায়ে আঁচল টেনে একটু দাঁড়িয়ে থাকল। বিছানাটা কী নোংরা, চাদর চিট, কয়েকটা দাগ ফুটে আছে। বালিশের ওয়াড় ছেঁড়া, এক পাশের মুখ দিয়ে তুলো বেরিয়ে গেছে।

নিজের বিছানা তোলা সুধা কবে ছেড়ে দিয়েছে। নীচে মাটিতে শোবার সময় আরতিই বিছানা তুলত। ইদানীং, সে আর মাটিতে শোয় না, মা-র তক্তপোশে শোয়। মা নীচে বিছানা করে নেয়। সেই বিছানা কখন তুলে গোছগাছ করে রেখে দিয়েছে আরতি। মেঝেটা পরিষ্কার।

সুধা কি ভেবে নিজের বিছানা নিজেই তুলতে বসল। এ সবই আজ সে রোদে দেবে। টানা বর্ষার মধ্যে রোদ খুব অল্পই উঠেছে, রাত্রে শোবার সময় সব কেমন স্যাঁত স্যাঁত করে।

বাইরে রত্নময়ী এবং আরতি কথা বলছিলেন। ওদের কথা সুধার কানে যাচ্ছিল। বাসুর কোনো সাড়া নেই। এ-সময় তার সাড়া পাওয়া যায় না। সুধার মনে হল, আজকাল সে বাসুকে খুব কমই দেখে, কদাচিৎ তার গলা শুনতে পায়। রাত্রে দুই ভাই বোনে কোনো কোনো দিন হঠাৎ চোখাচুখি হয়ে যায়। দেখা হলে বাসু সরাসরি দিদিকে এড়িয়ে যায়; সুধাও কেমন এক তিক্ত বিরক্তি বোধ করে আরও গম্ভীর নির্বাক হয়ে থাকে। প্রয়োজনে দু একটা কথা যাও বলে তাও বাসুকে নয়; রত্নময়ীকে, যদিও বাসু তার লক্ষ্য।

বিছানা থেকে চাদর এবং বালিশ সরিয়ে মাটিতে ফেলে দিল সুধা। নীচের গলিতে একটা ভিখিরি গুপিযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে। লোকটার গলা খুব সরু, একটু চড়ায় উঠলেই চিরে যাচ্ছে। বোধ হয় সুধাদের সদরে এসে দাঁড়িয়েছে।

তোশকটা গুটিয়ে নেবার সময় গানের টুকরো টাকরা দু একটা কথা কানে

এল। কান পেতে সুধা পুরো একটা কলি শোনবার চেষ্টা করল একটু, বুঝতে পারল না। তার মনে হল, ঝিঁঝিঁটা খুব সাধাসিধে একটা গান গাইছে, ভক্তির গান।

টেনে হিঁচড়ে তোশক নিয়ে কোনো রকমে সুধা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। হালকা তোশক, কিন্তু বেয়াড়াভাবে ধরার জন্যে বয়ে আনতে অসুবিধেই হচ্ছিল।

বাইরে রত্নময়ী এবং আরতি খুব হালকা সুরে কথা বলছে।

'রান্নাঘরেই ত রেখেছি। চোখের মাথা তুমি একেবারে খেয়েছ।' আরতির গলা।

'খেয়েছি না তোরা খাইয়েছিস—' রত্নময়ীর ঘরোয়া গলা।

'তোমার চোখে চালসে ধরে যাচ্ছে, একটা চশমা নিয়ে নাও—' আরতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি একটা কাজ করতে করতে বলছিল। সুধা আরতিকে দেখতে পেল না। রান্নাঘর দেখা যাচ্ছিল।

'তুই কিনে দিস, মুরোদ দেখব।' রত্নময়ী বললেন। একটু পরে, 'কী রাখার ছিরি তোর। নে এসে বের করে দিয়ে যা।'

সুধা তোশক নিয়ে বাইরে এসেছে। উঠোনভরা রোদ। আরতিকে দেখা গেল। বারান্দা ঝাঁট দিয়ে একপাশে জঞ্জাল জড় করছে। তোশকটাকে প্রায় লুটোতে লুটোতে কোনোরকমে আলসের কাছে নিয়ে গিয়ে সুধা পাঁচিলের ওপর ফেলে দিল। এইটুকুতেই সে ক্লান্ত। এই ক্লান্তি সুধা অনুভব করতে পারল।

আকাশ আজ বেশ নীল। একপাশে একখণ্ড মেঘ। বেলা যে যথেষ্ট, বাইরের রোদ থেকে সুধা বুঝতে পারল। দু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে হাঁপ ছেড়ে তোশকটা পাঁচিলের গায়ে টেনেটুনে মেলে দিল। হালদারবাড়ির ছাদে কটা মিস্ত্রী কাজ করছে; কাঠের খড়খড়ি, টালি ইটের গাঁথনি চোখে পড়ল সুধার। নতুন বউয়ের বসার ঘর তৈরী হচ্ছে বোধ হয়।

আবার ঘরে ফিরল সুধা। তক্তপোশের ওপর একটা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর, শতরঞ্চি পড়ে আছে। সমস্ত আজ সে রোদে দেবে। কাঁথাটা তুলতেই

শতরঞ্জি এবং মাদুরের যে ছিন্নদশা দেখল সুধা তাতে তার ঘেন্না হল। শতরঞ্চিটার রঙ আর বোঝবার উপায় নেই ; প্রায় তেরপলের রঙের মতন হয়ে গেছে। মাদুরটা কদাকার দেখাচ্ছিল ; বুনুনি ছিঁড়ে কাঠি ভেঙে ফাঁক হয়ে হয়ে সে এক বিশ্রী চেহারা। ফেলে দেওয়া শ্মশানের বিছানার মতন। এই বিছানায় সুধা শুয়ে থাকে—ভাবতেই কেমন ঘিন ঘিন করে উঠল সর্বাঙ্গ।

নোংরা ময়লা আবর্জনা যেমন করে ফেলে দেয় মানুষ, সেই ভাবে অসহিষ্ণু বিরক্ত ঘৃণিত মুখ করে সুধা শতরঞ্জি এবং মাদুর টেনে নিয়ে উঠোনে রোদে ফেলল। তারপর একে একে কাঁথা, বালিশ।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আরতি বাসি চুল খুলতে খুলতে সব দেখছিল। দিদি নিজের হাতে সংসারের কোনো কুটো কাটে না আজকাল। আজ ঘুম থেকে উঠেই হঠাৎ বিছানাপত্র তুলছে রোদে দিচ্ছে দেখে আরতি শঙ্কিত হয়েছিল। আজকের সকাল বুঝি এই বিছানা পর্ব দিয়ে শুরু হবে। একবার ভেবেছিল, ঘরে গিয়ে বাকি বিছানাগুলো তুলে আনে ; তাতে দোষের ভার একটু কমলেও কমতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক আর আরতি বিছানা তুলতে গেল না ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিকে লক্ষ করতে লাগল। দিদির মন মেজাজ বোঝা ভার ; এগিয়ে সাহায্য করতে গিয়েই হয়ত তাড়া খাবে, আর সেই যে শুরু হয়ে যাবে তারপর আরতির আর তিষ্ঠোতে হবে না। তার চেয়ে যা হচ্ছে হোক।

'মা—'আরতি রান্নাঘরের দিকে তাকাল, 'দিদি উঠেছে।' সুধা বারান্দায় নেই দেখে আরতি বলল।

রত্নময়ী উনুনে খানকয়েক বাসি রুটি সেঁকে নিচ্ছিলেন। এক রাশ পিঁপড়ে ধরেছে রুটিতে। আগুনে তেমন জোর নেই, তবু কালো পিঁপড়েগুলো ঝরে ঝরে পড়ছিল, পুড়ছিল, পালাচ্ছিল ; রুটিগুলো শক্ত হয়ে আসছিল। এই রুটি আজ ভাতের সঙ্গে আরতি ও রত্নময়ীকে খেতে হবে। চালের টান আছে।

'দিদি বিছানাপত্র রোদে দিল সব।' আরতি যেন রত্নময়ীকে সাবধান করে দিচ্ছে এমন গলা করে বলল।

হাতের খড়খড়ে রুটিগুলো বাটির মধ্যে রেখে দিয়ে রত্নময়ী ছোট মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'হঠাৎ—?'

'কি জানি।' আরতি নীচু গলায় বলল, বলার সময় ঠোঁট ওল্টালো।

চায়ের কালো তোবড়ানো কেটলিটা উনুনে বসিয়ে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন রত্নময়ী।

সুধা ঘর থেকে বাইরে এল। বারান্দার এক দিকে জানলার কাছে কাঠের তাক; সংসারের কয়েকটা টুকটাক জিনিস রাখা হয়েছে—দাঁতের মাজন সাবান তেলের শিশি। সামান্য মাজন হাতে নিয়ে সুধা উঠোনে এসে দাঁড়াল। কয়েকটা চড়ুই সামনের বাড়ির পাঁচিলের মাথায় বসানো ফুলের টবের মাটি খুঁটছিল আর ডাকছিল।

'মা—' সুধা রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল, রত্নময়ীকে দেখল, 'সোডা সাবান কিছু আছে বাড়িতে?'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রত্নময়ী যেন সুধার মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করলেন। 'সাবান এক চিলতে আছে, সোডা নেই।'

'তুই-ই একটু আনিয়ে নাও। চাদর ওয়াড় জামাটামা কাচতে হবে আমার।'

রত্নময়ী কোনো জবাব দিলেন না। সুধা রান্নাঘরের পাশ থেকে সরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সুধা নীচে নেমে গেলে আরতি তার চুলের রাশ কাঁধের পাশ দিয়ে বুকের ওপর টেনে আঙুল দিয়ে আঁচড়াল একটু। রত্নময়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ওই মাটির ভাঁড়টার মধ্যে একটু সোডা ছিল।'

'পরশু দিন মাথা ঘষলি না তুই।' রত্নময়ী কথা বলতে বলতে চায়ের কেটলিটা নামিয়ে নিলেন। 'তোর দাদাও আজ জামা কাচার ফরমাশ করে গেছে।'

বুকের ওপর চুলের গুচ্ছ মুঠো করে একটু দেখল আরতি। দেখার সময় নিজের বুকের পুষ্টতাও অনুভব করল। আজকাল প্রায়ই আরতি নিজের শরীর সজ্ঞানে দেখে। দেখতে ভাল লাগে।

'মুখ বাড়িয়ে তোর দাদাকে একটু দেখ না রে—' রত্নময়ী বললেন।

'কোথায় দেখব—?'

'খানিক আগে যে গলিতে গলা পাচ্ছিলাম।'

'সে কখন—!' আরতি গলার স্বরে দীর্ঘতার টান দিল, 'এখনও কি আর দাঁড়িয়ে আছে।' বুক থেকে চুলগুলো পিছনে ফেলে দিল আরতি। গলা মুখ উঁচু করে হাতের ঝাপটা দিয়ে পিঠে ছড়িয়ে নিল। মাটিতে পায়ের কাছে তার ফিতে আর গোনাগুনতি চারটে কাঁটা পড়েছিল। কাঁটাগুলো তুলে ফিতেয় জড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'পয়সা দাও আমি আনিয়ে নিচ্ছি।' আনিয়ে নিচ্ছি কথাটা অবশ্য ঠিক নয়, ওটা বলার ধরন, কানে লাগে না।

আরতি নিজে গিয়েই নিয়ে আসবে। এই গলিতে দু চারটে বাড়ির পর সেনদের বাড়ির নীচে একটা ছোট্ট মুদিখানার দোকান হয়েছে নতুন, হিন্দুস্থানীর দোকান, দোকানে এক বুড়ো বসে, বুড়োর একটা মেয়েও আছে আরতিদের প্রায় সমবয়সী—সামান্য ছোট, নাম গঙ্গা। ঠেকায় পড়লে এই দোকানটায় আরতিকে যেতে হয়। গলির মধ্যেটা একবার সতর্ক চোখে দেখে চট্ করে এটা ওটা এনে দেয় আরতি। এক সময় এ-সব নিষিদ্ধ গিয়েছিল, এখন কেউ তেমন আপত্তির চোখ দিয়ে দেখে না।

রত্নময়ী মেয়ের কথার কোনো জবাব দিলেন না। বাসুকে পাওয়া গেলে ভাল হত। সোডা সাবান তাকে দিয়ে আনাতে পারতেন, আট দশ গণ্ডা পয়সা এখন আর বের করে দিতে হত না তাঁকে।

আরতি রান্নাঘরের দরজার কাছে গা বাড়িয়ে সামান্য ঝুঁকলো। 'পয়সা দেবে না?'

রত্নময়ী বিরক্ত হলেন। 'অত তাড়াহুড়োর কি আছে, ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছে না কি সব, মুখের কথা খসালাম আর সঙ্গে সঙ্গে কাজটা হয়ে গেল।...এখন আমি সেদ্ধ বসাচ্ছি না, দেরী আছে।'

মার এই আকস্মিক বিরক্তির কারণ আরতি বুঝতে পারল। আজকাল তার অনেক কিছুই আর বোধের অগম্য নয়। বরং, তার বোধ বুদ্ধি অনেক বেশী প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রত্যহ এই সংসারকে সে দেখছে, এই সংসারের

মানুষদের মনোভাব তার জানা হয়ে যাচ্ছে। আরতির সুবিধে এই, সে রত্নময়ীর পাশে ছায়ার মতন সারাদিন রয়েছে; রত্নময়ীর মনের দুঃখ হতাশা রাগ বিরাগ দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ সে শুনছে, অনুভব করছে। বাসুর যাবতীয় মনের কথা এ বাড়িতে একমাত্র আরতিই জানতে পায়। বাসু বলে। বলে, কারণ তার দ্বিতীয় কোনো শ্রোতা নেই বাড়িতে। উমার সঙ্গে এই নিয়ে কথা হলে আরতি বলে, আমার হয়েছে যত জ্বালা বুঝলে, উমাদি।

'মা—' আরতি দরজায় হাত রেখে রান্নাঘরের মধ্যে আরও একটু ঝুঁকে পড়ল, 'বাকিতে নিয়ে আসব?'

রত্নময়ী চোখ তুলে তাকালেন।

'দাদার নাম করলে দিয়ে দেবে' আরতি বলল। মনে হল, এই সংবাদটা যেন খুব গোপন কিছু, জানানো নিষেধ ছিল, তবু না জানিয়ে আরতি পারল না।

'ওকে ওরা বাকি দেয়?' অবাক হলেন রত্নময়ী।

'দেয়।'

'কি দেখে দেয়! তারপর একদিন বাড়ি এসে তাগাদা করবে ত!'

'না—' আরতি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। তার মনে হল, সে একটু ভুল করে ফেলেছে, এই খবরটা না জানানোই উচিত ছিল, 'দাদার পয়সা দাদা মিটিয়ে দেয়।'

রত্নময়ী চুপ করে থাকলেন। সিঁড়িতে সুধার পায়ের শব্দ, সুধা উঠে আসছে।

আরতি রান্নাঘরের মধ্যে থেকে মাথা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকটা দেখে নিল একবার। নীচু গলায় বলল, 'নিয়ে আসি, মা; নয়ত এই নিয়ে সারাদিন এখন অশান্তি হবে।'

'আনো—' বিরস মুখে জবাব দিলেন রত্নময়ী। একটু থেমে বললেন, 'এই এক রাশ সেদ্ধ নিয়ে আমায় বসতে হবে। বাই উঠল কি সংসার শুদ্ধ রাজ্যের জিনিস বাইরে এনে ফেলে দিলেন।'

সুধা ওপরে উঠে এসেছিল। আরতি আড়চোখে দিদিকে দেখে নিল।

আঁচলের প্রান্তে ভিজে গাল-গলা কানের পাশগুলো মুছতে মুছতে সুধা রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর চোখের পাতা সামান্য ফুলে রয়েছে, গালের ওপরও কেমন ফোলা ফোলা ভাব। দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট অবসাদ ও নিস্পৃহতা।

ভাঙা বেতের মোড়াটা আরতিকে এনে দিতে বলল সুধা, বলে হাই তুলল।

রত্নময়ী চা ঢেলেছিলেন। সকালে বাসু দু আনার তেলে ভাজা এনেছিল, তার থেকে দুটো বেগুনি তুলে রেখেছিলেন মেয়ের জন্যে। দু চার গাল মুড়ির সঙ্গে বেগুনি দুটো বাটিতে রেখে চৌকাঠের দিকে ঠেলে দিলেন।

আরতি মোড়া এনে দিয়েছিল। রোদ গায়ে রেখে, ছায়ায় মাথা দিয়ে সুধা বসল।

চায়ের পাত্র এগিয়ে দিলেন রত্নময়ী।

'ভাদ্র মাসের আজ ক তারিখ, মা?' সুধা মুড়ির এবং চায়ের পাত্র টেনে নিয়ে উদাস গলায় বলল।

'দশ এগারো হবে।' রত্নময়ী জবাব দিলেন।

সুধা প্রথমে একটু চা খেল। সকালের দিকে গলার মধ্যে কেমন একটা দম আটকানো ভাব থাকে; মনে হয়, যেন কিছু আটকে আছে, ফুলে আছে কোথাও। চা খেয়ে গলার নালি যেন পরিষ্কার করে নিল।

'বর্ষাটা এবার গেলে হয়।' সুধা অন্যমনস্কের মতন বলল।

'এখনই—?' রত্নময়ী অবিশ্বাসের স্বরে জবাব দিলেন।

সুধা মুড়ি চিবোতে লাগল। আরতি কখন পাশ থেকে সরে গেছে। তাকে কোথাও দেখা গেল না।

'এবারে পূজো যেন কবে—?' সুধা শুধলো।

'আশ্বিনের শেষে টেশে হবে।' রত্নময়ী উনুনের তলা খুঁচিয়ে কয়েকটা পোড়া টুকরো কয়লা চাপালেন ওপরে। 'পাঁজি দেখি নি, কার্তিকেও পড়তে পারে।'

এই রকমই, আজকাল মায়ে মেয়ে অধিকাংশ সময় কথাবার্তার ধরন এই

রকম। কেউ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, কি বলবে ভেবে পায় না। নিতান্ত সাংসারিক কথাবার্তা বাদ দিলে পরস্পরের সঙ্গে ওদের বাক্যালাপ এই রকম ছাড়া ছাড়া, সম্পর্কহীন, অসংলগ্ন।

কলাইকরা ভাঙা একটা গামলা থেকে পোড়া আধপোড়া কয়লার টুকরো বেছে উনুনের মুখে সাজিয়ে দিলেন রত্নময়ী। ঘটির জলে দু হাত ভাল করে ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে বললেন, 'সোডা সাবান আনতে পাঠিয়েছি।'

সুধা আলস্যভরে মুড়ি মুখে দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে তেঁতো বিস্বাদ এক জলের স্বাদ গ্রহণ করছিল। শিস দেওয়ার মতন স্বর করে একটা চড়ুই বারান্দার দিক থেকে ডাকছে। ওপরতলা বেশ চুপচাপ, নীচের তলায় ছিন্নসূত্রে শব্দ উঠছে।

হাত বাড়িয়ে তরকারির ছোট ঝুড়িটা রত্নময়ী টেনে নিলেন। বাসুকে দিয়ে সকালে বাজার করিয়ে আনিয়েছেন, সংক্ষিপ্ত বাজার, আরতি ধুয়ে মুছে চুপড়িতে তুলে রেখেছে। সামান্য কিছু আলু, লাউয়ের টুকরো, অল্প শাকপাতা। এক পাশে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে কিছু কুচো চিংড়ি মাছ পড়েছিল, ধোয়া কোটা করে রেখেছে আরতি।

বঁটি টেনে নিয়ে রত্নময়ী তরকারি কুটতে বসলেন।

মাথায় একপেশে রোদ লাগছিল ; সুধা ভাঙা মোড়াটা সামান্য পিছিয়ে নিল। রান্নাঘরের দেওয়াল ঘেঁষা ছায়াটুকু এত অল্প যে মাথা বাঁচানো যায় না। রোদও দেখতে দেখতে চড়ে উঠছে।

সুধা রত্নময়ীর মুখোমুখি না বসে এখন এমন করে বসেছে যে, সামনে উঠোন এবং ডান পাশে রত্নময়ী। উঠোনের দিকে মুখ করে মুড়ি চিবোতে চিবোতে চা খেতে খেতে সুধা অন্যমনস্কের মতন কী ভাবছিল। নীচে উমার গলা শোনা যাচ্ছে, মেথর এসেছে উঠোন কলঘর ধুয়ে দিতে, বালতি বালতি জল ঢালছে উমা, তার তর্জন গর্জনের সঙ্গে জমাদারের উঠোন ধোওয়ার শব্দে এই বাড়িটা এখন সরব।

রত্নময়ী লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে বড় বড় টুকরো করে কুটতে বসেছেন। কথাবার্তা বলছেন না, বলবেন বলে মনেও হচ্ছে না। মনে হয়, দু জনেই

যেন কোনো অবধারিত তিক্ততা এড়িয়ে যাবার জন্য যতটা সম্ভব বোবা হয়ে আছে।

মুখ বুজে তরকারি কুটলেও রত্নময়ী মনে মনে ঠিক এই মুহূর্তে একাধিক কথা ভাবছিলেন। গত পরশু বাড়িঅলা বলাইবাবুর শালা এসেছিল ভাড়ার তাগাদা দিতে, সুধা তখন অফিস বেরিয়ে গেছে, রত্নময়ীকে নানান কড়া কথা শুনিয়ে গেছে, মামলা করে তুলে দেবার কথাও বলেছে, সুধা বাড়ি এলে রত্নময়ী মেয়েকে সবই বলেছিলেন, জবাবে শুধু সুধা বলেছে, 'যেদিন উঠিয়ে দেবে উঠে যাব, করবার আর কি আছে।' এই কি কোনো কথা হল। রত্নময়ীর ইচ্ছে ছিল সুধা একবার বলাইবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করুক, সব কথা বুঝিয়ে বলুক আপদে বিপদে এ রকম দুর্দশা চলছে বটে কিন্তু আজ আট ন বছরের পুরোনো ভাড়াটে তারা, কখনও কি প্রবঞ্চনার চেষ্টা করেছে! যদি মাঝ-মধ্যের একটা বিরাট বাকির বোঝা ঘাড়ে চেপে না থাকত, তবে বলাইবাবুর পাওনা এত ভারী হত না। তবু এই কষ্টের মধ্যেও যতটা পারছে তারা দিচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে।

সুধাকে মনের কথা বলবার সাহস হয় নি রত্নময়ীর। সে যাবে না। অপমান অসম্মানের বোধ যেন দিন দিন আরও বাড়ছে মেয়ের। গতকাল কথাটা একবার আভাসে ওঠাবার চেষ্টা করেই তিনি বুঝেছেন। সুধার ধারণা, বলাইবাবু তাদের উঠিয়ে নতুন ভাড়াটে বসাতে চাইছেন। সামান্য সারিয়ে সুরিয়ে এক পোঁচ কলি ফিরিয়ে দিলে এই বাড়ি থেকে এখন বেশি ভাড়া উঠবে। কলকাতার অলিতে গলিতে বাড়ির হাহাকার, দলে দলে দালাল ঘুরছে।

বলাইবাবুর মতলব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরে সুধা যেন রাগ এবং আক্রোশ বশে বলেছিল, 'করুক না মামলা, এখন আর সেদিন নেই; রেন্ট কনট্রোলে যাব।'

রত্নময়ী যেমন রেন্ট কন্‌ট্রোল কি জিনিস বোঝেন নি, সুধাও বোঝে নি। তবু কথাটা বলেছিল। ব্যাপারটা অফিসে সে শুনেছে নানা মুখে। সবিস্তারে বোঝে নি এটুকু মাত্র বুঝেছিল যে—বাড়িঅলাদের জব্দ করার একটা উপায় ওটা।

আজ এখন তরকারি কুটতে কুটতে বলাইবাবুর কথাটা প্রথমে মনে হল রত্নময়ীর, ইচ্ছে থাকলেও কথাটা তুলতে সাহস হল না, মেয়ে হয়ত রাগ করবে, বলবে ঘুম ভাংতে না ভাঙতেই শুরু করলে ; আমি কিছু জানি না, যা খুশি কর গে তোমরা।

মেয়ের বিরক্তিকে আজকাল যেন বড় বেশি সমীহ করে চলেন রত্নময়ী। মাঝে মাঝে মনে হয়, এতটা সমীহ তাঁকে মেয়ের কাছে বড় ছোট অক্ষম করে তুলছে। হীনতাবোধে পীড়িত হলে স্বভাবত তিনি ধরে নেন, এই গ্লানির জীবন তাঁর জন্যে লেখা ছিল, সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

সুধার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠোনমুখো হয়ে বসে সুধা একদৃষ্টে রোদে মেলা বিছানাগুলো দেখছিল। একটা শালিক নেমেছে শতছিন্ন মাদুরটার ওপর, ছেঁড়া বালিশটা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া আবর্জনার মতন পড়ে আছে।

রত্নময়ী বলাইবাবুর কথাটা আপাতত মন থেকে সরিয়ে রেখে অন্য একটা কথা ভাবছিলেন। কাল সুধা বেশ সন্ধ্যে করে ফিরেছে। শনিবার দিন এত দেরী হবার কথা নয়। সুধা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত দেরী করলি? জবাবে সুধা বলেছিল, ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম।

সুধা আর কিছু বলে নি; বলার যেন প্রয়োজন অনুভব করে নি। আজকাল দফায় দফায় সুধা ডাক্তারখানায় যায়। কেন? তার কি এমন অসুখ? নীচের তলার ডাক্তার ছেলেটি উমার কাকাকে কী বলেছে রত্নময়ী জানেন না। একদিন উমার কাকা দোতলায় এসে রত্নময়ীর সঙ্গে কথা বলে গেছেন। সে দিনই রত্নময়ীর মনে কেমন এক সন্দেহ হয়েছিল। তুচ্ছ কি খুব সাধারণ কিছু হলে উমার কাকা কি ওপরে আসতেন? উমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে পরে উমার সঙ্গে উনি এসেছিলেন। রত্নময়ী ঘরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘোমটা টেনে, বাইরে বারান্দায় বাসুর ঘরের ভাঙা চেয়ারটায় বসে উমার কাকা কথা বললেন। উমা বা আরতি কাছাকাছি কেউ ছিল না।

উমার কাকার কথা থেকে রত্নময়ী মাত্র এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, সুধার

অসুখটা কিছুকাল তাকে ভোগাবে। এ এক ধরনের বুকের অসুখ ; ভয়ের কিছু নেই, তবে সাবধান—বেশ সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা ফাণ্ডা না লাগানো, একটু ভাল খাওয়া দাওয়া, যথা সম্ভব বিশ্রাম। একঘরে বেশি লোক না শোওয়াই ভাল। ছেলে মেয়েদের একটু সাবধানে রাখবেন, এঁটো কাঁটা যেন না খায়, এক ঘরে না শোয়।

সেই থেকে আরতিকে পাশের ঘরে—বাসুর ঘরে—জায়গা করে দিয়েছেন রত্নময়ী। আরতি ও ঘরে মাটিতে বিছানা করে শোয়। সুধার এঁটো কাঁটা কাউকে খেতে দেন না তিনি। সংসারের কোনো কাজ তিনি করতে বলেন না সুধাকে।

কিন্তু এই অসুখের নাম কি ? কি হয় এতে ? সুধাকে তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন না। উমার কাকা বার বার নিষেধ করে দিয়েছেন, বলেছেন, একে ও অসুস্থ তার ওপর অল্প বয়েস—ওকে কথনও কিছু বলবেন না, ঘাবড়ে যাবে হয়ত।

রত্নময়ী সুধাকে কিছু বলেন নি। কিন্তু একটা বিশ্রী চিন্তা এবং আশঙ্কা সব সময় তাঁকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে প্রথম প্রথম। এখন সেই উদ্বিগ্ন ভাবটা সয়ে গেছে অনেক, কিন্তু যেদিনই শোনেন মেয়ে ডাক্তারখানায় গেছে কেমন একটা ভয়ে মন বিচলিত হয়ে ওঠে।

আজ দু মাস কি আড়াই মাস হল—এই রকম চলছে। দু চার দিন অন্তর সুধা ডাক্তারখানায় যাচ্ছে। এক দফা চলছে ইনজেকশান, পরের দফায় চলছে ওষুধ, আবার ইনজেকশান···, আসলে এটা কোন ধরনের অসুখ ? কই মেয়ের শরীর ত সারছে না।

লাউ কোটা শেষ করে পাত্রটা একপাশে সরিয়ে রেখে রত্নময়ী মেয়ের দিকে তাকালেন। সুধা কেমন তন্ময় হয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের পাতা পড়ছে না, কপালের কাছে দু একটি রেখা, মুখ মলিন কৃশ, ঠোঁট এবং গাল পাণ্ডুর।

ভাদ্রের রোদে মেয়েকে যেন আজ ভীষণ ফ্যাকাশে, নির্জীব, রুগ্না দেখাল। সুধার দু চোখ আরও বুঝি গর্তে ঢুকে গেছে। কেমন

কুঁজো হয়ে বসেছে, যেন একটু হেলান পেলে এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়বে।

রত্নময়ীর বুকের ভেতরটা বেদনায় কেমন মুচড়ে পাক দিয়ে উঠল। তিনি শিশুর মতন সহজ স্বাভাবিক এক বেদনা এবং করুণা অনুভব করলেন।

'রোদ লাগাচ্ছিস কেন, মাথা ধরবে—' মৃদু কোমল গলায় বললেন রত্নময়ী।

সুধা জবাব দিল না। তার তন্ময়তা যেন ঘোচে নি।

কয়েক পলক মেয়ের শূন্য বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে রত্নময়ী আবার কথা বললেন। 'তোর দুধটা গরম করে দেব, খাবি ?'

সুধা তাকাল, অন্যমনস্ক, রত্নময়ীর কথা সে খেয়াল করে নি। রত্নময়ী আবার বললেন, 'তোর দুধ রয়েছে—গরম করে দি, খা।'

মাথা নাড়ল সুধা ; না, এখন খাবে না।

অল্প সময় নীরব থেকে রত্নময়ী হঠাৎ বললেন, 'কাল কি বলল ?'

'কে ?' সুধা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

'ডাক্তারখানায় গিয়েছিলি বললি যে, কি বলল ডাক্তার ?'

'কিছু না।' সুধা ছোট করে জবাব দিল।

'তবে—!' রত্নময়ী বিস্মিত এবং অধীর হয়ে বললেন, 'কিছু না ত ওখানে যাওয়া কেন ?'

'যেতে বলেছিল।' সুধা কপালে জ্বর দেখার মতন করে হাত দিল, 'নতুন করে আবার ইনজেকশান দিচ্ছে, সেই ইনজেকশান নেবার দিন ছিল।'

রত্নময়ী ভেবে পেলেন না, তিনি আর কি বলতে পারেন। তাঁর উদ্বিগ্নতা অস্থিরতা এরা বুঝবে না। মুখ ফুটে তিনিও বলতে পারবেন না, উমার কাকার কাছ থেকে আধখাপচা তিনি যা শুনেছেন। ওরাও নিজের থেকে স্পষ্ট করে কিছু কি বলবে! বলবে না।

'তোর এই অসুখটা কি, আমি আজও জানতে পারলাম না।' রত্নময়ী হতাশ গলায় বললেন।

সুধা উঠে দাঁড়াল। রোদের ঝাঁঝে তার চোখ জ্বালা করছিল, মাথাটাও টিপ টিপ করছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সুধা বসা ভাঙা হতাশ গলায় বলল, 'আমিও জানি না। যা বলছে করছি, যতটা সম্ভব শুনছি। হয়ত এই করতে করতেই একদিন মরব।'

সুধার চোখ চক চক করছিল।

পাঁচিলের কাছে এসে সুধা একটু দাঁড়াল। রোদ বেশ চড়া, আকাশ নীল। হালদারবাড়ির মাথার ওপর একখণ্ড ধূসর মেঘ হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে এসেছে, অনেকদিন পরে আকাশভরা রোদ পেয়ে কাক চিলের দল ডানা মেলে দিয়েছে শূন্যে, চক্রাকারে ভাসছে। এই গলির বাড়িগুলো জলে জলে গায়ে শ্যাওলা আর স্যাতসঁ্যাতানি মেখেছে এতদিন, আজ রোদ গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে শরীরের আর্দ্রতা ও গন্ধ নষ্ট করছে যেন। প্রায় বাড়িতেই ছাদে পাঁচিলে বিছানা পত্র রোদে পড়েছে। কোথায় বুঝি একটা হল্লা লেগেছে, তার স্তিমিত রব ভেসে আসছে; গলির মধ্যে একটা মুচি বাড়ি বাড়ি ডেকে গেল, উত্তরের দিকের এক বাড়ি থেকে খোলা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে একটি মেয়ে জোরে জোরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

সুধা পাঁচিলের কাছে তার মেলে দেওয়া তোশকটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল। খুবই অন্যমনস্ক। সবই চোখে পড়ছিল, কোনো কোনো শব্দ ও কথা কানে যাচ্ছিল—কিন্তু কোনো কিছুই তাকে আকৃষ্ট করছিল না।

তার অসুখটা কি, সুধা নিজেও জানে না। জানার আগ্রহ তার চেয়ে আর কার বেশি। দিনের পর দিন যে উদ্বেগে সে ভুগছে সে উদ্বেগ মা-র কল্পনাতীত। মা-র পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব, সুধার এই ভোগ তাকে নিয়ত শারীরিক ক্লেশ অপেক্ষা মানসিক পীড়ায় অনেক বেশি পীড়িত করে। নিজেকে এখন হতাশ হৃতশ্বাস বোধ করার পরও সুধা তার ব্যাধির ক্লান্তিকর শোষণে যে কত বিপন্ন এবং বিচলিত সংসারে আর কারও সে কথা বোঝার মতন নয়।

চড়া রোদের তাপে অসহিষ্ণু হয়ে সুধা রোদ থেকে সরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দার গায়ে রোদ এসে পড়েছে, বাসুর ঘরের দিকে রোদ কেমন মলিন হয়ে এল একটু, বোধ হয় মেঘের আড়াল পেয়েছে।

সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থেকে সুধা ঘরে চলে গেল।

বিছানা পত্র বাইরে বের করে দেবার পর তক্তপোশটা বড় চোখে লাগছে, ফাঁকা খটখটে। সুধা তক্তপোশের ওপর বসল। ঘরের দুটো জানলাই খোলা, রোদ ঢুকছে না। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল সুধার। শুয়ে পড়লে হয়ত আবার ঘুম এসে যাবে, ঘোলাটে ঘুম। শরীর আরও বেজুত লাগবে।

সুধা জানলার দিকে মুখ করে বসে থাকল।

গতকাল যে ইনজেকশানটা নিয়েছে তার ব্যথা যেন এতক্ষণে ঈষৎ অনুভব করল সুধা। বাঁ হাতের বাহুমূলে হাত রাখল একটু, শাড়ি সরিয়ে জামার হাত গুটিয়ে জায়গাটা দেখল। সামান্য ফুলে টাটিয়ে আছে। ডান এবং বাঁ দু হাতেরই অবস্থা এখন একই রকম। একাদিক্রমে ইনজেকশান নিয়ে নিয়ে কেমন একটা কালশিটে পড়ার মতন দাগ পড়ে গেছে। আগে ছুঁচ ফুঁড়লে ব্যথা করত বড, আজকাল আর করে না, বোধ হয় জায়গা দুটো অসাড় হয়ে গেছে। গতকাল একটু জোর লেগেছিল বলে আজও ব্যথা আছে।

গতকালকের কথা সুধা মনে করল। ইনজেকশান দেবার সময় দেবব্রত হেসে বলেছিল, এখনও দুটো বাকি। তারপর কিছুদিন আর ফুঁড়ব না।

সুধা কোনো কথা বলেনি। তার মনে হয়েছিল, এই সাময়িক বিরতিতে খুশী হবার মতন কিছুই নেই। কথাটা সে খুব নির্লিপ্তের মতন শুনে ছাদের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকল, এবং বিদ্ধ হবার অপেক্ষা করতে লাগল।

'ছুটি নেবার কি করলেন?' ইনজেকশান দেওয়া হয়ে গেলে দেবব্রত বলল।

সুধা কোনো কথা বলল না। বলার ছিল না কিছু। উনি বার বার ছুটি নেওয়ার কথা বলছেন, সুধা হু হাঁ করে যাচ্ছে, বলতে পারছে না যে, ছুটি পাওয়া তার মুশকিল।

'অফিসে ছুটি দেবে না?' দেবব্রত শুধলো।

'আমার ছুটি তেমন পাওনা নেই।' সুধা বলল।

'তেমন মানে—?'

'দু চার দিন হয়ত থাকতে পারে।' সুধা উঠে বসে আড়ষ্ট গলায় জবাব দিল।

'ও দু চার দিনে কিছু হবে না। মাস ২ তিন ছুটি নিতে হবে অন্তত।'

সুধা নীরব। টানা ছুটির কথা সে চিন্তা করতেই পারে না। অগত্যা কুণ্ঠিত কেমন অপরাধীর মত মুখে বসে থাকল।

'ছুটি নিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে, যাকে বলে বেড্-রেস্ট। রেস্ট ইজ এসেনসিয়াল।...বাইরে কোনো জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারলে আরও ভাল হয়।'

চোখ তুলে তাকাল সুধা। টেবিলের ওপর থেকে আস্তে করে নেমে এসে দাঁড়াল। আঁচল আরও ঘন করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছুটি বেড়ানো কোনোটাই হবে না।'

'হবে না বললে কি হয়। চেষ্টা করুন।'

'কি হবে চেষ্টা করে!'

'বাঁচতে হলে কোনো কোনো সময় নিজের দিকেও একটু তাকাতে হয়।' দেবব্রতর স্বর খুব আন্তরিক শোনাল, 'এখন কিছুদিন বিশ্রাম এবং চেঞ্জ আপনার দরকার।'

সুধার ইচ্ছে হয়েছিল বলে, নিজের দিকে তাকিয়ে বাঁচার উপায় আমার নেই। আমরা সে-ভাগ্য নিয়ে জন্মাই নি।

সুধাকে নিরুত্তর দেখে দেবব্রত গলার স্বর আরও সহৃদয় করে বলল, 'শুধুমাত্র চিকিৎসায় অনেক রোগ সারে—অনেক রোগ আবার পুরোপুরি আমাদের হাতে ধরা দেয় না। রুগীকেও খানিকটা নিজের রোগ সারাতে হয়। এ-রোগ সারাতে হলে—'

'আমার রোগটা কি? সুধা কথার মধ্যে বাধা দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল।

দেবব্রত কয়েক পলক চেয়ে থাকল সরাসরি। সুধা চোখ নামায় নি, স্থির এবং সন্ত্রস্ত চোখে দেবব্রতকে দেখছিল। ওই ভদ্রলোকের পেশাদারী কপটতা সুধা কোনোদিন ধরতে পারে না। তার সন্দেহ হয়, দেবব্রত কোথায় যেন

একটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। সুধা বুঝতে পারে না কোথায়, ধরতেও পারে না। চোখে চোখে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও সুধা ওই ভীষণ সতর্ক সংযত চোখের দৃষ্টি থেকে মানুষটার মনোভাব অনুভব করতে পারল না।

'রুগীর কাছে রোগের কথা বলতে নেই।' দেবব্রত হাসিমুখে বলল, যেন এই হাসি সুধার ব্যাধিকে অনেকটা লঘু করবে। 'কি হবে জেনে?'

উদ্বেগ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা দূর হবে। সুধা বলতে পারত, আমার মনে হয় আমি একটা ভাঙা সাঁকোর ওপর দিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় হাঁটছি। সাঁকোটার চেহারা দেখতে পেলে বাঁচতাম।

'আমার বড় ভাবনা হয়, ভয় হয়।' মৃদু বিষণ্ণ গলায় সুধা বলেছিল।

মাথা নেড়ে দেবব্রত খুব যেন অপছন্দের একটা শব্দ করল; বলল, 'ভাবলে অসুখ সারে না, ভয় পেলে রোগ কমে না। এত ভেঙে পড়ার কি আছে। যা বলছি করুন, টানা একটা ছুটি নিয়ে নিন কোথাও গিয়ে থেকে আসুন মাস দু-তিন। আমি একটা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি বাইরে। যাবেন? এই ত সামনে পুজো আসছে—ভাল ক্লাইমেট পাবেন, চলে যান।'

এত হালকা সরল এবং অগ্রাহ্যের গলায় দেবব্রত কথাগুলো বলল যে, সুধা তার উদ্বিগ্নতার বিষয়ে আর কিছু জানাতে পারল না।

দেবব্রতর ওপর মাঝে মাঝে সুধা এই কারণে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের সব ভাল, কিন্তু এই চাপা স্বভাব ওর ভাল লাগে না। স্পষ্ট করে কোনোদিন সুধার কাছে কিছু বললেন না উনি। ওঁর ধারণা এর ফলে রুগীকে নিরুদ্বিগ্ন রাখা যায়। ধারণাটা ভুল। সুধা এতদিনেও জানতে পারল না তার কি হয়েছে, কেন সে এই দীর্ঘ দিন ধরে ভুগছে, কতকাল আর তাকে ডাক্তারের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে।

বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে, এবং সব জেনেও বার বার সুধাকে ছুটি নিতে বলায় দেবব্রতর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে সুধা কাল বলেছে, 'অফিস আমার ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নয়। ঘন ঘন অসুখে ভুগি। ছুটি চাইলে তাড়িয়ে দেবে।'

দেবব্রত কথাটা শুনল। মনে হল, যেন এ সবই তার জানা।

একটু ঊর্দ্ধে তাকাল, কি ভাবল মনে মনে, বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।'

'আমি জানি, ছুটি পাব না।

উঠে পড়েছিল দেবব্রত। সুধার দিকে না তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ছুটি করে নিতে হয়। উপায় কি।

কালকের কথা আজ সুধা পায় সবিস্তারে ভেবে নিয়ে অবসন্নের মতন বসে থাকল। নৈরাশ্য যেন কাস্তিকের বাদলার মতন তাকে বিষাদবোধে ও বিরক্তিকর চেতনায় ভরে রেখেছে। এখন, কি এই সময়, সুধা অমলাদির মতন বলতে পারে, আমাদের দেশের মেয়েরা কুষ্ঠ স্বামী পিঠে বয়, মরা স্বামী জ্যান্ত করতে গা খুলে নাচে তাই সবাই ধন্য ধন্য করে। আসলে কি জানিস রে, যা করার যা আর কেউ করবে না, তোকে দিয়ে তাই করিয়ে নেবার মতলব। আমাদের কথা আর বলিস না, জীবনে পোড়া ধরে গেছে।

এই ইতর স্বার্থপর সংসারকে সুধার ঠিক এক গলিত-কুষ্ঠ বোঝার মতনই মনে হচ্ছিল। যে বিকার-বিরক্তি, বিষক্রিয়া দুর্গন্ধ শ্বাসরোধী ভাব সুধাকে মুমূর্ষু করে তুলেছে, তবু তাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। কেন?

দেবব্রতবাবু বলেছেন ছুটি করে নিতে হয়। সুধার মনে হল, তিনি ঠিকই বলেছেন। হ্যাঁ বাঁচতে হলে কখনও কখনও নিজের দিকে তাকাতে হবে। তাকের স্বার্থপরের মতন যদি তাকাতে হয় – হবে তাই, স্বার্থান্ধের মতনই। যে বাঁচে সে ত্যাগ করে, যার বাঁচা নেই তার ত্যাগ কোথায়?

পায় নিমেষই সুধার মনে হল, তবে কি মনে মনে সে এই ছুটির কথাই ভেবেছে, নাহলে হঠাৎ আজ পুজোর কথা জিজ্ঞেস করল কেন মাকে? সুধা কি বাস্তবিক বেড়িয়ে আসার কথা ভাবছে।

এ-সবই অলীক। হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। তবু তার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর এবং মন বোধ হয় অগোচরে এই সুপ্ত বাসনাকে পালন করছিল।

দাঁতে ঠোঁট চেপে সুধা ঘরের ছাদের দিকে তাকাল। রত্নময়ী কি যেন একটা কাজে ঘরে এসেছেন।

তেরো

দুপুরবেলায় নিখিল বাড়ি ফিরল। চেহারা দেখে মনে হবে সারা রাত শ্মশানে ছিল শবদাহ করে এইমাত্র ফিরছে। শুকনো কালিমার মুখ, চোখে হলুদ হলুদ ছোপ, মাথার চুল রুক্ষ—কত দিন যেন তেল জল পড়ে নি। গায়ের জামা পরনের ধুতি চিট হয়ে গেছে। চেককাটা সুতির চাদর গায়ে জড়ানো।

সদরে কড়া নাড়ার শব্দে উমা দরজা খুলে দিতেই ভাইকে দেখল। মনে মনে সবক্ষণ সে নিখিলের প্রত্যাশা করছে। দীর্ঘ উদ্বিগ্নতার পর শেষ পযন্ত এই স্বস্তিটুকু মনকে হালকা করার কথা। ভাইয়ের চেহারা দেখে তেমন কোনো স্বস্তি পেল না উমা।

নিখিল চোরের মতন বোনের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, কথা বলল না।

সদর বন্ধ করে উমা ফিরল।

পায়ের ধুলো ভরা চটি দুটো বারান্দায় খুলে রেখে নিখিল সোজা ঘরে ঢুকেছে। উমা ঘরে এল।

নিখিলের ভাবভঙ্গী দেখে উমা বেশ বুঝতে পারছিল, দু'রাত বাড়ির বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরে দাদা এখন বোবা এবং খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। চোর সেজে বসে থাকার মতন অবস্থা।

বিছানার ধার ঘেষে শুয়ে পড়ল নিখিল। ভীষণ ক্লান্তির শব্দ করল একটু।

উমা সব লক্ষ্য করছিল। গত পরশু সকালে উনি বেরিয়েছিলেন, দু' রাত বাইরে কাটিয়ে আজ ফিরলেন দুপুরে। যাবার সময় কিছু বলে যা নি। সকালের দিকে প্রায়ই যেমন পড়াশোনার বাহানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই ভাবে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর সারাদিন আর পাত্তা নেই, রাত্রেও ফিরল না। গতকালও বেপাত্তা। আজ ফিরল। এ দুদিন উমার যে কী উদ্বিগ্নতায়

কেটেছে, রাত্তিরে ঘুম আসত না দুশ্চিন্তায়। কাকা ভেতরে ভেতরে আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়েছে, গতকাল থেকে বেশ গম্ভীর। মুখে অবশ্য তেমন কিছু বলে নি। আজ সকালে কিন্তু কাকাকে এই প্রথম বেশ বিরক্ত হতেই দেখেছে উমা। কাকা রাগ করেছে। করা উচিত।

'কোথায় গিয়েছিলি ?' উমা গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল।

নিখিল জবাব দিল না। বিছানার ওপর চিত হয়ে শুয়ে অর্ধেক শরীর তক্তপোশের বাইরে ঝুলয়ে আগের মতনই পড়ে থাকল।

উমা দু মুহূর্ত অপেক্ষা করল, কয়েক পা এগিয়ে এল বিছানার দিকে। নিখিলের মুখ ও দেখতে পাচ্ছিল। 'চুপ করে রয়েছিস যে! কোথায় গিয়েছিলি ?'

নিখিল কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে শুয়েছিল। চোখের পাতা বন্ধ করেই বলল, 'একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম।'

'কি কাজ—?' সঙ্গে সঙ্গে উমা শুধলো।

'তুই বুঝবি না।' এমন গলা করে বলল নিখিল যেন ও-সব গুরু কথা উমাকে বলা অনর্থক। বলে চোখ খুলল।

উমার রাগ হচ্ছিল খুব। দু' রাত বাড়ির লোককে ভুগিয়ে এখন মুরুব্বির গলায় কথা বলতে এসেছে। রাগের গলায় উমা বলল, 'তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে কারও মরা পোড়াতে গিয়েছিলি।'

'গিয়েছিলাম। তোর সব তাতে খোঁজ কেন—!' নিখিল উঠে বসল। উমা যদি কোনো কথাবার্তা না বলত নিখিল আরও চোর হয়ে থাকত। উমার রাগ এবং শাসন তাকে কিছু বলবার সুযোগ দিচ্ছিল, বস্তুত বোবা হয়ে থাকার চেয়ে এতে স্বস্তি পাচ্ছিল নিখিল।

ভাইকে দু পলক লক্ষ্য করল উমা। 'আমরা খোঁজ করব না, করবে তোর ইয়ার বন্ধুর দল। দু দিন ধরে বাড়ি ফিরলি না, আবার গলা বাজিয়ে কথা বলছিস। লজ্জা করে না তোর!'

নিখিল নীরব। গায়ের চাদরটা খুলে ফেলল। উমাকে চটিয়ে লাভ নেই। কাজটা তার অন্যায়ই হয়ে গেছে। এ-ভাবে বাড়ি ছেড়ে বাইরে

থাকার ফলে যে উমা এবং কাকা খুব ভেবেছে, উদ্বিগ্ন হয়েছে নিখিল অনুভব করতে পারছিল। তারও ভাল লাগে নি। গতকাল ফিরতে চেয়েছিল, পারে নি। কাকা কি কিছু বলেছে, অসন্তুষ্ট হয়েছে খুব ?—নিখিলের জানা দরকার। বোনের মুখের দিকে ভীরুর মত তাকাল নিখিল। তারপর নরম গলায় বলল, 'কাল থেকে আমার জ্বর, মাথা ধরে আছে ভীষণ ; তুই এখন তোর ধমকানি রাখ, পরে শোনাস।'

উমা চুপ করে শুনল। দু দিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে জ্বর মাথা ধরা—এ-সব ছুতো সহজেই মুখে আসে। উমা ধরে নিল, সবই মিথ্যে, বানানো কথা। বলল, 'জ্বর হয়েছিল বলে বাইরে দিন কাটাচ্ছিলি, ঘরে আসতে পারছিলি না ?'

নিখিলের সত্যি জ্বর। কাল ভোর থেকেই জ্বরটা গায়ে লেগে আছে, এখনও গা গরম, মাথা ধরে রয়েছে। শরীর খুব ক্লান্ত, পিঠ কোমর হাত পায়ে ব্যথা টনটন করছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। কাল থেকে আজ পর্যন্ত তিন দফা অ্যাসপ্রিন খেয়েছে। উমা তার কথা বিশ্বাস করছে না দেখে নিখিল বলল, 'ওই তো তোর দোষ, কথা বিশ্বাস করিস না। গায়ে হাত দিয়ে দেখ আমার।'

উমা এগিয়ে এল না। বলল, 'দেখ দাদা, তুই আমার সঙ্গে বেশী চালাকি করিস না।'

'চালাকি করছি কোথায়, জ্বর হলে বলব না !'

'যদি জ্বরই হবে তোর বাইরে পড়েছিলি কোথায় ?'

'বললাম ত একটা কাজে—'

'কি কাজ ?' উমা বাধা দিল।

নিখিল বিব্রত বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, 'কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, একটা কাজ ছিল—'

'তোর পার্টির কাজ।' উমা অপলকে চেয়ে থাকল।

মাথা নাড়ল নিখিল, হ্যাঁ—কাজটা তার পার্টির।

প্রথম থেকেই এই একটা সন্দেহ ছিল উমার। পার্টি পার্টি করে দাদা যেমন পাগল তাতে এই পার্টির কোনো কাজে-কর্মে নিশ্চয় মেতে আছে।

বাড়ি ভুলে খাওয়া দাওয়া ভুলে এ-ভাবে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার মতন বুদ্ধি আর কার হবে! উমার দুঃখ এবং ক্ষোভ হচ্ছিল। দাদার কাছে আজকাল তারা যেন পর, পার্টি আপন।

নিখিল জামাটা খুলল। গেঞ্জিটা দুদিনের বাসি। যেমন চেহারা তেমনি গন্ধ হয়েছে। ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে নিখিলের শুতে ইচ্ছে করছিল। খিদেও পেয়েছে খুব।

আলনা থেকে পাজামা তুলে নিতে যাচ্ছিল নিখিল, উমা বলল, 'তোর জর হল কি করে?'

জর হবার মতন কারণ যে না ঘটেছিল এমন নয়. নিখিল সে-সব কারণের মধ্যে গেল না. জবাব দিল, 'ঠাণ্ডাফাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়; ইনফ্লুয়েঞ্জা।' আলনা থেকে পাজামা বেছে নিয়ে গেঞ্জি খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'তোর কিছু খাবার দাবার আছে নাকি, খুব খিদে পেয়েছে।'

উমার রাগ যেন কমে আসছিল। যে লোক বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত বেশ দমে রয়েছে. তেমন চেঁচামেচি করছে না, জরের দোহাই দিয়ে বসেছে তার সঙ্গে কতক্ষণ এক তরফা চেঁচানো যায়। দাদা খুব চালাক। প্রথমে বলল জর. এখন বলছে খিদে পেয়েছে। 'যাদের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিলি তারা খাওয়ায় নি?'

'রাস্তা ঝাঁট—?' নিখিল ঘাড় ঘুরিয়ে বোনকে দেখল।

'ওই একই। বনের মোষ তাড়াতে গিয়েছিলি ত!…যাদের রাখালগিরি করবি তারা তোকে খেতে দেবে না?'

নিখিল রাগ করল না। উলটে যেন মজা পেয়েছে এমন মুখ করে হাসল; বলল, 'তুই একটা নিরেট মুখ্যু, তোকে কি করে বোঝাব বল, আজ-কালকার সমাজটাই এই, রাখালরা শুধু খেটে মরে দুধ খায় অন্যে।'

'তোর বুঝি খুব বিদ্যে?' উমা ঝগড়ার গলায় বলল।

'মন্দ কি!'

'বিদ্যে অনেক বলেই তো রাখালি করছিস।'

নিখিল হেসে ফেলল। ভাইবোনের কথা কাটাকাটি এখন যে সহজ স্বাভাবিক নিত্যদিনের খুনসুটির মধ্যে এসে পড়েছে তাতে বেশ বোঝা যায়

অবস্থাটা আর ভয়ঙ্কর হয়ে নেই। উমার রাগ নরম হয়েছে। আপাতত নিখিল নিশ্চিন্ত হতে পারে।

'আমাকে একটু চা খাওয়া না। আর একটা বড়ি আছে, চায়ের সঙ্গে খেয়ে ফেলি। জ্বরটা ছেড়ে যাবে।' নিখিল অনুনয়ের চোখে তাকাল।

ভোলাবার চেষ্টা। একটা ছুতো করে মন গলাবার এবং চা খাবার ফন্দি। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উমা দাদার মতলব জলের মতন বুঝতে পারল। 'ফন্দি অনেক শিখেছিস তুই।' উমা রাগের ভান করে বলল, 'রাস্তার দোকান থেকে চা কিনে বড়িটা খেয়ে এলেই পারতিস, জ্বর ছেড়ে যেত।'

নিখিল আর কথা বলল না। গোবেচারী মুখ করে হাসল। শরীরটা খুবই বেজুত। মুখ হাত না ধোওয়া পর্যন্ত বড় কদয লাগছে নিজেকে। পাজামা আর গেঞ্জি হাতে করে নিখিল কলঘরে চলে গেল।

নিখিলের জন্যে ভাত তরকারি সবই রেখেছিল উমা। দুদিন ধরে সমানে দুবেলা ওর খাবার রাখতে হচ্ছে, কখন এসে হাজির হবে কে জানে! সেই বাসি খাবার উমাকে খেতে হয়েছে কাল, আজও। আজকালকার দিনে কে চায় রান্না জিনিস নষ্ট হয়।

অবেলায় জ্বরো রুগীকে ভাত দেওয়া যায় না। অগত্যা, উনুনে কাঠের কুচি আর কাগজ জ্বালিয়ে দু চারখানা পরোটা ভেজে নিতে বসল উমা। এই আঁচেই চা করে নেবে।

কলঘরে নিখিল হাত মুখ ধুচ্ছে, জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল উমা। দাদার ওপর সে নিজেও আজকাল তেমন প্রসন্ন নয়। নেহাত ছোট বোন তাই তেমন করে কিছু বলতে পারে না, বড় হলে বলত। হ্যাঁ, উমা যদি বয়সে ওর বড় হত, নিশ্চয় বলত, বুড়ো কাকার সারাদিনের পরিশ্রমের পয়সায় খেয়ে পরে কলেজের মাইনে চুকিয়ে তোমার এই পার্টি না করাই উচিত। কিসের পার্টি তোমার—কি আছে তোমার পার্টিতে? তোমার পার্টি কি এই কথা বলছে, বৃদ্ধ অক্ষম মানুষ তোমার জন্যে অন্ন বস্ত্র শিক্ষার সংস্থান করে আসুক

আর তুমি মজুর উদ্ধার করে বেড়াও! নিশ্চয় বলছে, নয়ত তুমি এ-কাজ করতে না।

তুমি এবার পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করতে চাইছ। কেন? আজ দু বছর বাড়ির খেয়ে পরে কলেজের মাইনে গুনে হঠাৎ আজ তোমার এমন কথা কেন মনে হয়, পরীক্ষা এবার দেবে না? তৈরী হতে পার নি! না পারার দায় কার? কাকা আজ সকালে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছে, কলকাতায় আমি ওকে লেখাপড়া শেখাতে নিয়ে এসেছিলাম, চব্বিশ ঘণ্টা রাজনীতি করলে আর পড়াশোনা কেন! ছেড়ে দিক।

কাকা যে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অসন্তোষ বিন্দুমাত্র অকারণে নয়। (যার কাছে তুমি লালিত পালিত তার আশা আকাঙ্ক্ষার তুমি কিছু ত দেখবে! অতি অমানুষ না হলে এমন করে তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।)

উমা এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে অসাবধানে শাড়ির আঁচলে ধরে চাটুই নাবাবার সময় চেলা কাঠের আগুনে তার আঁচলটা ধরে গেল। পোড়া গন্ধ নাকে যেতে তাড়াতাড়ি আঁচল নিবিয়ে ফেলল। পুড়ল একটু। মন খুঁত খুঁত করতে লাগল উমার। শাড়িটা পুরনো নয়, পোড়া জিনিস ক' ধোপ আর টেঁকবে।

খাবার গুছিয়ে নিয়ে উমা ঘরে গেল। 'তোর জন্যে পুড়ে মরতাম—'উমা শাড়ির আঁচলের পোড়া অংশ দেখাল, 'আমাকে তুই শাড়ি কিনে এনে দিবি।'

বোনের হাত থেকে খাবার নিয়ে নিখিল ম্লান মুখে হাসল। 'আমার জন্যে তুই অনেক জলছিস পুড়ছিস। একটা শাড়ি কিনে দিয়ে কি সব শোধ করা যায়!'

উমা জলের গ্লাস দাদার পড়ার টেবিলে রাখতে রাখতে শুনল কথাটা। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'খোসামোদি ভালই শিখেছিস।'

'খোসামোদ—!'

'নয়ত কি—!' উমা গলা বেঁকিয়ে বলল। বলে চা ঢেলে আনতে রান্নাঘরে চলে গেল।

পরোটা ছিঁড়ে তরকারি মাখিয়ে মুখে পুরল নিখিল। কাল থেকে সে এক রকম অভুক্ত! জরজ্বালা হলে তার ভীষণ বমি বমি লাগে। বমির ধাত ওর। কাল সকালে এবং দুপুরে কিছু খাবার জুটলেও বমির ভয়ে নিখিল মুখে দেয় নি। পুরবীর সামনে বমি করবে এই লজ্জায়—জরের বিস্বাদ গন্ধ মুখে নিয়ে এক গাদা চা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। রাত্রের দিকে দু মুঠো মুড়ি খেয়েছিল, তাও বাইরে গিয়ে। আজ সকালে ট্রেনে আসবার সময় নিখিল তার উপবাসের পরিণাম বুঝতে পেরেছিল। তার মনে হচ্ছিল, পেটের মধ্যে যেন ক্রমশই এক যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতা মুঠো পাকিয়ে তার অন্ত্র এবং আরও কিছু সার টেনে নিচ্ছে। পরে, এই শূন্যতা একটা প্রকাণ্ড ফোড়ার মতন ফুলে টাটিয়ে তাকে ভয়ঙ্কর কাতর করে তুলেছিল। পুরবীকে বললে, সে কিছু খাওয়াতে পারত, তার কাছে পয়সা ছিল—শান্তিদা প্রায়ই চা বিস্কুট কলা এটা ওটা খাচ্ছিল—পুরবী পয়সা দিচ্ছিল, নিখিলও খেতে পারত, খায় নি।

পুরবী একটু বেশী রকম মেতে উঠতে পারে। নয়ত তার যাওয়ার খুব একটা দরকার ছিল না। বাইরে এ-ভাবে, যে-ভাবে তারা ছিল, মেয়েরা থাকতে পারে না। নানা অসুবিধে। তা সত্ত্বেও পুরবী কেমন সব কষ্ট অসুবিধে সহ্য করে দু দিন বাইরে কাটিয়ে এল। ও বলছিল ওর অভ্যেস আছে। আসলে কিন্তু অভ্যেস নেই, জোর করে অভ্যস্থ ভাব আনতে চাইছিল। নিখিল এটা বুঝতে পেরেছে। শান্তিদাই একমাত্র লোক যার আচরণ ভাবভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে—এ-ভাবে হাটেমাঠে নির্বিকার দিন কাটাতে পারে। আর পারে মিছিল তুলতে, সভায় গালিগালাজ খেতে এবং গালিগালাজ করতে। সংগঠনের বনেদ তৈরীর কাজেও শান্তিদার মতন সক্ষম লোক না থাকলে কিছু হয় না। নিখিল পারত না, পারে নি। তাকে কেন যে ওরা শান্তিদার সঙ্গে জুড়ে দিল নিখিল বুঝতে পারল না। অনর্থক। তার যাওয়া একেবারে অনর্থক হয়েছে। বরং বাইরে বেরিয়েই জরজর বাঁধিয়ে সে-একটা লজ্জাকর কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলল।

উমা চা নিয়ে ঘরে এসেছিল। নিখিল মুখ তুলল। মুখে খাবার, কথা বলল না।

চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে উমা বিছানার ওপর বসল। বলল, 'গায়ের ওই চাদরটা কার এনেছিস?'

চাদরটা পুরবীর। জর হয়ে গেল আচমকা, পুরবী গায়ে দিতে দিয়েছিল। নিখিল বোনের দিকে তাকিয়ে থাকল ক'পলক, জবাব দিল, 'অন্য লোকের।'

'তা ত বুঝতেই পারছি। ফেরত দেবার সময় আমি কেচেকুচে দিতে পারব না। তুই লণ্ড্রি থেকে কাচিয়ে দিস।'

নিখিল মাথা নেড়ে সায় দিল।

উমা অলস ভঙ্গি করে বসল। আজ দুপুরে এখন পর্যন্ত বিশ্রামের সময় পায় নি একটু; দু দিন ভাল করে ঘুমোতে পারে নি রাত্রে—ফলে বেশ আলস্য অনুভব করছিল। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না; দেখতে দেখতে দুপুর কেমন ফুরিয়ে এল, খানিক বাদেই জল আসবে, ঘুমিয়ে পড়লে কাজের সব অগোছাল হয়ে যাবে।

বড় মতন হাই তুলে এলো চুলে আঙুল টানতে টানতে উমা বলল, 'তা কোন চুলোয় গিয়েছিলি?'

নিখিলের খাওয়া শেষ হয়েছিল। পুরো গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে আরামের নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'বললাম ত বাইরে গিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'বহরমপুর।' নিখিল উঠল। ছাড়া জামার পকেট থেকে অ্যাসপ্রিনের ট্যাবলেট বের করে এনে আবার বসল তক্তপোশে। চায়ের কাপ টেনে নিল।

'সেখানে কি তোর?' উমা শুধলো।

'কাজ ছিল।'

উমা ভাইয়ের মুখ নজর করে দেখছিল। নিখিল চায়ের সঙ্গে ওষুধের বড়ি গিলে ফেলল।

'কি কাজ?' উমা আবার প্রশ্ন করল।

'তুই বুঝবি না।' নিখিল অগ্রাহ্য করার মতন করে মাথা নাড়ল. চায়ে চুমুক দিল, সামান্য অপেক্ষা করে বলল, 'হাঁড়িকুড়ি সংসার নিয়ে তুই থাকিস—পলিটিকসের কি বুঝবি?'

কেমন যেন ঈষৎ আহত হল উমা। তার মনে হল, দাদার কথার মধ্যে তাকে নগণ্য জ্ঞান করার একটা সুর আছে। বলল, 'আমার বোঝার দরকার নেই, তুই তোরটা বোঝ তা হলেই হবে।

নিখিল অনুভব করতে পারল উমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উমার রাগ ক্ষোভ ক্ষুণ্ণতা সে সব সময় সবার আগে অনুভব করতে পারে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে, এই একটা জায়গার সব বেসুরো সুর তার কানে যত বেশী যত ত্বরিতে ধরা পড়ে, এমন আর কোথাও নয়। কিন্তু নিখিল উমাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে কিছু বলেনি, এ-রকম হামেশাই বলে থাকে কোনো ক্ষোভ বা উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এখানে অবশ্য এড়াতে চাইছিল।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল নিখিল, আচমকা তার পুরবীর কথা মনে পড়ল, আলোর ঝলকানির মতন, অনুক্ত কথাটা মনেই হারিয়ে গেল।

'কথা নেই বার্তা নেই, কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে যে তুই বেপাত্তা হয়ে গেলি—আমাদের ভাবতে হয় না?' উমা ধীরে ধীরে বলল। তার গলার স্বর নিবিড়, স্নিগ্ধ। যেন সে বোঝাতে চাইছিল, সংসারের লোক তোর জন্যে ভাবে দুশ্চিন্তায় পড়ে এ কি তুই জানিস না!

নিখিল অস্বস্তি বোধ করছিল, অন্যায় বোধ তাকে যেন ঈষৎ আড়ষ্ট ও বিব্রত করছে। বোনের দিকে অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে কি যেন বলব বলব ভাব করল, বলল না, আবার চা খেল কয়েক চুমুক। তারপর নীচু গলায় বলল, 'আমি কি আগে জানতাম কিছু, একেবারে হঠাৎ যেতে হল, খবর দেবার সময় পেলাম না।' বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করল নিখিল, একটু থেমে বলল, 'নয়ত এক জামা কাপড়ে কেউ বাইরে যায়!'

'হাজার হঠাৎ হলেও তুই যাবি না। অন্তত আমাকে না জানিয়ে যাবি না।' উমা যেন বিশেষ করে তাকে সতর্ক করে দিল।

সামান্যক্ষণ কোনো কথা বলল না নিখিল। শেষে শুধলো, 'কাকা কি বলেছে রে?'

'কি আর বলবে—'

'না, তবু—?'

'রাগ করেছে, অসন্তুষ্ট হয়েছে খুব।' উমা ভাইয়ের মুখে চোখ রেখে বলল, 'কাকা তোর এ-সব পছন্দ করছে না।'

নিখিল বিরক্ত বোধ করল। কাকা কি পছন্দ করবে না করবে তাই দেখে কি তার নিজের পছন্দ ঠিক করতে হবে। কারও যদি নিখিলের কাজকর্ম মনোভাব পছন্দ না হয়, নিখিলের পক্ষে কি করার আছে। সব মানুষের একই মতামত ও মনোভাব থাকবে—এমন কিছু কথা নেই। কাকার এবং তার ধারণা পৃথক। নিখিল মনে মনে কাকাকে উদ্দেশ করে উমাকে বলল, 'না করলে আর আমি কি করব!'

উমা বিস্মিত এবং ব্যথিত হল। দাদা কি বোঝাতে চাইছে, কাকার পছন্দ অপছন্দে দাদার কিছু আসে যায় না। কাকাকে কি সে অগ্রাহ্য করতে চাইছে। উমার কাছে দাদার কথাবার্তা কাকাকে অসম্মান করার মতন মনে হল। বিরূপ গলায় উমা বলল, 'কি করবি মানে—?'

'মানে আর কি! কাকা যা চাইবে আমার যদি তা করতে ইচ্ছে না করে। প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের একটা বোধ বুদ্ধি আছে। আমি কিছু কচি খোকা নই।' নিখিল অসন্তুষ্ট ভাবে বলল।

'বোকার মতন কথা বলিস না। কাকা তোর ভাল ছাড়া মন্দ চাইবে না।' উমা রেগে উঠছিল।

'ভালর ধারণা সবার এক নয়। তা ছাড়া, যার যা ভাল তাকে তা নিজেরই বুঝতে দেওয়া উচিত।'

'সবাই নিজের ভাল বোঝে না। তুই বুঝিস না।'

'বুঝি। আমার ভাল মন্দ আমি বুঝি।'

উমা কিছু সময় নীরব থাকল। দাদাকে তার নিতান্ত জেদী অবুঝ একগুঁয়ে মনে হচ্ছিল। নিজের ভাল মন্দ যে ছেলে বোঝে সে কি এই ভাবে লেখাপড়া ঘরবাড়ির প্রতি অমনোযোগী অনুৎসাহ হয়ে ওঠে, কি ভালটা নিজের তুই করছিস! উমা মৃদু স্বরে বলল, 'তা হলে তুই বলতে চাস কাকাই তোর মন্দ করছে?'

নিখিল অল্পের জন্যে কেমন থতমত খেয়ে গেল, পরে বুঝতে পারল, কথাটা

অর্থহীন। না, সে কখনই এমন কথা ভাবে নি, কাকা তার মন্দ করছে। সে শুধু মনে করছে, কাকা কাকার ধারণা মতন ভাইপোর ভালো খুঁজছে, নিখিল তার নিজের মতন। বিরোধ তাদের কখনও হয় নি, কারণ আজ পর্যন্ত কাকার সঙ্গে তার এমন কোনো কথা হয় নি যাতে বুঝতে হবে কাকা নিখিলের প্রতি অসহিষ্ণু, নিখিলের রাজনীতির প্রতি বিরূপ। কাকা এখন পর্যন্ত নিখিলকে নিখিলের মত চলতে দিয়েছে।

'আমি কোনোদিন এ-সব ভাবি নি।' গম্ভীর হয়ে নিখিল বলল।

'ভাবতে আর কতক্ষণ!···দিন দিন যা পালটাচ্ছিস তুই।' উমা ক্ষুব্ধ স্বরে জবাব দিল।

'মানুষ মাত্রেই পালটায়, পালটানো তার স্বভাব।...তবে তুই যে পালটানোর কথা বলছিস সেটা বাজে, আমি ও-রকম কিছু পালটাই নি।'

উমা আর কথা বলল না। তার ভাল লাগছিল না কথা বলতে। দুপুর ফুরিয়ে গেল। জলের কলের মুখে বাতাসের ফোঁ ফোঁ শব্দ হচ্ছে। আরতির গলা শোনা যাচ্ছে ওপর তলায়। গলিতে করপোরেশন স্কুলের বাচ্চাগুলোর কলরব, বাড়ি ফিরছে।

হাই উঠল উমার, ক্লান্তিতে গা ভেঙে আসছিল। এবার উঠতে হবে, ঘরদোরের কাজে হাত দিতে হবে, বেলা পড়ে গেল। একঘেয়েমির অপ্রসন্নতা অনুভব করছিল উমা। অন্যমনস্ক চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল।

নিখিল শুয়ে পড়ল। তার ঘুম পাচ্ছিল। জ্বর গায়ে এই অবেলায় সে ঘুমোবে না, চোখ বুজে শুয়ে থাকবে। দু দিনের অনাচার অনিয়মের পর এখন এই আরাম পেয়ে শরীর যেন সামান্য ঝরঝরে লাগছিল।

উমা আস্তে আস্তে তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল।

নিখিল শুয়ে শুয়ে বহরমপুরের কথা ভাবতে লাগল। এ-রকম একটা অশান্তির ব্যাপার যে বাড়িতে ঘটবে নিখিল জানত। তার ইচ্ছে ছিল না যায়। বাড়ি ছেড়ে নিখিল এ-ভাবে কখনও বাইরে থাকে নি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও

নিখিলকে যেতে হল। বাড়ির জন্মে যে বাধা এবং অস্বস্তি বোধ করছিল, মুখ ফুটে তা বলতে পারল না। আপত্তির কারণ জানালে ওরা হাসত, হাসা স্বাভাবিক ছিল, ঠাট্টা করত। নৃপেনদা বলত, বাড়ির কথা ভাবলে বাইরের কাজ করা চলে না, আমাদের সকলেরই কিছু অসুবিধে আছে, কিন্তু ও-সব ওজর তুলে আমরা কর্তব্য দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না।

নিখিল আরও অনুভব করেছিল, অন্যদের তুলনায় সে অনেক নিষ্ক্রিয়, বাস্তবিক আর পাঁচজন দলের জন্য যতটা পরিশ্রম করে কাজ নিয়ে ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি করে নিখিল তার কিছুই করে না। শুধু কথায় কাজ হয় না, সবাই যদি কথায় সারে তবে কাজ করবে কে! একদিন নৃপেনদারা তাই বলছিল, অ্যাকটিভ ওয়ার্কার আমাদের যত বাড়বে তত ভাল, সার্কুলারে গত দু বছর থেকে বার বার এই ওয়ার্কারের স্ট্রেংথ বাড়াবার কথা বলছে। আমরা অনেকটা ইমপ্রুভ করেছি, আরও করতে হবে।

তা ছাড়া, নিখিল ভাবল, তা ছাড়া একটা লজ্জা বলে জিনিস আছে, হীনতা বোধ বলে কথা আছে। বস্তুত, নিখিল যদি বলত, তার যাবার অসুবিধে আছে—ওরা ভাবত, নিখিলের সাহস নেই স্বার্থত্যাগ নেই, সে কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছে। আর, সত্যি বলতে কি, এই প্রথমবার নিখিলকে একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। অনেক দিন থেকে মনে মনে কি নিখিল একটা কাজের ভার কামনা করত না? করত। তার মনে হত, মৃণালদের মতন সে দলের আত্মীয় হবার সুযোগ পাচ্ছে না, তাকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, ঘরে ঢুকতে বা বসতে দেওয়া হয় নি। সে এখনো মেম্বার নয়, সিমপ্যাথাইজার। শত শত সাধারণ অনুরাগীর মতন সে'ও এক অনুরাগী।

সুযোগটাও ভাগ্যবশে এসেছিল। শান্তিদার সঙ্গে মৃণালের যাবার কথা ছিল। মৃণাল যেতে পারল না। তাকে অন্য কাজের জন্মে টেনে নিয়ে গেছে প্রকাশবাবুরা। বর্ধমান জেলায় একটা কৃষক সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে, আগামী ধানকাটার আগে এই সম্মেলন শেষ করতে হবে। এখন ভাদ্র শেষ হয়ে এল। এখন থেকে উঠে পড়ে না লাগলে হবে না। মৃণাল

ডাক্তারী স্কুলটার স্ট্রাইকের সময় খুব নাম করে গেছে। ওকে ছাত্রফ্রন্ট থেকে ক্রমে ক্রমে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশবাবুদের। ভাল কর্মী, সংগঠনের ক্ষমতা খুব। মৃণালও যেন ও-দিকটাই পছন্দ করছে। একদিন মৃণাল তাকে বলেছিল, বুঝে সুঝে নিজের পছন্দ মতন জায়গায় সিঁড়ি লাগাতে হবে, ভাই ; আমি ধোপার গাধা হয়ে মোট বইতে পারব না।...

নিখিল কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছিল। মৃণালের খুব উচ্চ অভিলাষ। সে রাজনীতির উঁচু মহলে আসন পেতে চায়। মৃণালের স্বভাবে নেতৃত্বের গুণ আছে। একদিন তার আকাংখা পূর্ণ হবে।

মৃণালই বোধ হয় নৃপেনদাকে নিখিলের কথা বলে গিয়েছিল। নয়ত সৌরাংশু থাকতে আর কারও যাবার কথা নয়। মুশকিল এই, সৌরাংশুরা আবার শান্তিদাকে পছন্দ করে না। কেন করে না নিখিল জানে না। ওদের কথাবার্তা থেকে মনে হয়েছে, শান্তিদাকে ওরা পুরোপুরি পার্টির চিন্তার মধ্যে পায় না। সৌরাংশু বলে, উনি ঠিক মার্কসিস্ট নন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত কংগ্রেস করেছেন ত, মেণ্টাল অ্যাটাচমেণ্ট এখনও কিছুটা থেকে গেছে।

তবে শান্তিদাকে পার্টিতে নেওয়া কেন? উদ্দেশ্যটা নিখিলের কাছে তেমন স্পষ্ট হতে পারে নি। মোটামুটি বুঝেছে, শান্তিদার দাদা একদার বিখ্যাত নায়ক, টেররিস্ট যুগের মানুষ, বৃটিশের ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়েছিলেন। নিজের দেশ-বাড়ি জেলায় আজও মানুষ তাঁকে অসীম শ্রদ্ধার ও সম্মানের আসনে বসিয়ে রেখেছে। শান্তিদার সেই সূত্রে কিছু প্রতিপত্তি কিছু সুনাম আছে নিজের এলাকায়। তা ছাড়া মানুষটা কাজও করেছে কিছুকাল, বিয়াল্লিশের গোলমালের আগে মতান্তর হওয়ায় কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে এই দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।

শান্তিদাকে নিখিলের ভাল লাগে। সাধারণত আদর্শবাদীরা যেমন হয়, সর্বত্যাগী, নিষ্ঠাবান। কাজে কথায় সরল, আবেগবশে বক্তৃতা করেন। বিপদের মুখে বেপরোয়া। নানান আপাত বুদ্ধি যোগাতে পারেন। অনলস কর্মী। কর্মের মধ্যেই আনন্দ পান।

কিন্তু, নিখিলের মনে এখানে একটু খোঁচা লাগল, শান্তিদার সঙ্গে যদি পুরবী না যেত তা হলে কি নৃপেনদারা তাকে পাঠাত? এই সন্দেহ নিখিলের মনে আগে ছিল না, সেদিন হয়েছে।

বহরমপুরের সমস্ত ব্যাপারটাই এখন অসাফল্যের মতন লাগছে নিখিলের। জ্যোতিবাবুরা যতটা বলেছিল, অতটা কিছু নয়। একটা ইউনিট তারা গড়েছে, কাজকর্ম করছে কিন্তু বাধা প্রবল। ইউনিটটা খুব দুর্বল। সমর্থ লোক নেই। ওরা একটা সভার মতন করেছিল, ঠিক ছাত্রসভা নয়, বরং বলা যায় যুব সভা। ফ্যাসি-বিরোধী আওয়াজ তোলা ছাড়াও এই সভার উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রচার করা। অপর উদ্দেশ্য, ইউনিটের সংগঠনের কাজ এবং তার শক্তি কি করে বাড়ানো যায় তার একটা কর্মসূচী ঠিক করা।

সভায় গণ্ডগোল বাধবে এ যেন বহরমপুর ইউনিটের জানা ছিল, সেই মতন ব্যবস্থাও করেছিল। ইউনিট অফিসের কাছাকাছি এক ছোট মাঠেই সভা বসিয়েছিল ওরা, জনাকয়েক গুণ্ডা গোছের ছেলেকে তৈরী করে রেখেছিল আপদে রোখবার জন্যে। কপাল ক্রমে হাতাহাতিটা বাধে নি, কিন্তু বচসা এবং গালিগালাজ বেধে গিয়েছিল, সামান্য দূরে কিছু ইটপাটকেল ছোঁড়াও চলেছিল। র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টির গোটাকয়েক ছোকরাদের কেউ বোধ হয় লেলিয়ে দিয়েছিল। শান্তিদা বক্তৃতা শুরু করতেই ওরা যত আজে বাজে প্রশ্ন শুরু করল। সেই পুরনো কাসুন্দি—রাশিয়া যুদ্ধে নামলেই আপনাদের ইম্পিরিয়ালিস্ট ওআর পিপলস্ ওআর হয়ে গেল মশাই? কেন? কোন যুক্তিতে রাতারাতি ভোল পালটালেন, স্যার? পোল্যাণ্ড যখন ভাগাভাগি হল তখন ত স্যার এই ফ্যাসিস্জিমের সঙ্গে রফা করতে কমিউনিজিমের বাধে নি! কোন নীতি স্যার আপনাদের? একদিকে হাঁকছেন 'জাপানকে রুখতে হবে' অন্যদিকে মতলববাজদের মতন গোপনে শ্রমিক ধর্মঘট করাবার তাল করছেন। অবশ্য যেখানে ইউনিয়ন দখল করতে চান। দুর্ভিক্ষের সময় কি করেছেন, দাদা? কলোনিয়াল কান্ট্রির স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনাদের স্ট্যালিনের মতামত গ্রাহ্য করার কারণ কি?

এম. এন. রায়-এর চেলা র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ছোকরাগুলো সভায় হট্টগোল তুলল বলেই শান্তিদা ক্ষেপে গেলেন। ক্ষেপে গেলে শান্তিদার স্থান কাল পাত্রের বিবেচনা থাকে না। সরাসরি র‍্যাডিকালদের গালিগালাজ শুরু করলেন। এম. এন. রায় একটা ট্রেটার। যেখানে গেছে লোকটা ট্রেচারী করছে। চীন থেকে কেন তাড়িয়েছে তাকে? কেন সে পালিয়ে এসেছে রাশিয়া থেকে? কেন তোমরা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের টাকা নাও? যুদ্ধের সময় বৃটিশ গবর্নমেণ্টের ধামা ধরবে বলে হাজার হাজার টাকা খয়রাতি পাচ্ছ। বোম্বাইয়ে একটা কাগজ খুলেছ—ইংরিজী দৈনিক পত্রিকা—কে তোমাদের টাকা দিচ্ছে?

সভাটা র‍্যাডিকাল আর কমিউনিস্টদের হাতাহাতির জায়গা হয়ে উঠেছিল প্রায়। নিখিল গিয়েছিল শান্তিদা আর পূরবীকে সাহায্য করবে বলে। কথা ছিল, নিখিল হবে দ্বিতীয় বক্তা। শান্তিদার মতন সে সাধারণ বিষয়ে কথা বলবে না, তার বিষয় হবে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ প্রগতিশীল চিন্তার অভাবে কি ভাবে গণ-সংগ্রামকে পিছিয়ে দিচ্ছে তারই বিবরণ দান। নিখিলকে নৃপেনদারা আগেই বলে দিয়েছিল, কোনো জটিল কথা তোলবার প্রয়োজন নেই, তোমার সোজা কথা হবে, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন ছাড়া মধ্যবিত্ত সমাজের পথ নেই, যারা আজও গান্ধী, নেহরু বা সুভাষ বোসের দিকে মুখ চেয়ে বসে আছে তারা ক্যাপিটালিস্ট মনোভাবকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছে, এরা প্রতিক্রিয়াপন্থী—প্রগতিবাদী নয়।

নিখিল সভায় বসে ঘামছিল। তার বুক দুরু দুরু করছিল। কি তাকে বলতে হবে, কেমন করে সে কথা গুছিয়ে বলবে—বুঝতে পারছিল না। প্রথমাবধিই এই রকম, তার ওপর যখন শান্তিদার বক্তৃতার সময় গোলমাল বেধে গেল নিখিল ভীত সন্ত্রস্ত এবং দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার মনে হচ্ছিল, উঠে দাঁড়ালেই ওই কদর্য জীবগুলো তাকে টিটকিরি আর প্রশ্নের তীর মেরে মেরে বসিয়ে দেবে। ওরা হাসবে, দুয়ো দেবে, হাততালি বাজাবে, এই সভার মধ্যে নিদারুণ লজ্জা এবং গ্লানির কলঙ্ক মাখিয়ে তাকে দূর করে দেবে।... নিখিল যত ভাবছিল, ততই নির্জীব ভীত হয়ে পড়ছিল।

শেষ পর্যন্ত আর নিখিলকে দাঁড়াতে হল না। কেননা ইউনাইটেড

স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশনের একটা দল হামলা করতে সভায় এসে হাজির। দলটা নতুন, কংগ্রেসেরই আরেক মূর্তি। কদিন আগে এই দলের নেতা গান্ধীজীর কাছে গিয়ে খুব বড় বড় কথা গেয়ে এসেছে। ওরা নাকি বাঙলা দেশের বেশীর ভাগ ছাত্রকে কমিউনিস্ট আর র‍্যাডিকাল দল থেকে ফিরিয়ে এনেছে!

ইউ. এস. এ-র ছেলেগুলোকে মুখোমুখি পেয়ে সভায় যেন একটা কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। বাঁধাই স্বাভাবিক। ইউ. এস. এ-র ওপর যত রাগ কমিউনিস্টদের ততই আক্রোশ র‍্যাডিকালদের, দুই দলেরই সমান শত্রু। ফলে যা হবার—দুইয়ে মিলে ইউ. এস. এ-র সঙ্গে লড়ে পড়ল। অবস্থাটা তখন কারও আয়ত্তে নেই, পরিণামে গালিগালাজ, বিদ্রূপ বর্ষণ এবং দুই তরফ থেকেই সমান শাসানি চলতে লাগল।

পুরবী এই হট্টগোলের সময় একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসল। সভায় উঠে দাঁড়িয়ে রোখের বশে এমন বিপজ্জনক সব কথা বলে ফেলল যা বলা উচিত হয় নি। গান্ধীজীকে টাটা বিড়লার এজেণ্ট বা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের নীলামদার বলার স্থান ওটা ছিল না, অথচ পুরবী হঠকারিতা বশে তাই বলে ফেলল, সুভাষ বোসকে কুইসলিঙ বলতেও তার বাধল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই ঔদ্ধত্য এবং দুঃসাহসের ফল ভোগ তাকে করতে হল। ভিড় থেকে এক পাটি জুতো সজোরে এসে পুরবীর গালের কাছে লাগল। আর এক পাটি তার বুকে। আরও জুতো পড়ত, ইট পাটকেলও আসত, কিন্তু বিভ্রান্ত হতচকিত পুরবীকে আবার করে মুখ খুলতে না দিয়ে শান্তিদা ত্বরিতে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ইউ. এস. এ-র দল তখন রুখে উঠেছে, অবস্থা খুব সঙ্গীন, বহরমপুর ইউনিটের কিছু ছেলে সভায় উঠে দাঁড়িয়ে পুরবীকে আশ্রয় দিয়ে ঘিরে রাখল।

সভা ভেঙে গেল। একটা হাজাক বাতি ভেঙে দিয়ে এবং উত্তেজিতদের মধ্যে কেউ সভার মঞ্চের সালুতে দেশলাই জেলে শাসাতে শাসাতে চলে গেল। সমস্ত জায়গাটার তখন ভয়ংকর থমথমে চেহারা। মনে হল, এর শেষ এখানে নয়, আরও কিছু বাকি থাকল।

বহরমপুর ইউনিটের দল ভয় পেয়েছিল। কলকাতার কমরেডদের ওপর হামলা হবে এই ভয়ে তারা আর যথাস্থানে ফিরতে পারল না। অন্য এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল। পোড়ো বাড়ি। নোংরা। চারপাশে ঘিঞ্জি। বাড়িটা নাকি শ্রমিক সঙ্ঘের দপ্তর। হ্যারিকেনের টিমটিমে বাতি জ্বলছে।

সেই বাড়িতেই ঘরোয়া আলোচনা সভা বসল। শান্তিদা বহরমপুর ইউনিটের ছেলেদের সাহস দিলেন। বললেন, রাজনীতির সভায় হাঙ্গামা হুজ্জত গোলমাল বাঁধাধরা ব্যাপার, হবেই; কাজেই হতাশ হবার কিছু নেই। বরং খুশী হবার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। যারা বাধা দিতে এসেছিল তারা বিপক্ষের শক্তিকে নগণ্য জ্ঞান করতে পারে নি। আবার যখন সভা হবে তারা বাধা দিতে আসবে। আসুক। লাভ আমাদের। ছোট বড় সমস্ত সংঘর্ষ, বিপত্তি, গণ্ডগোলের একটা প্রচার আছে। এই প্রচারটা প্রয়োজন, অতি বড় অনুৎসাহীকেও আকর্ষণ করা যায়।

বেশ খোলাখুলিভাবেই শান্তিদা বলেছিলেন, সমস্ত রাজনীতির প্রথম কথা কি জানো ভাই, ইনফেকশান অ্যাণ্ড ইনফিলট্রেশান, অর্থাৎ রোগ বীজাণুর মতন রাজনীতির বীজাণুকে অন্যের মনে সংক্রমণ করিয়ে দিতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে তার মন এবং চিন্তাকে অধিকার করতে হবে। আপাতত তোমাদের উদ্দেশ্য হবে আমাদের পার্টির আইডিয়া ক্রমাগত প্রচার করা। কাজটা দুঃসাধ্য নয়। ধৈর্য এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে নিশ্চয় সফল হবে।

শান্তিদা কতক কাজ বলে দিয়ে এসেছেন ওদের—পোস্টারিঙ, স্ট্রীট কর্নার মিটিং, জনযুদ্ধ বিক্রি, প্যাম্ফলেট এবং ইস্তাহার ছড়ানো। সুযোগ পেলেই কোনো রকমের প্রতিবাদ আন্দোলন, স্টাডি সার্কেল।

ঘরোয়া আলোচনার সময়ও নিখিল চুপ করে বসেছিল। সে কোনো কথা বলে নি। বলা অসম্ভব ছিল। খানিকটা আগে যে ঘটনা ঘটে গেছে তার ভয়ঙ্কর চাপ তাকে বিমূঢ় এবং ভীত করে রেখেছিল। মনে মনে কেমন এক অপরিসীম গ্লানিও বোধ করছিল নিখিল। সহকর্মিণী একটি মেয়ের অসম্মান তাকে নীরবে অক্ষমের মতন বসে দেখতে হয়েছে। সে কিছু করতে পারে নি। কি করা যেতে পারত তাও তার বুদ্ধিগম্য হচ্ছিল না।

ভয়ে লজ্জায় গ্লানিতে এবং সমস্ত ব্যাপারটার ইতর প্রকাশে নিখিল পীড়া বোধ করছিল। এক সময় শান্তিদার পাশ থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে বাতাস শব্দ করছিল। আশেপাশে কোথাও একটা খাটাল আছে। ভূষি আর গোবরের উৎকট গন্ধ। পায়ের মাটি ঠাণ্ডা।

এই অন্ধকারে পুরবী ও দাঁড়িয়েছিল। পুরবী এখন নির্জীব বাথার্ত।

নিখিলের মনে হল তার কিছু সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। পুরবীর কাছে নিজের নিষ্ক্রিয়তার একটা কৈফিয়ত যেন প্রয়োজন।

নিখিল কিছু বলার আগেই পুরবী কথা বলল। 'চলে এলেন যে!'

'ভাল লাগছে না।' নিখিল ক্লেশের স্বরে বলল।

সামান্য নীরবতা। পুরবীকে অন্ধকারে ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল। নীরবতার মধ্যেই পুরবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। নিখিল পরিষ্কার শুনতে পেল নিশ্বাসটা।

'সভা করা আপনার আমার কর্ম নয়।' নিখিল সান্ত্বনা দেবার স্বরে বলল।

'কেন?'

'যোগ্যতা নেই। ওসব শান্তিদারা পারে।'

'আমি পারব।'

'মনে হয় না। আজকের মতন...'

'থামুন।' পুরবী কথার মধ্যে নিখিলকে থামিয়ে দিল। 'জুতোর মার আমার গায়ে যত না লেগেছে মনে তার অনেক বেশী। এই বহরমপুরেই আবার আমি আসব, বলে রাখলাম।'

পুরবীর রোখ এবং জেদ তার ধারালো গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছিল। নিখিল কি বলবে বুঝতে পারল না। অথচ তার মনে হল যেন কিছু বলা উচিত। নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে হাল্কা স্বরে বলল, 'আপনি আসতে চান আসুন, এই ইডিয়েটদের মধ্যে আমি আর আসছি না।'

'দরকার কি—' পুরবী কেমন করে যেন হাসল, ব্যঙ্গ না পরিহাসের ঠিক বোঝা গেল না, বলল, 'আপনাকে ত আর সভা করতে পাঠায় নি

নৃপেনবাবুরা, অন্য উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমার বা শান্তিদার তাতে যায় আসে না।'

কথাটার অর্থ নিখিল বুঝতে পারে নি প্রথমটায়। পরে নির্বোধের মতন কি একটা কথা বলতে গিয়ে পূরবীর তিক্ত গলার স্বর শুনে নীরব হয়েছে। পূরবী বলেছিল, 'আপনার কাজ আপনি করেছেন, নৃপেনবাবুরা খুশী হবেন খু-ব।'

পূরবী অন্ধকারেই দাঁড়িয়েছিল। নিমগাছের বিরাট কালো ছায়া যেন কোনো দৈত্যের মতন পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে শান্তিদা বহরমপুর ইউনিটের ছেলেদের কাছে ম্লান লণ্ঠনের আলোয় সর্বহারা সমাজের বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছে।

নিখিল ক্রমশ পূরবীর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। বিমূঢ় হতচেতন মানুষের মতন নিষ্পলোকে সে তাকিয়ে থাকল পূরবীর দিকে। পূরবী আকাশমুখো হয়ে নিমগাছের ডালপথে চুকরো আকাশের গায়ে দু-একটি তারা দেখছিল।

পরের দিন নিখিল ভোর থাকতে উঠে সকালে শান্তিদা এবং পূরবীকে দেখতে পায় নি। অনেক বেলায় ওরা ফিরল। কোথায় গিয়েছিল ওরা নিখিল জানে না, জানতে চায় নি। দুপুরে শান্তিদা গেল লালগোলা। পূরবী ইউনিটের ছেলেদের সঙ্গে বসে বসে কিছু কাজ করল।

নিখিল সারাক্ষণ কেমন আড়ষ্ট ও জড় হয়ে ছিল। তার অস্বস্তি তাকে সর্বদা পীড়িত করছিল। শান্তিদা এবং পূরবী ভাবছে, নিখিল নৃপেনদাদের চর হয়ে এসেছে। কেন ভাবছে? কি কারণে সে চর হয়ে আসবে?

সারাদিন নিখিল ভেবেছে। সে বুঝতে পারে নি, পূরবীর অভিযোগ সত্য কি না। যদি সত্য হয়, তবে নৃপেনদা কি উদ্দেশ্যে তাকে চর করে পাঠিয়েছে? শান্তিদার প্রতি অবিশ্বাস? পার্টি কি এখনও শান্তিদার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না?

কিংবা..., নিখিলের পরে সন্দেহ হল, কিংবা নৃপেনদার ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য আছে! শান্তিদার সঙ্গে পূরবীর ঘনিষ্ঠতা কি নৃপেনদা সহ্য করতে পারে না! নৃপেনদার মধ্যে কি পূরবীর জন্যে কোনো দুর্বলতা আছে?

নিখিল সঠিকভাবে কিছু অনুমান করতে পারে নি। সমস্ত ধারণাটাই কেমন অস্পষ্ট গ্লানিজড়িত হয়ে আছে। হয়ত পুরবীর সবই মনগড়া।

নিখিল কেন যেন প্রসন্ন হতে পারছিল না। বহরমপুরের সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে পীড়াদায়ক মনে হচ্ছিল। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ছিল নিখিল। চোখে তন্দ্রা ঘন হয়ে এসেছিল। উমা ঘরে এসেছিল কাজ সারতে, জ্বরো শরীরে দাদা অবেলায় ঘুমোচ্ছে দেখে গা নেড়ে ডেকে দিল—'এই, এই দাদা, ওঠ্—অবেলায় ঘুমোস না।'

চৌদ্দ

'কোথায় পেলি?'

বাসু কোনো জবাব দিল না। তার মুখভাব রূঢ়। কেমন যেন রুক্ষ এবং একরোখা দৃষ্টিতে সে মার দিকে পলকের জন্যে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। রত্নময়ীর মনে হল তিনি প্রবল নির্যাতন করে টাকাটা বাসুর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন। বাসুকে সেইরকম রুষ্ট বিবক্ত দেখাচ্ছে।

ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বাসু, তার সবল পায়ের শব্দে এক ধরনের উপেক্ষা এবং ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছিল।

দশ টাকার পাঁচখানা নোট রত্নময়ীর হাতের তালুকে আড়ষ্ট করে তুলেছিল। এতগুলো টাকা এক থোকে বাসুর কাছ থেকে পাওয়া যাবে তিনি জানতেন না। প্রত্যাশাও করেন নি। টাকাগুলো হাতে পেয়েই তাঁর মন সর্বাগ্রে তীরের মতন একটি সন্দেহের জায়গায় গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে।

দ্রুত পায়ে রত্নময়ী ছেলের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

বাসু গায়ের জামা খুলছে, আরতি মেঝেতে তার বিছানা পেতে দিচ্ছিল। রাত হয়েছে এখন। সাড়ে ন'টা বাজে কি বেজে গেছে।

রত্নময়ী ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'কি রে, কানে তোর কথা যায় নি?' ওঁর গলার স্বর তীক্ষ্ণ, গম্ভীর।

জামা খুলে দেওয়াল-আলনায় শার্টটা ঝুলিয়ে দিল বাসু। প্যান্টের মোটা বোতামটা হেঁট মুখে খুলতে লাগল। 'কোত্থেকে এই টাকা পেয়েছিস তুই?' রত্নময়ী শাসনের গলায় শুধোলেন আবার।

'পেয়েছি—' বাসু বলল। মার দিকে তাকাল না। বলার ভঙ্গিটা বেশ অবহেলার।

'কেমন করে পেয়েছিস—? কে তোকে এই টাকা দিয়েছে আমি জানতে চাই।' রত্নময়ীর কণ্ঠস্বর ভীষণ শাণিত কঠিন হয়ে উঠেছিল।

'রোজগার করেছি।' বাসু প্যান্ট খুলে লুঙিটা জড়িয়ে নিতে নিতে জবাব দিল।

রত্নময়ী বিশ্বাস করলেন না। ছেলের ব্যবহার তাঁকে আরও অস্থির অধৈর্য করে তুলছিল। আরতির পাতা বিছানার ওপর এসে দাড়ালেন, বাসুর মুখোমুখি। 'রোজগারের মুরোদ তোমার নেই। তা থাকলে আজ আমাদের এ-অবস্থা হয় না। এই টাকা তুই চুরি করেছিস।'

বাসু তাকাল। তার শক্ত চোয়াল আরও শক্ত দেখাল। চোখ জ্বলজ্বল করছিল। রুক্ষ আক্রোশ সমস্ত মুখে। 'তুমি দেখেছ চুরি করতে?'

'দেখার কি আছে রে, হারামজাদা! তোকে আবার দেখব কি। কোন গুণ তোর জানতে আমার বাকী আছে—' রত্নময়ী রাগে উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। 'ভগবানের কাছে আমার অনেক পাপ ছিল, তাই তোর মতন অপদার্থ জোচ্চোর কুলাঙ্গার আমায় পেটে ধরতে হয়েছে।'

'জোচ্চোরের কাছে টাকা চাও কেন তবে—?' বাসু কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'টাকা টাকা করে আমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিলে রোজ, টাকা পেয়েছ মামলা ফুরিয়ে গেছে। একটু থামল বাসু, কেমন যেন কেমন ক্ষোভের গলায় বলল, 'টাকা নিয়ে কথা, চুরি জুচ্চুরী বাটপাড়ি—যেমন করেই টাকা এনে থাকি তাতে কার কি।'

আরতি একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মা এবং দাদাকে লক্ষ্য করছিল। এ-সংসারে প্রত্যহ রাগারাগি কথা কাটাকাটি লেগে আছে, গলার স্বর সবারই সপ্তমে চড়ে থাকে। নিতান্ত বাড়াবাড়ি কাণ্ড না ঘটলে এই সব ঝগড়াঝাটির আঁচ তার তেমন গায়ে লাগে না আজকাল। বিশেষ করে দাদার ওপর মার যত রাগ ঝাল তার তেমন কোনো জের নেই; এই যতক্ষণ সামনাসামনি মুখোমুখি ততক্ষণ গালমন্দ। আজকের ব্যাপার দেখে মনে হল, সহজে যেন এই অশান্তি থামবে না। মা খুব রেগে গেছে, দাদাও কেমন রাবমুখো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দাদা বড় অবুঝ। গত কয়েকদিন থেকে মা এক ভীষণ অশান্তির মধ্যে কাটাচ্ছে, আজ সন্ধ্যেবেলায় দিদির সঙ্গে আবার এক মন কষাকষি হয়ে গেল, মনমেজাজ ভাল নেই মার, কেন তাকে আরও

জ্বালানো। তুমি বাপু চুপ করে থাক না একটু, বোবার শত্রু নেই। আরতি কেমন অনুনয়ের চোখে দাদার দিকে তাকাল।

বাসু অবশ্য কোনো কিছুই তখন লক্ষ্য করছিল না। কেন যেন আজ মার ওপর ওর ভীষণ এক বিদ্বেষ এবং আক্রোশ জেগেছে। নিজের মনে বিড় বিড় করে তখনও সে কি যেন বলছিল।

'দুবেলা বাড়ির ভাত খাচ্ছ তার বেলা হুঁশ থাকে না—' রত্নময়ী আরও দু-পা এগিয়ে এলেন, 'মুখের সামনে ভাতের থালা না ধরে দিলে যে তুমি আমার মাংস ছিঁড়ে খাও।' রাগে বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে রত্নময়ীর গলার স্বর ভাঙা কাঁসার বাসনের শব্দের মতন কটু শোনাচ্ছিল। 'কোন মুখে তুই কথা বলিস হারামজাদা। লজ্জা করে না। অতি বড় বেহায়া না হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতিস।'

'দেব দেব। একদিন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব। তুমি বাঁচবে।' বাসু গলার স্বর আরও তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল যেন এ বাড়ির সকলকে সে শাসিয়ে দিল।

'তাই দে। তুই মর তুই মরলে আমার হাড় জুড়োয়।' রত্নময়ী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তাঁর বলার ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছিল, এই সংসারের কার প্রতি যেন ভীষণ আক্রোশে অক্ষমের মতন তিনি সত্য সত্যই তাঁর সন্তানের মৃত্যু কামনা করছেন।

বাসু নীরব। আরতি স্তব্ধ। রত্নময়ীর হাতের মুঠোয় বাসুর দেওয়া দশ টাকার নোটগুলো তখনও একইভাবে ধরা রয়েছে।

পাশের ঘর থেকে সুধা কখন নিঃসাড়ে এ-ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। চৌকাট ছাড়িয়ে ভেতরে এলে আরতি প্রথমে দিদিকে দেখতে পেল। দরজার দিকে রত্নময়ীর পিঠ, তিনি সুধার আবির্ভাব লক্ষ্য করতে পারলেন না। বাসুও অন্যমনস্কতার জন্যে প্রথমে দিদিকে দেখে নি, পরে দেখল। দেখে বিন্দুমাত্র খুশী হল না, বরং মেজাজ আরও বিশ্রী হয়ে উঠল। প্রচণ্ড এক তিক্ততা এবং বিরক্তি অনুভব করল। দিদির উপস্থিতি তার যেন বরদাস্ত হচ্ছিল না। মানুষ

যেমন প্রবল বিপক্ষ দলের ব্যূহ দেখলে পালাবার চেষ্টা করে, বাসু সেইরকম ভঙ্গিতে চলে যাবার চেষ্টা করল।

রত্নময়ী চলে যেতে দিলেন না। পথ আগলালেন, 'যাচ্ছিস কোথায়? কথার জবাব দিয়ে যা।'

বাসু দাঁড়াল। বলল, 'তোমার সবতাতেই সন্দেহ। আমি বলছি টাকা চুরি করিনি, তবু সেই এক কথা।'

'চুরি ছাড়া আর কি তুমি করতে পার—?' সুধা কথা বলল। রত্নময়ী মেয়ের গলা শুনে পিছু ফিরে তাকালেন। বড় কঠিন বিরক্তভাবে সুধা দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে অশেষ ঘৃণা এবং তিক্ততা।

বাসু দু পলক দিদিকে দেখল। তার দৃষ্টি থেকে মনে হল, যেন জীবনের সবচেয়ে বড় এবং ঘৃণিত শত্রুকে সে মুখোমুখি চেয়ে দেখে নিচ্ছে। বাসুর মুখ একটু কালচে হয়ে গেল, উত্তেজনায় তার গলা কেমন ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। খুব আচমকা বাসু বলল, 'আমি চুরি করি আর যা খুশি করি, তুমি কথা বলবার কে? তোমার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে না।'

বাসুর বলার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর এমন ইতরের মতন শোনাল যে সুধার সহ্য হল না। রাগ মাথায় চড়ে গিয়েছিল দপ করে। চিৎকার করে উঠল সুধা, 'আমি এ বাড়ির মালিক। এই বাড়ি আমার।'

সুধার গলার তীব্র ঘোষণায় যে দম্ভ অধিকারের দাবী প্রকাশ পেল, বাসুর তা সহ্য হল না। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা মেয়েছেলে গলা ফুলিয়ে ধমকে তাকে থামিয়ে দেবে? বাসুর গায়ের চামড়া জ্বালা করে উঠল, চোখ কর-কর করতে লাগল। হাত কোমরে তুলে বাসু হিংস্র পশুর মতন দিদির দিকে তাকাল। 'তুমি মালিক—।'

'হ্যাঁ, আমি—' সুধাও রাগে বেহুঁশ, জ্ঞানহীন, তার জিবের ধার শন শন করছিল, 'আমি মালিক।'

'না, তুমি নও। তোমার কোনো এক্তিয়ার নেই—' বাসু গলা ছেড়ে কুৎসিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল। মুহূর্তেই তার কি মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, 'অত ফুটানি তুমি করো না, এ-বাড়ির রসিদ আছে তোমার নামে?'

সুধা কল্পনাও করতে পারে নি, বাসু তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এত বড আস্ফালনের কথা বলতে পারবে। বাসুর কথাটা যেন চাবুকের মতন তার মনে লাগল। অপমানে সর্বাঙ্গ জলে গেল সুধার। কি বলবে না বলবে ঠিক করতে না পেরে মুখের ডগায় অদ্ভুত কয়েকটা ধ্বনি তুলে শেষাবধি সুধা বলল 'এ-বাড়ির ভাডা আমি দি।' বলেই কেমন ক্ষোভ দুঃখ, অপমানের প্রবল উত্তেজনায় রুদ্ধস্বর হয়ে বলল, 'ছোটলোক চামার কোথাকার।

বাসু হুঁশিয়ার করে দিল সুধাকে, গালাগাল দিয়ো না। আমি তোমার চোখ রাঙানি কেয়ার করি না।'

সুধা রত্নময়ীর দিকে তাকাল, তার সবমুখে যাতনা, অপমানের দাহ, রাগে সুধা কাঁপছিল, গলার স্বর যেন ছিলে উঠে চিকন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, 'তোমার ছেলের কথা শুনছ।' রত্নময়ীকে সচেতন করে দিয়ে সুধা ভাইয়ের দিকে তাকাল, 'আমার পয়সায় খেতে তোমার গলায় আটকাব না, চোখ রাঙানি সইতেই যত গায়ে লাগে।

'আমি তোমার পয়সায় খাই না। বাসু দিদির গলার চেয়ে উঁচু পরদায় চেচিয়ে উঠল, রাগে তার চোখ কাচের মতন ঝকঝক করছে, 'তোমার মতন মেয়ের পয়সায় খেতে আমি হেট্ করি। আমি মুতে দি তোমার পয়সায়।'

'বাসু - !' রত্নময়ীরও যেন আর চেতনা ছিল না কর্কশ গলায় ধমকে উঠে তিনি ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হল, এই মুহূর্তে বাসুর গালে ঠাস করে এক চড বসিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, তিনি হাত তুলেছিলেন—কিন্তু বাসু মাথা সরিয়ে নিয়েছিল। বেত খাওয়া রাগী কুকুরের মতন সে তখন তেড়ে উঠেছে। বলল, 'আমার ওপর তুমি তম্বি করছ কেন—। তোমার মেয়ের লম্বা লম্বা বাত আমায় শুনতে হবে। ওর কি রাইট আছে আমায় কথা শোনাবার।'

রত্নময়ী দিশেহারার মতন কি বলবেন কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না হয়ত এই ঔদ্ধত্য এবং ইতর কথাবার্তার জন্যে বাসুর গায়ে তিনি আবার হাত তুলতেন, হয়ত আহত অভিমানে কেঁদে ফেলে ছেলে মেয়েদের চুপ করতে বলতেন—কিন্তু তাঁকে কিছু বলতে হল না, সুধা এগিয়ে এসে কথা বলল,

'এ-বাড়িতে থাকতে হলে আমার কথা তোমায় শুনতে হবে। না শুনতে চাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে।' নির্দ্বিধায় সুধা ডান হাতটা তুলে দরজার দিকে বাড়িয়ে দিল, তর্জনি স্থির।

অসম্ভব। বাসুর মনে হল, এ সম্ভব নয়। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে দিদি আঙুল তুলে দরজা দেখাবে—এ অসম্ভব। কিন্তু দিদি বাস্তবিকই তাকে দরজা দেখিয়ে দিচ্ছে। খানিক সময় বিভ্রম এবং অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকার পর বাসু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের আঘাত অনুভব করতে পারল। ঘাড়ের পাশে কানের কাছটা যেন আগুনের তাপ লেগে যেন গরম হয়ে গেছে। কপালের পাশে রগ দপ দপ করে উঠল। পশুর মতন তাকে হিংস্র হীন দেখাচ্ছিল। 'মুখ সামলে কথা বলো বলছি তোমার রোওয়াব বাসু ভটচায সহ্য করবে না। এই বাড়ি থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবার তুমি কে? হু আর ইউ?'

সুধার মন আজ স্থির করা হয়েছে একটা শেষবেশ সে করবেই। তার জেদ, রাগ, ঘৃণা ক্রমশ তাকে অবিবেচক দৃঢ় করেছে। সে নীরব থাকল না, সমান গলায় জবাব বলল, 'এ-বাড়ি আমার।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ। এ-বাড়ির ভাড়া আমি দি। এই সংসারের হাঁড়িতে যে চাল-ডাল চটকানো হয় তার টাকা আমার দেওয়া।'

বাসু কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। শেষের দিকের কথাগুলো তার কাছে অত্যন্ত নির্মম বলে মনে হল। সামান্য কয়েক পলক কেমন বোকার মতন দিদির দিকে তাকিয়ে থাকল বাসু। 'টাকা তুমি একলা দাও না, আমিও দি।'

'তুমি দাও—' সুধা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়াচ্ছে এমন মুখ এবং গলা করে কথাটা বলল, 'তুমি যে কি দাও আমার জানা আছে।'

'দু বেলা দুটো ডাল ভাত আর শুকনো রুটির জন্যে কি তোমায় শ দুশো টাকা দিতে হবে? একটা পেটের জন্য যা দি—অনেক দি।'

'একটা পেট! কেন একটা পেট কেন? মা বোন তোমার নয়?

আমার পেটের জন্যে তোমার কাছে আমি হাত পাতব না মরে গেলেও, কিন্তু মা আর আরতির পেট ভরাবার ভার তোমার নয়? স্বার্থপর জানোয়ার কোথাকার। শুধু নিজেদের ভাল, আর কারও ভাবনা ভাববার দরকার তোমার নেই, না—?

বাসু নীরব। তার ইচ্ছে হচ্ছে, চিৎকার করে বলে, মা-কে তুমি কি করে খাটাচ্ছ, আরতিকে তুমি তোমার পুরোনো পচা ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরিয়ে রেখেছ। আমার যদি সামর্থ্য থাকত, একটা চাকরি থাকত ভাল, তোমার চেয়ে এদের আমি ভদ্রলোকের মতন করে রাখতাম। আমার কিছু নেই, আমায় কেউ চাকরি দিচ্ছে না তাই না তোমার মতন মেয়েছেলের জুতো খেলাম আজ।

গলার কাছে ভয়ঙ্কর এক বেদনা বোধ করল বাসু, তার মনে হল, মা এবং আরতির সামনে দিদি বাস্তবিক তার দু গালে জুতো পেটা করে ছেড়ে দিল। মা দেখল, আরতি দেখল। শরীরে ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তি এবং কষাঘাত অনুভব করছিল বাসু। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

রত্নময়ী নির্বাক। আরতি অসহায় ও ভীরুর মতন দাঁড়িয়ে আছে।

এই পাথরের গুহের মতন আবদ্ধ নীরবতার মধ্যে সুধা শীর্ণ ক্লান্ত গলায় হঠাৎ বলল, 'আর ক'দিন—। যে ক'দিন আমি বেঁচে আছি আমার ওপর দিয়ে করে নাও। তারপর বুঝবে'

বাসু কোনো কথা বলল না। রত্নময়ী এতক্ষণ দুই সন্তানের রেষারেষি ঝগড়া শুনছিলেন। একে অন্যকে যেন দাঁত নোখ দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করছিল। এই ঝগড়ার মধ্যে রত্নময়ী তাঁর দুই সন্তানের চেহারা বুঝি আরও স্পষ্ট করে দেখতে পারছিলেন। সুধা শুধু এই সংসারের ওপর বীতরাগ নয়, এই বাড়ির ওপর তার কর্তৃত্ব যে সবার চেয়ে বেশী এ-কথাটা জেনে ফেলেছে। সে তার আশ্রিত যে কোনো মানুষকে দরজা দেখিয়ে দিতে পারে। একদিন, রত্নময়ীর মনে হল, তিনি যখন থাকবেন না, সুধা তার ভাই বোনকে দরজা দেখিয়ে দেবে, বলবে—'যাও, আর নয়।'

রত্নময়ীর চেতনায় এবং অভিমান-বোধে সুধার এই কর্তৃত্বের দম্ভ বড় বেশী

করে লেগেছিল। যে নিজেকে এ-বাড়ির মালিক বলেছে, সে বাড়ি ভাড়ার টাকা এবং পেটের অন্ন দেয় বলে নিজেকে মালিক বলে ভাবে। রত্নময়ী জানতেন, মনে মনে সুধার এই ঔদ্ধত্য আছে—তার আচার আচরণে এটা প্রকাশ পেত, কিন্তু সকলের কাছে মুখ বাড়িয়ে সুধা তার অধিকারের দাবী ঘোষণা করবে—রত্নময়ী যেন কল্পনা করেন নি। তাঁর খারাপ লাগছিল, কষ্ট হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সুধা যেন তাঁকেও এই সুযোগে সরল সত্য কথাটা জানিয়ে দিল। নিজেকে অপমানিত বোধ করছিলেন রত্নময়ী।

বাসুর কথাবার্তা আচার আচরণ তার অসহ্য লেগেছিল, কিন্তু এখন কী এক নিভৃত মমতা এবং সুধার প্রতি ক্ষুণ্ণতার জন্যে তার মনে হচ্ছিল, বাসু এমন কি মন্দ কাজ করেছে, সুধার এতখানি বেহায়াপনা এবং দেমাকের পর কড়া কড়া কথা কোন মানুষ না বলে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বাসু কি সুধার অন্ন খায়? সংসারে সে কি একেবারে ফাঁকা হাতে দু'বেলা খাচ্ছে না। গোটা মাসের খুচরো খরচগুলো যোগ করলে দেখা যাবে—মাসে তিরিশ চল্লিশ টাকা সে সংসারে দিচ্ছে। সুধা এ-সব বড় হিসেব রাখে না। রাখবার কথাও নয়। কিন্তু রত্নময়ী জানেন। তাঁকে নিতে হয়, আদায় করেই নিতে হয় বেশীর ভাগ সময়, তবু ধর্মত সেটা ত বাসুই দেয়।

এই যে পঞ্চাশটা টাকা- এই টাকা দিয়ে কি হবে সুধা কি জানে? জানে না। রত্নময়ীকে বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে দু'মাসের। আরও কটা টাকার দরকার। বাড়িওলা পুজোর মুখে টাকা না পেলে আর কোনো কথা শুনবে না রত্নময়ী কথা দিয়েছেন, তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। মেয়েকে কিছু বলা যায় না, বললে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যায়, কাজেই বাসুকে গত কয়েক দিন তিনি উঠতে বসতে খেতে শুধু তাগাদা দিয়েছেন। কোথা থেকে কেমন করে টাকা আনবে বাসু তিনি ভাবেন নি, ভেবে কোনো লাভ ছিল না বলেই ভাবেন নি, অনোন্যপায় হয়ে অবিবেচকের মতন তিনি দু বেলা কেবল ছেলেকে উত্যক্ত করেছেন।

অবশ্য তাঁর ধারণা ছিল না, বাস্তবিকই বাসু পঞ্চাশটা টাকা এনে দেবে। বড় জোর বিশ পঁচিশ টাকা আশা করেছিলেন রত্নময়ী, ভেবেছিলেন বাকিটা

সংসার খরচের টাকা থেকে আপাতত দিয়ে দেবেন, এবং পুজোর মুখে আরতির হারটা মথুর স্যাকরাকে বেচে দেবেন। আর ত আট দশ দিন বাকি পুজোর। সংসার এমনিতেই যখন অচল, তখন শত কষ্ট হোক, এবার পুজোয় মেয়েদের দুজনকে দু'খানা শাড়ি এবং বাসুকে একটা ধুতি কিনে দেবেন। একটা এক ভরি কি সিকি ভরির হার বাড়িতে রেখে আর কি লাভ! সব যখন গেছে - ওটাও যাক। তবু ওই এক দানা সোনার বদলে বছরকার দিনে ছেলেমেয়েগুলো নতুন বস্ত্র গায়ে তুলুক।

রত্নময়ীর অন্যমনস্ক চিন্তার মধ্যে সুধা কখন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাসুও অনেকক্ষণ কাঠগড়ার আসামীর মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। রত্নময়ীর নজরে পড়ল। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে রত্নময়ী ছেলের দিকে তাকালেন, দু' মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ভাঙা চাপা গলায় বললেন, 'তোর যদি লজ্জা শরম বলে কিছু থাকে, এ-বাড়িতে থাকতে খেতে হলে আগে খরচা গুনে দিবি তোর দিদিকে, নয়ত ভাত পাবি না কাল থেকে, মনে রাখিস।'

বাসু কথা বলল না মা-র আহত ক্ষুব্ধ কাতর এবং ব্যথার্ত মুখ চেয়ে চেয়ে দেখল। তার মনে হল, মাকে দিদি যেন গলা ধাক্কা দিয়ে তার কাছে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

দেওয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল বাসু। দেওয়ালটা টিমটিমে আলোয় কদর্য দেখাচ্ছিল, শুকনো ঘাসের মতন হলুদ, মাঝে মাঝে সুরকি বালি খসেছে, দাগ ধরা, কাচ ভাঙা রাম সীতার ছবিটা হেলে রয়েছে, ইলেকট্রিক তারের ফাঁকে টিকটিকি। নোংরা ভ্যাপসা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাসুর কেন যেন ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, দিদি তাকে সত্যিই এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাবা নেই, মা বেচারী অক্ষম, দিদি আজ তাই বাড়ির মালিক হয়ে তাকে দু'গালে দুই জুতো মেরে রাস্তায় বের করে দিল।

বাসু কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রত্নময়ী পরিত্যক্ত মানুষের মতন বসে থাকলেন। তাঁকে অত্যন্ত নিঃস্ব

ভগ্নমন দেখাচ্ছিল। শূন্য দৃষ্টি, আহত অভিমান-ক্ষত মুখ। আরতি মা-কে দেখছিল; তার কষ্ট হচ্ছিল খুব, কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না। এক সময় উবু হয়ে বসে বিছানার ময়লা তোশকটা ঠিক করতে লাগল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রত্নময়ী উঠলেন এক সময়। হাতের টাকাগুলো কেন যেন একটু বেশী রকম জোরে মুঠোর মধ্যে চেপে ধীর পায়ে চলে গেলেন।

ঘরে বাতি জ্বলছিল না। জানলা খোলা। অন্ধকার গুমোট হয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাসু বিছানায়—তক্তাপোশে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। নীচে মাটিতে পাতা ছোট বিছানায় আরতি শুয়ে। কেউ ঘুমোয় নি, এই মাত্র বাসু বাতি নিবিয়ে বিছানায় এসে শুয়েছে।

সামান্য সময় কেউ কোনো কথা বলল না। বাসু মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার সময় বাতাসের একটা হিসহিসে শব্দ করছিল। শব্দটা বুক ভরা নিশ্বাস ফেলার মতন অনেকটা। যেন কিছু একটা তার বুকে আটকে রয়েছে, কোনো চাপ কিংবা ভার অথবা কাঁটা কি ব্যথা—এবং বাসু তা বুক থেকে পরিষ্কার করে ফেলার চেষ্টা করছে।

'আরতি-' বাসু সহসা ডাকল।

আরতি ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দে সাড়া দিল।

দু মুহূর্ত নীরব থেকে বাসু বলল, 'লাটের মতন কী রকম বাত চিত দেখলি দিদির, বলে আমায় তাড়িয়ে দেবে!'

আরতি জবাব দিল না। বালিশের কোল থেকে গাল তুলে অন্ধকারে চেয়ে থাকল।

'আমার সঙ্গে ডাঁট কষতে এসেছিল, জবাব পেয়ে গেছে।' বাসু স্বগতোক্তির মতন বলছিল, 'মেয়েছেলে রোওয়াব নিয়ে থাবে—আমি শালা মরদের বাচ্চা হয়ে দেখব, ও সব হচ্ছে না।...তুমি চাকরি করো তো করো—আমার কি: তা বলে তুমি মাথায় চড়ে বসবে! সে সব হচ্ছে না।'

আরতির ইচ্ছে হল বলে, সমস্ত অশান্তির বারো আনা তোমার জন্যে দাদা। তুমি একটা চাকরি বাকরি করলে দিদি এতখানি রাগারাগি করত

না, মাকেও উঠতে বসতে তোমার জন্যে কথা সইতে হত না। আসলে দিদির রাগ কেন বোঝ না? আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকি, সে চাকরি বাকরি করে। যারা চাকরি করে তারা, যারা চাকরি করে না তাদের ওপর রেগে থাকে সব সময়।' ইতুর বাবা ইতুর দাদার ওপর দুবেলা কি রকম তম্বিই না করে, কথায় কথায় গালিগালাজ করছে, একদিন দু'পলা বেশী সরষের তেল নিয়ে গায়ে মেখেছিল বলে ইতুর বাবা ছেলের পিঠের ওপর কয়েক ঘা চটি বসিয়ে দিয়েছিল। তবু ত ইতুর দাদা পাগলা, হাবা গোবা, তার কাজ করার ক্ষমতা নেই।

সেই ইতুর দাদা এখন বাজারে ফটকের কাছে আলুর দোকান দিয়ে বসেছে। ইতু বলছিল, মা লুকিয়ে ক'টা টাকা দিয়েছিল দাদাকে, সেই টাকাতে আলুর ব্যবসা করছে দাদা।

আরতি ইতুর দাদার কথা ভেবে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

বাসুর সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। শেষ টান দিয়ে বিছানার পাশে ঝুঁকে পড়ে পোড়া টুকরোটা নিবিয়ে দিল মেঝেয় টিপে টিপে। আরাম করে আবার শুয়ে পড়ল।

'কি রে, তুই কথা বলছিস না যে বড—' বাসু বলল।

সাড়া দেবার মতন শব্দ করল আরতি, সে যে কী বলবে জানে না।

'দিদিকে তুই খুব ভয় পাস।' বাসু এমন ভাবে বলল কথাটা, যেন দিদির ভয়ে আরতি কিছু বলছে না। সামান্য থেমে আবার বলল, 'মাও দিদির ভয়ে জুজুবুড়ি হয়ে আছে। তোদের কারবার আমি বুঝি না।'

'দিদি আমার বড়।' আরতি বলল।

'বড় ত কি, বড় বলে লাট নাকি' বাসু যেন ধমকে উঠল।

আরতি অল্পক্ষণ নীরব থেকে মৃদু গলায় বলল, 'আমি সকলের ছোট, গুরুজনের মুখে মুখে কথা বলা আমার সাজে না।·· তা ছাড়া আমি ত সত্যিই গলগ্রহ দিদির।' শেষের কথাটা খুব খাপছাড়া উদাস করুণ শোনাল।

বাসু অন্ধকারে কেমন এক অবহেলার শব্দ করল, হয়ত মুখে তার ইতর রকম হাসি ফুটেছিল, যা দেখা যায় না। বলল, 'গুরুজন না আমার···' বাসু

বলতে বলতে চেপে গেল, তার মুখে অশ্লীল একটা শব্দ এসে গিয়েছিল। কোনো রকমে সামলে নিল। একটু অন্যমনস্কর মতন বলল, 'মা বাবা ছাড়া আবার গুরুজন কি! আমি আর কাউকে কেয়ার করি না।'

আরতি কথা বলল না। পাশের ঘর থেকে দিদির কাশির শব্দ আসছে। আজ এত চেঁচামেচি করে গিয়ে গলায় লেগেছে নিশ্চয়, খুব কাশছে। মা আর বাবা রাত ঘুমোতে পারবে না। মার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল আরতির। সারা দিন খাটছে, যত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা বয়ে বয়ে এমনিতেই মাথা গরমের ধাত হয়ে উঠেছে, তার ওপর অর্ধেক রাত দিদির জন্যে ঘুমোতে পারে না। এ-ভাবে আর কতকাল বেঁচে থাকবে মা! একদিন মরে যাবে।

মা মারা যাবে—কথাটা ভাবতেই আরতির বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। জলভর্তি গামছা নিংড়ে যেমন করে জল ঝরায় মানুষ, ঠিক যেন তেমনি করে বুকের সমস্ত যন্ত্রণার অংশটুকু কেউ নিংড়ে নিংড়ে দিচ্ছিল। ভয়ঙ্কর ফাঁকা লাগে সেই ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে দাঁড় করিয়ে আরতি অনুভব করতে পারল, এই বাড়ি এই সংসার একেবারে শূন্য। কেউ নেই, তার কেউ আছে বলে মনেই হয় না।

বাসু গলার মধ্যে এক শব্দ করল, শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার মতন শব্দ। বলল, 'দিদি যে অত গলাবাজি করে কথা বলে—কি সুখে রেখেছে তোদের? লাঙরখানায় গিয়ে দাঁড়ালে অমন জুটো পাপসি খেতে পাওয়া যায়।

আরতির কথাটা ভাল লাগল না। জবাব দিল, 'দিদি ত নিজে রাজভোগ খাচ্ছে না।'

কান পেতে কথাটা শুনল বাসু। বিদ্রূপ গলা করে বলল, 'যা রে যা! খাচ্ছে না—। রাজভোগ না হয় খাচ্ছে না, কিন্তু ওর দুধ দু চারটে ফল পাকড় যা আসে বাড়িতে কার পেটে যায় বাবা?'

হ্যাঁ, দিদির জন্যে গত ক'মাস দুধের বরাদ্দ হয়েছে, জলো দুধ এক পো করে। আধ সের করে কদিন খেতে হয়েছিল, টাকা সের দুধ—মা কুলোতে পারছিল না, দিদিও খেতে চাইছিল না, ফলে এক পো করে দুধ থাকে দিদির খাওয়ার জন্যে। এ ছাড়া মাঝে মধ্যে মা যা কিছু ভাল মন্দ

ব্যবস্থা করতে পারে দিদিকে দেয়। এ-সবই দিদির শরীরের জন্যে, ডাক্তার বলেছে।

'দিদির যে অসুখ।' আরতি বলল। ওর গলার স্বরে ক্ষুণ্ণতা।

'অ—সুখ।' বাসু ভেংচে উঠল, দাঁতে দাঁত দিয়ে জিব চেপে বিশ্রী একটা শব্দ করল, বলল, 'মাসের পর মাস ওর অসুখ। ও-সব পট্টি তোদের কাছে দিক, আমার কাছে যেন না দিতে আসে; এমন অসুখ আমি অনেক দেখেছি।'

সুধা তখনও পাশের ঘরে থেকে থেকে কাশছে। মা-র গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। মা নিশ্চয় উঠে বসেছে, কিছু বলছে দিদিকে। আরতির বিন্দুমাত্র ভাল লাগছিল না। দাদাটা কী! দিদির অসুখ তাতেও ওর গ্রাহ্য নেই, দুঃখ নেই। আরতির রাগ হচ্ছিল, বলল, 'দিদি কি শখ করে অসুখ পুষে রেখেছে।'

'আলবাৎ।' গলায় প্রবল জোর দিয়ে বাসু বলল। ও-সব ভড়কিতে আমি বাবা ভুলি না। বাড়িতে কুটো কাটবে না, কি না রোগ হয়েছে আমার; আর এদিকে ডাক্তারখানায় যাবার নাম করে ওই ফুকো ডাক্তারটার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরে আসছে।'

আরতি বিছানার মধ্যে শুয়ে শুয়ে শিউরে উঠল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, আরতি তবু বাসুর বিছানার দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল, দাদার স্বভাব অনুমান করবার চেষ্টা করল, তার নিশ্বাস বন্ধ, কেমন চিন চিন করে উঠল মাথার মধ্যে।

বাসু আরও অবহেলায় বেপরোয়া গলায় আবার বলল, 'সাফ কথা হচ্ছে দিদি চাইছে সে একটা ছোঁড়াকে বিয়ে করে এ-বাড়ি' থেকে কেটে যাক্! একটু থামল বাসু, নিশ্বাস নিল বোধ হয়, 'ওর সিধে বাত—আমি আমারটি নিয়ে চললাম, তোমরা তোমাদের বুঝে নাও।'

আরতি শুয়ে শুয়ে আঙুল মটকাল। ভয়ে না বিফল হয়ে কে জানে।

'তা, যাক্ না। চলে যাক।...ও চলে গেলে আমরা না খেয়ে মরব না।' কেমন একটা শব্দ হল তক্তপোশে, মনে হল কথা বলতে বলতে বাসু বিছানার

আরতি কান খাড়া করে শুনছিল। দাদা থামবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সিকদারবাড়ির সঙ্গে দাদার একটা চেনা-জানা হয়েছে; না হলে, হুট করে দাদাকে ওদের গাড়ির অ্যাঙেলবাবুর পাশে বসতে দিত না। কিন্তু এত জানা-শোনা হয়ে গেল দাদার সঙ্গে ..

একেবারে আচমকা আরতির কেন যেন হঠাৎ আজকে দাদার আনা পঞ্চাশটা টাকার কথা মনে পড়ে গেল। সিকদারবাড়ির বাবুদের সঙ্গে এই টাকার একটা সম্পর্ক ধাঁধার মতন তার চোখে ভাসতে লাগল। আরতি কিছুতেই সেই ধাঁধার রহস্য উদ্ধার করতে পারল না।

মন উসখুস করছিল। একবার ইচ্ছে হল, দাদাকে জিজ্ঞেস করে কথাটা, সাহস হল না। যে-রকম চড়া মন মেজাজ নিয়ে রয়েছে ও হয়ত এখুনি খেপে যাবে, যা তা বলবে। তার চেয়ে না জিজ্ঞেস করাই ভাল।

কিন্তু মা এবং দিদির মতনই আরতি স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, এই টাকাটা কখনো দাদার সৎ উপার্জন নয়। হতেই পারে না। হয় চুরি করেছে, না হয়—। না হয় কি করে দাদা টাকাটা বাগিয়েছে আরতি ভেবে কূল পাচ্ছিল না।

দিদি বোধ হয় আবার শুয়ে পড়েছে। থেমে থেমে কাশির শব্দ হচ্ছে, আগের মতন অত ঘন ঘন এবং জোরে নয়। মা দিদির বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না আরতি বুঝতে পারল না। খানিকটা আগে মার গলা শোনা গেলেও এখন আর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

গায়ের আঁচলের প্রান্ত পেটের কাছে সায়ার দড়ির মধ্যে গুঁজে পা গুটিয়ে পাশ ফিরল আরতি। তার শোওয়া নাকি ভাল নয়, সাড়ি শায়া ঠিক থাকে না। এই ভাবে সতর্ক হয়ে সে শোয়।

ঘুম পাচ্ছিল আরতির। চোখ বুজে সে ঠাকুর প্রণাম করল। মার শিব আর পাড়ার মঙ্গলচণ্ডী—দুইই তার প্রণম্য। ঘুমোবার আগে রোজ মনে মনে ঠাকুর প্রণাম করার সময় সে এই দুই মূর্তিকে তার প্রার্থনা জানায়। মা দিদি দাদা সকলের মঙ্গল কামনা করে, এবং শেষে নিজের জন্যে একটা চাকরি চায়।

আজ চাকরির প্রার্থনা একটু বেশীক্ষণ ধরে করল। গৌরাঙ্গদা প্রায় মাস খানেক আগেও বলেছে, হবে—চাকরি হবে, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেই চাকরিটা কেন এত দিনেও হচ্ছে না—আরতি কাতর ভাবে ভগবানের কাছে সেই নিবেদন জানিয়ে বলল, আমায় যেমন তেমন একটা কাজ জুটিয়ে দাও, ঠাকুর ; আর কিছু চাইব না কখনও।

প্রার্থনা করতে করতে আরতি কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

বাসু জেগে ছিল। তার ঘুম আসছে না। নীচের বিছানা থেকে কোনো সাড়া শব্দ আসছে না দেখে বাসু বুঝতে পারল, আরতি ঘুমিয়ে পড়েছে। বাসুর একটু রাগই হল ; আরতিটা ভীষণ ঘুম কাতুরে, বিছানায় গা দিলেই ঘুমে টলে পড়ে।

আরতি ঘুমিয়ে পড়ায় বাসুর অস্বস্তি হচ্ছিল। বস্তুত, এখন সে একা, একা একা কথা বলা যায় না, আরতির অভাবে বাসু আর কোনো কথাই বলতে পারছে না, অথচ তার যেন বলবার কথা এখনও অনেক বাকি ছিল. বলা হল না বলে কথাগুলো একটা খোলা পুঁটলির মতন তার হৃদয়কে ছত্রাকার অপরিচ্ছন্ন করে রেখেছে।

চুল আঁচড়াবার সময় বা দাড়ি কামাবার সময় মুখের সামনে একটা আয়না যেমন নিজেকে দেখার জন্যে প্রয়োজনীয়, বাসুর কাছে আরতির জেগে থাকা তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল। এখন, আরতি ঘুমিয়ে পড়ায় বাসু ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করছিল।

এক ধরনের অপ্রসন্নতা আছে যা ঘোলা জলের মতন মনের সবটুকু অপরিষ্কার করে রাখে। কোনো কিছু স্থির ভাবে অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবতে দেয় না। বাসু সেই রকম অপ্রসন্নতা বোধ করছিল। দিদির কাশির খুক্ খুক্ শব্দ তার বিরক্তি আরও বাড়াচ্ছিল। আরতি ঘুমিয়ে পড়েছে—এ যেন আরতির দোষ, আরতির ওপর বাসু চটে যাচ্ছিল। এই অন্ধকার. সারা বাড়ির নিস্তব্ধতা সবই তার কাছে অসহ্য লাগছিল।

অন্ধকারে চোখ মেলে বাসু একবার উমার কথা ভাববার চেষ্টা করল। কেন করল সে জানে না। দিদির সঙ্গে ঝগড়ার পর যখন নীচে কলঘরে মুখ

হাত ধুতে গিয়েছিল—তখন উমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছে। উমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সে কি ওপরতলার ঝগড়া শুনছিল? বাসুর কথাবার্তা সে শুনেছে? অবশ্য বাসু উমাকে অগ্রাহ্য করে কলঘরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়েটা অমন ভাবে কান বাড়িয়ে তাদের ঘরের কথা শোনে কেন? সুযোগ পেলে একদিন এই কথা নিয়েই সে বাসুকে ঠুকবে। বাসু বিরক্ত হচ্ছিল।

উমার চিন্তা থেকে তার মন পরমুহূর্তে সরে গিয়ে গৌরাঙ্গর চিন্তায় মগ্ন হল। গৌরাঙ্গ আজ চারদিন তার বউ আর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। ওর শ্বশুর মরেছে, সেই শোকে বউও ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছে। গৌরাঙ্গ মাকুর মতন একবার ছুটছে শ্বশুরবাড়ি—একবার ফিরছে নিজের বাড়ি। বউটাকে বাপের কাছে দিয়ে এলেই হয়—তা না। যত সব পুত পুত। বউয়ের বাচ্চা হবে—এটা বুঝি বিজোড় মাস, বিজোড় মাসে গৌরাঙ্গর বাবা মা বউকে কোথাও যেতে বা থাকতে দেবে না। গৌরাঙ্গর কথা শুনে বাসু বলেছে, বউয়ের পেট ফোলাবার সময় শালা জোড় বিজোড়ের কথা মনে ছিল না!

আসলে বাসুর রাগ গৌরাঙ্গর ওপর অন্য কারণে। শ্বশুর আর বউয়ের দোহাই দিয়ে গৌরাঙ্গ এবারে বাসুর কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চাইছে। টাকার কথা শোনা মাত্র এমন একটা ভাব করেছে যেন শালার সামনে শ্বশুরের শ্রাদ্ধর খরচ আর বউয়ের আঁতুড়ের বোঝা। খুব বিপদ-ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বেটা ভাল করে কথাটা শুনতেই চাইছে না। নয়ত ধরে পড়লে বিশ পঁচিশটা টাকা গৌরাঙ্গই দিতে পারত। দিলে আজ এ-অবস্থা হত না।

বাসু চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। মাথা বেশ গরম হয়ে গেছে। তার গলার তলায় নানা রকম কথা সুতোর জটের মতন জট পাকিয়ে রয়েছে। সে কিছু বলতে পারছে না। তার কথা শোনাবে এমন কেউ নেই।

একটা বিড়ি খাবার ঝোঁক হল বাসুর। ভাবল, জল এবং বিড়ি খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়বে। ভাবা সত্ত্বেও বাসু অনেকক্ষণ উঠল না বিছানা ছেড়ে। তারপর এ-পাশ ও-পাশ করে উঠে পড়ল। বাতি জ্বালল। ঘরের এক কোণায়

জল। বাসু দু গ্লাস জল খেল, জল খাওয়ার সময় বুঝতে পারল, আজ রাগারাগির পর সে প্রায় কিছুই খায় নি, ফলে পেট বেশ খালি, জল পেটের মধ্যে কল কল শব্দ করে উঠল। একটা মোচড় দিল নাভির কাছে।

পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরিয়ে নিতে নিতে বাসু কেমন শব্দ শুনে আরতির দিকে তাকাল। ঘুমের মধ্যে আরতি বিড বিড় করে কি দুটো কথা বলে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। বাসু একটু অবাক চোখে আরতির মুখ লক্ষ্য করল। আরতির চোখের ভুরু এবং গালে কেমন ভয় ভয় ভাব কোঁচকানো দাগ ফেলেছে। ঠোঁট খোলা, সামনের দুটি দাঁত অল্প একটু দেখা যাচ্ছে, কপালের ওপর কিছু চুল লেপটে গেছে।

ভয় অথবা দুঃখ কি অভিমানের রেখা আরতির মুখ থেকে ক্রমে মিলিয়ে এল। বাসু ভাবল, আরতি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিদির ধমক শুনছে! হয়ত।

বাসুর এখন কেন যেন আরতির জন্যে মমতা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে আরতিকে—বিশেষ করে আরতির চোখ দেখলে বাসুর মনে হয় মেয়েটা একেবারে পলকা গোবা-গাবলা; কোনো জোর নেই। ভয়ে অস্থির, তাড়া খেলে সরে যায়, ধমক শুনলে মুখ নীচু করে থাকে। এত ভীরু কেন আরতি, কেন ওর মনে একটু সাহস নেই?

দিদির মতন খাড়া ধরা মেয়েছেলে না হোক আরতি খানিকটা দিদির মতন হতে পারত। দিদির—! বাবা, আর যত দোষই থাক বেজায় জোর আছে মনের, সাহসও। বাসু সহসা যেন খুব বিচক্ষণের মতন ভেবে দেখল, দিদির এবং তার—দুই ভাই বোনেরই রক্তে বেশ তেজ আছে। কথাটা ভেবে বাসু নিজেকে যেন একটু ঠাট্টা করে ঠোঁটের ফাঁকে শীর্ণ হাসল।

বাতি নিবিয়ে, বিড়ির টুকরো ফেলে দিয়ে বাসু আবার শুয়ে পড়ল।

সমস্ত বাড়ি অঘোর ঘুমে। দিদির খুক্‌খুকে কাশিটা থেমে আছে। পাড়ার অলিগলি কোথাও একটু শব্দ নেই। অতি দূরে আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজের ভাঙা গলার ভোঁ কদাচিত ভেসে আসছিল। বাসু বালিশের ওপর মাথা রগড়ে এ-পাশ ও-পাশ করে হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে, দু হাত দিয়ে বালিশটা আঁকড়ে এ-ভাবে সে মাঝে মাঝে শোয়,

যখন আর কিছু ভাল লাগে না, মনের তলায় একটা শক্ত লোহার শিক খোঁচা মারতে থাকে তখন এই ভাবে শুয়ে কোথাও যেন কোনো অজ্ঞাত আশ্রয়দাতার পায়ে মাথা গুঁজে সে আঘাতটা সহ্য করে নিতে চেষ্টা করে।

আজ এতক্ষণে বাসু স্পষ্ট তার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছিল। দিদি আজ তাকে অপমানই করে নি শুধু একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। সে আর দিদির ভাই নয়। দিদির সংসারে সে বাসু অবাঞ্ছিত আজ স্পষ্ট করে তা জানা গেছে। দিদি তাকে ঘেন্না করে, তাকে ইতর এবং চামার ভাবে। তার জন্যে মা-কে ঠুকে ঠুকে কথা শোনায়, গায়ের চামড়ায় ফোস্কা পড়ে যায় এমন সব অপমান করে।

মাও তার জন্যে অসুখী। মারও শান্তি নেই বাসুর জন্যে। বাসু এমন কি করছে যার জন্যে এত অশান্তি বাড়িতে! মা তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বলেছে, বলেছে খাওয়া থাকার টাকা দিদির হাতে গুণে দিতে না পারলে কাল থেকে তার ভাত জুটবে না।

বহুক্ষণের পুঞ্জীভূত অভিমান এবং দুঃখ যেন গলে গলে বাসুর বুকের তলার বেদনায় পাত্র পূর্ণ করে তুলল। দীর্ঘশ্বাস গলার কাছে উপচে উঠে মুখ এবং নাক দিয়ে বেরিয়ে এল। বালিশে সেই শ্বাসের ভাপ লাগল, বাসু তার উষ্ণতা অনুভব করল। তার চোখের এবং নাকের চারপাশে মাংসের তলায় কেমন একটা কনকনে যন্ত্রণা।

এই কষ্টকর যন্ত্রণা দমাবার আশায় বালিশের কোল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল বাসু, এত জোরে কামড়াল যে বাসুর মনে হল সে কোনো কাঠ কিংবা লোহা কামড়ে ধরেছে।

তারপর এই অবস্থায় বাসু সিকদারবাড়ির ছোটবাবুকে একবার মনে করল। আজ কদিন সে ছোটবাবুর কাছে প্রায় যাচ্ছে আসছে। ছোটবাবুর গাড়িতে চড়ে দু দিন ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে কোথায় কোথায় ঘুরছে বাসু সে-সব রাস্তা ঘাট জীবনেও দেখে নি। কেন যে ছোটবাবু তাকে নামিয়ে দেননি গাড়ি থেকে বাসু জানে না। ছোটবাবু যখন গাড়ি থেকে নেবে কোথাও গেছেন, বাসু গাড়িতে বসে থেকেছে।

স্যাণ্ডেলদা বলেছিল ছোটবাবুর কাছে কাছে থাকতে, ছোটবাবুর ভাল লেগে গেলে কোনো ভাবনা নেই। বাসু যেন সেই কথা শুনে লেগে আছে। লেগে থেকে যদি কিছু হয়।

আজ নারকেলডাঙ্গায় এক গুদোম ঘরের মতন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছোটবাবু নেমে গেলেন, গাড়িটা ছেড়ে দিলেন, স্যাণ্ডেলদাকে বললেন, ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এসে দূরে ওই জোড়া বটগাছটার সামনে দাঁড়াতে। স্যাণ্ডেলদা গাড়ি নিয়ে চলে গেল। তখন সাতটা। ঘণ্টাখানেক বাসু স্যাণ্ডেলদার সঙ্গে এদিকে ওদিকে ঘুরে—দোকানে চা খেয়ে, বিড়ি ফুঁকে আবার আটটা নাগাদ ফিরল গাড়ি নিয়ে নারকেলডাঙায়। ওই রাস্তাটায় বাতি নেই; ঝিম ঝিম করছে অন্ধকার, দূরে কোনো জঙলায় কটা জোনাকি উড়ছিল, গোবর আর নালি নর্দমার গন্ধ, তার সঙ্গে কাঠের গুঁড়োর খসখসে গন্ধ।

জোড়া বটতলায় গাড়ির বাতি নিবিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে স্যাণ্ডেলদা বসে থাকল। কানের কাছে মশা গুন গুন করছে, দু চারটে মশা বুঝি কামড়াচ্ছিল, জঙলার দিকে শেয়াল ডাকছে।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বাসুর মনের মধ্যে কেমন এক ছমছমে ভাব আসছিল। স্যাণ্ডেলদা হুঁ হাঁ ছাড়া কথা বলছে না।

অনেকটা সময় বসে থাকার পর দূরে ছোটবাবুর গলার সাড়া পাওয়া গেল। আলোর একটু ফুটকি জ্বালিয়ে তিনি তাঁর নিশানা দিলেন, এবং আলো নিবিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। বাসুকে তিনি ডাকলেন নীচু গলায়। স্যাণ্ডেলদা বাসুকে ঠেলে দিল।

বাসু গাড়ির দরজা খুলে কেমন আচ্ছন্নের মতন এগিয়ে গেল। সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বুকের মধ্যে দব্ দব্ শব্দ করছিল। দূরে জঙলায় শেয়ালের পাল চিৎকার করছে।

ছোটবাবুর গলার ইশারা জানানো কাশির শব্দে বাসু পা পা করে এগিয়ে গেল। উঁচু ঢিবির মতন একটা জায়গার পাশে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন; বাসু কাছে গেলে বললেন, 'এটা তুলে গাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখ।

সাবধান।' হাতের তালুতে টর্চের মুখ-চাপা দিয়ে ছোটবাবু মিটমিটে আলোয় জিনিসটা পলকের জন্যে দেখিয়ে দিলেন। একটা কালো ট্রাংক। বাসু কুঁজো হয়ে ট্রাংক তুলে নিল। ট্রাংকটা বড় এবং ভারী।

গাড়ির মধ্যে ট্রাংকটা ঢোকানো তার পক্ষে বেশ মুশকিল হয়েছিল। ছোটবাবু পিছনের মাল বওয়া জায়গায় ট্রাংকটা নিতে পারতেন, নিলেন না। পেছনের সিটেই ঢোকাতে হল।

ছোটবাবু বললেন, 'সোজা বাড়ি চলে যাও। আমি খানিক পরে আসছি।'

স্যাণ্ডেলদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। বাসু উঠে বসল। অন্ধকারে পুরোনো গাড়িটা চাপা শব্দ তুলে এগুতে লাগল। তখনও বাসু জোনাকি দেখতে পাচ্ছিল, শেয়ালের পালের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল।

পথে বাসু অনেক ভেবেছে, মাঝে মাঝে পিছনের দিকে ফিরে কালো ট্রাংকটা দেখেছে। ওর মধ্যে কি আছে কি থাকতে পারে—বাসু অনুমান করতে পারে নি। ওটা যে চাল, চিনি, কাপড় নয়—এ বেশ সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ওটা কি? স্যাণ্ডেলদা বোবা, কিছু বলবে না। সে জানে না। জানতে চাওয়া তার অধিকারের বাইরে। বারো বছর সে সিকদার-বাড়ির গাড়ি চালাচ্ছে, তার অধিকার কোথায় কতটুকু সে জানে।

কিন্তু বাসু তার বহু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছিল, ওই কালো বাক্সে এমন কিছু নিশ্চয় আছে যা দিনের আলোয় বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। ছোটবাবু যেখানে গিয়েছিলেন—সেখানে দিনের বেলায় গাড়ি নিয়ে আসা নিশ্চয় বিপদের। খুব বিচক্ষণের মতন হিসেব করে না দেখলেও বাসুর মতন চতুর ছেলের পক্ষে এটা বোঝা মোটেই অসম্ভব হল না যে, এই বাক্সের একটা ভয়ঙ্কর গুরুত্ব এবং মূল্য আছে। এবং কাজটা বিপজ্জনক, বেআইনী।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাসু তার ব্যবসা ঠিক করে ফেলল। টাকা টাকা করে মা আজ কদিন তার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিছু টাকা তার চাই। ছোটবাবুর কাছে সে টাকাটা চাইবে। উনি কি দেবেন টাকা? বাসুর সঙ্গে কারবার রাখতে হলে দেওয়া উচিত। হয়ত আজ দেবেন না, কাল কি

পরন্তু নিতে বলবেন। তা হোক, তবু ত দেবেন, বাসু মাকে ঠাণ্ডা রাখতে পারবে।

আচ্ছা, যদি না দেন? যদি বাসুর কারবারী বুদ্ধি এবং দুঃসাহসের জন্যে চটে ওঠেন?...তা হলে তা হলে ছোটবাবুর সঙ্গে বাসুর কারবার এইখানেই বন্ধ।

সিকদারবাড়িতে এসে বাসু অপেক্ষা করে থাকল। কাল ট্রাংকটা গাড়ির মধ্যেই। গোপেনদা বলল, 'ছোটবাবু এসে জায়গা মতন রাখিয়ে দেবেন।'

আধ ঘণ্টাখানেক পরে ছোটবাবু ফিরলেন। বাক্সটা বাসুকে বয়ে আনতে হল না। ওটা কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে বাসু বুঝতে পারল না। তার তেমন কোনো গরজও নেই।

একটু ফাঁক পেয়ে বাসু মাথা চুলকে মুখ করুণ করে টাকা চেয়ে ফেলল।

ছোটবাবু বাসুকে নজর করে দেখছিলেন। যেন বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, ছোকরার অভিসন্ধি কি।

বাসু সেই দৃষ্টির সামনে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'বাড়িতে আমার মার টাইফয়েড।' বলার পরে বাসুর গলায় একটা শক্ত দলা যেন ঢুকে গেছে এই রকম ভাব হল তার।

ছোটবাবু যেন বাসুর এই বিপদ জানতেন না, জানার পর উদ্বেগে ও সহানুভূতিতে কাতর হয়ে মানিব্যাগ খুলে ফেললেন। পঞ্চাশটা টাকা এক থোকে দিয়ে দিলেন, অক্লেশে, এক বারও চিন্তা না করে।

বাসু আশা করে নি এতগুলো টাকা সে পেতে পারে। সে দশ বিশের আশা করেছিল, পঞ্চাশটা টাকা পেয়ে কেমন বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়ল।

ছোটবাবুর কাছ থেকে চলে আসবার সময় বাসুর বেশ উত্তেজনা হয়েছিল। তার পকেটে টাকা, পঞ্চাশটা টাকা। এই টাকা সে মার মুখের সামনে ধরে দিয়ে দেখাতে পারবে, বাসুও টাকা আনতে পারে। যা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল মা টাকার জন্যে!

রাস্তায় এসে বাসুর কেমন হাসি পাচ্ছিল। ছোটবাবুর কাছে কি রকম

ফার্স্ট কেলাস একটা গুল ছেড়ে দিল। মার টাইফয়েড। অসুখের নামটাও তার জানা নেই। ভাগ্যিস টাইফয়েড নামটা মনে পড়েছিল। আসলে ওই নামটা বাপ্‌ জানে, কেননা বাবা ওই রোগে মারা গিয়েছিল।

পরে অবশ্য বাপ্পুর ব্যাপারটা তেমন ভাল লাগে নি। যে রোগে বাবা মারা গিয়েছিল সেই রোগ মিথ্যে মিথ্যে মার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় তার মন একটু খুঁত খুঁত করছিল।

এখন, মাঝরাতে, শুয়ে শুয়ে বাপ্‌ অতি দুঃখীর মতন এত কথা ভাবল। সে আশা করেছিল, টাকাটা পেয়ে মা সন্তুষ্ট এবং সুখী হবে। নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে পুরো পঞ্চাশটা টাকাই মার হাতে দিয়ে দিয়েছিল। নিজের জন্যে কিছু রাখে নি। অথচ এই টাকা পেয়েও এ-বাড়ির কেউ একটু সুখী হল না।

পনেরো

সামনে শীত। নদীর দীর্ঘ চরার মতন এই শীতকে কাছ থেকেই দেখা যাচ্ছিল। ভোরে হিম পড়ছে, শিশিরে ভিজে থাকছে ঘাস পাতা, হেমন্তের অনাবিল রোদ ক্রমশ আরও গাঢ় ও তপ্ত হয়ে নতুন ধানের রঙ ধরেছে। শীতের দু চার ঝলক হাওয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটে আসছিল। ছোট পায়ের বেলা, অকালে দুপুর ফুরোয়, তারপর পড়ন্ত দিনের মাথায় অগ্রহায়ণের ক্ষণ-গোধূলির আলোটুকু আকাশের গা থেকে মুছে গিয়ে কলকাতার সন্ধ্যা নেমে আসে। এত চকিতে এই পট পরিবর্তন যে মনে হয় এই মহানগরের রঙ্গমঞ্চের দু পাশে বেতনভুক দুটি মানুষ অন্ধকারের পটক্ষেপের দড়ি হাতে দাঁড়িয়েছিল, মুহূর্তে যবনিকা ফেলে দিয়েছে। ধূসর এবং মলিন অন্ধকারে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে ওঠে, ব্ল্যাক আউটের বন্দী আইনে ঠুলি পরা ক্রীতদাস; প্রায়স্তিমিত নিরুজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আর শূন্য থেকে আগত অন্ধকার অক্লেশে এই নগরীর গা ঢেকে নিজেকে বিস্তার করে নেয়। শীতের ঘ্রাণ এবং শিহরিত হবার মতন বাতাস অনুভব করা যায়। আকাশের তলায় প্রচ্ছন্ন কুয়াশার প্রলেপ, সমতল অপরিচ্ছন্ন।

অবশেষে শীত এল।

এবার শীতে গিরিজাপতি অপটু হয়ে পড়েছেন। লাম্বাগোর ব্যথাটা প্রথম ঠাণ্ডাতেই দেখা দিয়ে কিছুদিন ভুগিয়েছিল। কোনো রকমে ওটা সামলে ওঠার পর পর আকস্মিক ভাবেই গিরিজাপতি কয়েক দিনের জন্যে হেতমপুর গিয়েছিলেন। কেন, কোন প্রয়োজনে—কেউ জানে না। উমাকে বলেছিলেন, বিজলীবাবু বার বার চিঠি লিখছেন একবার যাওয়া দরকার।

ফিরে এলেন জর গায়ে। এসে প্রায় নিমোনিয়া বাধানোর উপক্রম। আপাতত ব্যাধির প্রকোপ সামলে উঠেছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, শরীরে প্রচুর দুর্বলতা। এতটা বয়সে এ-ভাবে আধিব্যাধির হাতে পড়লে শরীরে সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি ও দুর্বলতা এসে পড়ে। গিরিজাপতির সম্ভবত সেই রকম ক্লান্তি এসে গিয়েছিল।

দেবব্রতকে একদিন তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'আমি অসুখ বিসুখে ভুগেছি এমন একটা বড় ঘটে নি, দেবু। এখন দেখছি আর-একটা দায় জুটল '

'কলকাতার জল হাওয়া আপনার সহ্য হচ্ছে না।' দেবব্রত বলেছিল, 'এ-রকম ভিড় ঘিঞ্জিতে থাকা ত আপনাদের অভ্যেস নয়। আলো বাতাস পান না, রোদ জল নেই, শরীর ভাল থাকা মুশকিলই। তার ওপর এখন যা অবস্থা শহরের—!

কথাটা কি ঠিক! কলকাতা কি আর সহ্য হচ্ছে না তাঁর! অনেকক্ষণ নীরব থেকে মৃদু গলায় তিনি দেবব্রতকে বলেছিলেন, 'আমার ভাল লাগছে না, দেবু। এখানে আর মন টিকছে না।'

গিরিজাপতির গলার স্বরের উদাস ভাব এবং অবসাদের রেশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তিনি এই নাগরিক জীবন যাপনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

'আমি মাঝে মাঝে ভাবি—' দেবব্রত বলল, 'কলকাতায় এসে আপনার কোনো লাভ হল না।'

গিরিজাপতি অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে থাকলেন, তাঁকে বিমর্ষ হতাশ দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'তা তুমি বলতে পার। আমি সুবিবেচনার কাজ করি নি, দেবু।' অল্প নীরব থেকে আবার বললেন, 'আমি বড় মন্দ ভাগ্যের লোক, আমার আশা কখনও পূর্ণ হয় নি।'

দেবব্রত নীরব ছিল। গিরিজাপতির কোনো কোনো বেদনার কথা সে জানে, তাঁর সব বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। দেবব্রত অনুভব করতে পারল, এই কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল উদার মানুষটি নানা কারণে আজ ব্যথিত, ভরসাহীন। ওঁর এই সুগভীর বেদনার জন্যে দেবব্রতর কোনো

সহানুভূতির কথা জানা ছিল না। নির্বাক ও কুণ্ঠিত হয়ে দেবব্রত বসে থাকল।

গিরিজাপতির অসুখের খবর পেয়ে মিহির দু এক বার এ-বাড়িতে এসেছিলেন। যথারীতি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, সুচিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। উনি বলে গিয়েছিলেন, যতদিন না গিরিজাপতি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল হচ্ছেন ততদিন তিনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করুন, প্রেসে যাওয়ার দরকার নেই। অবনী মাঝে মাঝে খবরাখবর নিতে, কাজকর্মের প্রয়োজন হলে এ বাড়িতে আসবে।

অবনী আসত। দু এক দিন অন্তর রাত্রের দিকে এসে গিরিজাপতির খবরাখবর নিয়ে যেত; গিরিজাপতির অনুপস্থিতিতে বইয়ের কাজগুলো সে দেখছে, মাঝে মাঝে কাজকর্মের পরামর্শ নিয়ে যেত।

সেদিন খামে মোড়া কিছু টাকা এনে গিরিজাপতির বিছানায় রাখল। উঁচু বালিশে পিঠ দিয়ে গিরিজাপতি বসেছিলেন, পাতলা লেপে পা কোমর ঢাকা। গিরিজাপতি সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন।

'কি, ওটা?'

'টাকা।' অবনী মৃদুস্বরে বলল।

টাকা। গিরিজাপতি অবাক হলেন। কিসের টাকা! আজ মাসের আঠাশ তারিখ। সাধারণত সাত আট তারিখ নাগাদ তিনি প্রেস থেকে মাইনেটা নেন। এত আগে ভাগে টাকা পাঠানোর কারণ তিনি বুঝলেন না। 'মাইনে—?'

অবনী মাথা নাড়ল, না মাইনে নয়। বলল, 'মিহিরবাবু আমায় বলেছিলেন ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে এসে আপনাকে দিতে।'

হঠাৎ মিহির টাকা পাঠাবেন কেন গিরিজাপতি ভেবে পেলেন না। তিনি টাকা চান নি, টাকার কথা কাউকে বলেন নি।

'কত টাকা?' গিরিজাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

'দেড় শ। উনি বলেছিলেন এক শ দেড় শ যা হয় নিয়ে আসতে, আমি দেড় শই এনেছি।' অবনী আস্তে আস্তে বলল।

সম্ভবত মাইনে থেকে কিছু টাকা মিহির আগাম পাঠিয়ে দিয়েছে। গিরিজাপতি হাত বাড়িয়ে খামটা টেনে নিলেন, খুললেন না, বললেন, 'অ্যাডভান্স?'

অবনী কিছু বলতে পারল না। অ্যাডভান্স হতেও পারে, নাও পারে। সে জানে না। মিহিরবাবু তাকে পরশু দিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, গিরিজাপতির টাকার দরকার আছে কি না, থাকলে ক্যাশ থেকে নিয়ে যেতে। অবনী ধরে নিয়েছিল, অসুখে বিসুখে টাকা কার না দরকার হয়, সে গিরিজাপতিকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি, আজ মিহিরবাবুকে বলে টাকাটা নিয়ে এসেছে। ক্যাশ থেকে টাকাটা নেবার সময় একটা ভাউচার করে নিয়েছে, গিরিজাপতির নামে, কিন্তু কোন বাবদ টাকাটা নিচ্ছে তার উল্লেখ কোথাও ছিল না, সুধাংশুবাবু ভাউচারে কিছু লিখে দেন নি।

অবনীকে নীরব দেখে গিরিজাপতি বিস্মিত হচ্ছিলেন। বললেন, 'কি হে—?'

চোখ তুলে তাকাল অবনী। বলল, 'ভাউচারে কোনো অ্যাকাউন্ট লেখা ছিল না।' বলে একটু থামল, তারপর যেন ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করার জন্যে বলল, 'মিহিরবাবু আমায় বলেছিলেন বাড়িতে টাকার দরকার থাকলে এনে দিয়ে যেতে, আমি নিয়ে এলাম।'

গিরিজাপতি কয়েক পলক অন্যমনস্ক চোখে অবনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি মনে করতে পারলেন না, ইতিমধ্যে অবনীর সামনে কখনও টাকাপত্রের কথা উঠেছে কি না। উনি অসুখে পড়ে থাকার দরুণ এই সংসারে অভাব বা অনটন যাচ্ছে এমন কোনো কথা অবনীর কানে গেছে বলে তাঁর মনে হল না। এটা হয়ত ওর স্বেচ্ছাকৃত উপকার।

টাকাটা আনার জন্যে নয়, কোনো রকম হিসেবের মধ্যে না ধরে টাকাটা এনেছে বলে গিরিজাপতির মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। কখনও সখনও তিনি নিজেও প্রেস থেকে টাকা এনেছেন দরকারে, কিন্তু হিসেবের মধ্যে ফেলে—বে নিয়মে নয়।

'সুধাংশুকে বলবে—টাকাটা আমার নামে মাইনের অ্যাডভান্স হিসেবে যেন তুলে নেয়।' গিরিজাপতি শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন।

অবনী তাকাল, কি ভাবল যেন, মুখ নামিয়ে নিল।

গিরিজাপতির খেয়াল হল, এসে পর্যন্ত অবনী একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত ভাবে বললেন, 'আরে, তুমি যে দাঁড়িয়েই আছ! বসো।. তোমায় বসতে না বললে বসবে না—এ যে এক বিশ্রী স্বভাব তোমার।'

অবনী যেন ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করল। বেতের মোড়া টেনে নিয়ে এল জানলার কাছ থেকে, গিরিজাপতির মুখোমুখি মোড়া রেখে বসল।

সাড়ে সাতটা বাজে। মাসটা পৌষ। শীত অনুভব করা যাচ্ছিল। বাইরের গলি থেকে কুয়াশার মতন ধোঁয়ার ভাব ঘরে ঢুকেছে। এক দিকের জানলা বন্ধ, অন্য জানলার পাট খোলা। ধোঁয়ার ভাব এই ঘরের ম্লান আলো আরও যেন ম্লানতর করে অধিক রাত্রির আচ্ছন্নতা এনেছে। গলিতে লোক চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

অবনীর গায়ে সুতির চাদর। তার সেই কালো রঙের বেখাপ্পা কোটটা এখন পর্যন্ত তার গায়ে দেখা যাচ্ছে না। ছেলেটা রোগা সোগা বলে গিরিজাপতি একদিন বলেছিলেন, তোমার শীত করে না, শুধু সুতির চাদর জড়িয়ে আছ। জবাবে অবনী কেমন কুণ্ঠিত মুখে বলেছিল, তলায় সোয়েটার আছে।...সামান্য পরে অবনী এক অদ্ভুত কথা বলেছিল, এমন কথা গিরিজাপতি কখনও শোনেন নি। অবনী বলেছিল, তার শীত কম; কারণ তার গা সব সময় খুব ঠাণ্ডা থাকে, পঁচানব্বইয়ের একটু বেশী তার গায়ের তাপ। 'আমার কখনও একশো একের বেশী জর হয় নি।'

গিরিজাপতি কৌতূহল এবং কৌতুক বোধ করে সহাস্যে বলেছিলেন, 'তোমার রক্ত তাহলে খুব ঠাণ্ডা বলতে হবে। না কি খুব গরম হে! আমি সাইন্স একেবারে জানি না বাপু।'

অবনী সে কথার কোনো জবাব দেয় নি।

গিরিজাপতি অবনীকে দেখছিলেন; দেখতে দেখতে কথাটা তাঁর মনে পড়ল। অবনীর সমস্তই বুঝি ঠাণ্ডা, স্বভাব মন ব্যবহার। মানুষের স্বাভাবিক কিছু বৃত্তি আছে, অবনীর বোধ হয় কোনো বৃত্তিই তার অনুভবকে পীড়িত করে না।

গিরিজাপতি দরজার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন অন্যমনস্ক

ভাবে। তারপর অবনীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। 'তুমি না কোথায় বাড়ি দেখতে যাবে বলেছিলে, গিয়েছিলে ?'

'গিয়েছিলাম।' অবনী মাথা নাড়ল, গলার স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল আশাপ্রদ কোনো ফল ফলে নি।

'কি হল ?' গিরিজাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাড়া বেশী। তার ওপর সেলামি চাইছে।'

'সেলামি ?'

'দেড়খানা ঘর, চল্লিশ টাকা ভাড়া, আড়াই শো টাকা সেলামি।' অবনী নিস্পৃহ গলায় বলল, যেন বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়ছে। এক মুহূর্ত থেমে গিরিজাপতির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'আজকাল সবাই সেলামি নেয়।'

গিরিজাপতি সেলামি ব্যাপারটা জানেন, আজকাল প্রায়ই শোনেন। প্রথাটা, তাঁর ধারণা, মহাজন কারবারীদের মধ্যে চালু ছিল, সামান্য বাসা ভাড়া দেওয়া নেওয়ায় এটা আজকাল কলকাতা শহরে চালু হয়ে গেছে দেখে তিনি বিস্মিত বোধ করেন। অবনীর কথায় সেই বিস্ময় আরও একবার প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আজকাল যে যে-দিক থেকে সুবিধে পাচ্ছে কিছু টাকা হাতড়ে নেবার চেষ্টা করছে। কী অবস্থা—!' গিরিজাপতির গলায় বিরক্তি এবং হতাশা প্রকাশ পেল।

অবনী নীরব। হাঁটুর কাছে কাপড়টা ঠিক করল, অনেকটা কালি পড়ে গেছে ; আজ রাত্রে বাড়ি ফিরে ভিজে চুন লাগিয়ে রেখে দিতে হবে, কাল সকালে সাবান দিয়ে এই দাগ ধুয়ে না ফেললে নয়, অন্য কাচা কাপড় নেই পরার।

'তোমার তাহলে আর বাড়ি বদলানো আপাতত হল না।' গিরিজাপতি বললেন।

অবনীর হুঁশ হল। মাথা নাড়ল, বলল, 'না। এখন আর হল না।'

সামান্য চুপ চাপ। গিরিজাপতি ভাবছিলেন কি যেন। বারান্দায় উমার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। শীতের ঈষৎ শিহরণ লাগছে এই ঘরে। গলি দিয়ে কোনো মানুষ হা হা করে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, হাসিটা

অস্বাভাবিক রকম বিশ্রী শোনাচ্ছিল। 'অবনী!' গিরিজাপতি ডাকলেন।

মুখ তুলে তাকাল অবনী।

'আমাকে একদিন তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চল।' মৃদু গলায় অনুরোধ জানালেন গিরিজাপতি। একটু থেমে সংযত গলায় বললেন আবার, 'তোমার মার সঙ্গে আলাপ করে আসব।' কথা শেষ করে গিরিজাপতি যেন সঙ্কোচ বশে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অবনী নতমুখে বসে। গিরিজাপতির কথার যথার্থ অর্থ সে বুঝতে পেরেছে। একদিন গিরিজাপতি অনেক ইতস্তত করে সঙ্কোচ এবং সকুণ্ঠায় তাকে প্রকারান্তরে একটি প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। অন্তত মাস চারেক আগে। তারপর আরও দু একবার অস্পষ্ট ভাবে এই প্রস্তাবের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি অবনীর কাছে তার মতামত জানতে আগ্রহী হয়েছেন। অবনী কোনো উত্তর দেয় নি। গিরিজাপতি বিন্দুমাত্র কিছু অনুমান করে নেন এমন সুযোগ সে দিতে চায় নি, ফলে অবনী সম্পূর্ণ নীরব এক শ্রোতার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। আজ হঠাৎ বাড়িতে মার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাবে সে গিরিজাপতির বক্তব্য বুঝতে পারল। উনি অবনীকে বিষয়টা বুঝি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

অস্বস্তি ও কুণ্ঠা বোধ করছিল অবনী। চোখ হাঁটুর ওপর, কালির মস্ত দাগটা সে দেখছিল। অবনী জানে, গিরিজাপতি যে-ধরনের মানুষ, তাঁর ব্যক্তিত্ব বোধ-বুদ্ধি উচিত অনুচিত জ্ঞান এত প্রখর যে, কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় উৎপীড়িত পিতার মতন তিনি সুযোগ অনুসন্ধানে রত নন। অবনীর কখনও মনে হয় নি, গিরিজাপতি কোনো উদ্দেশ্যবশত তাকে স্নেহ করেন। স্বার্থ-সিদ্ধির মনোভাব তাঁর নেই। এই মানুষটিকে মোটামুটি চেনে বলেই অবনী অনুমান করতে পেরেছিল, যে-ধরনের প্রস্তাব এই প্রবীণ মর্যাদাসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বময় পুরুষটির কাছে অপ্রত্যাশিত তেমন প্রস্তাবও নিরুপায় হয়ে ওঁকে করতে হয়েছে। দায় দায়িত্বের ভার বিশাল বোঝার মতন দুর্বহ না হলে, দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় অতিরিক্ত রকম পীড়িত বোধ না করলে ওঁর মতন মানুষ

কখনও এমন প্রস্তাব করতেন না। গিরিজাপতির অসহায় বেদনাদায়ক অবস্থাটা অবনী অনুভব করতে পারে।

বাইরে বারান্দায় উমার গলা পাওয়া গেল। কার সঙ্গে কথা বলছে বোঝা গেল না। ওপরতলার মেয়েটির সঙ্গে বোধ হয়। অবনী মেয়েটিকে চেনে। এ বাড়িতে এলে, প্রথম প্রথম ওই মেয়েটি এসেই গিরিজাপতির ঘরে তাকে চা দিয়ে যেত। উমা আসত না। উমাকে অবনী ইদানীং দেখেছে। আগে এ-বাড়ি আসতে যেতে হঠাৎ চকিতের জন্যে দেখলেও অবনী বুঝতে পারে নি, ওই মেয়েটি গিরিজাপতির ভাইঝি, বরং আরতিকেই সে ভুল করে উমা ভেবে নিয়েছিল।

গিরিজাপতির অসুখের সময় অবনী যথার্থ ভাবে উমাকে দেখেছে, প্রয়োজনে কথাবার্তাও বলেছে। আজ আর উমা তার কাছে ঠিক অপরিচিত নয়।

নতমুখে বসে হাঁটুর কাছে কাপড়ে কালির দাগ দেখতে দেখতে অবনী হঠাৎ ভাবল, গিরিজাপতি কি তার নীরবতার অন্য কোনো অর্থ ধরে নিয়েছেন? কথাটা মনে হওয়ায় অবনী কেমন উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত হল।

পলকের জন্যে মুখ তুলে তাকাল অবনী, গিরিজাপতি অন্য দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর মুখে ক্লান্তি। উনি কিছু ভাবছেন। অবনী চোখ নামিয়ে বিছানার পায়ের দিকে তাকাল।

অবনীর ইচ্ছে হল, সে উঠে যায়। তার অস্বস্তি এবং অশান্তি হচ্ছিল। গিরিজাপতি ভুল করেছেন। অবনী যে গিরিজাপতির প্রস্তাবে নীরব নিস্পৃহ থেকেছে এর অর্থ এই নয়, সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। না, অবনী সম্মতি দেয় নি, সম্মত হবার মতন কোনো আভাস ইঙ্গিতও প্রকাশ করে নি। ব্যাপারটা তাঁর কাছে মনোক্লেশের কারণ হত। গিরিজাপতির প্রতি অবনীর যে শ্রদ্ধা সম্মান এবং অনুগত ভাব তাতে তার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব ছিল। যে-মানুষটিকে অবনী পরিপূর্ণ ভাবে চিনতে পারছে, যার উদ্বিগ্নতা ব্যাকুলতা এবং সমস্যা তার কাছে প্রায় স্পষ্ট, যিনি অক্ষম উপায়হীন হয়ে একটি প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁকে আহত করতে অবনী পারে নি। বেশ ত, তবে দুঃখী হয়ে

তাঁকে, দায় দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত কর। অবনী মনে মনে নিজেকেই বলেছে। একজন সাধু ব্যক্তিকে সুখী করা তৃপ্ত করা কিছু কম উদারতার কাজ নয়।

অবনী জানত তার পক্ষে গিরিজাপতিকে তৃপ্ত বা দুর্ভাবনামুক্ত করাও সম্ভব নয়।

নীরব আড়ষ্ট ঘরে অনেকক্ষণ পরে একটু শব্দ হল। বিছানার পাশ থেকে একটা বই মাটিতে পড়ে গেছে, গিরিজাপতি সরতে গিয়ে ফেলে দিয়েছেন বোধ হয়। অবনী দেখল, বইটা কুড়িয়ে রেখে দিল বিছানায়।

'তোমায় একটু চা-টাও দিল না—?' গিরিজাপতি যেন হঠাৎ তন্দ্রায় পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণে সচকিত হয়ে লক্ষ্য করলেন অবনী নীরবে বসে আছে।

গিরিজাপতি উমাকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, অবনী বাধা দিল, বলল, 'আজ আর চা খাব না। আমায় একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

গিরিজাপতি পূর্ণ চোখে লক্ষ্য করলেন অবনীকে। ওকে যেন অমনোযোগী কুন্ঠিত দেখাচ্ছে। সামান্য অপেক্ষা করে গিরিজাপতি বললেন 'কটা বেজেছে?'

'আটটা বাজে বোধ হয়।'

'তেমন কিছু রাত হয় নি তবে।' গিরিজাপতি হালকা স্বরে বললেন, 'শীত সইতে সইতে যাবে, চা খেয়ে যাও।

'আজ থাক। অবনী ব্যস্ত হয়ে বলল, বলে উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। পরশু দিন আসব।'

গিরিজাপতি বাধা দিলেন না। অবনী চলে যাচ্ছে, উনি আবার একবার মনে করিয়ে দিলেন, 'সুধাংশুকে বলে টাকাটা কাল আমার মাইনের হিসেবে ধরে নিও, ভুলো না।'

অবনী মাথা নাড়ল, সুধাংশুবাবুকে সে বলবে। দরজার চৌকাটের কাছে গিয়ে হঠাৎ অবনী কি ভেবে ফিরে দাড়াল। তাকাল গিরিজাপতির দিকে। ইতস্তত করে বলল, 'সুধাংশুবাবু বলছিলেন, আপনি নাকি প্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন।'

গিরিজাপতি ঈষৎ কৌতূহলের দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে

থাকলেন। মনে হল, তিনি সামান্য বিস্মিত হয়েছেন। 'সুধাংশু বলছিল—?'

'আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন বলে মনে হল।'

গিরিজাপতি উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কিছু ভাবছিলেন। গিরিজাপতির চোখের পল্লব সঙ্কুচিত এবং ঘোলাটে হয়ে এল। অবনী দু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে পা বাড়াল।

ঘরের বাইরে এসে একপাশ থেকে চটিটা পায়ে গলিয়ে অবনী চলে যাচ্ছিল, অন্যমনস্ক ; বারান্দা পেরিয়ে সদরের মুখে ঢাকা গলির মতন জায়গাটায় পা দিয়েছে, পিছনে সাড়া পেল, অস্ফুট স্বর, কে যেন ডাকল। অবনী দাঁড়াল। পিছু ফিরে মুখ তুলে দেখে উমা। এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্য হাতে আর একটা কাচের ডিশ। অবনী বুঝতে পারল, উমা তার পিছু পিছু এসেছে। বারান্দার নিরুজ্জ্বল আলোয় উমাকে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল না; সে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে, সরু থামের বেঁকা ছায়া আড়াআড়ি গায়ে পড়েছে, চার পাশের আবছায়া দেওয়াল উঠোন বারান্দার গায়ে গায়ে জড়ানো; অবনী বারান্দার নীচে উঠোনের ধাপে নেমে দাঁড়িয়ে। অবনী সামান্য বিস্ময় বোধ করল। 'চা—?'

উমা কিছু বলল না। বলার কিছু ছিল না তার, চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে অবনী চলে যাচ্ছে।

চায়ের আগ্রহ অবনীর ছিল না। উমা তৈরী করে এনেছে বলেই সৌজন্যবশে হাত বাড়াল। 'দিন'।

উমা বোধ হয় এই অভব্যতা পছন্দ করল না। পথে দাঁড়িয়ে এ-ভাবে কেউ খায় নাকি! কেমন সব কথা। 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবেন কেন! ঘরে আসুন '

আবার ঘর! অবনী বিব্রত স্বরে বলল, 'চা ত, এখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে নি।

উমা মাথা নুইয়ে চোখের দৃষ্টি অন্য হাতের ডিশের ওপর রাখল, যেন বলল, শুধু চা কেন, এটাও ত আছে। 'আমাদের কি ঘর দোর নেই বসার। আসুন ; খেয়ে যান।' উমার কণ্ঠস্বরে গার্হস্থ্য আন্তরিকতা।

ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল উমা। অবনী আড়ষ্ট গলায় কিছু বলতে চাইল, মনে হল না উমা কান দিল কথায় এগিয়ে গেল; অবনীকেও বারান্দায় উঠে আসতে হল।

গিরিজাপতির ঘরে নয়, পাশের ঘরে নিজেদের শোওয়া-বসার জায়গায় এনে বসাল উমা অবনীকে। এ-ঘর অবনীর কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। গিরিজাপতির অসুখের সময় যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা চলছে—অবনীকে অনেক সময় এই ঘরে এসে বসতে হয়েছে, অপেক্ষা করতে হয়েছে, বসে বসে নিখিলের সঙ্গে কথা বলেছে, কখনও কখনও বা কোনো বই কাগজ তুলে পাতা উলটেছে। উমা বড় একটা আসত না, এলেও দু চারটে প্রয়োজনীয় কথায় বেশী কিছু বলে নি। একেবারে ইদানীং উমার সেই সঙ্কোচ কিছুটা কেটেছে।

অবনী আস্তে পায়ে নিখিলের তক্তপোশের ওপর পাতা বিছানায় বসল। উমা হাতের ডিশটা এগিয়ে দিল। মাথা নাড়ল অবনী, হাত তুলে না করল। 'শুধু চা দিন।'

'আমি কষ্ট করে ভাজলাম—' উমা কান দিল না। ডিশটা অবনীর কোলের সামনে নামিয়ে রাখল, 'একা হাতে এগুলো ভাজতে গিয়েই দেরী হয়ে গেল।'

জিনিসটা এমন কিছু নয়, ফুলকপির ফুল ছোট ছোট করে কেটে বেসন দিয়ে ভাজা, এখনও বেশ গরম। অবনী জানে, এই সংসারে সামান্য কিছু আতিথ্য করা এদের রীতি, গিরিজাপতি পছন্দ করেন।

ডিশ উঠিয়ে নিল অবনী। অযথা আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই, কথা বাড়বে। একটা ভাজা মুখে দিল। উমা চায়ের কাপ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। অস্বস্তি বোধ করল অবনী। 'আমাকেই দিন—' হাত বাড়াল অবনী।

'এতক্ষণে জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। একটু গরম করে এনে দি।'

'দরকার কি; দিন আমি খেতে পারব।'

'ওগুলো খান, ততক্ষণে আমি গরম করে আনছি।' উমা স্মিত হাসল, হেসে চলে গেল।

অবনী আজ যেন বেশী রকম আড়ষ্ট এবং অস্বস্তি বোধ করছে। সামান্ত আগে গিরিজাপতির সামনে বসে কথাটা নতুন করে না শুনলে সে অনেকটা স্বাভাবিক হতে পারত। অবস্থা এখন মোটেই উপভোগ্য নয়। যে-বিষয়ে সংকোচ, যে-প্রসঙ্গে বিরক্তি, অবনী মনে মনে যার পীড়ন বোধ করছে, সেই বিষয়টিকে এখন আরও স্পষ্ট করে অনুভব করতে তার ভাল লাগছিল না।

মুখে শব্দ হচ্ছিল না। অন্তমনস্ক হয়ে অবনী বসেছিল এবং ভাবছিল। এই ঘরের আলো সামান্ত উজ্জ্বল, ফলে রাস্তার দিকে জানলা বন্ধ। শীত সামান্ত কম। জিনিসপত্র বিছানা আলনা বাক্স টেবিল বইয়ের র‍্যাক—ঘরটাকে কেমন ঘন উষ্ণ করে রেখেছে। অবনী অন্তমনস্ক ভাবে ঘরের সামনের দিকে তাকিয়েছিল, ফলে চোখের দৃষ্টি সরাসরি সুইচ বোর্ড এবং তার পাশে কাঠের ছোট-র‍্যাকের ওপর পড়ছিল। কয়েকটা টুকটাক জিনিসের ওপর দৃষ্টি পড়লেও, প্রধানত অবনীর দৃষ্টি পুতুলের ওপর। পুতুলটা কাচের। সাদা কাচের ওপর সোনালী রঙ সামান্ত চিকচিক করছিল। এ-রকম পুতুল অনেক দেখা যায়, শিবমূর্তি। মাথাটা সোনালী রঙ করা। পুতুলের পাশে একটা কাচের বোতল, বোতলের মধ্যে সুতোর তৈরী লতাপাতা ; এও এক ধরনের সূচীকর্ম। অবনীর চোখে পড়ছিল অবশ্য, কিন্তু পুতুল বা ফুল নিয়ে সে ভাবছিল না।

উমা কি ব্যাপারটা জানে ? অবনীর হঠাৎ মনে হল। উমার ব্যবহারে কখনও কি সে রকম কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে ? অবনী অনুমান করবার চেষ্টা করল। মুশকিল এই যে, অবনীর সঙ্গে উমার আলাপ এত সংক্ষিপ্ত, এমন সীমাবদ্ধ এবং অবনী এ-সব ব্যাপারে এত অজ্ঞ যে সে কিছুই অনুমান করতে পারল না।

আজকের ব্যবহারে উমার কি কিছু নতুন করে চোখে পড়তে পারে ? অবনী যেন প্রেসের কোনো ছাপা কাজে কালি কম বেশী পড়া দেখছে অনেকটা এই ভাবে ঘটনাটা ভাবল। সে কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু এই চিন্তা, উমা যদি গিরিজাপতির মনোভাব জেনে থাকে—এই বিশ্রী অস্বস্তিকর চিন্তা অবনীকে ভীষণ অতৃপ্ত করছিল।

উমা ঘরে এল। চা গরম করে এনেছে।

অবনী সচকিত হল, হুঁশ পেল যেন; এতক্ষণ হাতের খাবার হাতেই ধরা ছিল, সেই যে একটা ভাজা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছিল, তারপর আর খেয়াল হয় নি।

'খান নি—?' উমা অবাক হবার গলায় বলল।

'এই যে...' অবনী বিব্রতভাবে আর একটা বড়া তুলে নিল।

চায়ের কাপ সন্তর্পণে অবনীর পাশে রেখে দিল উমা। দাঁড়িয়ে থাকল।

কপালের কাছটায় গরম লাগছিল অবনীর। যদিও মুখ আনত, তবু চোখের দৃষ্টি যেন উমার চোখ দেখতে পাচ্ছে। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল অবনী, জড়তা এবং কুণ্ঠায় আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল।

উমা সামান্য সময় যেন লক্ষ্য করল। 'খেতে ভাল লাগছে না—?'

'আমার খিদে নেই।' অবনী কোনো রকমে বলল।

'ভালও হয় নি।'

ভাল মন্দ বিচার করার কথা ওঠে না, কেন না অবনী স্বাদের দিকে মন দেয় নি। কিছু বলল না।

'ওটা থাক; চা খান।' উমা একটু পাশে সরে গেল।

অবনী চায়ের কাপ তুলে নিল। তার মনে হল, উমা বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কোনো রকমের একটা কৈফিয়ৎ দিলে ভাল হত, অবনীর কোনো কথা মনে পড়ল না, বলতেও ইচ্ছে করল না।

একেবারে চুপচাপ। ঘরে মানুষ না থাকলে এই রকম নীরব ফাঁকা লাগে। অবনী মুখ ভরে চা নিতে পারছিল না, বেশ গরম। পায়ের দিকটায় সামান্য শীত শীত করে উঠল। অনেকটা যেন রাত হয়ে গেছে, সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। উমা কেন দাঁড়িয়ে আছে অবনী বুঝতে পারছিল না। গিরিজাপতি কি জানেন, অবনী আবার ফিরে এসে এ-ঘরে বসেছে?

উমাও অস্বস্তি বোধ করছিল বোধ হয়, একই ঘরে দুজন মানুষ মুখোমুখি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। গলায় প্রথমে একট শব্দ করল উমা,

যেন বাধা কাটিয়ে নিল, অন্য কোন কথা পেল না, বলল, 'কাপড়ে অত কালি ফেললেন কি করে ?'

অবনী মুখ নীচু করেই ছিল, হাঁটুর কাছটা লক্ষ্য করল, কুণ্ঠিত ভাবে হাত দিয়ে কাপড়টা সরাল একটু, হাত আড়াল করে রাখল। 'পড়ে গেছে।'

'দাদার মতন —।'

'উঁ—' অবনী অল্প করে মাথা তুলল।

'দাদার কথা বলছি। এমনই পড়ুয়া, যত কাপড় জামা সব কটাতে কালির দাগ মাখিয়েছে।' উমার গলার স্বর সরল, বেশ লঘু।

'আমাদের প্রেস . ' অবনী আড়ষ্ট ভাবে অগোছালো কথা বলল, সে বলতে চাইছিল, আমাদের প্রেসে কাজ, কালি ময়লা এ-কাজের অঙ্গ। কথাটা খাপছাড়া ভাবে অর্ধেক বলে অবনী থামল একটু, পরে শোধরাবার মতন করে অন্য কথা পাড়ল, 'নিখিলবাবু ফেরেন নি ?'

উমা চোখের পাতা ঘন করল, হাসি পাচ্ছিল তার, নিখিলবাবু ফিরলে কি উমার রান্নাঘরে বসে থাকত। অবনী যে জড়তা বোধ করছে উমা বুঝতে পারছিল ; উমা জানে অবনী লাজুক। তবে কি না মেয়েদের মতন একেবারে ঘাড় মুখ গোঁজা লজ্জা তার খুব পছন্দ হচ্ছিল। দাদাও লাজুক, কিন্তু এতটা লাজুক আজকাল নয়। অবনী এ-বাড়িতে এতবার এল গেল, তবু এত লজ্জার কি আছে।

'দাদা ফেরে নি।' উমা বলল, 'ওর ফেরার কিছু ঠিক নেই।'

অবনী অর্ধেক চা কোনো রকমে শেষ করে ফেলেছিল। আর দু এক চুমুক খেয়ে সে উঠতে পারে।

'দাদা আপনাকে কি বই দেবে বলছিল। নিয়েছেন ?'

'কি বই !' অবনী মুখ তুলল, উমার চোখে চোখ পড়ল, 'না, বই নিই নি।'

'নেবেন না।' উমা কৌতুক করে হাসল।

অবনী বুঝতে পারল না, কি বই, হাসির কারণই বা কোথায়। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

'দাদা—' উমা বলল হালকা গলায়, 'দাদা আপনাকে ভাত কাপড়ের কথা কিংবা ওই রকম কিছু গছিয়ে দেবে ঠিক।'

অবনীর মনে পড়ল। নিখিল একদিন এই ঘরে বসে কথায় কথায় তাকে দু চারখানা বই পড়তে বলেছিল, একটা বই তখনই সে দিতে চায়, খুঁজে পেল না, উমাকে দিয়ে খোঁজাল খানিক। না, অবনী সে বই পড়ে নি। উমা নিশ্চয় আজ ওই ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করল।

কেন কে জানে, অবনী এতক্ষণ পরে এখন সামান্য স্বস্তি বোধ করছিল। ক্রমশ তার এই আবহাওয়া সয়ে আসছে, না কি, এখন নিখিলকে নিয়ে কথা হচ্ছে বলে অবনী নিজের কথা ভুলতে পারছে। চা থাকল অল্প। কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে অবনী মুখ তুলল। উমা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, অবনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে বিছানার দিকে চোখ রাখল।

'আমি যাই; বাড়িতে কাজ আছে একটু।' অবনী উঠে দাঁড়াল।

উমা পাশে সরে গেল, পথ করে দিল।

অবনী চলে আসছিল। উমার ছায়া মেঝেয় পড়েছে। এত ছোট স্থল যে আসতে গিয়ে অবনী যখন পা দিয়ে সেই ছায়া মাড়িয়ে ফেলেছে, তখন চোখে পড়ল তার নিজের দীর্ঘ শীর্ণ ছায়া দরজার গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য অবনী কেমন থমকে দাঁড়াল। তার মনে হল, পাশে অনেকখানি জায়গা ছিল, উমার ছায়া না মাড়িয়ে সে পা ফেলতে পারত।

বিষণ্ণ হবার কারণ কি ছিল অবনী বুঝতে পারল না, কিন্তু বাইরে বারান্দায় এসে নিজেকে হঠাৎ তার কেমন নিষ্ঠুর এবং সতর্ক মনে হল।

বারান্দার এক পাশ থেকে চটিটা পায়ে গলিয়ে চলে যাবার সময় অবনী কাউকে দেখতে পেল না।

ষোলো

বুক পর্যন্ত লেপ টেনে গিরিজাপতি শুয়েছিলেন। নিখিল খানিকটা আগে ফিরেছে। উমার গলাও আর শোনা যাচ্ছে না। ওরা ভাইবোনে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে। বাড়ি এখন পূর্ণ শান্ত ; ঘুমন্ত। গলিতেও মানুষ চলছে না। ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে কদাচিত কোনো ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ির শব্দ ভেসে আসছিল।

ঘর অন্ধকার। রাস্তার দিকের ভেজানো জানলার কাছে যেটুকু ফাঁক—সেখানে আলোর সামান্য একটু দাগ। গিরিজাপতি সে আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। অন্ধকার দেখছিলেন। অন্ধকারে চোখ এত অভ্যস্থ যে কখনও কখনও মনে হয়, অন্ধকার দিয়েই যেন দিন শুরু হয়েছিল, অন্ধকারেই শেষ হবে।

এই অন্ধকারে একরকম পোকা আছে, কান পাতলে তার ডাক শোনা যায়। বাতাসে যেমন করে নিঃশব্দতা ভাসে, এই পোকার ডাক তেমনি করে ভেসে বেড়ায়।

অবনীর কথাটা গিরিজাপতি ভাবছিলেন, অবনী শুনেছে তিনি প্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন। কথাটা কে রটনা করেছে গিরিজাপতি বুঝতে পেরেছেন। মিহির ; মিহিরই বলেছে সুধাংশুকে, হয়ত ওরা আলোচনা করেছে নিজেদের মধ্যে।

কিছুদিন আগে গিরিজাপতি আঁচে আভাসে মিহিরের কাছে কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। তখন মনে হয় নি মিহির তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছে। এখন গিরিজাপতি বেশ বুঝতে পারছেন, মিহির সবই বুঝেছিল।

অথচ, গিরিজাপতি ভেবে পাচ্ছিলেন না, মিহির কেন তাঁর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করল না যে, কথাটা সে বুঝেছে। মিহিরের আচার-আচরণ দেখে গিরিজাপতির ধারণা হয়েছিল, সে কিছু বোঝে নি ; বা বুঝলেও

পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। অসুখের সময় মিহির এসেছে, খোঁজ-খবর নিয়েছে, বন্ধুজনোচিত আন্তরিকতা এবং উদ্বিগ্নতা দেখিয়েছে। এমন কি গিরিজাপতির আরাম-বিরাম ক্লেশকষ্ট সম্পর্কে ওকে খুবই সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল হতে দেখেছেন গিরিজাপতি।

মিহিরের এই আচরণ গিরিজাপতিকে বিব্রত করছিল। তিনি সব সময় সঙ্কোচবোধ করেছেন। যাকে তিনি ছাড়তে চান, যেখান থেকে তিনি মুক্তি পেতে ব্যস্ত সেখানে যদি কেউ ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন আরও স্পষ্ট প্রকাশ্য করে তোলে তবে অস্বস্তিবোধ না করে উপায় কি!

মিহির তার আচরণে এই অন্তরঙ্গতা অধিকার এবং সহানুভূতির আধিক্য প্রকাশ করছিল। গিরিজাপতি পীড়িতবোধ করছিলেন। তাঁর মনে হত, এ-সবের প্রতিদান কি মিহির আশা করবে না!

গিরিজাপতিও কি আরোগ্যের পর এ-কথা বলতে কুণ্ঠা অনুভব করবেন না যে, এবার আমায় তোমার প্রেস থেকে ছেড়ে দাও মিহির।

এই অসুখ তাঁর দুর্ভোগ, কিন্তু এই অসুখকেই এক সময় গিরিজাপতির সুযোগ বলে মনে হয়েছিল। কারণ, অসুখের আগে তিনি হেতমপুর গিয়েছিলেন, তারও আগে লাম্বাগোর ব্যথা নিয়ে কিছুদিন ভুগেছেন। প্রেসে একরকম একটানা কামাই চলছিল; হেতমপুর যাবার আগে মিহিরের কাছে আভাসে নিজের মনোভাবও জানিয়েছিলেন উনি। ফলে এই যে কামাই, অনিচ্ছা, বড় রকমের একটা অসুখ এবং দীর্ঘ সময়ের মতন অথর্বতা, এ সবই মিহিরের পক্ষেও প্রার্থনীয় সুযোগ হতে পারত। গিরিজাপতিকে মুক্তি দিতে খুব একটা কারণ খুঁজতে হত না মিহিরকে। মনে মনে গিরিজাপতি সেরকম আশা করছিলেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল মিহিরের আচরণ দেখে ক্রমেই তাঁর সে আশা মরে আসছিল।

অবনীর মুখ থেকে আজ কথাটা শোনার পর গিরিজাপতি এক বিষয়ে স্বস্তি অনুভব করছেন। মিহির তাঁর মনোভাব বুঝেছে, বিষয়টা নিয়ে [illegible] আলোচনাও হয়েছে, কাজেই গিরিজাপতিকে নতুন করে কথাটা [illegible]তে হবে না।

ধাঁধার মতন একটি প্রশ্নই শুধু গিরিজাপতিকে বিস্মিত করছিল, সব বুঝে জেনেশুনেও মিহির তাঁর কাছে কেন কিছু না বোঝার ভান করল? এ কি শুধুমাত্র এই কারণে যে, গিরিজাপতি অসুস্থ বলেই মিহির কোনো রকম অপ্রিয় কাজ করতে চায় নি, ভেবেছে কাজটা অশোভন হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বোধ কি তাকে অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত করেছে? অথবা… · অথবা .....

অথবা আর কি হতে পারে গিরিজাপতি ভেবে পেলেন না। মিহিরের অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে কথাটা নিয়ে সে কি আলোচনা করত সুধাংশুদের সঙ্গে? তা ছাড়া, গিরিজাপতি বুঝে পেলেন না, মিহির কেনই বা তাঁকে প্রেস থেকে চলে যেতে দেবে না? গিরিজাপতিকে ধরে রেখে তার ক্ষতি বই লাভ নেই। যথার্থভাবেই গিরিজাপতি এখন মিহিরের প্রেসে একটি অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য নয়। মাস মাস কতগুলো টাকা অনর্থক নষ্ট করার মতন অবিবেচক হবে কেন মিহির।

সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হলেও আপাতত ক্লান্ত হয়ে যেন গিরিজাপতি এই চিন্তা থেকে ক্রমে অন্য চিন্তায় মন ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি হেতমপুরের কথা ভাবছিলেন। হেতমপুরের কথা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে আসছিল।

কথাটা কেউ জানে না, গিরিজাপতি কাউকে বলেন নি; কিন্তু একেবারে অকারণে তিনি হেতমপুর যাননি। উমারা জানে, বিজলীজ্যাঠা বুড়ো বয়সে নানা আধি-ব্যাধিতে ভুগছেন, কাকার সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে জানিয়ে বার বার চিঠি লিখছিলেন—কাকা বিজলী জ্যাঠার সেই অনুরোধ রাখতে হেতমপুর গিয়েছিল।

উমারা সবটা জানে না। এ-কথা সত্যি, বিজলীবাবু বৃদ্ধ বয়সে রোগ-শয্যায় শুয়ে আছেন, এবং তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা গিরিজাপতি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু গিরিজাপতির আরও এক কর্তব্য ছিল।

অনেক দিন আগে গিরজাপতি যখন ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে ও অন্যান্য কারণে খুবই আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে পড়েছিলেন তখন বিজলীবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। হেতমপুরে সামান্য জমি ছিল

গিরিজাপতির ; ঋণের জন্যে বিজলীবাবুর কাছে এই জমি গচ্ছিত রাখার প্রয়োজন ছিল না, গিরিজাপতি তবু জেদ করেই গচ্ছিত রেখেছিলেন। বিজলীবাবু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই জমি বাঁধা নিয়েছিলেন, কিন্তু আইন-আদালত সাক্ষী-সাবুদ হাজির করতে সম্মত হন নি। পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস—এই ছিল যথেষ্ট। সামান্য একটা কাগজে গিরিজাপতি জমি গচ্ছিত রেখে ঋণ নেবার কথা লিখে দিয়েছিলেন। বস্তুত তার কোনো আইনগত মূল্য ছিল না।

বিজলীবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন রোগশয্যায়। জীবনের শেষবেলায় তিনি এই অন্যের জমির দায় থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন। বিজলীবাবু অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। গিরিজাপতির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। এই জমির ব্যাপারটা তাঁকে ইদানীং বড় পীড়িত করছিল। বিজলীবাবুর আশঙ্কা হত, তাঁর মৃত্যুর পর গিরিজাপতির জমি আর ফেরৎ দেওয়া যাবে না। তাঁর ছেলে মণ্টু দিন দিন অর্থ-পিশাচ এবং বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠছে; বিজলীবাবু চোখ বুজলে সে বাবার বিষয়সম্পত্তির যখন মালিক হবে, কাগজপত্র হাতে পাবে তখন গিরিজাপতিকে আর জমি ফেরৎ দিতে চাইবে না। মামলা-মোকদ্দমা সাজিয়ে, আইন-আদালত করে এই জমিটা আত্মসাৎ করবে।

অথচ গিরিজাপতির সেই জমি, এই যুদ্ধের হিড়িকে দামে শুধু যথেষ্ট বাড়ে নি, অন্যান্য কারণেও খুব লোভনীয় হয়ে উঠেছে। বিজলীবাবু আন্তরিকভাবেই চাইছিলেন, জমিটা গিরিজাপতি এবার ফেরৎ নিয়ে নেন।

গিরিজাপতিও জমিটার কথা ইদানীং ভাবতে শুরু করেছিলেন। বিজলীবাবুকে দায়মুক্ত করা যে তাঁর উচিত গিরিজাপতি অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর হাতে ঋণ পরিশোধের মতন টাকা ছিল না। টাকা যে খুব বেশী তাও নয়। তবু এই সংসার চালিয়ে গিরিজাপতি তেমন কিছু সঞ্চয় করতে পারেন নি যাতে ঋণ এককালে শোধ করে দিতে পারেন।

তবে এই ঋণ শোধের একটা সুযোগ এসে যাচ্ছিল। মাস ছয় সাতেক পরে গিরিজাপতি তাঁর পুরোনো ইনসিওরেন্সের পলিসি থেকে টাকা পাবেন। টাকাটা পেলে বিজলীবাবুর কর্জ শোধ করা যাবে।

হেতমপুর যাবার সময় গিরিজাপতি আরও কিছু সত্য অনুভব করতে পেরেছিলেন, কলকাতা থেকে এবার তিনি চলে যেতে চান। কলকাতা তাঁকে বিরক্ত ব্যথিত হতাশ ও নির্মোহ করেছে। এই শহর আর তাঁর ভাল লাগে না। এখানে শান্তি নেই, শান্তির আবহাওয়া নেই। কোনো নিরারোগ্য ব্যাধির মতন কলকাতার দূষিত আবহাওয়া তাঁকে ক্রমশই অক্ষম পঙ্গু করে তুলছে। গিরিজাপতি স্বস্তি পাচ্ছেন না।

জীবনের প্রায় অপরাহ্ণে গিরিজাপতি এই বহুজনের বাসভবনে এসে যেন দর্শক হিসাবে দেখতে পাচ্ছিলেন—একটি অস্বাভাবিক জীর্ণতা এর চার পাশে, যুদ্ধের মহোৎসবে সেই জীর্ণতাকে বোঝা যায় না—কিন্তু অন্তঃস্থল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে স্বাভাবিক বিশুদ্ধ রক্ত চলাচল করল হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকে সেই স্বাভাবিকতা এবং শুদ্ধতা এখানে নেই। এখানে—এই বহুজনের বাসভবনের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যাবে, অদ্ভুত এক যন্ত্রণা যেন সারাবেলা নিশ্বাস ফেলছে, মুমূর্ষুর নিশ্বাস। এখানে মানুষের চরম লোভ, নীতিহীনতা, স্বেচ্ছাচার, নিষ্ঠুরতা; এখানে মানুষের ভীষণ পরাজয়, ব্যর্থতা, নীচতা, হাহাকার; এখানে বীভৎস কোনো শোভাযাত্রা যেন সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মিছিল করে বেরিয়ে পড়েছে।

হেতমপুরে গিয়ে গিরিজাপতি দেখলেন, বিজলীবাবু যেন তাঁর ফেরার পথ আরও সহজ করে রেখেছেন।

গিরিজাপতির জমি সামান্য। হেতমপুরের মতন জায়গায় বলে সস্তার দিনে প্রায় দুবিঘেই কিনেছিলেন। সময়ের হাতে আর যুদ্ধের ডামাডোলে তার মূল্য সাত আটগুণ বেড়ে গেছে। বিজলীবাবু অর্ধেকটা বেচে দিতে বললেন। বললেন, কেনার লোক আছে, আপনি আপনার মতন রেখে বাকিটা বেচে দিন; ছোটখাটো একটা মাথা গোঁজার আস্তানাই যখন করতে চান সবটা রেখে কি লাভ।

গিরিজাপতির কাছে বিজলীবাবুর প্রস্তাব সব দিক থেকেই সুবিধের বলে মনে হল। জমিটা এবার ফেরৎ না নিলে বিজলীবাবু দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁকে দেখে কথাবার্তা শুনে গিরিজাপতির মনে হয়েছিল যেন এই

পরের দায়টুকু যথাহস্তে অর্পণ না করে পাছে চলে যেতে হয় সেই দুর্ভাবনায় ঘুমোতে পারেন না।

রাজী হলেন গিরিজাপতি। বিজলীবাবুর হাতেই ভার থাকল, জমি বেচার ব্যবস্থা করে গিরিজাপতিকে জানাবেন।

দিন কয়েক আগে বিজলীবাবুর একটা চিঠি এসেছে, মাঘ মাসে একবার গিরিজাপতিকে হেতমপুর যেতে হবে, জমিটা বেচে আসতে; ব্যবস্থাদি করা হয়ে গেছে।

মাঘ মাস সামনে। গিরিজাপতি তার মধ্যে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়ে উঠতে পারবেন কি না জানেন না। সম্ভবত পারবেন।

হেতমপুরের কথা ভাবতে ভাবতে গিরিজাপতি অনুভব করতে পারছিলেন, অনিদ্রা সত্ত্বেও এখন, তাঁর মনে একরকম স্বস্তি এসেছে। আজ যেন মনে হচ্ছে, গিরিজাপতির সামনে থেকে বিশ্রী এক সমস্যা সরে গেছে। তিনি ইচ্ছে করলেই এই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

অবনী আজ তাকে একটা বিষয় নিশ্চিন্ত করে গেল। মিহিররা গিরিজাপতির মনোভাব বুঝতে পেরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে।

ওদের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া এখন আর সমস্যা নয়।

পায়ের দিকের লেপটা সরে গিয়েছিল। রাত গভীর হয়ে আসার সঙ্গে ঠাণ্ডাও বেড়েছে। লেপটা পায়ের দিকে ঠিক করে নিয়ে গিরিজাপতি অন্ধকারে কয়েক দণ্ড চোখের পাতা খুলে থাকলেন।

খুবই আচমকা তার মনে হল, হেতমপুরের কথাটা এবার একদিন উমাকে বলবেন। উমা খুব খুশী হবে। এই কলকাতার গলি আর বাড়ি তারও ভাল লাগে না। হেতমপুর ফিরে যাওয়ার কথা শুনলে মেয়েটা বোধ হয় আনন্দে আটখানা হবে।

'উমা কুটির'। গিরিজাপতি প্রায় ছেলেমানুষের মতন এক বিষয় থেকে টপকে হঠাৎ হেতমপুরের ভবিষ্যৎ গৃহের নাম দিয়ে বসলেন। 'উমা কুটির' নামটা তার খুব ভাল লাগল।...

এই নাম পরক্ষণেই মনের শান্তিকে ঘোলাটে করে ক্রমশ অশান্ত করে তুলছিল। গিরিজাপতি প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে তাঁর হেতমপুর ফিরে যাওয়া এবং একটি আশ্রয়ের চিন্তার আরও একটি বড় কারণকে আবিষ্কার করলেন। উমা, উমার জন্যে এই আশ্রয়টুকু আজ বোধ হয় গিরিজাপতির কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

উমার জন্যে স্নেহ করুণা সহানুভূতির একটি আশ্রয় তিনি অবনীর কাছে খুঁজেছিলেন। পান নি; হয়ত পাবেন না। তিনি খুব নিশ্চিন্ত বা নিঃসন্দেহ কোনো কালেই হতে পারেন নি। আগে যাও বা একটা আশা ছিল, এখন অবনীর ব্যবহার থেকে সে-আশাও ক্ষীণ হয়ে গেছে। নিতান্ত অবনীর মতন ছেলে বলেই যেন একটি দুরাশাকে তিনি এখনও অবলম্বন করে আছেন। অবনীর মা-কে তৃতীয় পক্ষ করে এবার গিরিজাপতি এ-বিষয়ে শেষ কথাটা জেনে নেবেন।

সতেরো

কলকাতার শীত আজ ক'দিন তার পুরো নখ দাঁত বের করে শহরটাকে আঁচড়াচ্ছিল। মাঘ মাস। উত্তরে বাতাস দিচ্ছিল ক'দিন ধরে। সাগরের বাতাস। আঁচড়ও তাই তীক্ষ্ণ। কনকনে ঠাণ্ডার ভাবটায় আবার বাদলা লেগেছিল। বিকেলের পর শীত আরও যেন কষ্টকর হয়। ধোঁয়া আর ধুলোর চাপ জমে সন্ধ্যের দিকে কুয়াশা পুরু হয়ে ওঠে। গলিগুলোর চেহারা দেখলে মনে হবে এরা যেন ঘসা কাঁচের গায়ে আবছা অস্পষ্ট কোনো প্রতিবিম্ব। ভৌতিক রহস্যময় লোক যেন। সেদিন গিরিজাপতি পার্ক থেকে রিকশা করে বাড়ি ফিরে সদরে নামবার সময় দেখতে পেলেন, কে একজন দরজার প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে।

রিকশাঅলাকে পয়সা মিটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন গিরিজাপতি। গ্যাসের দীন আলো সদর পর্যন্ত আসে না। জায়গাটা পুঞ্জিভূত ধোঁয়ার এবং সামান্য কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। এখন সবে সন্ধ্যে। গিরিজাপতি চিনতে পারলেন না।

'কাকে চান?' গিরিজাপতি আগন্তুকের মুখ লক্ষ্য করতে করতে প্রশ্ন করলেন।' আগন্তুক বোধ হয় কিছুক্ষণ ধরে এই গলিটায় ঘুরেছে, ঘুরে এ-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে অনুসন্ধানের ইতস্তত- ভাব। গিরিজাপতির কথায় কেমন দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিব্রত হয়ে অপরিচিত লোকটি কিছু বলতে চাইছিল, গিরিজাপতি ঠিক শুনতে বা বুঝতে পারলেন না।

'আপনি কত নম্বর বাড়ি খুঁজছেন?' গিরিজাপতি বললেন, 'এটা এগারোর এক।'

সদরের দিকে আবার ভাল করে তাকাল আগন্তুক, যেন সে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল। বলল, 'নম্বর ঠিক মনে নেই, ওইরকম হবে।' বলে কিছু মনে

করছে, এমন গলায় বলল, 'এ-বাড়িতে আমার জানাশোনা এক ফ্যামিলি থাকত···' ; কথাটা অসম্পূর্ণভাবে শেষ হল।

গিরিজাপতির মনে হল, ভদ্রলোক কোনো কারণে তন্ময় এবং স্থিরচিত্ত। ওর চোখের কোটর খুব গভীর, দৃষ্টিও কেমন অনিশ্চিত, স্বাভাবিক মানুষের মতন দেখাচ্ছিল না ওকে, একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিল। 'এ-বাড়ির দোতলায় একটি পরিবার থাকে, নীচে আমি।' গিরিজাপতি বললেন, 'আপনি কি বাসুদের কথা বলছেন ?'

আগন্তুক হঠাৎ কেমন স্থির চোখে গিরিজাপতির দিকে তাকাল। নির্বাক। কেমন যেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র অথচ নিজেকে দমন করছে। গিরিজাপতির ধারণা হল, লোকটি বিহ্বল এবং ঈষৎ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

গলির মধ্যে বিশ্রী একটা কনকনে শীতের শিহরণ লাগছিল। গ্যাসের আলো মুখ ঢেকে পিট পিট করে চেয়ে আছে। ধোঁয়ার ভার নিশ্বাসে লাগছিল। আগন্তুক শূন্য চোখে সদরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

'ওপর থেকে কাউকে একবার ডেকে দেবেন ? আরতিকে—'

গিরিজাপতি এক মুহূর্ত ভাবলেন। এখন সবে সন্ধ্যে, সাড়ে ছটাও বাজে নি ; আরতি কি ফিরেছে ? 'আপনি আসুন আমার সঙ্গে, ডেকে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোককে সঙ্গে করে গিরিজাপতি বাড়ি ঢুকলেন। ঢাকা গলির মতন জায়গাটুকু পেরোবার সময় মনে হল, ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বারান্দায় এসে গিরিজাপতি পিছু ফিরে তাকালেন। সুইচের কাছে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। পথের বাতিটা জ্বলছিল ; বোধ হয় এইমাত্র কেউ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। লোকটি অন্যমনস্কভাবে আলোর দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল।

এই লোকটিকে সরাসরি ওপরে পাঠিয়ে দেবেন কি না ভাবলেন গিরিজাপতি। উমা বারান্দায় ছিল না। গিরিজাপতি পা বাড়িয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে উমাকে ডাকলেন। 'ওপরে গিয়ে একবার খবর দে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।'

উমা খবর দিতে গেল, যাবার সময় সিঁড়ির কাছ থেকে সদরের দিকে

তাকিয়ে একবার ভদ্রলোককে দেখে নিল। ভদ্রলোক ধীর পায়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে।

'আসুন—' গিরিজাপতি সৌজন্যের স্বরে বললেন, 'খবর পাঠিয়েছি।'

গিরিজাপতি বারান্দার সামান্য আলোয় ওকে অনেকটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন। মানুষটিকে কেমন উদভ্রান্ত কাতর দেখাচ্ছে। কপালের নানা জায়গায় কালো দাগ; মাথার চুল লম্বা, কয়েক কুচো চুল কপালে পড়ে আছে। গায়ে লম্বা ভারী একটা কোট, পিঠের ওপর দিয়ে ঝোলানো, ট্রাউজার আর শার্ট পরনে।

'বাড়িটা সেই রকমই রয়েছে—' অল্প আলোয় ছায়াবহুল বাড়িটা দেখতে দেখতে আগন্তুক বলল; যেন স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল। কথাটা বলে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল।

গিরিজাপতি ভাবছিলেন, পথে দাঁড় করিয়ে না রেখে ভদ্রলোককে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাবেন কি না! উমার ফিরে আসতে একটু যেন দেরী হচ্ছে।

'আপনি কোথ থেকে আসছেন?' গিরিজাপতি সাধারণ আলাপের স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'আমি—?' লোকটি গিরিজাপতির চোখে চোখে তাকাল। কোনো জবাব দিল না। ওর দৃষ্টি কেমন রহস্যজনক দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এ-প্রশ্ন যেন তাকে করা অনুচিত হয়েছে।

উমা নেমে আসছে। পায়ের শব্দে গিরিজাপতি সিঁড়ির দিকে তাকালেন। সিঁড়ির মাঝপথ পর্যন্ত এসে উমা ঝাপসা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল। গিরিজাপতি বুঝতে পারলেন, উমা অপরিচিত লোকের সামনা সামনি আসতে চায় না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই উমা বলল, 'আরতি ফেরে নি এখনও। সুধাদি আসছে—'

গিরিজাপতি আগন্তুকের দিকে তাকালেন। সিঁড়ির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে ও। উমার কথা কান পেতে শোনার পরও সে যেন আরও কিছু শুনছে।

এই অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখ গিরিজাপতি আবার মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ছোট চাপদাড়িতে থুতনি আর গালের মাংস ভরা। কপালটা বেশ লম্বা, কিন্তু কালো কালো দাগ। চোখ দুটো এতখানি কোটরে ঢুকেছে কেন গিরিজাপতি বুঝতে পারলেন না। তাঁর মোটামুটি ধারণা হল ভদ্রলোক কোনো ব্যাধিতে ভুগছে।

সুধা আসছিল। গিরিজাপতি সিঁড়ির দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

উমার পাশ দিয়ে নেমে আসতে আসতে সুধা মুখ তুলল। খুব যেন বিরক্ত এবং ক্লান্তভাবেই সুধা নেমে আসছিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর দু পা নেমে উঠোনে।

এখানে আলো এত স্বল্প যে পরস্পরের মুখ ভালো করে দেখা যায় না। সুধা অপরিচিত লোক দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল।

গিরিজাপতি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আগন্তুক আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে সুধার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

সুধা চোখ তুলে দেখছিল। এখানে সবাই নীরব। বারান্দার বাতির মেটে আলো উঠোনের একপাশে হলুদ-ধোওয়া জলের মতন পড়ে আছে। দোতলায় সামান্য শব্দ হল। ম্লান আলো এবং বিমূঢ় অপরিচয়-জাত স্তব্ধতার মধ্যে সুধা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ, যেন এইমাত্র তার চোখের সামনে থেকে কোনো মোটা পরদা সরে গেছে বলে সে দেখতে পাচ্ছে, যেন তার মানসিক জড়তা অকস্মাৎ দূর হয়ে গেছে বলে সে সজ্ঞান হতে পারল, সুধা সামনের মানুষটিকে অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারছে পারছে-না চোখে দু-পলক তাকিয়ে থাকল। আর পর মুহূর্তে কোনো অন্ধকারাবৃত গুহায় সহসা আলো এসে পড়েছে যেন, সুধা সম্পূর্ণভাবে স্মৃতির অন্ধকারে আলোকিত হবার আগেই অস্ফুট শব্দ করল, 'তুমি—!'

সুচারু স্তব্ধ। নিষ্পলক, নির্বাক। দুই চোখের মাঝখানে ভুরুর কাছে কোথাও একটা শিরা যেন কাঁপছিল। সুচারু সেই ব্যথা অনুভব করতে পারছিল।

সুধার পা কাঁপছিল। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড দ্রুত এবং শব্দবহুল হয়েছে। কপালের দুটো পাশ দপ দপ করছিল। হাত খুব আড়ষ্ট। সুধার মনে হল, সে স্বপ্নের মধ্যে সুচারুকে দেখছে। তার ভয় হল, এই দৃশ্য যে কোনো মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এখন—এই চিন্তায় দুঃসহ এক বেদনা তার রক্ত স্রোতে মিশ্রিত হয়ে যেন বুক আড়ষ্ট করে তুলছিল। ম্লান ধোয়া আলোয় সুধা কোনো রকমে একটা শব্দ করল। এই শব্দ নিশ্বাসের। যেন দীর্ঘকাল এই নিশ্বাসটুকু তার বুকের কোথাও আটকে ছিল।

সুচারুর গায়ের ত্বক উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কপালে চাপা ব্যথা। ঘাড়ের পাশটায় গরম লাগছে। নিজেকে অকস্মাৎ খুব তৃষ্ণার্ত মনে হল সুচারুর।

'এস।' সুধা বলল। ঘোরের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যেই বলল। বলে, দুর্বল কাঁপা পায়ে কোনো রকমে সিঁড়ির ধাপে উঠে রেলিঙ ধরল শক্ত করে, তারপর পা পা করে উঠতে লাগল।

সুচারু সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

গিরিজাপতি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। এবার নিজের ঘরের দিকে ফিরলেন।

বাসুদের ঘরে এসে সুচারু বসল। সুধা তখনও কেমন ঘোরের মধ্যে অর্ধ-চেতন হয়ে আছে। বাতিটা জ্বলছিল। বাসুর তক্তাপোশের তলায় আরতির বিছানা গোটানো রয়েছে। জানলা বন্ধ। শীতের স্পর্শ আবার অনুভব করা যাচ্ছিল।

সুচারু তক্তপোশে বসল। ঘরটা অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখল। মনে হয় না, সে-দিন আর আজকের মধ্যে তিনটে বছরের ব্যবধান। সুচারু এই ঘরের প্রায় প্রত্যেকটি অতীত স্মৃতি মনে করতে পারছিল।

সুধা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বারান্দা থেকে শীতের ঝাপটা এসে তার পিঠে লাগছিল। গায়ে সেই পুরনো শালের টুকরোটাও নেই। কে না কে

বাইরের লোক দেখা করতে এসেছে ভেবে সুধা ছেঁড়া টুকরোটা গায়ে দেয় নি। সুধার পা ঠাণ্ডা, শরীরও কাঁপছিল।

সুচারু তার প্রাথমিক বিহ্বলতা অনেকটা সামলে নিয়েছে। গায়ের তাপ এবং উত্তেজনার ভীত অস্বস্তি এখন ক্রমে কমে আসছিল। সুধাকে দেখছিল সুচারু। আজ যেমন করে সুধা দরজার কাছে, এমনি করেই তখন দাড়াত। সুচারু পূর্বস্মৃতি স্মরণের চেষ্টা করল।

কখনও কখনও এমনি করেই মানুষের কান্না আসে। পুঞ্জীভূত কঠিন বেদনা অন্তরের কোথাও সুখ অথবা সান্ত্বনার তাপে গলিত হতে থাকে। যে বেদনা নিবিড় দীর্ঘ ঘন মেঘের মতন কালো হয়েছিল, সেই মেঘ বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে আসে। সুধার বুকের কোনো নিভৃত সঞ্চিত বেদনা এখন গলিত হয়ে তার অনুভবকে কান্নায় রূপান্তরিত করছিল। গলার শিরা টাটিয়ে ফুলে উঠছিল, তালুর গহ্বরে শ্বাস বন্ধ হবার মতন অসহ যন্ত্রণা বোধ করছিল সুধা, বুকের দুর্বল হাড়ের তলায় কে যেন শিরা উপশিরায় আঙুল জড়িয়ে জড়িয়ে চাপা কান্নাটা তুলে আনছিল।

'তোমায় চেনা মুশকিল।' সুচারু যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করে এই প্রথম কথা বলল। মৃদু ধীর গলায়, প্রায় যেন অশ্রুত থাকল তার স্বর।

সুধা তাকাল না। তাকাতে পারছিল না। কচি মেয়ের মত তার মুখে ফোঁপানো কান্নার দুঃসহ আবেগ এসে গেছে। সুচারুর চোখের সামনে নিজের এই সঞ্চিত কান্না সে কাঁদতে চাইল না। মুখ নীচু করে কোনো রকমে অস্ফুটস্বরে বলল, 'বসো; মাকে ডেকে দি।' সুধা আর দাঁড়াল না, চলে গেল। যেন আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে তার সাহস হল না। ঠোঁটের আগায় কাতর আহত পশুর মতন যন্ত্রণার আর্তস্বর বুঝি এসে পড়েছিল।

সুচারু তাকিয়ে থাকল, দরজার সামনে সুধা নেই, তবু মনে হচ্ছিল ও যেন এখনও চৌকাটের সামনে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে বারান্দার হালকা অন্ধকার; রত্নময়ীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। সুচারু বিমর্ষ অন্যমনস্ক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে। পুরোনো স্মৃতি বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন ভাবে তার মনে পড়ছিল।

এই সংসারের ছবিটা বুঝি বদলায় নি। সুচারু সেদিন এবং আজকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ভুলতে চাইল, মনে করবার চেষ্টা করল, এই সময়টুকু সে অপ্রয়োজনীয় অংশ বিবেচনা করে বাদ দিতে পারে কি না! পারল না, সুধার মুখ মনে পড়ার পর এই সময় বাদ দেওয়া সম্ভব হল না। সময়ের স্পর্শ এই সংসারের ইটের দেওয়ালে পড়ে নি, বা পড়লেও সুচারুর অনভ্যস্ত চোখে এখন ধরা পড়ছে না, কিন্তু সংসারের মানুষগুলোর মুখে তার দাগ পড়েছে।

রত্নময়ী ঘরে এলেন। সুচারু অন্যমনস্ক ছিল। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকার পর সহসা রত্নময়ীকে চিনতে ও দেখতে পেল।

রত্নময়ীও সুচারুকে দেখছিলেন। সুধা না বলে দিলে সুচারুকে বোধ হয় সহজে তিনি চিনতে পারতেন না। চেহারটা কেমন বদলে গেছে সুচারুর। মুখ কি চেহারা কোনোটাই আগের মতন দেখাচ্ছে না। অপলকে সামান্য সময় সুচারুকে লক্ষ্য করে রত্নময়ী কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে সুচারুই কথা বলল।

'চিনতে পারেন, মাসিমা?' সুচারু ম্লান হাসল।

'না পারারই কথা—' রত্নময়ী জবাব দিলেন, 'সুধা না বলে দিলে আমি চিনতে পারতাম না।'

সুচারু যেন স্বীকার করে নীরবে হাসল। 'আপনার চেহারাও কেমন হয়ে গেছে, খুব রোগা দেখাচ্ছে।'

'আমার কথা বাদ দাও, সকাল বিকেল গিয়ে সন্ধ্যেতে এসে ঠেকেছি।' রত্নময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, একটু সময় নীরব থেকে বললেন, 'তারপর, কবে এলে?'

'তা কিছুদিন হল।' সুচারু ঘাড় উঁচু করে অন্ধকার ছাদ দেখল, চোখ নামাল আবার, 'আপনাদের আবার দেখতে পাব ভাবি নি।' সুচারু নিজের কোনো কথা মনে করে, না, রত্নময়ীদের কথা ভেবে এটা বলল বোঝা গেল না।

'আমরা আর কোথায় যাব, বাবা! ভগবান যেখানে এনে বসিয়েছেন—সেখানেই বসে আছি।'

অল্প সময় দু জনেই নীরব। শীতের কনকনে ভাব দরজা দিয়ে ঘরে এল আবার। সুচারু কি ভাবছিল। 'ছুটিতে এসেছ?' রত্নময়ী প্রশ্ন করলেন।

সুচারু মুখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। 'হ্যাঁ, বরাবরের ছুটি।' বলে কেমন ম্লান ভাবে হাসল।

রত্নময়ী ঠিক বুঝলেন না কথাটা। তাঁর ধারণা হল, বোধ হয় সুচারুর কাজ শেষ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। বললেন, 'আর যেতে হবে না?'

'না।' সুচারু মাথা নাড়ল। 'আর যেতে হবে না।'

রত্নময়ীর কেন যেন কথাটা ভাল লাগল। এই প্রথম তাঁর মনে হল, সুচারুকে দেখে তাঁর ভাল লাগছে।

'আরতি কোথায়?' সুচারু বলল।

'এখনও ফেরে নি—' রত্নময়ী জবাব দিলেন, 'কদিন হল ও একটা চাকরি পেয়েছে।'

সুচারু যেন মন দিয়ে কথাটা শুনল। তারপর সামান্য অবাক হবার মতন করে বলল, 'আরতি চাকরি করছে! বাঃ।...তা হলে বলুন আপনার ছোট মেয়েও বেশ বড় হয়ে গেছে।'

রত্নময়ী কথা বললেন না, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি কেমন প্রসন্ন দেখাল।

'বাসু?' সুচারু শুধলো।

'বাড়ি নেই।' রত্নময়ী ছোট করে জবাব দিলেন।

'ওর খবর কি? কি করছে আজকাল?'

'তেমন কিছু না।...ওই এক রকম...' রত্নময়ী এড়িয়ে যাবার মতন করে বললেন। সুচারু লক্ষ্য করল, রত্নময়ীর চোখের সেই প্রসন্ন ভাব মুছে গেছে।

সুচারু বাসুকে ভাবছিল। বাসুর সেই মার ধোর খেয়ে ফিরে আসার দৃশ্যটা তার মনে পড়ছিল। এই সংসারটা যে পালটেছে, সেদিনের স্রোত আর আজকের স্রোতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সুচারু ক্রমশ অনুভব করতে পারছিল।

রত্নময়ী অল্প সময় দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বললেন, 'তুমি বসো, বাবা। একটু চা করে আনি।'

রত্নময়ী চলে গেলেন। সুচারু বসে থাকল। রত্নময়ীর চেহারায় এই সময়ের ছাপ সে বোধ হয় স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে।

সুচারু একটা সিগারেট ধরাল। বাঁ হাতে প্যাকেট বার করল, বাঁ হাতেই লাইটার জ্বালল। অনেকক্ষণ পর তামাকের স্বাদ তার ভাল লাগছিল। ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে শোষিত ধোঁয়া পুরোটাই গিলে ফেলছিল।... সুধা এখন কোথায় সুচারু ভাববার চেষ্টা করল। পাশের ঘরে? উঠোনে? সুচারুর মনে হল, উঠোনে আলসের ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুধা এখনও কাঁদছে।

বেদনা বোধ করছিল সুচারু। সুধাকে এই প্রাথমিক আবেগ থেকে খুব সাবধানে বাঁচাবার চেষ্টা করা তার উচিত ছিল। কেমন কথে বা কি ভাবে সেটা সম্ভব হত সুচারু বুঝতে পারল না।

প্রথমে সিঁড়িতে পরে দোতলার বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ হল। দ্রুত চঞ্চল পায়ে কেউ উঠোনে এসেছে। রত্নময়ীকে ডাকল, রত্নময়ীর গলা শোনা গেল, তারপর কে যেন বিস্মিত স্বরে কি বলল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুচারুর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

সুচারু চিনতে পারে নি। চেনা প্রায় অসম্ভব।

'সুচারুদা—।' আরতি যেন ছুটে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত, সবিস্ময়ে সুচারুর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ যেন বলল, 'সুচারুদা—।'

সুচারু অনুমান করে নিল, আরতি। অনুমান করে খুব লক্ষ্য করে আরতির মুখ দেখতে লাগল।

'আরে, আরতি।' সুচারু হাসি মুখ করল।

'চিনতে পারলেন—' আরতি বড় সুন্দর ছেলেমানুষি ভঙ্গি করল।

'এতক্ষণে পারলাম।' সুচারু হাসল, 'চেনা কি যায়—'

'আ-হা!' আরতি ঠোঁট খুলে কেমন করে যেন মাথা হেলাল, চোখের দৃষ্টিতে চাপা খুশী। 'আমার বেলাতেই চেনা যায় না।'

আরতিকে কাছে ডাকল সুচারু। 'অত দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে চিনব কি করে, কাছে এস।'

'রাখুন, আর কাছে ডাকতে হবে না।' আরতি বলল, হেসে হেসেই বলল, 'দূরই ভাল।'

'ভাল—?'

'না ত কি! আমাদের দূর করেই রেখেছিলেন।'

সুচারু কথাটার অর্থ অনুভব করতে পারল। মনে হল, এ-কথা এ-বাড়ির অন্যেরাও বলতে পারত, বলে নি।

'খুব কথা বলতে শিখেছ ত!' সুচারু কথাটা হালকা করবার চেষ্টা করল।

আরতি ততক্ষণে সুচারুর প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। গালে হাসি, চোখে সরল আনন্দ। বলল, 'শিখব না। কথা না বলতে পারলে চাকরি থাকবে না।'

সুচারু বিস্মিত হল। 'কিসের চাকরি তোমার? এক উকিলরাই ত কথা বেচে খায় জানি।'

'আমাদেরও কথা বলে খেতে হয়—'আরতি ঘাড় এক পাশে হেলিয়ে যেন তার চাকরির গুরুত্ব বোঝাতে চাইল। 'সেলস্ গার্ল, মানে জানেন ত, দু টাকার জিনিস ছ টাকায় বিক্রি করা। খালি লোক ঠকানো। বাব্বা, সারা-দিন যে কী মিথ্যে কথা বলতে হয়—।'

সুচারু মনযোগের সঙ্গে আরতিকে দেখছিল, ওর কথা শুনছিল। কলকাতা শহরে সেলস্ গার্ল-এরও চলন হয়েছে তা হলে। সামান্য অন্যমনস্ক হল সুচারু। 'কিসের দোকান?'

'ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস। ধর্মতলায়। ওয়াছেল মোল্লার কাছে—আর একটু এগিয়ে।'

সুচারু ধর্মতলার পুরোনো দোকানগুলো ভাববার চেষ্টা করল।

'আপনি কবে এসেছেন ?' আরতি জিজ্ঞেস করল।

'কিছু দিন।'

'হঠাৎ আমাদের মনে পড়ল বুঝি ?'

আরতির চোখের দিকে তাকাল সুচারু। কিছু বলল না।

সামান্যক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল আরতি। তার খেয়াল হল, সুচারুকে একটা প্রণাম করা তার উচিত ছিল। যেন ভুল করে ফেলেছে, ছোট করে জিব কেটে আরও একটু এগিয়ে এসে পিঠ নোয়াল। 'কই পা দুটো এগিয়ে দিন।'

প্রথমে সুচারু বুঝতে পারে নি। পরে আরতির ভঙ্গি দেখে বুঝল। 'আরে থাক থাক— ; পায়ে হাত দিতে হবে না।'

আরতি সামনে, একবারে কাছাকাছি ; সুচারু কেমন বিব্রত বোধ করে পা সরিয়ে নিতে গেল, আরতি তার আগেই কোমর ভেঙে সুচারুর হাঁটুর কাছে ঝুঁকে পড়েছে। হাত দিয়ে ধরতে গেল সুচারু, আরতি ততক্ষণে পায়ে হাত ছুঁইয়ে ফেলেছে। হাত উঠিয়ে মাথায় ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে আরতি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। সুচারু বাঁ হাত দিয়ে আরতির বাহু ধরে রয়েছে তখনও। হাতের জোর আরতি অনুভব করতে পারছিল।

সুচারু যেন কি বলতে যাবে, আরতি সুচারুর দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ আরতির চোখে পড়ল, সুচারুর ডান হাতের জামাটা কেমন বুকের তলা থেকে কোলের কাছে চুপসে পড়ে আছে। কোটের ফাঁক থেকে বুক এবং কোল দেখা যাচ্ছিল। আরতি অবাক চোখে তাকিয়ে এই অস্বাভাবিক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। জামার তলায় হাত না থাকলে জামার হাতা যেমন দেখায় অবিকল সেই রকম দেখাচ্ছে।

আরতির চোখের দৃষ্টি থেকে সুচারু তার বিস্ময় ও কৌতূহলের কারণ অনুভব করতে পারল। দু মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না, বুক কেমন ভার লাগল, বাঁ হাতটাও আলগা হয়ে এল।

অকারণে হাসবার চেষ্টা করল সুচারু, তরল গলায় ঠাট্টা করবার চেষ্টা করছে যেন, কিছুই নয় এমন গলা করে বলল, 'সব জিনিস নিয়ে পথে ঘাটে

বেরোতে নেই, একটা রেখে এসেছি।' বলে চোখ তুলে হাসবার ভাব করল, হাসতে পারল না, মুখের মাংস কুঁচকে কেমন এক কষ্টের ভাব হল, চোখ সরিয়ে নিল সুচারু।

আরতি বুঝতে পেরেছে। নিজেকে অসাড় লাগছিল। অঙ্গের একটা অঙ্গ খোয়া যাওয়ার বেদনা তাকে কাতর করছিল। মুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। কষ্টের রেখা ফুটে উঠেছে চোখের তলায়। অস্বস্তি বোধ করে সুচারুর কাছ থেকে সামান্য সরে গেল।

গলিতে এ-পাড়ার একটা পাগলা সাইরেন বাজার শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে। সুচারু চমকে উঠেছিল। আরতি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল বলে দেখতে পেল না। পাগলটা সাইরেন বাজানোর রেশ টানতে টানতে এগিয়ে গেল।

সুচারু আর একটু হলে হয়ত ভয় পেত। শব্দটা যে নকল বুঝতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

আরতি আর কোনো কথা বলছিল না।

এই আবাহাওয়া বাইরের শীতের মতনই আড়ষ্ট কষ্টকর হয়ে আসছিল। সামান্য আগে আরতির সরল খুশীতে, তার জোর গলার কথাবার্তায় ঘরের মধ্যে জমা আবিলতা নষ্ট হয়ে এসেছিল; আবার—সুচারু অনুভব করল—আবার এই ঘরের বাতাসে ক্লেশ ও শূন্যতার ভার নামছে।

'তোমার দিদি কোথায়?' সুচারু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল।

'দিদি—।' আরতি মুখ তুলে তাকাল, 'দেখছি—' আরতি পিঠের দিক থেকে আঁচল টেনে নীচু মুখে চলে গেল।

সুচারু দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। বারান্দার বাতিটা বোধ হয় নিবিয়ে দিয়েছে কেউ। একটু বেশী অন্ধকার লাগছিল। রত্নময়ীর কোনো সাড়া শোনা যাচ্ছিল না, সুধারও নয়। মনে হচ্ছিল, বাইরেটা ফাঁকা, কেউ নেই। আরতিও নয়।

মাথার চুলে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চিরুনির মতন করে বার কয়েক টেনে নিল সুচারু। কপাল যেন খুব ঠাণ্ডা। চুলের গোড়ায় ব্যথা ব্যথা করল। দীর্ঘ শ্বাস টেনে আবার প্রশ্বাস ফেলল।

খুব আচমকা সুচারুর একটা কথা মনে হল। যদি কোনো রকমে সেদিন আর আজকের মধ্যে সময়ের রেখাগুলোকে মুছে ফেলা যেত সুচারু মুছে ফেলত। অঙ্কের খাতায় ভুল অঙ্ক অশুদ্ধ হিসেবে মোছা যায়, যোগফল অথবা গুণফলকে নিশ্চিহ্ন করে নতুন ভাবে লেখা চলে—জীবনে কেন যায় না! কেন?

এ-বাড়িতে পা দিয়ে সদরের গলিতে বাতিটা জ্বলতে দেখে সুচারুর সে-দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বিদায় নিয়ে যাবার দিন সুধা গলি-পথের অন্ধকারে বাতিটা জালিয়ে দিয়েছিল, ম্লান হলুদ একটু আলো। সুচারু সেই আলোয় সুধাকে সম্পূর্ণ ভাবে আবিষ্কার করেছিল। সুধা বলেছিল : আলো দিয়ে তুমি যাও।

সুচারু আলো দিয়েই গিয়েছিল। আজ ফিরে এসে সেই আলোই আবার জ্বলতে দেখল। যেন আলোটা সুধা সেই যে জালিয়ে রেখেছিল তারপর আর নিবিয়ে দেয় নি। বিষণ্ণ বোধ করছিল সুচারু। এ বিষণ্ণতা অন্য ধরনের; খুশী হয়েও না-হওয়ার জটিলতায় বেদনাদায়ক। প্রাপ্তির পর অক্ষমতার বোধে পূর্ণ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রাপ্তি, অথচ গ্রহণের উপায় নেই।

সুচারু মনে করতে পারল, যাবার সময় সে বলেছিল, 'আমি আবার আসব। ফিরে এসে তোমায় খুঁজব।' এত স্পষ্ট নিখুঁত ভাবে সুচারু কথাগুলো এবং সেই বিদায়-দৃশ্য মনে করতে পারল যে অল্প সময়ের মতন সুচারুর মনে হল, যেন এই মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটেছে, এখনও তার কানে নিজের মৃদু অস্পষ্ট স্বর ভাসছে।

'খুঁজতে হবে না তোমায়, যদি বেঁচে থাকি আমি থাকব। তুমি এস।' সুধা বলেছিল। সুচারু সুধার কথা মনে করতে পারল। সুধার সেই জড়িত আচ্ছন্ন নরম গলার শব্দগুলো এখন গুঞ্জনের মতন ধ্বনি তুলল।

সুচারু এসেছে। সুধা আছে। ওরা দু জনেই এমন অনিশ্চয়-দিনের মধ্যে নিজেদের প্রতিশ্রুতি রেখেছে। রাখা কঠিন ছিল। একজন অথবা দু-জনেই প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারত, ভাঙার সহস্র কারণ ছিল, ওরা দুজনেই এক চূড়ান্ত দুঃসময় ও সঙ্কটের মধ্যে ভাসমান ছিল, বলা অসম্ভব—কে কোথায়

ভেসে যেত, যেতে পারত। অথচ যায় নি। কেন যায় নি সুচারু জানে না। নিতান্ত ভাগ্যবান বলেই বোধ হয়।

দরজার পাললায় একটু শব্দ হল। সুধা ঘরে এসেছে। গায়ে সুতির মোটা চাদর। সুচারু তাকাল। সুধা মুখ নীচু করে মাটি দেখছে। চোখে চশমা। চশমার কাচের আড়ালে চোখ লুকোতে চাইছে যেন। নিজেকে সে দেখাতে পারছে না, দেখাতে চায় না। দরজার কাঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

সুচারু শীর্ণ নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ একটি মেয়েকে দেখছিল। কিন্তু, সুচারু ভাবল, সুধার দিকে বিষণ্ণ অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে ভাবল, কিন্তু কি হল সুধা? আমি আমার কথা রেখেছি, তুমি তোমার কথা রেখেছ। জোর করে উচিত ভেবে নিয়ে আমরা নিতান্ত ভাগ্যবশে পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি। কিন্তু এরপর—? এখন আর কি আশা কর তুমি? আর কি হতে পারে?

সুধা মুখ তুলেছে। মলিন। এই মাত্র বুঝি জল দিয়ে ধুয়ে এসেছে মুখ। ভিজে বিবর্ণ লাগছিল। কিছু কুচো চুল কানের পাশে গালে জড়িয়ে আছে। .. সুধা এমন ভাবে তাকিয়েছিল যেন তার কাছে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা এখন বিশ্বাস এবং সত্য অনুভবের মধ্যে এসেছে। পূর্ণ চোখে সে তাকিয়েছিল, নিশ্চিত ভাবে সে বোধ হয় কোনো পুনঃপ্রাপ্তির আশ্বাস পেয়েছে।

আঠারো

সে-দিন রাত্রে সুধা একটা স্বপ্ন দেখল। দেখল মাটিতে সে বসে আছে। প্রথমে মনে হয়েছিল পার্ক, পরে বুঝতে পারল পার্ক নয়, নদীর পাড়। খুব উঁচু ঢালু পাড়ের ওপর ঘাসে সে বসে রয়েছে। জায়গাটা যেন গাছ-গাছালিতে ভরা। তবু আলো আছে। সামনে নদী। নদীর জল স্রোতের টানে বয়ে যাচ্ছে। পাশে সুচারু। সুচারুকে খুব খুশী দেখাচ্ছিল না। সামনে নদীতে একটা নৌকো, একজন দাঁড় বইছে। সুধা নৌকো দেখছিল। সুচারু ঘাসের ওপর হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সুধা হঠাৎ বুঝতে পারল, নদীর জলে জোয়ার এসেছে, নৌকোটা অনেকখানি দূরে গিয়ে ঘাটে ভিড়ল। জোয়ারের জল বাড়ছে।

এই জল সুধার ভাল লাগছিল না। আলো মরে এসেছে, হয়ত সন্ধ্যে নামছে। পাখিরা যেন মাথার উপর গাছপালায় শব্দ করে উড়ে আসছিল।

বাড়ি ফেরার জন্যে সুধা উঠতে চাইল। সুচারু শুয়ে আছে। উঠছে না। সুধা ঘাড় ফিরিয়ে ডাকল। সুচারু উঠল না। সুধা গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল। সুচারু চোখ খুলল।

'কি হল?' সুচারু বলল।

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

'হোক না।' সুচারু যেন হাসছিল।

'জোয়ার এসেছে।'

সুচারু উঠে বসল। নদী দেখছিল। নদীর জল আরও বেড়েছে। বেড়ে পাড়ের অনেকখানি উঠে এসেছে। স্রোতের টানের শব্দ হচ্ছিল। কলকল করে জল বয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের সেই জল আরও অতল দেখাচ্ছিল।

'তুমি সাঁতার জানো না?' সুচারু হাসতে হাসতে জানতে চাইল

'না।' সুধা মাথা নাড়ল।

'তাই জল দেখে ভয় পেয়েছ।'

সুধা বুঝতে পারল সে ভয় পেয়েছে। নদীর জোয়ার দেখে সে ভয় পেয়েছে, জোয়ারের শব্দ শুনে তার বুক কাঁপছে। জলের ঢেউ পাড়ে আছড়ে পড়ছিল। আরও যেন জল বাড়ল; আরও। সন্ধ্যের অন্ধকারে নদী কালো হয়ে এল।

সুচারু হঠাৎ বলল, 'আমি এই জোয়ারে ডুব দিয়ে আসতে পারি।'

'না।' সুধা খুব ভয় পেয়ে বাধা দিল।

সুচারু শুনল না, ছেলেমানুষের মতন তার ঝোঁক চাপল ওই জোয়ারে সে ডুব দিয়ে আসবে। গায়ের জামাটা খুলে ফেলল সুচারু, খুলে সুধার কোলে ফেলে দিল। তখন জলের টান ভয়ঙ্কর, হু হু করে ভেসে যাচ্ছে, পাড়ের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সুধার প্রায় পায়ের কাছে উঠে এসেছে, কালো দেখাচ্ছিল সব। সুচারু উঠে দাঁড়াল। সুধা ভয়ে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'যেও না। নদী নিয়ে ছেলেখেলা নয়।'

'তুমি বসে থাক। আমি ডুব দিয়ে ফিরে আসছি।' সুচারু বলল, বলে সেই জোয়ারের জলে ঝাঁপ দিল।

সুধা বসে থাকল। ভয়ে কাঠ হয়ে, অজ্ঞান নিশ্চেতন হয়ে। তার কোলে সুচারুর জামা। সুচারু রেখে গেছে।

কতক্ষণ যে জল বয়ে গেল সুধা জানে না। সে নিশ্চল স্থির হয়ে বসে থাকল। সুচারু এল না। সুচারুর জামা কোলের মধ্যে তার স্পর্শের মতন মনে হচ্ছিল। সুধা উঠতে পারছিল না।

বসে—বসে—বসে—রাত হল। সুচারু আর এল না।

সুধা উঠে পড়ল। উঠে চলে আসছিল, তার পা অসাড়, হাঁটতে পারছিল না। জায়গাটা ঠিক মতন দেখতেও পাচ্ছিল না সুধা। কতকগুলো লোক অন্ধকারে যেন মাল ওঠাবার শব্দ করছিল। অনেক কষ্টে আন্দাজে সামান্য এগিয়ে এসে একটা ফাঁকা বড় রাস্তা দেখতে পেল সুধা। একেবারে ফাঁকা। অতবড় রাস্তার মধ্যে একটি মাত্র বাতি। সুধা চারপাশে তাকিয়ে ট্রাম লাইন খুঁজছিল।

বাস আসছে বলে সুধার মনে হল। শব্দ শুনতে পেল।

বাসটা কাছে এলে সুধা গাড়িটা দেখতে পেল। সুধার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। গাড়ির সামনে দেবব্রত-ডাক্তার বসে রয়েছে। সুধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন।'

সুধা যাবে না। সুধা যেতে চায় নি। কিন্তু দরজা খুলে কারা যেন নেমে এসে সুধাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে গাড়ির মধ্যে পুরে দিল। গাড়িটা চলছে, দুলছে। সুধা অসহায়ের মতন শুয়ে; তার মাথার দিকে মোমবাতির আলোর মতন একটু আলো।

তারপর গাড়িটা থেমেছে না থামে নি সুধা জানে না। সুচারুর জামাটা হঠাৎ সে মুখের পাশে গালে অনুভব করতে পারল। ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে যাবার পর অনেকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকল সুধা। শুয়ে শুয়ে ক্রমে নিজেকে ঘুম থেকে বিচ্ছিন্ন করে চেতনায় ফিরিয়ে আনতে পারল। পাতা খুলল চোখের। অন্ধকার। ঘরের কোনো জানলাই খোলা নেই। বারান্দার দিকের একটা জানলায় সামান্য ফাঁক, সুধা দেখতে পেল না। নীচে মাটিতে বিছানা পেতে মা ঘুমোচ্ছে।

অল্প সময় সুধা সামান্য নড়াচড়া করতেও পারল না, ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। ভয়ের রেশটুকুও যেন সর্বাঙ্গে লেগেছিল। লেপের তলা থেকে হাত বের করে গলায় রাখল একটু, পরে কপালে। তারপর আবার বুকের মধ্যে আনল।

আজ সন্ধ্যেবেলায় সুচারুকে যেমন চেহারায় দেখেছে সেই চেহারায় মনে করতে পারল। মনে করতে পারল, পাশের ঘরে তারা দুজনে অনেকক্ষণ সামনা সামনি থাকা সত্ত্বেও কত অল্প এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলেছে। ওরা দুজনেই ভীষণ আড়ষ্ট এবং অস্বস্তিবোধ করছিল। যেন এই পরিচয়টা একেবারে নতুন।

শেষ পর্যন্ত ও এল। সুধা ভাবে নি, সুচারু আর কোনোদিন আসবে। প্রত্যাশা করেনি। আজকাল আর বড় একটা মনেও পড়ত না। পড়ার কারণ ছিল না। অপেক্ষা করে করে এক সময় সুধা বাধ্য হয়ে ভেবে নিয়েছিল, সুচারু হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না; ভাবা কষ্টকর ছিল। কখনো কখনো সবচেয়ে ভয়ের কথাটা মনে আসত, কিন্তু সুধা শিউরে উঠে সেই ভয়ের ভাবনাকে থামিয়ে দিত। না, অত নিষ্ঠুর কথা সে ভাববে না। ভগবানের যে দুটো হাত এই বিশ্বসংসারের বিরাট অংশকে অন্ধকার অজ্ঞেয় করে রেখেছে—সুচারুকে সেই অন্ধকারে রেখে দিয়ে সুধা ভেবে নিত, কোথাও রয়েছে ও। ভেবে স্বস্তি পেত।

এমন করে কেউ আসে না।

এমন করে কেউ কি যায়? সুধা যেন সুচারুকে দেখছে, সামনে সুচারু, সুচারুর মুখের দিকে চেয়ে সুধা মনে মনে বলল: এমন করে কেউ যায়?

সুধা সদ্য দেখা স্বপ্নের সেই জোয়ার যেন আবার দেখতে পেল। তখন যেমন আতঙ্ক হয়েছিল এখন আর অতটা ভয় লাগল না। তবু ছমছম করছিল। সুচারু যে কেন জোয়ারের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল সুধা স্বপ্নের মধ্যে বুঝে পায় নি, এখনও পেল না। নেহাত জেদ, ও যে সাঁতার জানে এটা দেখাবার জন্যে ছটফট করছিল। সুধাকে বসিয়ে রেখে এই বোকার মতন বীরত্ব দেখানোর কোনো অর্থ সুধা খুঁজে পায় নি কোনোদিন। এখনও মনে হল না, সুচারু যুদ্ধ থেকে কোনো সম্পদ নিয়ে ফিরে এসেছে।তুমিও সাঁতার জানতে না।

তোমার যা ছিল তুমি হারিয়ে এসেছ। সুধা সুচারুকে মনে করে বলছিল: তুমি অকারণে একটা সর্বনাশের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে নিজের অনিষ্ট করে ফিরে এলে। যখন যাও তখন তোমার দিকে তাকিয়ে ভাল লাগত, তুমি নিখুঁত ছিলে—, ফিরে এলে হতশ্রী দীন হয়ে অঙ্গ হারিয়ে। তোমায় প্রথমে দেখে আমার মনে হয়েছিল, এ কে? একে আমি চিনি না, দেখি নি কোনোদিন। আমার ভয় হয়েছিল, বিশ্রী লেগেছিল। মন্দ ছাড়া ভাল চিন্তা আমার মনে আসে নি। উঠোনের সেই মিটমিটে আলোয় তোমার চেহারা মানুষের মতন দেখাচ্ছিল না, ভৌতিক দেখাচ্ছিল…যখন কাছে এলে, সামনে এসে দাঁড়ালে, মুখ দেখে তোমায় চিনতে পারলাম। তোমার মুখ এতদিন আমি অনেক কষ্টের মধ্যেও মনে রেখেছিলাম। ওই টুকু আমার সান্ত্বনা ছিল।

স্বপ্নের সেই জামার কথা মনে পড়ল সুধার। সুচারু গায়ের জামাটা রাখতে দিয়ে জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কোলের মধ্যে জামা নিয়ে দু হাতে আঁকড়ে সুধা অনেক সময় বসেছিল। তারপর আর জামার কথা তার মনে ছিল না। অজ্ঞানেই সেটা বয়ে বেড়াচ্ছিল।

নিজের ঠাণ্ডা নিশ্বাস সুধা অনুভব করতে পারল। আজ সে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছে। তার বুকে এমন একটা অনুভূতি যা সুধার আগে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ল না। কোনো ফাঁকা বোধের ওপর একটা স্বস্তির আচ্ছাদন যেন জড়ানো আছে। বেদনা ও দুঃখের কাতরতার ওপর নিরুদ্বেগের সামান্য শান্তি। সুধা এই অনুভব সম্পর্কে কিছুক্ষণ সচেতন হতে চাইল।

এই ঘরে শীত যেন আরও বেশী। কনকন করছিল। বাইরে হিম পড়ছে, মাঘের হিম। কী ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেতরটায়, কিছু চোখে পড়ছে না, রত্নময়ীকেও নয়। কান পেতে থাকলে মার ঘুমের ঘোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে: সুধা লেপের তলা থেকে হাত বের করে কপালে মুখে চুলে বুলিয়ে নিল, নিয়ে ঠোঁটের কাছে রাখল, ফাটা ঠোঁটের ছাল তুলল।

হাই উঠল সুধার। এখন কত রাত খেয়াল করবার চেষ্টা করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা, বরফের মতন কনকন করে উঠবে আবার এই ভয়ে বুকের তলায় নিয়ে সামান্য পিঠ ভেঙে বালিশে মুখ চেপে শুয়ে থাকল।

সুচারুর সঙ্গে আজ সামান্য কয়েকটা কথাবার্তা হয়েছে। কথাগুলো আবার ভাবছিল সুধা। যেন অনেক অজস্র কথা তাদের বলার ছিল বলা হয় নি, এবং সেই অভাব ক্ষুধার মতন কাতর করছে বলেই এখন সুধা সন্ধ্যেবেলার কথাগুলো ভাবছিল।

আমার ফিরে আসার কোনো ঠিক ছিল না। ভেবেছিলাম বাঁচব না। মৃত্যুটা ছিল নাগালে, বেঁচে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। তোমায় তাই কিছু জানাই নি। সুচারুর কথা, ঠিক যে ভাবে ও বলেছিল, সুধার মনে পড়ল।

যখন মৃত্যু সুচারুকে আগলে রয়েছে, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, শীতল নিস্তব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ সুধা কল্পনা করার চেষ্টা করল। পারল না। শুধু সুচারুর মুখ তার মনে পড়ল, স্থির চোখের পাতা বোজা। সর্বত্র অন্ধকার।

এই নির্মম দৃশ্য সুধাকে ভীত করছিল। চোখের পাতা খুলল সুধা। দৃশ্যটা ফিকে হয়ে এল। এই চিন্তাকে আরও দূরান্তে সরিয়ে রাখার জন্যে সুধা সহজ কথাগুলো মনে করল, মনে মনে পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করল।

'কবে এসেছ?' সুধা জিজ্ঞেস করেছিল।

'কিছুদিন।'

'কলকাতায়—?'

'না, কলকাতায় এসেছি বেশী দিন হয় নি। অন্য জায়গায় ছিলাম—'

খানিক পরে আবার।

'কোথায় আছ?'

'কাছেই, একটা হোটেলে।'

সুধা একটা শব্দ শুনল। রত্নময়ী ঘুমের মধ্যে হাঁপ ওঠার মতন শব্দ করে অস্পষ্ট গলায় কি যেন বললেন। আবার ঘুমোতে লাগলেন। সুধা জামাটা সামান্য আলগা করল। মা ঘুমিয়ে আজকাল ওই রকম করে ওঠে। আবার হয়ত হাঁপানি বাড়বে। যা শীত পড়েছে।

'তুমি ভীষণ রোগা হয়ে গেছ—' সুচারুর কথা আবার মনে পড়ল সুধার। 'চেনা যায় না।'

'কি হবে চিনে।' সুধা অন্যদিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলল।

সামান্য চুপচাপ। সুচারু যেন একদৃষ্টে তাকে দেখছিল। বলল, 'তোমায় দেখলে মনে হয়, কোনো অসুখে ভুগছ। কি হয়েছে তোমার?'

'কি আর...কিছু না।' সুধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে, 'অনেক দিন পরে দেখছ, তাই...'

না, তা নয়। সুধা এখন বিছানায় শুয়ে সুচারুকে মনে করে বলল: না, তা নয়। অনেক দিন থেকেই এই। আমি অসুখে ভুগছি। ক্রমাগত ভুগে চলেছি। এ-অসুখ কিসের আমি জানতাম না। আমায় কেউ জানতে দেয়

নি। এখন জেনেছি। অফিস থেকে আমায় ছুটি দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, রোগ সারলে আবার দেখা করতে। অফিস থেকে আমায় চাঁদা তুলে ওরা চারশো টাকা দিয়েছে। চন্দ্রসাহেব দয়া করে মাসে মাসে তিরিশ টাকা সাহায্য দিতে হুকুম দিয়েছেন, এক বছরের জন্যে। আমাদের অফিসটা বিলেতি কি না। অনেক দয়ামায়া।

আর, সুধা কি যেন বলতে গিয়ে, আবার স্বপ্নের কথা ভাবল। দেবব্রত ডাক্তার ফাঁকা রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি নিয়ে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

বুকের তলা থেকে অসহ্য এক যন্ত্রণা এবং কান্না যেন সিসের ডেলার মতন শক্ত ভারী হয়ে কণ্ঠনালীর কাছে এসে সুধার নিশ্বাস রুদ্ধ করছিল।

কষ্টে কাতর হয়ে ছটফট করছিল সুধা। গলা বুজে বুকের শিরা ছিঁড়ে হাহাকার উঠে আসছিল। মনে মনে বলছিল, কেমন সময় তুমি এলে দেখেছ! এমন সময় কেউ আসে!

অমন করে কেউ যায় না, বুঝলে! আর এমন সময় কেউ আসে না।

সুধা ঠোঁট চেপে রাখতে পারল না। কান্নাটা কাশির সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড ভাবে গলায় এসে গিয়েছিল।

উনিশ

প্যারাডাইস সিনেমার সামনে বাসু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। ম্যাটিনী শো ভেঙেছে, লোক বেরিয়ে চলে গেছে কখন, বাড়ি পৌঁছে গেল বোধ হয়। সন্ধ্যের শোয়ের লোক জমে ভিড় বাড়তে লাগল অথচ সেই মক্কেলের দেখা নেই। বাসুকে বলেছিল পাঁচটা সোয়া পাঁচটায় এখানে হাজির থাকতে। ফুটপাথে নেমে বাসু আর-একবার চারপাশে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিল। কোথায় বিশ্বাস? জগন্নাথ বিশ্বাসের কোথাও পাত্তা নেই। বেমালুম গুল চড়িয়েছে ও। নন্দার সঙ্গে দেখা করে বাসু এর শোধ নেবে। অ্যায়সা খিস্তি ঝাড়বে যে নন্দীটাও বুঝবে বাসুর সঙ্গে এ-রকম হারামিপনা করে পার পাওয়া যায় না।

বিরক্ত হয়ে বাসু আর প্যারাডাইস সিনেমার দিকে তাকাল না। কি করবে তাও ভেবে পেল না। পয়সা থাকলে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ত। ভেতরে ঢুকে ছবিগুলো দেখেছে বাসু। বইটা ভাল। খুব ভিড় হচ্ছে।

বিরক্তি আর আফশোস নিয়ে বাসু ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল। এক জোড়া পাঞ্জাবী মেয়ে সিনেমায় আসছিল। বাসু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মেয়েগুলোর জামাটামা ছিঁড়ে ফেটে পড়ছে। কী গরম চেহারা। এই মেয়েদের পাতলা পাতলা রঙীন উড়নিগুলোও বাসুর খুব ভাল লাগে। পথ হাঁটতে হাঁটতেই বাসু একটা মেয়েকে চোখ মেরে দিল।

নন্দীর বন্ধু ওই বিশ্বাসটা পয়লা নম্বরের খলিফা, বাসুকে ঝুটমুট নাচিয়ে মজা করল। এর শোধ বাসু নেবে। কে বাবা তোমার পা ধরে বলতে গিয়েছিল, আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে দাও। বাসু বলে নি। তুমি শালাই খুব বাকতাল্লা ঝাড়ছিলে।

নন্দীর ওপর অবশ্য বাসুর কোনো রাগ নেই, ওই বিশ্বাসের জন্যেই যা নন্দীর ওপর সে চটেছিল। নয়ত নন্দীর ওপর বাসু আজকাল যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

আই বাপ, সে-বারে আর একটু হলেই বাসুর হয়ে গিয়েছিল, সোজা শালা জেল। ঘটনাটা ভাবতে গেলে এখনও বাসুর কপাল ঘেমে ওঠে। সিকদার বাড়ির ছোটবাবু তাকে অ্যায়সা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল! ফিফটি রুপিজের ঠেলা সামলাতে বাসুকে শেষ পর্যন্ত থানায় যেতে হত। জোর বেঁচে গেছে।

সিকদার বাড়ির ছোটবাবু এখন কোথায়? পাটনায়? এলাহাবাদে? কোথায় কেউ জানে না। পুলিস তাঁকে ধরতে পারে নি। বাড়ি ঘেরাও করবার আগের দিন রাত্রেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। একেবারে হাওয়া।

সেই পঞ্চাশটা টাকা মুখের কথা খসাবার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গিয়ে বাসু ছোটবাবুর সঙ্গে ভিড়ে যাচ্ছিল আর কি। নন্দী তাকে বাঁচিয়েছে। বাসু কি জানত ছোটবাবু আসলে কোন ধরনের মানুষ? জানত না। নন্দী তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। রিয়েল ফ্রেণ্ড নন্দী। নয়ত আজকাল নন্দীর সঙ্গে বাসুর কত কম দেখা হয়, পথে ঘাটে আচমকা, সেই নন্দী বিপদ দেখে ছুটতে ছুটতে বাসুকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে গোল পুকুরের পার্কে বসিয়ে সব কথা বলেছিল।

সব শুনে বাসুর মাথা ঘুরে গেল। আরে ব্বাস, ছোটবাবুও সাংঘাতিক লোক। ওপরে ওই রকম—ফুলবাবু, ভেতরে গুলিগোলা রাইফেল নিয়ে কাজ কারবার করে।

নন্দী বলল, 'পুলিস ওর সব কিছু ওয়াচ করে। খুব তকে আছে। শীগ্রি ধরবে একদিন।'

'পুলিসে ধরবে—?'

'আলবাৎ। পুলিস যখন ঘা করে ভটচায, একেবারে দগদগে ঘা।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'জেনেছি। ...আমার এক চেনা লোক আছে পুলিসে। সি আই ডি ইনফরমার। সে বলেছে। .. তোমার কথা কাল আমায় জিজ্ঞেস করছিল। ছোটবাবুর সঙ্গে গাড়িতে ঘুরছ খুব।'

বাসুর বুক ধক্ করে কেমন যেন ভয়ে কেঁপে উঠল। তবে ত নন্দী সবই জানে। ঘাবড়ে গিয়ে বাসু বলল, 'ছোটবাবু কোন দলের?'

'জানি না। আজকাল কি দলের কমতি আছে। .. ফিফ্‌থ্‌ কলমিস্টের কোন দল কে জানে।'

'আমি.. নন্দী, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি মাইরি, ছোটবাবুকে কফেন্দা ভেবেছিলাম।' বাপ্পু বলল। বলে খানিক ভেবে সেই নারকেল ডাঙার কাঠগোলা থেকে বাক্স বয়ে আনার কথাটা প্রকাশ করল।

নন্দী উৎকর্ণ হয়ে সব শুনল, শুনে বোবা হয়ে বসে থাকল।

'বাক্সটা অ্যায়সা ভারী ছিল নন্দী, কি বলব তোমায়! শালা যেন লোহা বোঝাই করা ছিল।'

নন্দী সাড়া দিচ্ছিল না, অপলকে বাপ্পুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। বাপ্পু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'কি ছিল বলো ত মাইরি?'

নন্দী বলতে পারল না। চুপচাপ বসে থেকে শেষে বলল, 'দেখ ভটচায্‌, একটা কথা বলি তোমায়। তোমার এই সব ঝামেলায় না থাকাই ভাল। যা খারাপ দিনকাল, কোন দিক থেকে কি হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। তোমার এ আর পি-র চাকরিটা এস. ও. খারাপ রিপোর্ট দিয়ে খেয়েছে। কে জানে থানায় তোমার নামে কি লিখিয়ে রেখেছে শালা! সোজা কথা, নিজে সেফ সাইডে থাক, তোমার আমার শালা পেট ভরাবার চিন্তা—অন্য ব্যাপারে মাথা গলিয়ে কি লাভ! আজকাল হাজার হাজার ইনফরমার।'

এই ঘটনার পর বাপ্পু আর ছোটবাবুর ছায়া মাড়াত না। সিকদার বাড়ির পথটা সে যে জানে, বোধ হয় তাও ভুলে গেল। আর, নন্দীর কথাই ফলে গেল, কালী পুজোর পর একদিন পুলিস সিকদারবাড়ি ঘিরে ফেলল ভোর বেলায়। ছোটবাবু আগেই পালিয়েছেন।

পাড়ায় নানান গুজব রটল। কেউ বলল, ছোটবাবুর সঙ্গে সুভাষ বোসের দলের সাঁট ছিল, কেউ বলল জয়প্রকাশের। একটা গুজব অন্তত খানিকটা সত্যি হলেও হতে পারে। ছোটবাবু যাবার আগে নাকি বউবাজার আর মুচিপাড়ার অনেক জায়গায় কিছু রিভলবার পাচার করে গেছে। পরে কাজে লাগানো যাবে।

ভাবতে ভাবতে বাসু এস্প্লানেডের গুমটির কাছে চলে এসেছিল। বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। খানিকটা কুয়াশা চারপাশে। শীত যেন একটু কম হয়ে এসেছে কদিন।

আজকের বিকেলটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। নন্দীর বন্ধু বিশ্বাস—পুলিসের লোক বলেই—বড় বড় বাতচিত বলে। নন্দীর জন্যেই বিশ্বাসের সঙ্গে বাসুর আলাপ হয়েছিল। তারপর মাঝে মাঝে নন্দীর সঙ্গে দেখা করতে এসে বিশ্বাস বাসুকে খুঁজেপেতে বের করে, টেনে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ায়। বাসু প্রথম প্রথম এই চুগলিখোর পুলিসের লোকটাকে পছন্দ করত না, এখনও করে না খুব একটা, কিন্তু খানিকটা যেন ছোটবাবুর দরুণ সামান্য ভয়ে ভয়ে, খানিকটা বিশ্বাসের গায়ে পড়া ভাবের জন্যে কেটে পড়তেও পারে না।

বিশ্বাস নিজের থেকেই বলেছিল, বাসুকে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলেই চাকরি। কোথায় তা বলে নি। খালি বলেছিল, সিকরেট ব্যাপার আমাদের বলতে নেই। আজ প্যারাডাইস সিনেমায় ম্যাটিনী শো ভাঙার সময় দেখা করার কথা বিশ্বাসের। সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে দেখা করবে বলেছিল।

সব ঝুট। বিশ্বাসের মুখ আর করপোরেশনের কলের জল এক জিনিস। তা ছাড়া চাকরিটা যদি ওই বিশ্বাসের মতন হয়, পুলিসের গোলামি, ইনফরমারের চাকরি, বাসু করবে না। দূর বে, ও-সব চুতিয়া কাজ ভদ্রলোকে করে!...বাসু রাস্তা পেরিয়ে কার্জন পার্কে এসে পড়ল। পকেটে আনা চারেক পয়সা আছে, একটা আধ পোড়া সিগারেট, গোটা দুই বিড়ি। বেশ খিদে পেয়েছে। দু চার পয়সার চিনে বাদাম আর এক খুরি চা খাবে ঠিক করে বাসু কার্জন পার্কের ভেতর ঢুকে পড়ল।

অনেক দিন এই পার্কে আর আসে নি বাসু। আগে তারা বন্ধু বান্ধব মিলে বেড়াতে আসত, মুড়ি বাদাম খেত, সিগারেট ফুঁকত; কোনো কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে গিয়েও বসত। জায়গাগুলো আগে ভাল ছিল। এখন একেবারে রদ্দি হয়ে গেছে। কার্জন পার্কটা যত রকম কারবার চালানোর জায়গা। দিশী মেয়ে, আর বিদেশী সোলজার। দু পাঁচটা নিগ্রো সোলজারও

দেখা যায়। একটু অন্ধকার আর সামান্য ঝোপ ঝাড় পেলেই ওদের হয়ে যায়।

কার্জন পার্কের ও-পাশে লাট বাড়ির দিকে বাসু গেল না। ও দিকটা আরও খারাপ। অন্ধকার। বাসু শুনেছে, ইচ্ছে করেই পার্কের ওপাশটা বেশী অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। এমনি লোকজন বড় একটা যায় না ওদিকে।

ধর্মতলার দিকে মুখ করে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বাসু বসল। খানিক তফাতে দু এক জন বসে আছে। পার্কের মাঝ রাস্তাটা দিয়ে মিলিটারি যাচ্ছে মাঝে মাঝে, মেয়েছেলে টেয়েছেলেও চোখে পড়ছে বাসুর। সমস্ত পার্কটাই কেমন অন্ধকার, কুয়াশায় আরও ঝাপসা দেখাচ্ছে। ঘাস এবং গাছপালা ঠাণ্ডা।

বাদামঅলা আর কলসির চাঅলা কাছাকাছি আছে কোথাও, আসবে। পোড়া সিগারেটটা ধরিয়ে নিল বাসু। ধরিয়ে ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর এলিয়ে বসে পড়ল।

আজকাল বাসুর মন মেজাজ প্রায় খারাপ হয়ে যায়। কেন হয় বাসু বুঝতে পারে না। প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবে এমন কেউ নেই। এক গৌরাঙ্গ ছিল, সেই গৌরাঙ্গ আজকাল দূরের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার দেখা পাওয়াই কপাল। গৌরের একটা ছেলে হয়েছে। গৌরে বাপ হয়ে একেবারে কেতাৎ হয়ে গেছে। শালার মুখে কী হাসি, যেন আর কেউ বাপ হয় না। অফিস আর বাড়ি ছাড়া জানে না বেটা। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে নিজের ঘরে বউয়ের কাপড়ের গন্ধ শুঁকছে, আর ছেলে কোলে করে বসে আছে।

বাসু গৌরাঙ্গর মুখ মনে মনে কল্পনা করে নিজের মনেই কেমন হেসে উঠল। হাসল অথচ কোনো সুখ পেল না। মনে হল, গৌরাঙ্গ যেন ফাঁকি মেরে একটা বউ এবং ছেলে বাগিয়ে নিয়েছে। সবই কপাল, কপাল না হলে ওই গৌরেও বাপ হয়ে যায়। গৌরাঙ্গর ছেলের কথা মনে পড়ল বাসুর। বড্ড রোগা, কিন্তু ফরসা। ছেলেটা রোগা বলে বাসুর হঠাৎ খানিক দুঃখ এবং সমবেদনাও হল। গৌরাঙ্গ বলে, ছেলেটা নাকি এখনই পাকা বদমাশ হয়ে

গেছে। সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোবে, রাতে চেঁচাবে। 'ঘুমোতে দেয় না রে অ্যায়সা কাঁদে'—গৌরাঙ্গ খুব খুশ মেজাজে বলেছিল। শুনে বাসু মুখের মতন জবাব দিয়েছে,' সে বে'লে, তোর ছেলে কাঁদে আর তুই তোর বউয়ের পাশে বসে বসে শিবরাত্তির করিস! তোকে শালা চিনতে বাকি আছে আমার!'

মুড়িঅলা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। বাসু ডাকল।

ঝাপসা অন্ধকারে ঝুড়ি নামিয়ে বসে মুড়িঅলা মুড়ি তৈরি করতে লাগল। একটু বেশী পিঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা চাইল বাসু। সামনে দিয়ে একটা মেয়ে-ছেলে যেন কিছু খুঁজছে এমন ভাব করে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে রেলিঙয়ের কাছটায় চলে গেল, গিয়ে ঝোপের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটা একেবারে আট দশ আনা-অলা বেশ্যা। বাসু চেহারা আঁচ করেই বুঝতে পারল। হয়ত সেই ভিখারীগুলোরই একটা, ভাত খেতে কলকাতায় এসেছিল, তারপর রূপম সিনেমার ফোর্থ ক্লাস টিকিটের মতন তিন চার আনার বেশ্যা হয়ে গেছে।

মুড়ি হাতে করে বাসু এক গাল মুখে দিল। আরও একগাল। খুব ঝাল দিয়েছে বেটা। ঝালটা ভাল লাগছিল বাসুর।

পয়সা মিটিয়ে মুড়িঅলাকে হটিয়ে দিল বাসু, একটা চাঅলাকে ডেকে দিতে বলল।...শীত যেন একটু বাড়ল। মাটি ঘাস বেশ ঠাণ্ডা। চৌরঙ্গীর দিকে গাড়ি ঘোড়ার শব্দ খুব, ট্রাম এসে এসপ্লানেড জংশনকে যেন আরতি করে চলে যাচ্ছে অনবরত, ব্ল্যাক আউটের ঠেলায় আকাশটাও কী কালো দেখাচ্ছে। তারা ফুটেছে অনেক। একটা প্লেন রেড বোড থেকে উঠে কোথায় সেই অন্ধকারে ঠহল দিতে গেল। মেয়েটা ঝোপের পাশে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে।

অন্ধকার যত বাড়ছিল, বাসুর মনে হল কার্জন পার্কের রেলিঙয়ের ঝোপে আর লতাপাতার আড়ালে ততই যেন দু একজন করে লোক বাড়ছে। মাঝের রাস্তাটা দিয়ে লাট বাড়ির দিকে সাজা-গোজা দোঁ-আসলা মেয়ে আর সোলজার প্রায়ই যাচ্ছে। হাতে হাত এঁটে, বুকে জড়িয়ে নিয়ে শালারা ফুর্তি করতে গাছতলায় চলেছে। সুখ এদের!

সেবারে যুদ্ধের চাকরির খোঁজে গিয়ে বাসু যে কেন হেস্টিংসের সেই বাড়িটা থেকে ফিরে এল। না এলে আজ তার কিসের পরোয়া! পেটের কথাও ভাবতে হত না বাড়ির ঝামেলার মধ্যেও থাকতে হত না। দিব্যি থাকা যেত। আসলে, এই যুদ্ধের চাকরি যারা করে তারাই এখন সুখে আছে, খেতে পরতে পায়, মেয়েছেলেও পায়। বাসুর দুঃখ হচ্ছিল, অনুতাপ হচ্ছিল, সে সেদিন বাড়ির কথা ভেবে কেন মন খারাপ করে ক্যাম্প থেকে কেটে পড়েছিল। নন্দীকেও বাসু কাটিয়ে এনেছিল।

চাঅলা কাছে এসেছে। বাসু এক ভাড় চা চাইল।

সেই মেয়েটা খদ্দের পেয়ে গেছে। একটা লম্বা রোগা লোক কোন দিক থেকে যেন এসে মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে কি একটু কথা বলল তারপর পিছুতে অন্ধকারে হটে গেল।

'তোমারা কেত্‌না লাভ হোতা হায়?' বাসু তার নিজের হিন্দীতে চা অলাকে জিজ্ঞেস করল পয়সা দিতে দিতে।

'থোড়া কুছ, বাবু। দো আড়াই রুপেয়া।' চাআলা জবাব দিল।

'মাহিনামে সাট সত্তর!'

'জী।'

'উধার নেহি যাতা—?' বাসু লাটবাড়ির দিকটা দেখাল।

'যাতা হ্যায় বাবুজী, মগর ইয়ে অঁধারি মে নেই। ওও ফৌজী শালে লোক বহুৎ জনোয়ার হ্যায়। আগর গোস্সি-অলি চালা দে।' চা অলা কলসি উঠিয়ে নিচ্ছিল, বলল, 'বাহানচোত লোক এক রাণ্ডিমে দু তিন আদ্‌মি।' দাঁড়াল লোকটা, যেতে যেতে বলল আবার, 'ইয়ে বাগচা শয়তান কো জাগা। ধরম ইযে না হ্যায়।'

চাঅলা চলে গেল। বাসু অন্যমনস্ক ভাবে শেষ ঢোক চা খেয়ে খুরিটা সামনে ছুঁড়ে মারল, ফুলের কেয়ারিটার দিকে। তারপর একটা বিড়ি ধরাল।

যুদ্ধের চাকরি এখনও কি পাওয়া যায়? যায় বোধ হয়। বাসু জানে না। নন্দীকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। নাস ফার্স এরোপ্লেনের লোক-

জন ত খুব নিচ্ছে, রাস্তাঘাটে ছবি দেখেছে বাসু, সিনেমাতেও। এবার একবার যুদ্ধের চাকরির চেষ্টা করে দেখলে হয়।

যুদ্ধের চাকরির কথা ভাবতে গিয়ে সুচারুর কথা মনে পড়ল বাসুর। আজ পর্যন্ত সেই মক্কেলের সঙ্গে বাসুর একদিনও দেখা হল না। অথচ লোকটা এর মধ্যে দু তিনবার বাড়িতে এসে আড্ডা মেরে গেছে। আরতির কাছে সুচারুর কথা সব শুনেছে বাসু। যুদ্ধে গিয়ে লোকটার ডান হাত কাটা গেছে। খুব জখম হয়েছিল, মরতে মরতে কপাল জোরে বেঁচে গেছে।

বাসুর সামান্য কষ্ট হল। একটা লোকের ডান হাতই যদি কাটা যায় তবে আর থাকল কি? একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে জীবনটা। হাত কাটার দুশ্চিন্তা বাসুকে ম্রিয়মান করল।

একটা ট্রাম ধর্মতলার দিকে যেতে যেতে মাথার উপর আগুনের ফুলকি জ্বালিয়ে মিনিট খানেক ফরফর করে পুড়ল। ট্রামটা দাঁড়িয়ে। সামান্য ত্রস্ত গলা শোনা গেল, তারপর আবার ঘণ্টার ধ্বনি ছড়িয়ে চলে গেল ট্রাম। বাসু আগুন-জলাটা দেখল। আর সেই আলোয় পার্কের গাছপালা রেলিঙ বেড়া ঘাসও কয়েক লহমার মতন দেখে নিল। মনে হল খানিক দূরে মলঙ্গ পাড়ার কয়েকটা ছোঁড়া বসে আছে।

যুদ্ধের চাকরির কথা আবার ভাবল বাসু। ক মুহূর্ত আগে হাত-কাটা পড়ার যে দুশ্চিন্তা হয়েছিল এখন সেই দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে ফেলে বাসু ভাববার চেষ্টা করল, কি শালা এল গেল তাতে, হাত থেকেই বা কোন সুখে আছে সে? হাত পা আছে বলেই ত আরও বাত শুনতে হয়, না থাকলে কেউ কিছু বলত না।

বাসুর ভাল লাগছিল না। আগে সে এত বাজে কথা ভাবত না, আজকাল প্রায়ই ভাবে। আরতির চাকরিতে ঢোকার পর যেন আরও বেইজ্জত হয়ে গেছে বাসু। মার কাছে আর মুখ তোলা যায় না, আরতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে মা বলে, তুই না পুরুষমানুষ! লজ্জা করে না। ওই এক ফোঁটা মেয়েটা বাড়িতে বসে বসে এর ওর পায়ে ধরে কাজ যোগাড়

করতে পারল, আর তুই পারিস না! ছোট বোনের পা ধোওয়া জল খা, তবু যদি শিক্ষা হয়।

আরতি যে কি করে চাকরি পেল বাসু আজও ভেবে পায় না। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার। শালা গৌরের যে তলায় তলায় হাত ছিল বাসু কি জানত। জানতে পারল সে-দিন যে-দিন গৌরে আরতিকে নিয়ে তার এক ভায়রার কাছে গেল। ব্যাস, ওই একবারই, তারপরেই চাকরি পেয়ে গেল আরতি।

একটা মেয়েছেলে হয়েও কেন জন্মাল না সে। বাসু দুঃখের সঙ্গে ভাবল, মেয়েছেলে হলে আজকাল হরদম চাকরি পাওয়া যায়। সব শালা মেয়ে-চাটা হয়ে গেছে। নয়ত কার্তিকের বিধবা দিদিটাও নার্সের চাকরি পেয়ে যায়, দু বেলা যে বাসন মাজত আর সেলাই তুলত।

দিদির যে চাকরিটা গেল, পুরোপুরি না হলেও ওই প্রায় যাওয়াই, সেই দিদিই কি আর বসে থাকবে না কি? আবার একটা জুটিয়ে নেবে। লাভের মধ্যে কিছু থোক টাকা পেয়ে গেল। দু দিন বাড়িতে খেয়ে ঘুমিয়ে আরাম করে নিচ্ছে।

এতক্ষণে শীত ধরে গিয়েছিল। ঠাণ্ডায় বসে বসে মাথাটা কনকন করছে। কুয়াশা আরও চাপ। বাসু উঠে পড়ল। এখন সবে সন্ধ্যে ঘোর হয়েছে, এরই মধ্যে কেমন রাত রাত দেখাচ্ছে পার্কটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বাসু ধর্মতলার দিকে মুখ করে এগুতে লাগল।

নেই নেই করেও পার্কের ফেন্সিংয়ের এদিকটায় কিছু লোকজন। শীত বলে কেউ কেউ উঠে পড়ছে, কেউ বসে বসে গান গাইছে, দুটো লোক সামান্য আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা বাঙালী মেয়েকে নজর করছে।

পার্কের বেড়া পেরিয়ে ফটক দিয়ে বাসু বাইরে এল। ট্রাম লাইন টপকে ধর্মতলার দিকে হাঁটতে লাগল অন্যমনস্ক ভাবে। কাল পরশুর মধ্যে কিছু টাকা রোজগার করতে হবে। নয়ত মা আর তিষ্ঠে দেবে না। আজকাল, দিদির সঙ্গে সেই ঝগড়ার পর, মা বাসুর কাছ থেকে টাকা গুনে নিয়ে তবে রেহাই দেয়। গতমাসে বাসু কাবলিঅলা জপিয়েছিল, পাড়ার চেনা

কাবলিওলা। এ-মাসে সেই কাবলিঅলা ক দিনই পাড়ায় খুঁজে গেছে বাসুকে। বাসু তাকে গিরিধারীবাবুর লেন আর এ. আর. পি.র মেডিকাল পোস্ট দেখিয়ে টাকা ধার করেছিল। সে বেটা এখন পঙ্কাকে চেপে ধরেছে। পঙ্কা বলেছে, বাবু কাম মে বাহার গিয়া হায়, লউট নে মে থোড়া দেরী হোগা।

চৌমাথাডিঙিয়ে বাসু ফুটপাথ ধরল। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনু ধরে গেলেও চলত, বাসু কেন যেন ধর্মতলা স্ট্রীট ধরেই হাঁটতে লাগল।

সমস্ত দোকানই খোলা। লোকও অনেক। ট্রামের ভিড় সামান্য কমেছে, বাসে গাদাগাদি। দোকানে রেডিয়ো বাজছে, খবর পড়ছে সেই লোকটা : আমাদের বোমারু বিমান বুধবার রাত্রে শত্রুপক্ষের গোপন ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়…। একটা ঘড়ি চোখে পড়ল বাসুর, পৌনে সাত। রিকশায় ছুঁড়ি বসিয়ে এক মাতাল নিগ্রো সোলজার চলে যাচ্ছে, পকেটমার ধরে ফেলেছে কেউ ট্রামে, ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে, চেল্লাচেল্লি লেগেছে…বাসু চারপাশ দেখতে দেখতে হেঁটে চলল।

নিউ সিনেমার কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বাসু। আরতি না! সঙ্গে একটা অচেনা ছেলে। রিকশা ডাকছিল ছেলেটা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না বাসু। বোকার মতন দাঁড়িয়ে বার কয়েক চোখের পাতা ভাল করে কচলাল। হ্যাঁ, আরতি। অন্ধকারের ঘনতার দিকে সরে গেল বাসু; চোখে না পড়ে যায়। আরতিকে খুব তীক্ষ্ণ ভাবে নজর করতে লাগল। বাসুর অবাক লাগছিল, আরতি অচেনা অজানা একটা ছেলের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে। সামান্য তফাতে আরতিদের দোকান। দোকানটা এখনও খোলা বলে মনে হল বাসুর। চাকরি শেষ করে বেরিয়ে আরতি কি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে গল্প করছে? ও কে—ওই ছেলেটা? পাতলা গোছের ছোকরা। সাদা প্যাণ্ট; গায়ে শার্টের ওপর ফুল হাতা কলার তোলা লালচে সোয়েটার। চুল ওলটানো।

বিস্ময়ের হতবোধ ভাব কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসু তীব্র রাগ এবং জ্বালা অনুভব করল। ছোঁড়াটা আরতিকে বাগিয়েছে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

তার মনে হল, ছোঁড়াটা আরতিকে বাগিয়ে নিয়েছে। পর মুহূর্তেই বাসু নিশ্চিত হল, আরতি ওই ছোঁড়াটার পাল্লায় পড়ে গেছে।

রিকশা ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। ছোঁড়াটা কি যেন বলছে আরতিকে। আরতি আহ্লাদীর মতন ডান হাত মুখের কাছে নেড়ে না না ভাব করল, তারপর রিকশায় উঠল ; উঠে এক পাশে ঘেঁষে বসল। ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, রিকশায় উঠে আরতির পাশে বসল। রিকশার পিঠ গুটোনো।

বাসুর মাথা দপ্ দপ্ করছিল, চোখের ধার দিয়ে যেন এই দূরত্বটুকু কেটে ছেলেটাকে হিংস্র ভাবে দেখছিল বাসু। গায়ের চামড়া জ্বালা করছিল, কান গরম, নিশ্বাস উষ্ণ। সহসা সে অনুভব করছিল, কোনো কিছু অসম্মানের লজ্জার অপমানের দৃশ্য সে দেখছে। দাঁতে দাঁত ঘষে বাসু ইতর একটা গালা-গাল দিল।

রিকশা চলতে শুরু করেছে। বাসু কি করবে বুঝতে পারল না। ছুটে গিয়ে ধরবে রিকশাটাকে? পেছনে পেছনে যাবে? কোথায় যায় ওরা, কি কারবার করে দেখবে? দেখা দরকার। ওরা কি করে দেখা দরকার।

দেখতে দেখতে রিকশাটা চোখের বাইরে চলে যাচ্ছিল। বাসু পেছন পেছন ছুটতে শুরু করল।

ধর্মতলা দিয়ে রিকশাটা যাচ্ছে, বাসু ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় বাসুর মনে হল, ছেলেটা আরতির পিঠের পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে রিকশার পিঠ তুলে নিল। ও শালা আরতিকে ঘন করে জড়িয়ে আরতির গা নিজের দিকে টেনে নিয়ে সুখ করে বসছে আর কি। একটা কোথাকার কে আরতিকে পার্কের মেয়েছেলের মতন লোটবার জন্যে গায়ে গায়ে টেনে নিয়ে বসেছে দেখে বাসুর হাত গা পা হিংস্র হয়ে উঠল, বড় বড় পা ফেলে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল বলে দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং উত্তেজনার সঙ্গে মিশ্রিত এই তীব্র ঘৃণা ও শত্রুতার জ্বালা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল। চোর ধরার মতন করে বাসু ছুটছিল। ধর্মতলা স্ট্রিটের ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়ার ভিড় আর ব্ল্যাকআউটের ঘোলা আলোয় চোর বার

বার দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। বাসুর অন্য কোনো খেয়াল নেই, ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে চকিতে বাসুর মনে হল, একটা রাস্তার লোক তার—তাদের অনেক কষ্টে বাঁচানো কি একটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কি জিনিস বাসু বুঝল না। বোঝার চেষ্টা করল না। শুধু অনুভব করতে পারছিল, তাদের অধিকার থেকে আরতিকে কেড়ে নিয়ে ওই অচেনা লোকটা পালাচ্ছে।

অন্ধকারে, কিছু বিক্ষিপ্ত লোকজনের ভিড়ে, বাস আর ট্রামের আড়ালে রিকশা হারিয়ে গেল।

কুড়ি

স্বভাবত এ বাড়িতে যা হয় না, আজ কোন ভাগ্যবশে তা হচ্ছিল। রাতের খাওয়া সারতে বসে রত্নময়ী আর দুই মেয়েতে কথা হচ্ছিল কিসের যেন, সেই কথার সূত্রে হঠাৎ—একেবারে আচমকা—অবিশ্বাস্য ভাবে তিন জনেই হেসে ফেলেছিল।

হাসিতে ভাটা পড়লে সুধা বলল, 'তাহলে সেই বুড়ির তোকে খুব মনে ধরেছে ?'

আরতি সামান্য লজ্জা পেল। দিদির দিকে পলকের জন্যে চোখ তুলে দেখে আবার চোখ নামিয়ে নিল।

'অধর্ম করতে তোদের একটু আটকায় না বাপু—' রত্নময়ী বললেন, 'তোরা যা হয়েছিস আজকাল !···তোর মা মাসির বয়সী বুড়ি, আদর করে তোর মুখে হাত বুলিয়ে চুমু খেল আর তুই তার গলা কাটলি।'

'আহা, আমি গলা কাটলুম কোথায় ?' আরতি আপত্তি করল। 'যা বড়লোক দাম দিয়ে জিনিস ত কিনবেই।'

'জিনিসটা তা বলে ভাল না। তুইই ত বললি, খেলো। তা হলে ঠকাবি কেন ?' রত্নময়ী ন্যায় মতন কথা বললেন।

'আমি ঠকিয়েছি কোথায় ! দোকানে যা দাম বেঁধেছে। আমি কি করব।' আরতি জল খেল।

পাতের পাশ থেকে এঁটো কুড়িয়ে নিতে নিতে সুধা বলল, 'বুড়ি এবার এলে খুব দামী দামী জিনিস দিবি, ভাল ভাল জিনিস, পরে তোরই হয়ে যাবে। বলে সুধা হাসল, হেসে রত্নময়ীকে বলল, 'বুড়ির ছেলে আছে কি না তুমি একবার খোঁজ কর, মা।'

আরতি লজ্জা পেয়ে কেমন যেন দিদির খুনসুটির বিরুদ্ধে একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল।

রত্নময়ী বললেন, 'আমার বড়লোকে দরকার নেই, গরিব গেরস্থ ছেলে হলেই আমি খুশী।'

আরতি উঠে পড়ল। সুধার কেমন যেন এখন আরতিকে বড় ভাল লাগছিল। ভগবান এই মেয়েটাকে হঠাৎ করে বুঝি এত লাবণ্য ঢেলে দিয়েছেন। কিংবা কে জানে, ঘরের ঝুল ধুলো কালি ময়লার সঙ্গে মলিন হয়ে মিশে ছিল বলে আরতির সৌন্দর্য ও লাবণ্য এমন করে চোখে পড়ত না। আজকাল পড়ে। চাকরি পেয়ে মেয়েটা খুব খুশী। এই খুশী তার অর্ধেক উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে। তাছাড়া, এই বয়েসে—সতের আঠার বছর বয়সটা মেয়েদের এই রকমই করে তোলে। সুধা নিজের কথা ভাবল, তার ওই বয়সের কথা। সে কি হতে পেরেছিল? সুধা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বাইরে রান্নাঘরের পাশে নর্দমার কাছে এঁটো বাসনপত্র রেখে আরতি নীচে যাচ্ছিল। সিঁড়ির কাছে আসতেই চোখে পড়ল, বাসু ঘরের কাছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আরতি কিছু বুঝল না, বোঝার কিছু ছিল না। দাদার বিছানা পাতা আছে। হয়ত ও এমনি দাঁড়িয়ে আছে। এই শীতে যে কি সুখ বাইরে দাঁড়িয়ে কে জানে।...আরতি হাত মুখ ধুতে নীচে কলঘরে চলে গেল।

বাসু অনেকক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে। রান্নাঘরে হাসির যে রোল উঠেছিল সেই হাসি সে শুনেছে, শুনে অন্ধকারে পা টিপে এগিয়ে গিয়ে ওদের কথাবার্তাতেও কান পেতেছিল। তার মেজাজ আরও যেন বিগড়ে যাচ্ছিল ওই সব হাসি তামাশা শুনে। আরতি যে চাল দিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত মিথ্যে, আগাগোড়া বানানো, বাসুর তাতে সন্দেহ ছিল না। এক একবার মনে হচ্ছিল, মার কাছে গিয়ে আরতির চাল ভেঙে দেয়। আসলে আরতি যে কী, কেমন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে, ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে কোল ঘেঁষে বসছে, সে-কথা মাকে বলে দিয়ে আসে। মা ভাবছে, মেয়ে

চাকরি করছে—; দিদি ভাবছে, বোন চাকরি করছে; কিন্তু তাদের মেয়ে বোন যে কেন চাকরি করছে তারা জানে না।

আজ বাসু ভয়ঙ্কর অধৈর্য। তার কিছু ভাল লাগছিল না। সেই সন্ধ্যে থেকে আরতিকে সে পিছু নিয়েছে। তখন, ওদের রিকশা হারাবার পর, বাসু ট্রাম ধরেছিল, সেকেণ্ডক্লাস ট্রামের পা-দানিতে চেপে রিকশাটাকে খুঁজতে খুঁজতে ওয়েলিংটনে এসে আবার পেল। ওয়েলিংটনে রিকশা থামিয়ে ওরা পার্কে ঢুকল। বাসু ভেবেছিল, এখানে দুজনকে ধরবে। ধরতে পারল না। ওরা কেন যেন কোথাও বসল না, একটা চক্কর মেরে বেরিয়ে পড়ল। বাসু আড়াল রেখে পিছু নিল আবার। ছেলেটা শ্রীনাথ দাস লেন পর্যন্ত এসে হাওয়া হয়ে গেল। বাসু ছেলেটাকে ধরতে পারত, পারল না বাসের জন্যে, বাসে উঠে ছেলেটা চলে গেল। আরতিও সেই ফাঁকে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়েছে।

বাসুর ইচ্ছে হয়েছিল, তখনই বাড়ি এসে আরতিকে ধরে। কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে একটা হল্লা বাঁধালে ব্যাপারটা যে কোথায় গড়াবে বাসু অনুমান করতে পারল না। তা ছাড়া, বাড়িতে ব্যাপারটা সকলকে জানাবার আগে বাসু নিজে এই মামলাটা জানতে চায়। আরতিকে মা দিদির হাত থেকে বাঁচাতে অথচ নিজের কর্তৃত্বের কাছে তাকে দাবিয়ে রাখার অদ্ভুত এক বাসনা বোধ করছিল। বোধ হয় বাসু আরতির কাছে দেখাবার চেষ্টা করছিল সে আরতির সবচেয়ে বড় হিতৈষী; হয়ত বোকার মতন প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিল, এই গোপনতাটুকু বাঁচিয়ে আরতিকে সে অন্যের পীড়ন ও আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

সারা সন্ধ্যে এবং এতটা রাত পর্যন্ত বাসু অন্য কিছু ভাবে নি। পাড়ায় ঘুরেছে পরে, গৌরাঙ্গর খোঁজ নিয়েছে আগে, পায় নি, বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরেছে; অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে আরতিকে সে ঘরে একা পাবে। ওদের খাওয়া গল্প হাসাহাসি কোনো কিছুই তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। বরং এই ভাবে সময় ব্যয় হয়ে যাওয়ায় বাসু আরও অধীর বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

আরতি নীচে কলঘরে যাচ্ছে দেখে বাসু এবার ঘরে গিয়ে বসল।

সংসারের পাট চুকল। রত্নময়ী সারাদিনের এঁটোকাটা বাসী থান বদলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ও-ঘরে ঢুকলেন। আরতি এ-ঘরে তার বিছানা পেতে ফেলেছে। শীত বলে আগে ভাগে পেতে রাখে না, মেঝের বিছানা বড্ড কালিয়ে যায়। মার বিছানা পেতে দিয়ে এসে নিজেরটা বিছিয়ে নেয়।

বাসু তক্তপোশে তার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বিড়ি খাচ্ছিল। গম্ভীর। আরতিকে তার মুখ দেখতে দিতে চায় না।

আরতি একটা ছুটো কথা বলল, বাসু জবাব দিল না।

শোবার জন্যে তৈরী হয়ে আরতি দরজা বন্ধ করে দিল। বাতি নিবিয়ে দেবে কি না ইতস্তত করে বাসুকে জিজ্ঞেস করল, 'বাতি নিবিয়ে দি?'

বাসু জবাব দিল না। আরতির শীত করছিল। ঘুমও পেয়েছে। বলল, 'তাহলে তুমি নিবিয়ে দিও, আমি শুলাম।'

বিছানায় চলে আসছিল আরতি, বাসু উঠে বসল। মানুষ যেমন করে ধরা-পড়া চোর দেখে বাসু সেই ভাবে আরতিকে দেখছিল, একদৃষ্টে তীক্ষ্ণ ভাবে।

আরতি বিছানায়। ঠাকুর নমস্কার করে শুয়ে পড়ার অপেক্ষা। বাতি জলছে, তার ওপর দাদা বসে বসে তাকে দেখছে বলে অস্বস্তি বোধ করছিল।

'ও শালা কে?' বাসু হঠাৎ বলল, গম্ভীর চাপা গলায়।

আরতি বুঝতে পারল না। বাসুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

সামান্য অপেক্ষা করে বাসু আবার জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটা কে?' এবার গলার স্বরে রুক্ষতা এবং কাঠিন্য।

আরতি তখনও যেন দিশেহারা ছিল, সবিস্ময় চোখে জবাব দিল, 'কে—?'

'কে তুমি জান না—' বাসুর দু চোখ দপ্ করে জলে উঠল, সমস্ত মুখ কঠিন; হিংস্র রেখায় গালের ওপরটা কুটিল দেখাচ্ছিল। 'আমার কাছে ন্যাকা সাজতে এস না, এক থাপ্পড়ে ন্যাকামি ভেঙে দেব।' বলতে বলতে বাসু তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল। 'তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই

পাতায় পাতায়।...ও শালা শুয়ারের বাচ্চাটা কে আমি জানতে চাই।'
পাশের ঘরে তার গলা যাতে না পৌঁছোয় বাসুর তা খেয়াল ছিল। বুঝতে পারল আরতি। অনুমান করে নিতে পারল। মুখ শুকিয়ে এসেছিল। ভয় পেয়ে গেল। তবু কিছু বুঝতে পারে নি এমন ভাব করার চেষ্টা করল। 'আমি কিছু জানি না' বলে বিরক্ত হবার ভান করে শুয়ে পড়তে গেল।

বাসুর অসহ্য লাগছিল। আরতি স্বীকার করছে না, ধরা দিচ্ছে না—এই প্রবঞ্চনায় সে খেপে গেল। ঝুঁকে পড়ে আরতির একটা হাত ধরে হেঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল। হাত ছাড়ল না, ভীষণ জোরে বার কয় নেড়ে দিল, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আরতি।

'তুমি আমার কাছে পট্টি ঝাড়তে এসেছ ...। মারব টেনে লাথি, মুখ দিয়ে রক্ত বার করে দেব।...ও শালা চুতিয়া কে? বানচোত্‌ তোমায় কোলের পাশে বসিয়ে রিকশ: হাঁকায়।'

আরতির মনে হল, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। সে ধরা পড়েছে। ভয় এবং উদ্বিগ্নতায় নিজেকে অসাড় লাগছিল। কি বলবে আরতি বুঝতে পারছিল না। কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। মুখ বিবর্ণ, নিশ্বাস যেন বন্ধ।

এই নীরবতা বাসুর সহ্য হচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, আরতি জেদ করে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; তার ধারণা হচ্ছিল, আরতি বোবা সেজে তাকে অগ্রাহ্য করছে। বাসুর কপালের শিরা দপ দপ করছিল, প্রচণ্ড রাগে মাথা জ্বলছিল।

'তুই কথা বলবি না—' বলতে বলতে বাসু দাঁত ঘষছিল। হাতটা ছেড়ে দিয়ে পর মুহূর্তেই প্রাণপণ জোরে একটা চড় মারল আরতিকে—'তুই কতক্ষণ বোবা হয়ে থাকিস দেখি—'

চড়ের শব্দ এত জোরে হল যে বাসু রাগের মাথায়ও সেই শব্দ শুনতে পেল। আরতি আচমকা বাসুর ওই শক্ত রুক্ষ হাতের চড় খেয়ে টলে যেতে যেতে কোনো রকমে সামলে নিল। আঘাতটা তার ভয়ঙ্কর হয়ে লেগেছে,

গালের চামড়া কান জ্বলে যন্ত্রণায় কনকন করছিল। কিন্তু সে-যন্ত্রণা এখন এই আত্মরক্ষার মুহূর্তে তেমন করে অনুভব করতে পারছিল না। কেঁদে উঠতে গিয়েও কোনো রকমে সামলে নেবার চেষ্টা করল।

আরতির এত বড় অবাধ্যতা, এই প্রচণ্ড জেদ, একরোখামি বাসুর কাছে কল্পনাতীত। মার খেয়েও মুখ ফুটে একটা কথা বলছে না! বাসুর শিরা তপ্ত। ভীষণ নিষ্টুরের মতন তার মনে হচ্ছিল, আরতিকে একটা লাথি মারে, জোর লাথি, যাতে ও ছিটকে পড়ে মাটিতে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে। কিন্তু পাশের ঘরে মা দিদি জানতে পারবে এই ভয়ে ভীষণ কিছু করতে পারছিল না।

'এখনও ভাল কথা বলছি, আরতি।·· আমায় তুমি চেন না—। মেরে ফেলব, খুন করে ছাড়ব বলে দিচ্ছি ..।'

আরতি ঘাড় মুখ হেঁট করে দাঁড়িয়ে। পাথরের মতন। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, হাজার মার খেলেও কিছু বলবে না। কিছুতেই না।

বাসু নিশ্বাস ফেলল। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল কেমন। চোখে সব দেখছিল, কিন্তু এই দেখা যেন স্পষ্ট নয়, আয়ত্তের মধ্যে না। বলল, 'আমি আজ নিজের চোখে দেখেছি লাল সোয়েটার-পরা একটা ছেলের সঙ্গে তুমি রিকশায় বসে আসছিলে। . ছেলেটা তোমায় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মজা লুঠছিল।...ও শালাকে আমি ধরব, গলার টুঁটি ছিঁড়ে নেব···'

আরতি কেঁদে ফেলেছে। গলিত যন্ত্রণা মুক্ত করার পর এই প্রথম অশ্রু এবং লালার অবরোধ থেকে শ্বাস মুক্ত করার চেষ্টায় মুখ দিয়ে বাতাস টানল; তার ফোঁপান শব্দটা শোনা গেল। হাঁপানির কষ্টতে মানুষ যে ভাবে হাঁপ টানে আরতি সেই ভাবে মু· দিয়ে কান্না টানছিল আর গলায় জড়িয়ে যাওয়া অশ্রুর শব্দ করছিল।

'ও-সব চোখের জল বের করে আমায় ভোলানো যায় না—' বাসু খুব অগ্রাহ্য স্বরে বলবার চেষ্টা করল, 'মেয়েছেলের কান্না আমি কেয়ার করি না। ·· আমি মা-কে বলব। তার মেয়ে চাকরির নাম করে কোন কারবার করছে আমি জানিয়ে দেব কাল।'

বাসু লুঙ্গিটা কোমরের কাছে জড়িয়ে নিল ভাল করে। তার ডান হাতের আঙুলগুলো জ্বালা করছে। 'রাস্তার একটা লোফারের সঙ্গে রিকশায় বসে আসতে তোর লজ্জা করে না? তুই কি ওই পার্কের মেয়েছেলে? ইজ্জত নেই? বেহায়া কোথাকার! আবার কাঁদছে... মারব আর-এক কষে চড় দাঁত ভেঙে দেব।'

'মারো।' আরতি কান্নায় জড়ানো বিকৃত স্বরে এই প্রথম কথা বলল, 'আমায় মেরে ফেলত কার কি!'

আরতি আঁচল মুঠো করে পাকিয়ে মুখে চেপে ধরতে ধরতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাসু দেখছিল।

বাইরে হিম। কৃশ চাঁদ উঠেছে বুঝি আকাশে; অন্ধকার সেই ফিকে আলো শুষে নিয়েছে। বারান্দায় এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি আরও খানিক কাঁদল। বাসুর আঙুলের দাগ বেশ ফুটে উঠেছে, আরতি গালে হাত দিয়ে অনুভব করতে পারছিল। বড্ড জ্বালা করছে, ব্যথাও। রান্নাঘরের কাছে টুকটাক কাজের জন্যে জল থাকে এক বালতি। এখন তার তলানি পড়ে আছে। শীতে হিমে খোলা জল কনকনে। আরতি উঠোনে গিয়ে গালে খানিক জল ছোঁয়াল। জল ঝরে গেলে জ্বালাটা আরও যেন বাড়ছিল। অনুমান করতে পারল গালে কালশিরে ফুটে উঠেছে। কাল এই গাল নিয়ে তাকে চাকরিতে যেতে হবে।

শীত অসহ্য হলে আরতি ঘরে ফিরল। বাসু বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আরতি সে-দিকে তাকাল না। দরজা বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল।

এ-ঘর প্রত্যহ এক সময় এমনি করে অন্ধকার হয়। আরতি ঠাকুর প্রণাম করে। আজ ভুলে গেল। শুয়ে পড়ল নিঃশব্দে। শুয়ে, অন্ধকার সত্ত্বেও বাসুর উল্টো দিকে মুখ করে কুঁকড়ে থাকল, ছেঁড়া লেপটা টেনে মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিল।

বাসু জেগেছিল, কোনো সাড়াশব্দ দিচ্ছিল না।

আরতি লেপের তলায় মুখ মাথা ঢেকে গালের তলায় হাত রেখে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকল। চোখের পাতা বন্ধ। মন খাঁ খাঁ করছিল। অনেক কথা মনে আসছিল, অনেক দুঃখ অনুভব করতে পারছিল। এমন করে কোনোদিন সে কারও কাছে মার খায় নি, এমন খারাপ গালিগালাজও কেউ তাকে করে নি। কাতর ও ক্ষুব্ধ হয়ে বার বার সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

অসম্মানের ক্লেশে সমস্ত কিছু তিক্ত হয়ে উঠেছে। বাসুর অত্যাচার তার কাছে অন্যায় বলে মনে হচ্ছিল, কোনো অধিকার বাসুর আছে বলে আরতির মনে হচ্ছিল না। গায়ে জোর আছে বলেই মানুষ মানুষকে মারতে পারে না। সম্মানে বড় বলেই দাপট দেখান চলে না। অসভ্য ছোটলোকের মতন এত বড় মেয়ের গায়ে কি করে যে ও হাত তুলল—আরতি বুঝে উঠতে না পেরে বাসুকে ধিকার দিচ্ছিল।

রাস্তার লোকের সঙ্গে আরতি রিকশা চড়ে নি, মনে মনে আরতি যেন বাসুর অভিযোগের জবাব দিচ্ছিল, সে-লোক রাস্তার নয়, পথ-ঘাটেরও নয়। আরতিদের দোকানেই চাকরি করে, অনেক ভাল চাকরি। অমন একটা চাকরি দাদাকে এ-জন্মে আর পেতে হবে না। ওই লোকটাকে কি অধিকারে দাদা শুয়ারের বাচ্চা বলল! ওর খাতির সম্মান দাদা জানে না। জানে না, ওর হাতে তাদের অত বড় দোকানের কত কি দায়িত্ব। দোকান সাজানো, দেখাশোনা, লোকজনের সঙ্গে কথা বলা, কাস্টমারের সুবিধে অসুবিধে দেখা—আরও কত কি কাজ তার। ও যে ভাবে কথা বলে, সে-ভাবে কথা বলতে হলে দাদাকে এক জন্ম তপস্যা করতে হবে। অমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাসি-খুশী ছেলেকে দাদা কোন যুক্তিতে যে যা-তা বলল আরতি ভেবে পাচ্ছিল না।

ওর নাম বিশ্বময়, বিশ্বময় সেন। বড়বাবু ক্যাশবাবুরা ডাকেন বিশু বলে। ম্যানেজার বলেন, বিশ্ব। বিশ্ববাবু ডাকটাই দোকানে চল হয়ে গেছে। অল্প বয়েস, চব্বিশ পঁচিশ হবে বড় জোর। বি এ পাশ এর আগে নাকি কোন ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করত, ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছে, বড়-বাবুর বন্ধুর ছেলে।

ওর যদি আরতিকে ভাল লাগে, দু দশটা কথা বলে তবে আরতি কি করবে! বারণ করবে! আর সবার চেয়ে একটু আলাদা চোখে আরতিকে দেখে বলে কত লোকের যে চোখ টাটাল! আগে সামান্য লজ্জা পেত আরতি, এখন পায় না। বরং ভাল লাগে। কেন লাগবে না? রেবা একদিন যেমন ঠাট্টা করে বলতে এসেছিল, তোমার গায়ে কী চিনি ভাই একটু বলবে—বাজার থেকে কিনব?' আরতিও জবাব দিয়েছে মুখের মতন, 'কেন বলব? তুমি খুঁজে নাও।'

আরও হাসি ঠাট্টার কথা আছে। কিন্তু এখন সে-সব কথা আরতি ভাবতে পারল না। দাদা যে কোথায় কোন দোষ দেখল! হ্যাঁ, তারা রিকশায় চেপে ফিরেছে। বিশ্বময় মোটেই তার গা জড়িয়ে ধরে নি, পিঠের পাশ দিয়ে রিকশার কাঠে হাত রেখেছিল। হাত থাকলে কি গুটিয়ে রাখতে হবে!

আর তোমরা কোন মুখে আরতির দোষ দেখ। দিদি কি সুচারুদার সঙ্গে ভাব করে নি, না দিদি সুচারুদাকে ভালবাসে না? আরতি জানে, কোন যুগেই বুঝতে পেরেছিল, দিদি সুচারুদাকে ভালবাসে। এই ভালবাসার জন্যে দিদি যে কত দুঃখ সয়েছে, সয়ে যাচ্ছে আরতি তাও বুঝতে পারে। উমাদির কাছে দিদি আর সুচারুদার গল্প বলার সময় আরতি বলেছিল, তুমি যাই বল উমাদি, আমি হলে এ-ভাবে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকতে পারতাম না। কিসের ঠিক আছে বল; যুদ্ধে গেছে, মরে যেতেও ত পারে। কি জানি দিদি কি ভাবে!

সুচারুদা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে এল। আরতি সেদিন এত খুশী হয়েছিল ওঁকে দেখে। দিদির জন্যে এমন খুশী এত আনন্দ আর কখনও হয় নি আরতি। মনে হয়েছিল, দিদি যেন বেহুলা ... ।

লেপের তলায় মাথা ঢেকে শুয়ে থেকে এবার সমস্ত মুখ গরম হয়ে এসেছিল আরতির, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। আস্তে করে লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে মুক্ত বাতাস নিল।

দাদা কি ঘুমিয়ে পড়েছে! কে জানে! আরতির বিন্দুমাত্র আগ্রহ হল

না বাসু ঘুমিয়েছে কি না অনুমান করে। বাসুর ওপর রাগ হচ্ছিল আরতির, ঘৃণা হচ্ছিল। দাদার অনেক কুকীর্তির কথা তার মনে পড়ছিল। ..কে কাকে শিক্ষা দেয়! আরতিকে যে শিক্ষা দিতে আসে সে নিজে কী? আগে নিজের মুখের দিকে তাকাও। উমাদির সঙ্গে তুমি কি করতে চাইতে আমি আমার চোখে ধুলো দিয়ো না। এই গলির ওই মুদিঅলার মেয়ে পার্বতীর সঙ্গে তুমি না করেছ এমন কিছু কাজ নেই। ছি ছি! সে-সব কথাও আরতি এ-পাড়ার অন্য মেয়েদের কাছে শুনেছে। মা দিদি জানতে পারলে তোমায় ঝেঁটা মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

কত গুণের ছেলে যে দাদা আরতি সব জানে। ও মদও খায়। পাড়ার মেয়েদের যাকে যতটুকু পারে চেটে নেয়। জোচ্চুরি বদমাইশি গুণ্ডামি— কোনো গুণের অভাব নেই। কোন অধিকারে তবে তুমি কথা বলতে আস?

আরতি অসহিষ্ণু উত্তেজিত হয়ে ভাবছিল, আজ তাকে দাদা মেরেছে বলে আবার যে গায়ে হাত তুলবে তা হবে না। আমিও মা দিদির কাছে তোমার কীর্তি বলে দেব। আর ওই ছেলেটাকে তুমি মেরেই দেখ কি হয়! আমার চাকরি গেলে তোমায় কেউ আদর করে পিঠে হাত বোলাবে না!

অসীম ঘৃণা এবং তিক্ততায় আরতি বাসুকে ধিক্কার দিচ্ছিল। এই দাদা তার শত্রু, অনিষ্ট।

একুশ

সুচারু বাথরুম থেকে ফিরছিল, গায়ে বড একটা তোয়ালে। প্যাসেজ থেকেই চোখে পড়ল সুধা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বিকেলের মরা আলো উল্টো দিকের ছাদের কার্নিশে এখনও দেখা যাচ্ছে। এ-পাশের বারান্দায় ছায়া।

'তুমি!' সুচারু অবাক হয়েছিল। 'কতক্ষণ—?'

'বেশীক্ষণ নয়।' সুধা বলল; হাঁপটা ততক্ষণে অনেক কমে এসেছে।

কোমরের কাছে পাজামা থেকে চাবি বের করে সুচারু তালা খুলতে যাচ্ছিল, সুধা বলল, 'আমায় দাও।.. কোন চাবিটা?'

'ছোটটা—।'

তালা খুলল সুধা। দরজা হাট করে দিল। পরদাটা কোনো গতিকে ঝুলছে। সুধা ঘরে ঢুকল।

ঘরটা ছোট। আকৃতিও অদ্ভুত। তেকোণা। পুবের দিকটা ছুঁচোলো হয়ে আছে। লম্বা লম্বা সরু জানলা, খড়খড়ি আর কাচের শার্সি, দুটো জানলাই খোলা রয়েছে, কাচের শার্সিতে কাটাকুটি করে মোটা কাগজ আঁটা, পশ্চিমের দিকে বিছানা, মাথার দিকে একটা জানলা। একপাশে আয়না-বসানো ছোট দেরাজ, পাশে আলনা। ঘরের মাঝ মধ্যিখানে হালকা ছোট টেবিল, একটা চেয়ার। ঘরটা অব্যবস্থায় ভরা। অগোছালো। খাটের তলায় বড় সুটকেস, মেঝের একদিকে হোল্ডঅলটা দুমড়ে পড়ে আছে। একরাশ খবরের কাগজ ডাঁই করা, কিছু পত্রিকা। দেরাজের ওপর দু একটা বই, দু তিনটে সিগারেটের কৌটো, সাদা কাগজের পুরু একটা বাণ্ডিল গোল করে মোড়া। কয়েকটা সাদা কাগজের টুকরো মেঝেয় পড়েছিল, যেন কাঠ কয়লার আঁচড় দিয়ে কিম্ভুত কিছু আঁকা হয়েছে টুকরো গুলোতে।

সুচারু গা থেকে তোয়ালে সরিয়ে একটা জামা পরে নিচ্ছিল। সুধা তাকাল। গেঞ্জির তলায় সুচারুর কাটা ডান হাতের বাহুর অংশটা দেখা যাচ্ছে না। সুধা অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'বসো ' সুচারু গায়ে জামা গলিয়ে দিয়ে ইতস্তত করে বলল।

সুধা বসল না। বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। বালিশটা দুমড়ে এক পাশে পড়ে আছে, চাদরটা ঝুলে আছে খাট থেকে। একটা টেনিস বল খাটের ওপর।

'এই তোমার ঘর!' সুধা সব যেন দেখে বুঝে এবার কথা বলল।

সুচারু জামার একটা বোতাম লাগিয়ে নিয়েছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনি তুলে নিল। 'খারাপ—!' সুচারু মুখ ফেরাল। হাসার মতন মুখ করল, 'এই হোটেলের নাম কি জান?...প্যারাডাইস্...'

পরিহাসে কান দিল না সুধা। বলল, 'হোটেলের চাকর নেই?'

চুলটা ত্বরিতে আঁচড়ে নিয়েছে সুচারু। ভাল করে আঁচড়াতে পারে নি; এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

'তবে?'

সে-বেটার অনেক দোষ। ঘরে ঢুকলে আর সহজে নড়তে চায় না।' সুচারু চেয়ারটা সুধার দিকে এগিয়ে দিল। 'দাঁড়িয়ে কেন, বস।'

চেয়ার সরিয়ে নিয়ে সুধা বসল। 'নড়তে চায় না বলে চাকরটাকেও তুমিও কিছু নাড়তে দাও না?' সুধা মেঝের দিকে—খবরের কাগজের স্তূপের দিকে তাকাল। 'কী ধুলো।'

দেরাজের ওপর থেকে সিগারেটের টিনটা উঠিয়ে নিয়ে সুচারু বিছানায় এসে বসল। সিগারেট ধরাল।

ঘরের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের আভাটুকুও আর আসছে না। হয়ত রোদ আরও ওপর-আকাশ ছুঁয়ে মিলিয়ে আসছে। রাস্তার কোলাহল ভেসে আসছিল। সুধা সামান্য আচ্ছন্নের মতন এই ঘর আর সুচারুকে দেখছিল। ঘরটা যেন সুচারুকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এখানে সর্বত্রই অযত্ন নিস্পৃহ

ভাবটা চোখে পড়ে। মনে হয়, কোনো রকমে দিন কাটানো ছাড়া সুচারুর কাছে ঘরটার অন্য প্রয়োজন নেই। এই ধূলো আর অব্যবস্থার মধ্যে ক্ষীণ আলোয় ঘর মলিন হয়ে উঠেছে। সুচারুকেও এই মলিন জগতের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। সুধা অনুভব করতে পারল ঘরের বাতাস বড় শুকনো, এখানে কোনো পরিত্যক্ত গৃহের গন্ধ আছে। তিনটে দেওয়াল যেন তিন দিক থেকে চেপে এসে একটা মানুষকে এক কোণে ঠেলে ধরেছে। ছাদের দিকে তাকাল সুধা; ছাদটা বিবর্ণ, ছায়া জমেছে ঝুলের মতন।

'আজ তোমাদের ওখানে যেতাম।' সুচারু বলল।

সুধা চোখ নামাল ছাদ থেকে, সুচারুর দিকে তাকাল। 'এ ক দিন কি হয়েছিল?'

দিন পাঁচেক সুচারুর যাওয়া হয় নি। পাঁচটা দিন এমন কিছু নয়। তবু সুধার কাছে দীর্ঘ মনে হয়েছে। সে উদ্বেগ বোধ করছিল।

'কিছু না। একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম।' সুচারু অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে জবাব দিল। চুপ করে থাকল সামান্য, পরে বলল, 'একটা ছোট খাটো বাড়ি খুঁজছিলাম। ওয়ান-রুম। তা ছাড়া...'

'এই হোটেল তবে ছেড়ে দেবে?

'এখানে বেশী দিন টেঁকা মুশকিল।' সুচারু মৃদু গলায় বলল, ঈষৎ বিরতির পর হাসল সামান্য, 'স্বর্গবাসের জন্যে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়।'

'একা বাড়িতে অনেক হাঙ্গামা—।'

'তা ত থাকবেই। তবু আমার পক্ষে সেটা ভাল। ..এখানে কোনো প্রাইভেসি নেই, হাটের মধ্যে থাকা। তার ওপর জুয়া মদ হট্টগোল ..'সুচারু কয়েক দমক সিগারেট খেল, কি ভাবছিল, বলল, 'আমি একটা অনুগ্রহ পাই —ইনভ্যালিড পেন্‌শান্। আর্মি থেকে দেয়, হাত খোয়ানোর ক্ষতি-পূরণ।'

সুধা খুব ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। মুখ স্থির। চোখের পাতা পড়ছিল না।

টাকাটা কিন্তু সামান্য, আজকের দিনে একটা মানুষের ভদ্রভাবে চলা মুশকিল।'

বলবে কি বলবে-না করেও সুধা বলল, 'তুমি ত বাড়ি খুঁজছ—'

'চাকরিও।' সুচারু হেসে জবাব দিল। 'একটা ছোট বাড়ি, একটা চাকরি বাকরি দুইই আমার দরকার।'

সুধার খুব আচমকাই একটা কথা মনে হল। তাদের নীচের তলা খালি হয়ে যাবে শীগ্রি। উমারা চলে যাচ্ছে। ওকে ও-বাড়িতে নিয়ে গেলে ক্ষতি কি! কথাটা ভাবল সুধা, বলতে পারল না।

'অবশ্য আমার চাকরি পাওয়া কঠিন।' সুচারু সিগারেটের টুকরো মাটিতে ফেলে নিবিয়ে দিল।' 'অক্ষম মানুষকে কে আর নিতে চায়! তবু ..

বিকেলের শেষ ছায়াও গত। ছুটির বেলায় রাজমিস্ত্রীরা যেমন চুন-কামের শেষ কাজটুকু সেরে নেয় দ্রুত হাতে তেমনি ভাবে কেউ যেন আসন্ন সন্ধ্যার কালো কালো দাগগুলো ক্ষিপ্রভাবে দেওয়ালে টেনে দিচ্ছিল।

'চাকরির জন্যে এখনই আমি খুব ব্যস্ত নয়।' সুচারু যেন সুধাকে সান্ত্বনা দেবার মতন করে বলল, 'দু চারটে মাস কেটে যাবে।'

সুধা নীরব। জানলা দিয়ে একটু বাতাস এসেছে। মেঝের ওপর সাদা কাগজের টুকরো সরে গেল সামান্য। সুচারুর আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়ল সুধার। তাদের কথা সুচারু আগেই বলেছে। সেই বুড়ো পিসি মারা গেছেন, ভাই কাশীতেই আছে, স্কুল মাস্টারি করে আর সেতার বাজায়। তার কোনো বড় প্রত্যাশা নেই, সে অল্পে সুখী, সে গানে-বাজনায় পাগল হয়েছে। সুচারু কাশী ঘুরে কলকাতায় এসেছে, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে। ভাই থাকতে বলেছিল—'দাদা তুমি এখানে থাক।' ...সুচারু থাকে নি; বলেছে 'একে বাবা বিশ্বনাথের কাশী; তার ওপর তোর বাজনা—; না, ও আমার পোষাবে না। তুই বরং একটা বিয়ে থা কর।'...সুচারু ভাইয়ের খবর দিয়ে আরও বলেছিল, 'ও খুব মনোক্ষুন্ন হয়েছে, বুঝলে সুধা। কিন্তু আমি কাছে থাকলে ওর গানটান হত না। আমি একটা বোঝা হয়ে থাকতাম। আমার সুখ স্বস্তি দেখতে গিয়ে ওর ক্ষতি হত।'

সুচারুর অসহায়তার কথা ভেবে সুধার ওর আত্মীয়স্বজনের প্রসঙ্গ মনে পড়েছিল। মানুষটা যে কেন কোনো নিকটজনের আশ্রয়ে থাকল না, সুধা বুঝতে পারল না। এখন সে কত ব্যাপারেই অক্ষম, নানা অসুবিধে তার; শরীরের সব চেয়ে কাজের অঙ্গটাই নেই, এ-অবস্থায় একা একা থাকা কি কাজের কথা!

'পুরোনো জানাশোনা কয়েক জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলাম।' সুচারু বলল, 'আমাদের সেই ললিতবাবুকে মনে আছে, যাঁর সঙ্গে আমার রোজ তর্কাতর্কি হত। সেই ললিতবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমায় চিনতে পারেন নি। আমিই ডাকলাম। ভদ্রলোক আমায় দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন কাণ্ড শুরু করলেন।' বলতে বলতে সুচারু থামল, ললিতবাবুর কথা ভাবছিল, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল, 'ভদ্রলোক আমায় একটা কথা বলেছিলেন তখন, যাবার সময়; কথাটা দেখলাম তাঁর মনে আছে।'

কথাটা কি? সুধা কথাটা শোনবার আশায় চেয়ে থাকল।

'ললিতবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমি—'সুচারু সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিচ্ছে যেন, বলল, 'আমি সত্যিই ছেলেমানুষ আর বোকা ছিলাম। বোকার মতন একটা ম্যাসাকার দেখতে গিয়েছিলাম।'

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফাল্গুনের বাতাস অন্যকোথাও চলে গেছে। এখানে গরম লাগছিল। জানলা দিয়ে কালি মেশানো সন্ধ্যে ঢুকে ঘরের দেওয়াল আর আসবাবপত্র ক্রমশ আড়াল করে ফেলছিল। সুধা ছায়াসদৃশ একটি ব্যর্থ মানুষকে দেখছিল না, তার মনে হচ্ছিল, কোনো অশেষ গভীর ব্যর্থতার পট যেন তার চোখের সামনে মেলা রয়েছে। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। সুধা অনুভব করছিল। নিজের শূন্যতার সঙ্গে এই দ্বিতীয় ব্যর্থতাকে সে অজ্ঞাতে যোগ করে যাচ্ছিল।

সুচারুর খেয়াল হল সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পরস্পরকে ওরা আর দেখতে পাচ্ছে না। সুচারু উঠল। উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ঠুলি পরা বাতিটা ঘরের মাঝখানটুকু আলো করল, বাকি অংশ ম্লান হয়ে থাকল।

'একটু চা-টা খাও।' সুচারু সুধার দিকে তাকল।

'না—' সুধা হাত উঠিয়ে না করল, মাথা নাড়ল।

'তা হলে আর কিছু ?

'না, কিছু না।' সুধা ঘরের চারপাশে তাকাল। একটু জল খেতে পেলে আরাম হত।

'কোনো রকম আতিথ্য না করলে কেমন বেয়াড়া দেখায়।' সুচারু সহজ হয়ে হাসবার চেষ্টা করল। 'এক পেয়ালা চা খাও। আমিও খাব। তারপর চল একটু ঘুরে আসি।'

সুধা চেয়ার ছেড়ে উঠল। জলের কুঁজোটা দেরাজের পাশে। জল গড়াতে যাচ্ছিল, বলল, 'এখন আবার কোথায় ঘুরতে যাব।'

সুচারু কোনো জবাব দিল না। চায়ের কথা বলতে বেরিয়ে গেল।

জল গড়িয়ে খেল সুধা। আলগোছে খেয়ে গ্লাস ধুয়ে রেখে দিল। ওঠার সময় মেঝে থেকে টুকরো কাগজ একটা উঠিয়ে নিল। কিছু বুঝতে পারল না। আলোর তলায় এনে দেখল আবার। কিছু বোঝা যায় না, কতক কালো রেখা, তার কোনো আকার নেই, অবয়ব নেই ; ছাঁদ বা রূপ নেই ; কিম্ভূত দুর্বোধ্য। কোনো জন্তু না কোনো গাছের শেকড়, বাদুড় না বন্য মানুষ বোঝা যায় না। সুচারুর এই অদ্ভুত খেয়ালের অর্থ সুধা বুঝছিল না।

সুচারু আসছে। সুধা দরজার দিকে তাকাল।

ঘরে পা দিয়ে সুচারু ইতস্তত করে বলল, 'তোমায় একটু বাইরে যেতে হবে।'

বাইরে! সুধা অবাক চোখে সুচারুকে দেখছিল।

সুচারু হাসল। 'পোশাকটা পালটে নি। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে পারব।'

সুধা সামান্য আড়ষ্ট হল, লজ্জা পেল বোধ হয়। চলে যাচ্ছিল। যেতে যেতে কি ভাবল হঠাৎ, বলল, 'বাইরে কেউ নেই ?'

'না, কাউকে দেখলাম না।'

সুধা চলে গেল।

বাইরের সরু বারান্দা অন্ধকার। সিঁড়ির দিকে একটা বাতি জ্বলছে। এ দিকে আর বুঝি দুখানা ঘর। দোতলায় কারা ঝগড়া করছিল। উলটো দিকের ছাদে কয়েকটা পায়রা এসে বসল। আকাশের ফালি দেখা যাচ্ছিল। এখান থেকেও বউবাজার স্ট্রীটের ট্রামের শব্দ পাওয়া যায়।

রেলিঙে হাত দিয়ে সুধা নীচু হয়ে নীচের তলাগুলো দেখতে লাগল। দোতলায় কয়েকটা ঘরেই বাতি জ্বলছে। আলো পড়েছে। চৌকো মতন বাড়ি। মধ্যেটা ফাঁকা। একেবারে নীচের তলায় উঠোন দেখা যায়। অবশ্য অন্ধকারে উঠোন আর দেখা যাচ্ছিল না।

দোতলায় কেউ শিস দিচ্ছে। একটা কাক এই সন্ধ্যের অন্ধকারে কোথা থেকে ডেকে উঠল।

'সুধা—' দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে সুচারু ডাকল।

ঘরে এল সুধা। সুচারু ট্রাউজার পরে নিয়েছে, গায়ে শার্ট, বুশ শার্ট। বোতাম লাগায় নি এখনও।

'তুমি আর একটু সকাল সকাল এলে খানিক খাটিয়ে নিতাম।' সুচারু হালকা স্বরে হাসিমুখে বলল। 'আমার আর্ধেক জামা আর প্যাণ্টের বোতাম গেছে, এই দেখ না এই শার্টটা সেদিন—' সুচারু একটা ছেঁড়া দেখাল, 'কোথায় যে লাগল—'

সুধা কিছু বলল না। বিমর্ষ বোধ করছিল। এই স্বাভাবিক সাধারণ অন্তরঙ্গতা তার হৃদয়কে কাতর করছিল। মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। 'বললে না কেন আগে।'

'খেয়াল হয় নি।' সুচারু হাসল। 'আবার একদিন এস।'

'না।..তোমার এই তেতলা ভেঙে আসতে আমার বড় বুকে লাগে।'

সুচারুর যেন খেয়াল হল। সুধাকে লক্ষ্য করল মনযোগে। কেমন কুণ্ঠা বোধ করছিল। 'তোমার খুব কষ্ট হয়েছে আজ?'

'খুব না—' সুধা ম্লান হাসল।

চাকর এসে চা দিয়ে গেল। সুধা চাকরটাকে দেখল। ছোকরা মতন, মুখে বসন্তের দাগ।

'এই সেই···কি যেন নাম বললে...' সুধা বলল।

'নন্দ। বেটা বকেশ্বর। বড্ড কথা বলে—'

'কই একটা কথাও ত বলল না।' সুধা হাসল।

'আজকাল আর বলতে সাহস করছে না।' সুচারু চায়ের কাপ তুলে নিল, রগড়ের গলায় বলল, 'সে-দিন খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি।'

সুধা কৌতুক ও বিস্ময় বোধ করছিল। 'হঠাৎ ভয় দেখাবার কি হল?'

'নন্দর ধারণা, আমি এক মস্ত যোদ্ধা! এ হিরো। হিরো ফ্রম ওআর ফ্রণ্ট। আমার কাছে গল্প শুনতে চায়।' সুচারু এক চুমুক চা খেয়ে নিল, 'ওর কৌতূহল আর উৎসাহ প্রচণ্ড। জ্বালিয়ে মারত।'

পায়ের কাছে টুকরো কাগজের ফালিটা বাতাসে সরে গেল। সুধা পেয়ালার আঙটায় আঙুল দিয়ে কাপটা নাড়ছিল।

'এতেই তোমার রাগ হল?'

সুচারু চোখে চোখে তাকাল সুধার। দৃষ্টিটা খুব পরিচ্ছন্ন নয়; বোঝা যায় না সুচারু কি বলতে চাইছে। ও কোনো কথা বলছিল না। সুধা দেখছিল, সুচারুর মুখে কেমন অসহিষ্ণুতা বিরক্তি ফুটে উঠছে ক্রমশ। যেন কোনো মানুষকে অসন্তুষ্ট বিরক্ত করেছে। 'আমার ভাল লাগে না।' সুচারু বলল। চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মানুষটাকে গম্ভীর অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সুধা বিব্রত বোধ করল। তার খেয়াল হল, সুচারু এই প্রসঙ্গটা বরাবর এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। আজ পর্যন্ত সুধার কাছেও কোনোদিন পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। প্রসঙ্গটা এক দিক থেকে অপ্রিয়—একটা লোককে তার অঙ্গহানির কষ্টকর স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়া হবে এই বিবেচনায় সুধাও কেমন অস্বস্তি বোধ করে বড় একটা ও-সম্পর্কে কিছু খুঁটিয়ে জানতে চাইত না। তা ছাড়া, সুধা ভাবত, এত অধৈর্য হবার কিছু নেই, কোনোদিন সে সবই শুনতে পাবে।

টিন থেকে সিগারেট নিয়ে সুচারু ধরাল। লাইটার পকেটে রাখল।

অন্যমনস্ক ভাবে বিছানা থেকে টেনিস বলটা কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়াতে লাগল। বল লাফিয়ে উঠে এলেই বাঁ হাতের মুঠোয় ধরছিল, আবার ছুঁড়ছিল, ধরছিল।

সুধার চা খেতে আর ইচ্ছে হল না। উঠে টেবিলের ওপর কাপটা রেখে দিল। কি ভেবে কুঁজোর জল গড়িয়ে কাপটা ধুয়ে ফেলল আবার।

সুচারু লক্ষ্য করছিল। বলল, 'না করতে ওটা—।'

'অভ্যেস।' সুধা হাসবার চেষ্টা করল। 'নাও চলো।'

টেনিস বলটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল সুচারু। সিগারেটের টিন থেকে কয়েকটা পকেটে রেখে নিল। বলটা বিছানার পাশে চলে গিয়ে মাটিতে পড়েছে, খাটের তলা দিয়ে গড়িয়ে চলে এল। সুধা মেঝে থেকে বল তুলে বিছানায় রাখল। 'ছেলেমানুষের মতন বল খেল নাকি?'

দেরাজের ওপর থেকে মনিব্যাগ চাবি বেছে বেছে তুলে পকেটে রাখছিল সুচারু। মুখ ফেরাল, 'নতুন করে আবার শিখতে হচ্ছে...' সুচারু মলিন চোখে যেন হাসল, 'যে কাজ জানত না তাকে কাজ শেখাচ্ছি—' বলে ইঙ্গিতে বাঁ হাতটা দেখাল।

চুল আঁচড়ে নেবার মতন করে চিরুনি বুলিয়ে সুচারু বুশ শার্টের বোতাম আঁটছিল। সুধার কি মনে হল, কাছে এল সুচারুর, বাকি বোতাম কটা লাগিয়ে দিল।

সুচারু নিশ্চল। সুধা মুখ তুলল না।

সামান্যক্ষণ এই ভাবে কাটল। উভয়েই নীরব। পরস্পর যেন পরস্পরের হৃদয় অনুভব করছিল।

অবশেষে সুচারু চাপা নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'চলো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

গঙ্গার জল দেখে সুধা আজ ভয় পাচ্ছিল না। অথচ এই জল স্বপ্নের নদীর জলের চেয়েও কালো। আশে পাশে কাছে কোথাও একটু আলো

নেই, অনেকটা তফাতে ঘাট। আকাশের তারার বিন্দু বিন্দু আলো দিয়ে এই অন্ধকার মোছা যায় না। নদীর জল ক্রমাগত একই ভাবে শব্দ করছিল। যে-শব্দ উচ্চ নয়, কানে সয়ে গেছে। কোথাও একদল লোক হরিসংকীর্তন করছে, বাতাসে মাঝে মাঝে দু একটি ভাঙা ধ্বনি ভেসে আসছিল। ওপারে আকাশ আর অন্ধকার মিলিত হয়ে অদৃশ্য কোনো জগতের সীমানা সৃষ্টি করছিল। এখানে বাতাস আছে, আর্দ্র ঠাণ্ডা বাতাস।

স্বপ্নের কথা মনে পড়ছিল সুধার। আর কি কোনোদিন জোয়ার আসবে? না, সুধা মনে মনে মাথা নাড়ল, আর আসবে না। যদি বা আসে সুধা ওকে চলে যেতে দেবে না।

'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি সে-দিন—' সুধা বলল।

'কিসের?'

'তোমার।' সুধা আঁচল গলায় জড়াল। 'তুমি যেদিন এলে সে-দিন।'

'বলো।'

'আজ থাক। পরে বলব একদিন।' সুধা অন্যমনস্ক গলায় বলল। মানুষ যে ভাবে বাঁধানো বড় একটা প্রকৃতি দৃশ্যের ছবি দেখে সুধা অনেকটা সেই ভাবে স্বপ্নটা দেখছিল সামগ্রিক ভাবে।

'খারাপ স্বপ্ন?'

'জানি না।' অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির চোহারাটা হঠাৎ সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশাল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সুচারু গঙ্গার অগ্রপ্রান্তের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকল। বাতাস এখানে বড় এলোমেলো। অন্ধকারে কদাচিৎ কোনো আলোর রেখা পড়লে স্রোতের গতিকে সরীসৃপের মতন দেখাচ্ছিল। জলপ্রবাহের শব্দ কানে আসছিল সুচারুর।

'জায়গাটা খুব নিরিবিলি—' সুধা হঠাৎ বলল, বলে একটু থামল, আবার বলল, 'এ-সব জায়গায় এসে বসলে কেমন যেন লাগে—'

'মন খারাপ—?'

'না,...হ্যাঁ ঐ রকম...'

'আমি আর একদিন এসেছিলাম, পরশু।' সুচারু পা ছড়িয়ে দিল, ঘাস আর মাটির স্পর্শ পাচ্ছিল।

সামান্য সময় কোনো কথা হল না। সঙ্গীতের সুর ভেসে এল। সমস্বরে ওরা হরিধ্বনি দিয়ে উঠেছে। একটা ঠেলা গাড়ি কেউ ঠেলে আনছে পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে, শব্দ হচ্ছিল।

'কটা বাজল?' সুধা জিজ্ঞেস করল।

'সাতটা হবে।' সুচারু বলল, বলে লাইটার জ্বালিয়ে বাঁ হাতে বাঁধা ঘড়ি দেখল। 'সাতটা দশ...'

'তা হলে ওঠো এবার।'

'এখুনি। বসো আর খানিক। তুমি ত বাড়ি থেকে বেরোও না।'

'না।' মাথা নাড়ল সুধা। 'মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে যাই। আজ যাব ভেবেছিলাম।'

সুচারু অন্ধকারে সুধার মুখ দেখবার চেষ্টা করল। 'তোমার অসুখটা কিসের?'

'জানি না। বোধ হয় খারাপ কিছু—' সুধা নিশ্বাস জড়ানো ভাঙা গলায় বলল। অল্প নীরব থেকে আবার, 'অফিস থেকে অত দয়ামায়া দেখিয়ে যখন তাড়িয়ে দিয়েছে, রোগটা যে খারাপ আমি বুঝতে পেরেছি।'

সুচারুও সন্দেহ করে রোগটা ভাল না। সুধার চেহারা দেখলে সেটা বোঝা যায়, চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া শুনে সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। সুচারু অনুমান করতে পারে। কিছু বলে না। আজও স্পষ্ট করে কিছু বলল না। বরং আশ্বাস দিল, 'ও তেমন কিছু না, বিশ্রাম পেলে শরীর আবার ভাল হয়ে যাবে। চাকরিটাও পেতে পার।'

সুধা বিবর্ণ মুখ অন্ধকারে আড়াল করে বোধ হয় ভাগ্যের কথা ভেবে সঃদুঃখে হাসল। 'আবার করে কিছু হবে না।'

সুচারু বেদনা অনুভব করছিল। এই বেদনার এক মৃদু দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহ আছে। সুচারু ঈষৎ আড়ষ্ট বোধ করল। 'কিছু হবে না তোমায় কে বলল?'

'আমি জানি।' সুধা নিশ্চিত।

'এত বড সংসারের তুমি কতটুকু জান ?' সুচারু জোর করে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে যেন।

'বড সংসারের জানি না; ছোট সংসারের জানি।' সুধা বলল, খেদ ক্লেশ ব্যর্থতা সত্ত্বেও ওর বলার ভঙ্গিতে সুস্পষ্ট জোর ছিল, যেন সে নিঃসন্দেহ অতি নিশ্চিত।

'কি জান ?'

সুচারুকে দেখবার জন্যে ঘাড ফেরাল সুধা। আঁধারে সুচারুর মুখ শ্লেটের ওপর ফুটে ওঠা দাগের মতন দেখাচ্ছিল, অস্পষ্ট, ঈষৎ-স্ফুট। বলল, 'ছোট সংসারে আবার করে কিছু হয় না। যা যায় বরাবরের মতনই যায়।' বলে থামল সুধা, অন্যমনস্ক ভাবে আঁচলের প্রান্ত থেকে সুতো টেনে নিচ্ছিল। নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে, তারপর সুচারুকে আরও স্পষ্ট করে যেন বোঝাচ্ছে এই ভাবে বলল, 'যেমন একসময় আমার একটা হার ছিল গেছে, আরতির ছিল তাও গেছে। ছিটে ফোঁটা নিয়ে আমরা থাকি, গেলে আবার নতুন করে কিছু হয় না। সোনাদানা নয়, শরীর-স্বাস্থ্যও না। চাকরিও।'

সুধা যেমন করে কথাটা বলল তেমন করে সুচারু বুঝল না, আরও বেশী বুঝল, কথার ভেতরে যে অর্থ, যে হাহাকার তা অনুভব করতে পারল।

'সুধা—' সুচারু কিছুক্ষণ নীরব থেকে নীচু গলায় ডাকল।

পিঠ কুঁজো করে ভাঙা হাটুতে চিবুক দিয়ে সুধা বসেছিল। বাঁ হাত কোলের কাছে লুকোনো, ডান হাত মাটিতে। খোঁপা খুলে ঘাডে পিঠে পডেছে। সুধা শব্দ করে সাড়া দিল না। মুখ সামান্য ফেরাল।

'তোমাদের অনেক গেছে—'সুচারু কোমল বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'মুখ ফুটে বলার কিছু নেই, এমনিতেই বোঝা যায়। খুব স্পষ্ট। কিন্তু আরও কত মানুষের কি গেছে তা বোঝানও যায় না।... আমার কত কি খোয়া গেছে... টোটালি লস্ট কাউকে জানানো যায় না, বোঝানও মুশকিল।'

সুধা নীচে—ঢালু পাড়ের নীচের দিকে তাকিয়ে থাকল, নদীর জল জমাট অন্ধকারের মতন দেখাচ্ছে।

সুচারু ব্যাকুল অথচ বিব্রত হচ্ছিল। শান্তি অনুভব করা যাচ্ছে না,

তবু শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। আবেগ ও অতৃপ্তির সঙ্গে মানুষ মনে মনে যুদ্ধ করলে যেমন বিকৃত হয়, বিরক্তি বোধ করে—সুচারু সেই রকম অসন্তোষ বোধ করছিল।

এখানে শ্মশান অনেকটা দূরে। তবু কোনো মৃতের জন্যে সমস্বর হরিবোলের ধ্বনি উঠে ফাল্গুনের বাতাসে ভেসে এল। সংকীর্তনের শব্দটাও ঝিঁঝিঁর ডাকের মত দূরান্তে স্থায়ী হয়ে আছে।

'আবার করে কিছু হবে না এ তুমি ভেব না। হয়ত হবে।' সুচারু আকাশের তারার দিকে মুখ তুলল। 'সকলেই খেলায় হারবে এক দানও জিতবে না। আমি হেরেছি, তুমিও। তবু দু-একটা খেলায় তুমি জেত।'

কথাটা সুচারু কেমন মিশ্র জটিল চিন্তার মধ্যে বলল। কিছু বোঝার চেষ্টা করল হয়ত, বোধ হয় পারল না। হয়ত সুধাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টাটাই নিজের কাছে এত বৃথা স্তোক দেবার মনে হল যে সুচারু নিতান্ত বাঁধা ধরা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখল না।

সুধা নীরব। শ্বাসনালীর মুখে আড়ষ্ট বেদনা বোধ করছিল। ঠোঁটের ডগা স্নায়ু-তাপে কাঁপছিল অল্প। জিব শুকনো। নদীর জল বয়ে ছল ছল শব্দ করছে।

'আশা করে করে এতকাল কাটল –' সুধা বলল, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, 'এখন আর আশা করি না।··তুমি ফিরে না এলে হয়ত···' সুধা কথা শেষ করল না।

অনেকক্ষণ আর কথা হল না। দু-জনেই নীরব। আউটরামের দিক থেকে জাহাজের ভাঙা বাঁশি বেজে থেমে গেল। কোথাও একটা প্লেন উড়েছে।

অবশেষে সুচারু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'চল'।

পথে সুধা হঠাৎ বলল, 'আমাদের নীচের তলায় ওঁরা চলে যাবেন। তুমি আসবে?'

সুচারু মনোযোগের সঙ্গে দেখল সুধাকে। বিস্ময় বোধ করেছিল হয়ত,

পরে সে-বিস্ময় সয়ে গেলে দুর্বল কোমল দৃষ্টি ওর চোখের মণি অ-স্বচ্ছ করে তুলল।

আড়ষ্ট বোধ করছিল সুধা। কথাটা বলার পর অস্বস্তি লাগছিল। সুচারুর দৃষ্টিতে কেমন বিব্রত হয়ে ইতস্তত করল। 'আমি শুনছিলাম ওঁরা চলে যাবেন·· ঠিক নেই কিছু।'

'ভেবে দেখি।' সুচারু মৃদু স্বরে জবাব দিল।

বাইশ

চিঠিটা নিখিলের নামে। উমা খামের ওপর হাতের লেখা থেকে অনুমান করতে পারল না, কার হতে পারে। দাদার নামে কদাচিৎ কোনো চিঠি আসে। আগে হেতমপুর থেকে মধুদারা লিখত। দাদা জবাব দিত না বলে ওরা আর চিঠি লেখে না। আজকাল পোস্টকার্ডে দু-একটা চিঠি দাদার আসে, বন্ধুবান্ধবের, উমা মোটামুটি সে-লেখাগুলো চেনে। এই খামের চিঠিটা কার উমা ধরতে পারল না। হাতের লেখার ছাঁদ স্পষ্ট, গোটা গোটা, কেমন মেয়েলি। কৌতূহল এবং সন্দেহ হলেও উমা চিঠিটা খোলে নি, দাদার টেবিলে রেখে দিয়েছিল।

নিখিল ইদানীং আরও গৃহ-বিমুখ। এখন তার বাড়িতে থাকা না-থাকার ঠিক নেই। পরীক্ষা পোড়াশোনার বালাই গেছে। সারাটা দিন বাইরে, পার্টির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অনেক দিন রাত্রেও ফেরে না। আগে বাড়িতে না ফিরলে অপরাধীর মতন সংকোচ বোধ করত, আজকাল আর করে না। মনে হয় না, দু-এক রাত বাড়ি ফিরলাম কি না-ফিরলাম, খাবার নষ্ট হল কি না-হল, কে দুশ্চিন্তা করল—কোনো বিষয়ে তার বিবেচনা আছে।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর একদিন কাকা ওকে ডেকে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। তার পর থেকে দাদা পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। তার সংকোচ অনুতাপ অস্বস্তি বোধ কিছু আর নেই। এখন নিখিলকে দেখলে মনে হবে, এ-সংসারের সঙ্গে তার বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক নেই। দূর আত্মীয়ের মতন সে আছে। যে-বন্ধন প্রাত্যহিকের, যার অনুভব পরিবারগত আচরণের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পায়, নিখিল সেই বন্ধন ও আচরণ থেকে যেন সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত।

কাকা কি বলেছে দাদাকে উমা জানে ; দাদা কি চেয়েছে কাকার কাছ থেকে উমা তাও জানে।

এমনি মানুষ কাকা। দাদা আজ বড় হয়েছে বলে নিজের যা পছন্দ যা খুশি করতে চাইল, আর কাকাও তাতে বাধা দিল না। উমা কাকাকে এর জন্যে অনেকটা দায়ী করে রেখেছে। আগে থেকেই করছিল। কলকাতায় এসে যখন দাদা ক্রমশ বন্ধুবান্ধবের পাললায় পড়ে ধীরে ধীরে মতিগতি পালটাচ্ছিল তখন কাকা কিছু বলে নি, মুখ ফুটে বারণ পর্যন্ত করে নি কোনোদিন, যা খুশি করতে দিয়েছে। অত প্রশ্রয় পাবার পর আজ আর সে-ছেলে ফিরবে কেন।

কাকা অবশ্য ফেরাতে চায় নি ; দাদাও ফিরে আসার কোনো লক্ষণ দেখায় নি।

দাদা বলেছিল, কাকার সঙ্গে কথা হবার পর সেই রাত্রেই উমাকে বলেছিল. 'মনে একটা খুঁতখুঁত ছিল, বুঝলি ; সেটা গেল।'

খুঁতখুঁতটা কিসের উমা জানত, কিছু বলেনি তাই। নিখিল নিজেই বলেছিল, 'আজকাল বাবা কাকাদের সঙ্গে তাদের ছেলে মেয়ের মত মেলে না। সে-কালের লোকের এক ধরনের মন, আমাদের আলাদা। ব্যাপারটা স্পষ্ট। সবাই বোঝে। অথচ এই দুই জেনারেশানে কেবল অযথা লড়াই করে। মানে, যে যার মত সেরকম থাকলে আর আননেসেসারি ট্রাবল হয় না।'

'সোজা কথা বলো, তুমি দড়িদড়া থেকে ছাড়া পেয়েছ।' উমা ভীষণ ক্ষুব্ধ ভাবে বলেছিল।

'তোর কথা-বার্তাগুলো সব সময় চড়া। নরম মেজাজে কথা বলতে পারিস না।'

'না, পারি না।'

'এই দোষ শুধরে ফেল।'

'কে কাকে শোধরায়!'

নিখিল বোনের রাগ ক্ষোভ দুঃখ সবই বুঝছিল। তখন আর কিছু

বলেনি। পরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে যেন নিজের হয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, এমন ভাবে বলল, 'দেখ উমা, আমাদের রক্তটাই আলাদা। চাকরি-বাকরি ঘর-সংসার করে কাটাব, বুড়ো হব, তারপর শ্মশানে যাব—ও-সব আমাদের রক্তে নেই। বাবা যাদের টেররিস্ট ছিল, কাকা অমন লিবারাল তাদের বংশে ছোটখাটো সুখ আরাম ঘর-কন্না নিয়ে পড়ে থাকার ট্রাডিশন থাকে না। আমার নেই।… আমার জন্যে আলাদা কিছু রয়েছে।'

'কি আছে?'

'দুঃখ, আঘাত, নানা দুর্ভোগ।'

'তাই তুমি খুশী?'

'হ্যাঁ। আইডিয়াল ইজ এ গ্রেটার হ্যাপিনেস…। আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে। বুঝলি না—?'

দু মুহূর্ত নীরবতা থাকল ভাই-বোনের মধ্যে। উমা আচমকা বলল, 'দাদা—'

'বল।'

'কাকা তোমায় বুঝি বাবার কথা বলেছে।'

'না, মানে কথায় কথায় এসেছিল।'

'বাবা তোমার কাছে অনেক বড়, না দাদা?'

'নিশ্চয়।…আমি বাবাকে তবু দেখেছি—মানে তখন একটু বড় ত, যেন ঝাপসা ভাবে মনে পড়ে…। তুই একেবারে বাচ্চা ছিলি…'

'ভালই ছিলাম। বড় হয়ে বাবাকে দেখলে আমার হয়ত অনেক কিছু চোখে পড়ত। তাতে খারাপ হত।'

'খারাপ—!'

'ঘেন্না হত।'

'উমা—!'

'আমার কাছে কাকা অনেক বড়।…বাবা ত কিছু করেন নি আমাদের জন্যে। আমরা মরি কি বাঁচি তার জন্য গ্রাহ্যও করেন নি। কাকার জন্যে

বেঁচেছি।...যে আমায় বাঁচিয়েছে পালন করেছে সে আমার কাছে অনেক বড়।'

আর কোনো কথা হয় নি ভাই বোনে। হয়ত দু-জনেই মৃত বিস্মৃত বাবাকে ভাবছিল।

চিঠিটা নিখিলের টেবিলে সারা দুপুর পড়ে থাকল; বিকেলেও। সন্ধ্যের দিকে নিখিল একবার বাড়ি এসেছিল, সঙ্গে কে এক বন্ধু। এল আর তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে জামা কাপড় বদলে বেরিয়ে গেল আবার। যাবার সময় জানিয়ে গেল, আজ আর সে ফিরবে না—বাইরে যাচ্ছে। উমা তখন নানা কাজে ব্যস্ত। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, উনুনটা দু দুবার নিবে সবে জ্বলেছে, বিকেলের কাজ অনেক বাকি—রত্নময়ী মাথা ঘুরে পড়ায় বিকেলে একটা সন্ত্রস্ত ভাব জেগেছিল এ-বাড়িতে, উমা অনেকক্ষণ ওপরে কাটিয়েছে।

উনুন নিবে নিবে জ্বলল, উমার গা ধোওয়া কাপড় কাচাও হয় নি, রান্নার-যোগাড় আছে—। এই ব্যস্ততার সময় নিখিল এসেছিল আচমকা, এসেই চলে গেল। চিঠির কথা উমার খেয়াল হয় নি।

খেয়াল হল রাত্রে। রান্নাবান্নার কাজ সেরে, সব চুকিয়ে অনেকটা সুস্থির শান্ত হয়ে উমা গা ধুয়ে ঘরে এসেছিল। শাড়ি জামা বদলাচ্ছে, দাদার চিঠিটা চোখে পড়ল। মাটিতে তক্তপোশের তলায় পড়ে আছে। চোখে পড়ত না যদি না ব্লাউজে সেফটিপিন লাগাবার সময় পিনটা মাটিতে পড়ত। সেফটিপিন তুলতে গিয়েই চিঠিটা চোখে পড়েছিল।

মাটি থেকে চিঠি কুড়িয়ে নেবার সময় উমা খামটা দেখল। সেই সকালের চিঠি। টেবিল থেকে কখন যে পড়ে গেছে কে জানে। হয়ত দাদা কোনো বই পত্র টানতে গিয়ে ফেলেছে।

নিখিলের বিছানায় বসে উমা হাতের লেখাটা আবার একবার খুঁটিয়ে দেখল। গোটা গোটা অক্ষর, মেয়েদের হাতের লেখার ছাঁদ। ডাকঘরের ছাপটাও আবার দেখল উমা। মানিকতলা পোস্টঅফিস বলে মনে হল।

নিখিলের ওপর আজকাল উমার তেমন একটা বিশ্বাস নেই। কোনো মেয়ের চিঠি হতেও পারে।

চিঠিটা টেবিলে রেখে উমা উঠল। ভিজে শাড়ি জামা মেলে দিতে বাইরে গেল। আজ বুঝি পূর্ণিমা, কি দ্বাদশী ত্রয়োদশী হবে। চাঁদের আলো দোতলার সিঁড়ির গা গড়িয়ে উঠোনের আধখানা ভরে রেখেছে। কলঘরের টিনের দরজার গায় এক ফালি জ্যোৎস্না পড়েছে। কাকা বাড়ি নেই, বোধ হয় কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

উমা ঘরে ফিরল। পরনের শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাড় গলা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে ও-পাশটায় গেল, তাকের দিকটায়। চিরুনি দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করল, সামান্য পাউডার দিল ঘাড়ে বুকে; মুখে ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না। দুটো ধূপ জেলে দিল।

জানলা খোলা, সামান্য বাতাস আসছে। উমা নিখিলের বিছানায় গিয়ে বসল। তার আধ-পড়া গল্পটা এবার শেষ করবে। প্রবাসী কাগজটা খুঁজছিল।...চিঠিটা আবার চোখে পড়ল।

দাদা যে মেয়েদের সঙ্গে মেশে উমা তা আগেই জানতে পেরেছে। দু চার জনের নাম দাদার মুখে সে নিজেই শুনেছে। তারা সবাই পার্টির মেয়ে। এই মেয়েটা কে?

উমার সন্দেহ হল, কোনো মেয়েই না দাদার কাছে খুব বড় একটা আকর্ষণ হয়ে থাকে। বিশ্বাস করতে পারছিল না উমা, আবার সন্দেহমুক্ত হতেও পারছিল না। তা ছাড়া কেমন একটা কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য ক্রমে ওকে অস্থির করে তুলছিল।

দাদা কি কাউকে ভালবাসে? সে কে? কেমন দেখতে? অনেক কি লেখাপড়া শিখেছে? ঘর সংসার থেকে বেরিয়ে এসে যারা—যে-সব মেয়েরা দাদাদের মতন পার্টি করে তারা যে কেমন উমার বড় জানতে আগ্রহ ছিল। একদিন একটি মেয়ে দাদার খোঁজে এ-বাড়ি এসেছিল। কেমন যেন উদভ্রান্ত, রুক্ষ চেহারা; কোনো পরিপাটি নেই, যেন অনেকটা ইচ্ছে করেই না সুশ্রী না সাধারণ, কোনোটাই হতে চায় নি। তার ময়লা রঙ

আধ ময়লা শাড়িতে আরও কালচে দেখাচ্ছিল, চুলে একটা বিনুনি, উস্কো-খুস্কো হয়ে আছে মাথা, হাত গলা খালি—কানে ছোট রিঙ শুধু।

দাদা যদি কাউকে ভালবেসে থাকে—সেই মেয়ে উমার সঙ্গে একটা সম্পর্কের মধ্যে এসে দাঁড়াবে। কথাটা ভাবতেই কেমন এক সকৌতুক প্রসন্ন শিহরণ বোধ করল উমা। ভাল লাগছিল, আবার কেমন এক দুষ্টুমির প্রলোভন বোধ করছিল।

চিঠিটা উমা হাতে নিল। ঠিকানা পড়ল আবার, নজর করে দেখল। লেখার ছাঁদটা যে মেয়ের এবার যেন আরও নিশ্চিত হল।

কি আর বলবে দাদা? বকবে? রাগ করবে? করুক না রাগ। বলুক কিছু। উমাও বেশ করে শুনিয়ে দেবে 'থাক থাক আর রাগ দেখাস না, দাদা। আহ্লাদে ত গলে পড়ছিস।...আমি পছন্দ না করলে তোর বউ এ-বাড়িতে ঢুকতে পারবে না কি!'

দাদা রাগ করবে না। এই চিঠির পরবর্তী ঘটনা কল্পনা করতে করতে উমা খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল।

গোটা গোটা ছাঁদ হলেও কেমন রোগা রোগা অক্ষর। বেশ বড় চিঠি! পাতা উলটে চিঠির শেষে নাম দেখে উমা অবাক। অবনীর চিঠি। দাদাকে শেষ পর্যন্ত ও চিঠি লিখবে এ কল্পনাতীত। হঠাৎ? এই চিঠি কেন? এত কি কথা লিখেছেন?

উমা চিঠির প্রথম দু চার লাইনের ওপর চোখ বুলিয়ে সচেতন সতর্ক হল। প্রথম থেকে আবার পড়তে লাগল:

নিখিলবাবু,

উপায়হীন হয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, অন্য এমন কেউ ছিল না যাকে এ-চিঠি লিখতে পারি। আপনি আমার সমবয়সী; আপনার কাছে যা বলা সম্ভব আপনার কাকার কাছে তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার যত দূর জানাবার আমি প্রায় সবই জানাচ্ছি; আপনি ওঁকে জানিয়ে দেবেন। সব কথা জানাবার বোধ হয় দরকার হবে না, কিছু কথা আমি আপনাকে নিজের অবস্থা

বোঝাবার জন্মে একটু বেশী করে লিখলাম। আপনি আমায় বুঝবেন এই আশায়।

আপনি নিশ্চয় জানেন, আপনার কাকার ইচ্ছে ছিল আপনার বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ দেন। মাসখানেক আগে একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে মা-র (আমার জ্যেঠাইমাকে আমি মা বলি) সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, প্রস্তাবও করেছিলেন। অবশ্য আমার মতামত উনি অনেক আগেই জানতে চেয়েছিলেন—আমি কিছু বলি নি। মার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন এই ভেবে যে আমি মাকে আমার মতামত জানাতে পারব।

আমি আপনাদের কাউকে দুঃখ দেব, অসম্মান করব, এমন ইচ্ছে কোনদিন ছিল না, এখনও নেই। আপনার কাকাকে আমি যে কত শ্রদ্ধা সম্মান করি আমি নিজেই জানি। উনি দেবতুল্য ব্যক্তি। তাঁর দুঃখ দুশ্চিন্তা আমি বুঝতে পারি। এ সব সত্ত্বেও আমি তাঁর অনুরোধে রাজী হতে পারলাম না।

আপনার কাকা আশা করেছিলেন, আমি উদার হব, একটি সৎ কাজ করব। তিনি আমায় খুবই স্নেহ করেন বলে আমার কাছে এতখানি আশা করেছিলেন। আমি অত উদার নই। আমার মাও নন।

আমার সংসারের কথা আপনি জানেন না; আপনার কাকা কিছু জানেন, সবটা নয়। আমার আয় স্বল্প; দায়-দায়িত্ব অনেক। মা অসুস্থ। জ্যেঠতুত বোনটি বাচ্চা হবার পর থেকে নানা রোগে ভুগছে, তার স্বামী সামান্য কারখানায় চাকরি করে, বোন এবং ভাগ্নেটির জন্মে আমায় কিছু সাহায্য করতে হয়। প্রেসের চাকরি করি, মালিকের সুনজরে আছি পরিশ্রম করি বলে, দু দফা মাইনে বাড়িয়েও তিনি আমায় একশো টাকা দেন। একশো টাকায় পরিবার প্রতিপালন আজকালকার দিনে কত কষ্টের আপনি বুঝবেন না।

আমার অবস্থার কথা বললাম। এবার নিজের কয়েকটা কথা বলি। আমার বাবা থিয়েটারে বাঁশি বাজাতেন। ও সব দিকে থাকলে লোকের নানা দুর্মতি হয়। আমার বাবারও হয়েছিল। খুব নোংরা একটা রোগ হয় তাঁর। রোগ ভয়ঙ্কর হলে থিয়েটারের একটি মেয়ে নিয়ে আলাদা থাকতেন,

পরে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োন। আমার মা বাবার সংস্পর্শে সেই একই রোগ আগেই শরীরে নিয়েছিলেন। রোগটা দিনে দিনে বেড়ে মার সর্বনাশ করে। মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, একেবারে পাগল। লোকের বাড়িতে গিয়ে এঁটো পাত কুড়িয়ে খেতেন। জামাকাপড় ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেন। একদিন আমি মাকে মেরেছিলাম। তারপর মা কোথায় যে চলে যান আমি জানি না। হয়ত মারা গেছেন, হয়ত আজও কোথাও রাস্তায় পাগলী হয়ে পড়ে আছে, জানি না।

আমি বেশীদিন বাঁচব না। আপনার কাকাকে একদিন বলেছিলাম। উনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু আমি জানি আমার আয়ু খুব কম। বাবার মতন আমিও অল্প বয়সে মরব। আমি যে আমার মা-বাবার রক্ত গায়ে নিয়ে বেঁচে আছি তা ত জানি। আপনার বোনকে বিয়ে করলে তার জীবন নষ্ট হত। আমার ওপর দু চার দিনের ভরসা করা যায়, সারা জীবনের নয়।

আমার নিজের ওপর কোনো বিশ্বাস নেই। অনেক রকম ভয় আছে আমার। যদি বা ধরুন বেঁচেই থাকি, নিতান্ত মায়া করে আপনার বোনকে বিয়ে করি, সেই মায়া কতকাল টিঁকবে। করুণার পাত্র জলের ঝারি, তার সব জল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তখন? আজ যাকে লোক দেখান উদার হয়ে বিয়ে করব কাল তার ওপর পশুর মতন অত্যাচার করব, তাই কি ভাল?

আমি কাউকে ঠকাতে চাই না। আমায় উদার ভেবে আপনারা মিথ্যে কেন দুদিনের সান্ত্বনা পাবেন। আমার যা অসাধ্য আমি তা করতে চাই না। করা উচিত নয়।

আপনাকে যতটা পারলাম গুছিয়ে লিখলাম। আপনি আপনার কাকাকে বুঝিয়ে বলবেন। তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আপনিও ক্ষমা করবেন।

ইতি অবনী।

পুনশ্চ: আরও একটা কথা লিখছি। এটা অবশ্য আমার নিজের গায়ে পড়ে বলা। আপনার কাকা আপনার বোনের বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেন, কিন্তু এমন বিয়ে শুনেছি ভাল না। মা বলছিলেন, তাঁর এক আত্মীয়ার এই ভাবে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাচ্চা হবার সময় পেট কাটতে হয়। দু

জনেই মারা যায়। কয়েকদিন আগেকার কাগজে এই রকম একটা খবর বেরিয়েছে, চোখে পড়ে থাকলে দেখেছেন নিশ্চয়, সেখানেও দুজনে মারা গেছে। ভগবান আমাদের ওপর দয়া করেন নি। শুরুতেই অন্ধ করে দিয়েছেন, চাঁদ দেখার লোভ করে কি লাভ বলুন। অবনী।

চিঠি শেষ করে উমা আর চোখ তুলতে পারল না। তার কাছে এই ঘর ওই আলো, আঘাত অসম্মান বেদনা বা কোনো রকম অস্তিত্বের সজ্ঞান কোনো বোধ ছিল না। সর্ববিষয় থেকে যেন বিচ্ছিন্ন বিচ্যুত হয়ে লুপ্তচেতন মৃতের মতন সে বসে থাকল।

তেইশ

আচমকা নাক দিয়ে অনেকটা রক্ত পড়েছিল বাসুর; ঠাণ্ডা জল টেনে টেনেও থামছিল না। ঘাড় মাথা ধুয়ে খানিক শুয়ে থাকার পর রক্ত বন্ধ হল। কপালের কাছে ঝিমঝিম করছিল।

শুয়ে পড়ার আগে বিড়িটায় সুখ টান দিচ্ছে বাসু, তখনই নাক সির সির করে রক্ত পড়তে লাগল। আরতি তখনও শোয় নি, বিছানা পাতছে। জল এনে দিল। সে জলে কিছু হয় নি। বাসুকে বাইরে গিয়ে অনেক জল টানতে হয়েছে নাকে। ঘাড় মাথা ভেজাতে হয়েছে।

গরমের জন্তেই এরকম। আরতি বলল, মাথা গরমের জন্তে। বাসুর অবশ্য ধারণা, আজ সারা দুপুর চৈত্র মাসের চড়া রোদ খেয়েছে বলে এ-রকমটা হল। কাল সকালে উঠে খুব ভাল করে স্নান করতে হবে।

আরতি ঘুমিয়ে পড়ল। বাসু জেগে থাকল। চুপ করে শুয়ে থাকল। কপালের ওপরটা থেকে থেকে ঝিমঝিম করছিল। আজ বেশ গরম। বাসু গায়ের চামড়ায় জ্বরের মতন তাপ অনুভব করছিল।

ঘুম পাচ্ছিল না। অথচ বাসুর ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল। সামান্ত দুর্বল লাগছে মাথাটা, কেমন হালকা, তবু ঘুম আসছে না। গলা পিঠে ঘাম হচ্ছিল। বাসু খালি গায়ে শুয়ে আছে।

ঘুম আরতির। শুলো আর মরার মতন ঘুমিয়ে পড়ল। বাসুর ইচ্ছে হচ্ছিল আরতিকে জাগিয়ে দেয়।

আরতি তার ওপর যে খুব চটে আছে আজকাল বাসু জানে। নেহাত ভয়ে কিছু বলতে পারে না। পাছে মুখ খুললে বাসু ব্যাপারটা মাকে বলে দেয় তাই বোবা হয়ে রয়েছে। মনে মনে যে বাসুকে আরতি কী বিষ চোখে

দেখছে, গালাগাল শাপ শাপান্ত করছে বাসু বুঝতে পারে। আরতির ব্যবহার, গোমড়া মুখ, বোবা সেজে থাকা, বাসুর কোনো কিছুতে গা না লাগানোর ভাব থেকেই সব বোঝা যায়। বাসুর সঙ্গে কথাও বলে না, নেহাত দরকার না পড়লে। আরতি যে বাসুকে তার সুখের পথে মস্ত বাধা ভেবে নিয়েছে বাসু বুঝতে পেরেছে।

সে-দিনের সেই ঘটনার পর বাসু প্রায় প্রত্যহ বাঁধা নিয়ম করে আরতিকে ছুটির পর আগলে বাড়ি নিয়ে আসে। আরতির ছুটি হয় সাতটায়। সাতটার সময় বাসু আরতিদের দোকানের সামনে উলটো দিকের ফুটপাথে হাজির থাকে। প্রথম প্রথম ক দিন দোকান যাওয়ার সময়ও সঙ্গে যেত। তারপর ভেবে দেখেছিল, সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই; ন'টার সময় গলির পথ ধরে আরতি যায়, সে-সময় কেউ তাকে রিকশায় নিয়ে হাওয়া খেতে যাবে না। তা ছাড়া, এই সময়টা বাসু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পাড়ায় ঘোরে, চা বিড়ি খায়, আড্ডা মারে, দুটো পয়সা রোজগারের নানা ধান্ধায় থাকে। কালতু খানিক সময় নষ্ট করার মানে হয় না। কয়েক দিন আরতিকে সঙ্গে করে পোঁছে দিয়ে আসার পর আর পোষাল না। সঙ্গে যাওয়া ছেড়ে দিল। কিন্তু আসার সময় আরতিকে একলা আসতে দিল না। প্রায় রোজই সময় মতন হাজির হতে লাগল। যে দিন কোনো কারণে যাওয়া হত না সেদিন বাসুর মনে কেমন এক সন্দেহ থাকত। সময় পেলেই একবার বাড়ি এসে দেখে যেত আরতি ফিরেছে কি না, কখন ফিরেছে।

আরতি যে ব্যাপারটা পছন্দ করছে না, চটে আগুন হয়ে যাচ্ছে, বাসু বুঝতে পারত। গ্রাহ্য করত না। মজা মারার সময় কেউ বাধা দিলে মানুষ চটবেই, এ সোজা কথা, বাবা। তুমি যেটি চাও, ঢলাঢলি, লভ্‌ টভ্‌, সে-সব হচ্ছে না, কাজেই এখন আমি তোমার কাছে বিষ। হোক বিষ, তবু এই গাড্ডায় আরতিকে সে পড়তে দেবে না।

একদিন আরতি খুব চটে গিয়ে বলেছিল, 'আমি কি চোর যে আমায় এমন করে আগলে আগলে নিয়ে যাও?'

'আলবাত চোর।' বাসু টেনে এক ধমক দিয়েছিল। ধমক দিয়ে মুখ

খিঁচিয়ে বলেছিল, 'বেহায়াগিরি করে, আবার কথা বলতে আসে। মারব এক ঝাপট্...'

আর-একদিন আরতি দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে বেশ দেরী করল, প্রায় আটটা বাজিয়ে দিল। ভেবেছিল বাসু থাকবে না, দোকানের বাইরে এসে দেখল বাসু আছে কি না, আবার দোকানে ঢুকে পড়ল, খানিক পরে ফিরল।

'এত দেরী যে!' বাসু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল গম্ভীর গলায়।

'কাজ শেষ হয় নি।'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে কি সত্যি গিয়ে জেনে এস।' আরতি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বলেছিল।

'জেনে আবার কি আসব রে, জানাটানার দরকার আমার হয় না।... তুমি বার বার বাইরে এসে উঁকি মারছিলে...। ও-সব ধাপ্পা আমার কাছে চলবে না।'

'আমি তোমার মতন ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী নই।' আরতি চলতে চলতে অসহ্য রাগে বলল।

বাসু আরতির রাগ গ্রাহ্য করল না। বলল, 'অত বাড় দেখাতে আসিস না, মরবি। গলা টিপে মেরে ফেলব।'

অনেকটা পথ আর কথা বলল না আরতি। তারপর অসম্ভব বিরক্ত হতাশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তোমার হাতেই একদিন আমি মরব।'

সেদিনের কথাটায় বাসু কান করে নি, মনেও রাখে নি। কিন্তু আজ আবার ওই একই কথা বলেছে আরতি।

দোকান থেকে বেরিয়ে আরতি বাসুর সঙ্গে ফিরছিল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসু বলল, 'আজ সারা দুপুর যা হুড়কো দিয়েছে কাবুলটা, শালা এই রোদে দমদমে নিয়ে গিয়েছিল।'

আরতি কোনো কথা বলে নি। বাসু আশা করছিল, আরতি কিছু জিজ্ঞেস করুক, কেন কি জন্যে সে দমদম গিয়েছিল।

আরতি কিছু বলছে না দেখে বাসু নিজের থেকেই শোনাবার মতন করে বলল, 'চৌধুরীরা সাব-কনট্রাক্ট পেয়েছে না—ওই কাবুল যাদের কাজ করে, বুঝলি। আমায় নিয়ে গিয়েছিল।...পানাগড়ে ওদের কাজ হচ্ছে কিছু...। সে যে কোথায় কে জানে, বলছে ত কাছে। ওখানে আমায় একটা চাকরি দিতে পারে, বুঝলি। কাবলেটা ত খুব বলল টলল। দেখা যাক...'

গলি ধরে এসে ওরা গণেশ অ্যাভিন্যুতে পা দিয়েছে। রাস্তা টপকে গলি ধরল। আরতি চুপ। বাসু কাজের কথাটা ভাবছে, যদি হয়, হয়ে যায়!

'কবে হবে?' আরতি হঠাৎ বলল।

কবে বাসু জানে না। হবে কি না তারই বা ঠিক কি। তবু চাকরি হবে এই আশায় বাসু যেন সামান্য খুশী ছিল। বলল, 'কে জানে।'

'তাড়াতাড়ি হলে ভাল।' আরতি বলল।

কি ভাবল বাসু; মুখ ফিরিয়ে আরতিকে দেখল, 'যত তাড়াতাড়ি হয়, তোর তত সুবিধে।'

আরতি ঘাড় উঁচু করে তাকাল।

'আমি না থাকলে—'বাসু ভুরু বেঁকিয়ে এবং ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি না থাকলে তোমার খুব মজা।...ওই শালা হারামির সঙ্গে আবার মজা লুঠতে পারবে।'

মজা লুঠতে পারব...।

হাঁটতে লাগল আরতি, কথা বলল না। মদন বড়াল লেনের মুখে এসে পড়েছে। পাড়ার মধ্যে ছোট পার্কটায় কাদের কুকুর চেঁচাচ্ছিল, দু চার জন বসে আছে।

'আমি থাকি আর যাই—' বাসু হঠাৎ বলল, 'ইজ্জত নষ্ট করলে আমি তোমায় আস্ত রাখব না, মেরে ফেলব।'

'ফেললেই পার। একদিন না একদিন মারবেই ত তুমি।' আরতি কেমন যেন প্যাঁচালো ভাবে কথাটা বলেছিল। রাগ করে নয়, অভিমান করেও নয়। অন্য কিছু ভেবে। কি ভেবে, কেন, বাসু জানে না—, তবে আরতির কথা বলার ধরনটাই তার খারাপ লেগেছিল।

শুয়ে শুয়ে বাসুর কথাগুলো আবার মনে পড়ল। সত্যিই কি সে আরতিকে মারতে পারে! পাগল! আরতি বিশ্বাস করে নাকি বাসু তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে? মেয়েটা পয়লা নম্বরের নেমকহারাম। মেয়েছেলে হলে যা হয়। মেয়েদের মতন এমন নেমকহারাম জাত আর নেই।. বাসু কি তার ভালর জন্যে তোকে আগলে বেড়াচ্ছে? কি দরকার বাসুর তোর ঝুট-ঝামেলায় মাথা গলিয়ে, যদি না তোকে ভালবাসত! এ-সব রিকশায় চড়াচড়ি, একটু টাচ ফাচ, দু-চারটে কাটলিস্ খাওয়া—এ সবের শেষ কথায় বাসু জানে। সিনেমায় যেমন ফিনিস দেয়, বুঝলি আরতি, সে-রকম ফিনিস মারতে পারলে বাসু কবে রাজা হয়ে যেত, দিদি কোন কালে ছেলেপুলের মা হয়ে যেত। আরে বাবা, এই কারবার বাসুর হাতের মধ্যে। সেই মিনুদিকে নিয়ে কি-রকমটা হল, জানিস তুই? শুনলে ত মাথা ঘুরে পড়বি। একেবারে পুরো সাঁতার হয়েছিল। কিন্তু তারপর? সে মেয়ে কতবড় চালু! সাঁতরে ও-পারে এনে দিয়ে কেটে পড়ল।..সবাই এই রকম। গরিব বড়লোক বলে কথা নেই। পার্বতীর সঙ্গেও খানিক জমিয়েছিল বাসু, আরে ব্বাস, সে-মেয়ে ক'টা দিন বাসুর সঙ্গে কিসফিস করল, তারপরই ওই টুকুতেই মাথায় চড়ে বসল। বলে এ হয়েছে, ও হয়েছে। হয়েছে না আরকিছু। অত বুদ্ধু বাসু নয়। অত কাঁচা ছেলে পাও নি তাকে। ঝামেলা থেকে কেটে পড়ল বাসু। পটলার মাসি? সে কত ছুতো করে আঁচল সরাত তাস খেলতে খেলতে, সেই মেয়ে --বঙ্কুর খপ্পরে পড়ে কেটে পড়ল।....জগতে লভ্ নেই। কেউ কাউকে ভালবাসে না। যারা শালা গোবর গণেশ, বুদ্ধু, তারা মজে যায়, ভাবে প্রেম শালা চণ্ডীদাস আর রামী ধোপানি! এ-সব বিলকুল পট্টি। সোজা বাত, দু দশ দিন ফুর্তি আরাম যেটুকু হয় করে নিয়ে খিঁচ মার। নন্দী যা বলেছে একেবারে তাই। খাশা বলেছে নন্দী। ট্রামগাড়ির গদি আর প্রেম এক রকম যতক্ষণ টিকিট আছে বসে থাক, তারপরই নামিয়ে দেবে।

বাসু এ-সব জানে। দিদিও জানে। এই ফিরে এসেছে সুচারু, হাতকাটা অকেজো একটা লোক। কি করবে সে আর দিদিকে? বিয়ে

করবে? ঘর সংসার করবে? কিচ্ছু করবে না। নেহাত ভগবান মেয়ে দিয়েছে তাই আজ ফিরে এসে অন্য কোথাও কিছু জুটল না বলে দিদির কাছে পুরোনো প্রেম ঝালাতে এসেছে। ওই হাতকাটাকে কোন মেয়ে পুছবে? কেউ পুছবে না বলেই দিদির কথা মনে পড়েছে। নয়ত ও বেটা, এতদিন কি করছিল?

আরতিকে এই দুঃখের মধ্যে পড়তে দিতে চায় না বাসু। এ-সব জিনিসের প্রথম প্রথম যেমন সুখ, পরে তেমনি দুঃখ। ওই লাল সোয়েটার পারা ছেলেটা যেদিন মজা লুঠে খিঁচ দেবে সেদিন সব সুখ বাতাস হয়ে যাবে। নতুন নতুন নেশা করছে বলে খুব মজা লাগছে আরতির, তারপর নেশা ধরে গেলে যখন খোয়াড় পাবে না তখন মরবে।

ফালতু কষ্ট পেয়ে কি লাভ! আর, ওই ত আরতি—নিতান্ত ক্যাবলা গোবলা মেয়ে, কিছু বোঝে না, নিরীহ, একেবারে নরম কাদার মতন, সে একটা চালু শয়তান ছেলের পাললায় পড়ে যে বোকা বনে যাবে এ একেবারে জানা কথা। বাসু কিংবা দিদির মতন হলেও কথা ছিল। আমরা পারি তবু, দুটো ধাক্কা খেলেও সামলাতে পারি। তুই পারবি?

তা ছাড়া বাড়ির ইজ্জত আছে। মেয়েরাই বাড়ির ইজ্জত রাখে, ছেলেরা নয়। একটা ছেলে একটা মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়ুক—মেয়ের বাড়ির ইজ্জত নিয়ে লোকে কথা বলবে। পাড়ার কোনো মেয়ে একটু এদিক ওদিক করলে লোকে সেই মেয়ে আর তার বাড়ির নামে কেচ্ছা করে; অথচ একটা ছেলে কত কি করে, কই কে বা বলে তেমন কিছু। যদি বলত, তবে বউবাজারের এই পাড়ার সব ক'টা ছোঁড়া এতদিনে কেচ্ছার চোটে পাড়া ছেড়ে কেটে পড়ত।

দিদির মতন বুদ্ধি থাকলে, চালাক চতুর হলে, এমন কি দিদির মতন সাবধানী হলেও কথা ছিল। আরতি তা নয়। সেই দোকানের ছোকরা ভুলিয়ে ভালিয়ে যে কী সর্বনাশ করতে পারে আরতির আরতি তা জানে না। একবার যদি সে-রকম সর্বনাশ ঘটে যায়—এ-সংসারের মুখ পুড়ে যাবে। মা গলায় দড়ি দেবে, দিদি...

দিদি কি করবে বাসু ভাবতে পারল না।

বাসু ভাবল, সে আরতিকে যে সর্বনাশের পথ থেকে আগলে রাখছে আরতি সেটা জানে না। না জেনেই এমন সব কথা বলছে। হয়ত, এর পর কোনদিন বলে বসবে, আমার সর্বনাশ হয় হবে, তোমার কি, আমি ত তোমাদের বোন নই।

অন্ধকারে বাসু কেমন যেন চমকে উঠল। সে ভাবতে পারল না, আরতি কি করে এ-কথা বলবে। পর মুহূর্তেই বাসুর মনে হল, কথাটা আরতি বলে নি। তার পরমুহূর্তেই বাসু ভাবল, হঠাৎ এই কথাটা তার মনে এল কেন ?

অস্বস্তি বোধ করছিল বাসু। পুরোনো তুলো-সরে-যাওয়া তোশক আর শতচ্ছিন্ন চাদরের গন্ধ ও খসখসে ভাবটা গায়ে বালির মতন রগড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বিছানার তলা থেকে কতক পোকা এসে তার গায়ে উঠেছে। বড় গরম। চামড়া জ্বালা করছিল সর্বাঙ্গের।

আরতি তার বোন নয়, এ কথা কি আজ মনে পড়ল হঠাৎ ? না। আজ কদিনই কথাটা কেন যেন হঠাৎ মনে পড়ে, মনে পড়েই কেমন সব এলোমেলো করে দেয়। ভাবনাটাকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে আবার সব পরিষ্কার। এক ধরনের কাক আছে না, যেমন চেহারা তেমনি ডাক ; হঠাৎ একবার বাড়িতে এসে বসলে সময় অসময় নেই ডেকে যায়। ডাকটা শুনতে বিশ্রী লাগে। মনে হয় ওটা অমঙ্গল। ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে তবে নিশ্চিন্ত। এই চিন্তাটাও তেমনি। না তাড়ানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।... আরতির ব্যবহারই কি বাসুকে ভাবাচ্ছে ! আরতির আজকালকার আচরণ দেখে অনেকটা সেই রকম মনে হয়। মনে হয়, যেন বাসু যার ওপর জোর করার অধিকার নেই তার ওপর জোর জবরদস্তি করছে।

'একদিন না একদিন তুমি আমায় মারবে।' আরতির এই কথার মানে খুঁজতে গিয়ে বাসু শেষ পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে এইসব কথা ভাবল। সে অনুভব করল আরতি তাকে নিজের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দেখে না, বাসুকে সে বিশ্বাস করে না, ভাবতে পারে না বাসু তার ক্ষতি করতে পারে না। কি

করে যে আরতি ভাবল, বাসু তাকে সত্যিই মেরে ফেলবে—ভগবান জানেন।

মেয়েরা এই রকম। নেমকহারাম, শয়তান। বাসুর কেমন ঘৃণা আর রাগ হচ্ছিল। আরতি যেন এতবড় কথাটা বলে ফেলেছে, বাসু সেইরকম রাগ আর ঘৃণা নিয়ে আগুন হয়ে উঠছিল। আর সেই অসহ্য রাগ বিতৃষ্ণা ঘৃণার মধ্যে সহসা বাসু ভাবল, সত্যিই আরতি তার বোন নয়। বোন নয় বলেই আরতি তাদের ইজ্জত নষ্ট করায় গ্রাহ্য করে না।

এই মেয়েটাকে তবে কেন এমন করে আগলে রাখার চেষ্টা করছে বাসু। জাহান্নামে যেতে দাও।

না। এক বিচিত্র বোধ, অন্তঃস্থ বৃত্তির কাছে হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেল। যমের মতন দুটো বিশাল হাত যেন তাকে নির্দয় ভাবে ধরে ফেলেছে। পালাবার চেষ্টা করেও বাসু পারল না। এবং আধ-চেতনায় অনুভব করল আরতিকে আগলাতে গিয়ে বাসু যেন নিজেই এক দুর্বোধ্য ফাঁসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

নাকের মধ্যে আবার সির সির করতে লাগল। কপালের হাড়ের তলায় ঝিম ঝিম করছে। দু-একটি শিরায় টান ধরে মাথার মধ্যে কেমন ব্যথা ছড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।···আবার বোধ হয় রক্ত পড়তে শুরু করল। বাসু অন্ধকারে নাকের কাছে আঙুল দিল। কিছু বোঝা যায় না।

বিছানার ওপর উঠে বসল বাসু। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার, জানলার বাইরে হালকা আলোর আভা দেখা যাচ্ছিল। আরতিকে অন্ধকারে আরতির মতন দেখাচ্ছিল না। কেউ, কোনো একজন শুয়ে আছে মাটিতে, এক শরীর অন্ধকার। বাসুর ইচ্ছে হচ্ছিল আরতিকে ডাকে, ইচ্ছে করছিল হাত বাড়িয়ে ওর পা ছোঁয়।

বাসু উঠল। এই অন্ধকার তাকে কিছু অনুমান করতে দিচ্ছে না। উঠে আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে আলোর সুইচটা টিপল। ঘরের অন্ধকার কেউ যেন তুলে নিল, আলো পা পেতে দাঁড়াল। বাসু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আরতির দিকে তাকাল।

অকাতরে অব্যবস্থবস্ত্রে আরতি ঘুমোচ্ছে। পায়ের ওপর কাপড় নেই, হাত এলিয়ে রয়েছে, কোমরের কাছ থেকে আঁচলটা মাটিতে লুটোনো, গলা মুখে যেন অনেক ঘাম। সমস্ত শরীর এই সংসারের পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে ও যেন ঘুমোচ্ছে। কোনো লালিত পালিত প্রাণীকে যেন বাসু আজ স্তব্ধ। ভীত, শিহরিত হয়ে দেখছিল। ব্যবধানের ফাঁকটুকু না থাকলে বাসু হয়ত আগুনে দাহ হত।

বাসু বাতি নিবিয়ে দিল। জ্বর ছেড়ে যাবার মত সে ঘামছে, দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, সমস্ত শরীর অবসাদে ভরে গেছে, ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে; পায়ে হাতে জোর পাচ্ছে না।

দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলল বাসু। আরতি খুব ধারালো একটা কাঁটা তার বুকের তলায় ফুটিয়ে দিয়েছে। সেই যন্ত্রণায় শরীর বেদনা এবং কান্নায়, আঘাতে এবং গ্লানিতে শেষ হয়ে এসেছিল।

মনে মনে বাসু বলল, তুই নিজে মরগে যা; বাসু ভট্চায এক বাপের বেটা, সে তোকে মারবে না।

দরজা খুলে ফেলে বাসু কেমন আচ্ছন্ন হতবোধ অজ্ঞানের মতন নীচে কলঘরে চলে গেল।

কলঘরে দাঁড়িয়ে হাত পা মুখ ঘাড় খুব ভাল করে ধুয়ে নিল বাসু। অনেকটা জল ঢালল। নাকে জল টানল। না, রক্ত পড়ছে না। তারপর বেশ খানিকটা স্বস্তি আর আরাম পেয়ে বাইরে এল। উঠোনে বাতাস আছে। বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছিল।

কলঘরের বাইরে বিশ্রী একটা গন্ধ। দু-চারবার নাক টানল বাসু। নিজের হাত নাকের কাছে তুলে গন্ধ নিল। না। কেরাসিন তেলের বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে যেন। এ-সময় এখন এই গন্ধ কোথা থেকে আসছে বুঝতে না পেরে বাসু এ-পাশ ও-পাশ মুখ ফিরিয়ে নাক টানতে লাগল। চাঁদের আলো বাঁকা হয়ে এসে কলঘরের কাছে খানিকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। টিনের দরজাটার সামান্য ওপাশে একটা শাড়ি পড়ে থাকতে দেখল বাসু, নাক টেনে সন্দেহ

হল গন্ধটা ওখান থেকেই আসছে। দু-পা এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়তেই গন্ধ আরো তীব্র হয়ে নাকে এল। বাসু হাত বাড়িয়ে শাড়িটার একপ্রান্ত উঠিয়ে নিয়ে শুঁকল। আরে ব্যাস! কী কেরাসিনের গন্ধ। অল্প অল্প ভেজা শাড়িটা ফেলে দিয়ে বাসু অনুমান করল, অর্ধেকটা শাড়িই বোধ হয় কেরাসিনে ভেজানো হয়েছে। শাড়িটা উমার। বাসু এই শাড়ি চেনে।

উঠোনে বা বারান্দায় কেউ নেই। গিরিজাপতির ঘরে তিনি ঘুমোচ্ছেন। বারান্দায় অন্ধকার। কিছু বুঝতে না পেরে এবং এই কেরাসিন তেলের ব্যাপারটায় কেমন সন্দেহ হওয়ায় বাসু বারান্দায় এল। পা টিপে টিপে উমাদের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নাক টানল। মনে হল গন্ধটা এখানেও কিছু আছে।

বাসু একটু ভাবল। ভেবে দরজায় হাত দিল। খোলা দরজা; ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার. কেরাসিনের বিশ্রী গন্ধ বন্ধ হয়ে আছে বাতাসে। কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাসু কেমন অচেতন এবং ঈষৎ ভীত হয়ে ঘরের সুইচ হাতড়াতে লাগল।

ঘর ফাঁকা। আলোতে বাসু দেখল ঘরে কেউ নেই। কেরাসিন তেলের দুটো বোতল জানলায় বসানো রয়েছে।

বাতি নিবিয়ে বাসু বাইরে এল—বারান্দায় বা উঠোনে কেউ নেই। রান্নাঘরে শেকল তোলা আছে। সদরের দিকটাও দেখে বাসু ভীষণ অবাক হয়ে সিঁড়ি উঠতে লাগল দ্রুত পায়ে।

দোতলায় সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে বাসু উমাকে দেখতে পেল। ভাঙা ফুলের টবের কাছে—আলসের তলায়—একেবারে কোণের দিকটায় পিঠ হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। উঠোনটা চাঁদের আলোয় ভরা।

বাসু বড় বড় পা ফেলে উমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উমা অচেতনের মতন বসে। বাসুকে দেখে একটুও নড়ল না। মুখ মাথা তুলল না পর্যন্ত।

বাসু বিমূঢ়। উত্তেজনায় তার বুক শব্দ করছিল, পা কাঁপছিল সামান্য। 'তুমি এখানে বসে আছ!'

উমা নিরুত্তর। হাঁটু দুটো যেন আরও গুটিয়ে নিল একটু।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাসু কি বলবে না বলবে ভাবল। তারপর বলল, 'নীচে খুব কেরাসিনের গন্ধ। তোমার শাড়িটা—'

উমা অসাড়। মুখ নীচু করে কাঠ হয়ে বসে আছে।

কি ভেবে বাসু উঠোনে উমার সামনে বসে পড়ল। বসে থাকল একটু সময়। উমাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল। উমার হাত পা কোথাও থেকে এখনও কেরাসিনের ফিকে গন্ধ উঠছিল। বাসু গন্ধ শুঁকল, বলল, 'আই বাপ, তুমি কত কেরাসিন ঢেলেছ, গা থেকে গন্ধ আসছে।'

উমা শুনল কথাটা। শুনে আরও ঘাড় মুখ হাঁটুর মধ্যে গুঁজে নিজেকে যেন লুকোবার চেষ্টা করল।

উঠোনটা চাঁদের আলোয় নরম দেখাচ্ছিল। বাতাস আছে এখানে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস। আলসের গা ধরে ধরে সামান্য ছায়ার পাড় পড়ে আছে। উমা নিজেকে গুটিয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল বাসু আর তার মনে হচ্ছিল উমা যেন তার হয়েও কাঁদছে, দু জনের হয়ে।

ফোঁপানো কান্নার শব্দটা এক সময় বাসুকে ভীষণ বিচলিত ও আকুল করল। এই চাঁদের আলোর মতন কোনো বিষণ্নবিশাল বেদনা তাদের চতুষ্পার্শে পড়ে আছে।

বাসু সহ্য করতে পারছিল না, দুঃখ ও কষ্ট তাকে এত কাতর করে তুলছিল যে, এই মুহূর্তে বাসুও তার একার হয়ে পশুর মতন কাঁদতে পারত। আবেগ ও যন্ত্রণা গলার কাছে পুঁটলি হয়ে ঠেলে আসছে।

'তুমি মাইরি ডেন্‌জারাস—' বাসু হালকা করে বলবার চেষ্টা করল, 'কেরাসিন তেল কাপড়ে ঢেলেছিলে।'

উমার ঠোঁট কাঁপছিল, গাল ফুলে ফুলে উঠছিল, চোখ নাক মুছছিল উমা।

'মামলাটা কিসের?' বাসু জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না।' উমা জড়ানো ভাঙা গলায় বলল। বলে মুখ চোখ মুছতে লাগল।

'কিছু না ত মরতে যাচ্ছিলে কেন?'

'জ্বালা জুড়োতে।' উমার গলার স্বর যেন জলে ভিজে ভারী হয়ে আছে।

'আই বাপ্‌...!' বাসু আরও হালকা হবার মতন করে, যেন কচি ছেলেকে ভুলোচ্ছে এমন একটা শব্দ করল বিস্ময়ের, 'আগুনে পুড়লে জ্বালা জুড়োয় নাকি! আমি ত শুনেছি মাংসফাংস পচে গলে দগ্ধে যায়।'

'দগ্ধেই ত যাচ্ছি!' উমা আঁচলের প্রান্তে চিবুক মুছে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকল।

বাসু করুণা এবং মমতা বোধ করছিল। উমা কেন শাড়িতে কেরাসিন ঢেলে মরতে গিয়েছিল সে জানে না, কেন সে মরতে গিয়েও মরতে পারে নি তাও জানে না, তবে বাসু বুঝতে পারছিল এই মেয়েটার ভীষণ দুঃখ। অসহ্য কষ্টে না পড়লে মানুষ কি মরতে যায়। হয়ত বাসুও একদিন মরতে চাইবে। উমার মতন সে কেরাসিন তেল গায়ে ঢালবে না। বিষ খাবে, কিংবা গলায় দড়ি দেবে।

'আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে...' বাসু বলল, বলে সিঁড়িটার দিকে তাকাল, তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল। কি যেন ভাবছিল, দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল। 'কিন্তু মরেই বা কিসের লাট হব। মা বেচারী আরও বুক চাপড়াবে।'

উমা কোনো জবাব দিল না। মরতে গিয়ে তারও একজনের কথা মনে পড়েছে। কাকা। কাকার জন্যে উমা সব গুছিয়ে ঠিক করে নিয়েও দেশলাইয়ের কাঠিটা আর জ্বালতে পারে নি।

বাসু হাত বাড়িয়ে উমার হাঁটু ছুঁল, বলল, 'আমি কাউকে কিছু বলব না, তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি। কিন্তু কাল সকালের আগে কাপড়টা তুমি কেচে ফেল মাইরি। বড্ড গন্ধ। কেমন যেন লাগে।'

উমা বাসুর হাত সরিয়ে দিল না। ওরা দু-জনে চুপচাপ বসে থাকল। চাঁদের আলো ক্রমশ সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল।

চব্বিশ

ট্রাম থেকে দুজনে একই সঙ্গে নেমে পরস্পরকে দেখতে পেলেন। গিরিজাপতি হাত তুলে সৌজন্যোচিত নমস্কার জানালেন। 'কেমন আছেন, ভাল?'

সুচারু প্রতি নমস্কারের বিনিময়ে সবিনীত ভাবে অনেকখানি মাথা নোয়াল। 'ভাল। আপনি কেমন আছেন?'

'এই ত—' গিরিজাপতি অন্যের কুশল জিজ্ঞাসায় স্বাভাবিক সকৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, 'আছি এক রকম। চলুন—' উনি পা বাড়ালেন।

শ্রীনাথ দাস লেনের মুখে দু জনেই ট্রাম থেকে নেমেছেন। গিরিজাপতি বুঝতে পারলেন সুচারু তাঁদের বাড়িতেই যাচ্ছে। ভদ্রলোক প্রায়ই এ-বাড়িতে আসেন। গিরিজাপতির সঙ্গে সেই প্রথম দিনের পর মাঝে আরেক দিন অল্পের জন্যে দেখা হয়েছিল। কথা বলতে পারেন নি।

হাঁটতে হাঁটতে গিরিজাপতি অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আপনি ট্রামে ছিলেন আমি দেখতে পাই নি। যা ভিড়।'

'খুবই ভিড়।' সুচারু সায় দিল, 'ওঠা নামা করাও কষ্ট।' কথাটা বলে সুচারু বুঝতে পারল সে যেন অজ্ঞাতে তার নিজের অসুবিধের কথাই বলল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বৈশাখের শুরু সবে, সারা দিন আজ বেশ গরম গেছে। দুপুর-শেষে অল্প মেঘ করেছিল। গুমোট তাতে বেড়েছে। বিকেলে একটা কালবৈশাখীর আশা ছিল, সে-আশা মরেছে। পিচ পাথরের রাস্তা বাড়ি ঘর দোরের গা থেকে সারা দিনের তাপ ঝাঁঝ হয়ে বাতাসে মিশে আবহাওয়া তপ্ত করে রেখেছিল। গরমে গিরিজাপতির বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মুখ কালো, পোড়া, ক্লান্ত এবং শুকনো দেখাচ্ছিল।

গলিতে সবে বাতি জ্বলল। এর মধ্যেই ঘুঘনিঅলা আর মালাইঅলা জোড় বেঁধে চলে এসেছে। তাদের একজনের হাঁক শোনা যাচ্ছিল, অন্য জনকে দেখা যাচ্ছে অদূরে।

'আজ এক পশলা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেলে ভাল হত।' গিরিজাপতি বললেন, 'গরমটা বেড়েছে'।'

সুচারু হাঁটছিল। গরমে তার কপাল পিঠ ঘামে ভিজে আছে। একটু বাতাস পেলে ঠাণ্ডা লাগে, নয়ত মনে হয় সমস্ত শরীর যেন ক্লেদাক্ত।

'আপনার খুবই কষ্ট হয়।' সুচারু গিরিজাপতির বয়স এবং ক্লান্তির ভাব লক্ষ্য করে বলল।

'তা হয়।' গিরিজাপতি মুখ ফিরিয়ে সুচারুকে একটু দেখলেন, সাধারণ সরল গলায় বললেন, 'বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের সহ্যশক্তি কমে আসে বোধ হয়। এই গরমটা এ-বছরে আর সইতে পারছিলাম না।…দেবু একটা পাখা দিয়ে গেছে। সেটা আবার কানের কাছে বিকট শব্দ করে—' বলে গিরিজাপতি মৃদু হাসলেন।

বাড়ির কাছে এসে পড়েছিলেন দু জনেই। এই সন্ধ্যে বেলায় বিকেলের ডাক বিলি করে পিয়ন চলে যাচ্ছে। বোধ হয় আজ অনেকটা দেরী করে পাড়ায় এসেছে। কোনো বাড়িতে রেডিয়োয় গান হচ্ছিল, ঝিল্লিস্বরের মতন একটি বিচিত্র জনশব্দ ভেসে আসছে।

সদরে পা দিয়ে গিরিজাপতি বললেন, 'আপনি এ-বাড়িতে কখনো কখনো আসেন শুনেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ হয় নি। অসুবিধে না থাকলে নীচে সামান্য বসতেন…'

সুচারু এই উদার সৌজন্য ও অকপট ভদ্রতার কাছে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। সুচারু প্রায়ই এ-বাড়িতে আসে, অথচ ভদ্রলোক বললেন কখনো কখনো; ইচ্ছে করেই বললেন যে সুচারু বুঝতে পারল। হয়ত সুচারুকে বিব্রত না করতে, হয়ত অনুচিত বিবেচনা করেই তিনি সুচারুর আসা-যাওয়ার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালেন না।

'না না—, আমার অসুবিধে কি!' সুচারু বিব্রত স্বরে বলল, এই আশ্চর্য শালীনতার কাছে কেন যেন সে নিজেকে অপরাধী ও লজ্জিত বোধ করছিল। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁকে প্রথম দিন সুমার্জিত সুন্দর সৌজন্যের দ্বারা অভ্যর্থনা করে ওপর থেকে সুধাকে ডেকে দিয়েছিলেন। সুচারুর

উচিত ছিল সৌজন্যের প্রতিদান হিসেবে একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যাওয়া। প্রায় সে এ-বাড়িতে আসে, সুধার কাছে আরতির কাছে নীচের তলার কথাও কিছু না শুনেছে এমন নয়; এঁকে যে ওপর তলার সকলে আত্মীয়ের মতন ভক্তিশ্রদ্ধা করে, এবং দুই পরিবারে একটি অন্তরঙ্গতা আছে সুচারু বুঝতে পেরেছিল। অথচ, সুচারু এ-বাড়িতে আসা যাওয়ার পথে কোনো দিন অল্পের জন্যেও গিরিজাপতির সঙ্গে ভদ্রতাবশে আলাপ করে যায় নি।

সদর দিয়ে গলির মতন ছোটপথটুকু পেরিয়ে গিরিজাপতি বারান্দায় উঠলেন, 'আসুন।' অভ্যর্থনা জানিয়েই তাঁর যেন কি খেয়াল হল, বললেন, 'ওপরে বরং একটা খবর পাঠিয়ে রাখি আপনি নীচে আছেন?'

'না না, কোনো দরকার নেই।' সুচারু সকুণ্ঠ ভাবে মাথা নাড়ল। 'আপনি হাত মুখে জল দিয়ে জামা কাপড় ছাড়ুন, আমি আসছি।'

'বেশ।' গিরিজাপতি স্মিতমুখে বললেন, 'আমি দু পেয়ালা চা করতে বলি, আপনি এলে খাওয়া যাবে।'

সুচারুও হাসল, ঘাড় নাড়ল সম্মতি জানিয়ে।

টেবিল-পাখাটা পুরোনো, কলকব্জার কোথাও ঢিলে আছে; প্রাণপণে পাক খেলে বেপরোয়া গর্জন করে, ধীরে ঘুরলেও বিশ্রী একটা কাতরানির শব্দ। ঝড়ের মতন বাতাস গিরিজাপতির সহ্য হয় না, পাখাটার মুখ সামান্য সরিয়ে তিনি ওটাকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

সুচারুর অপেক্ষা করছিলেন তিনি। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে বসেছিলেন। সন্ধ্যা ঘন হয়ে জানলার বাইরে পথ অন্ধকার হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যেও ভরা সন্ধ্যার ঘনতা অনুভব করা যাচ্ছিল।

সুচারু সম্পর্কে গিরিজাপতির একটি স্বাভাবিক আগ্রহ পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম দর্শনেই মানুষটিকে তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ বলে মনে হয় নি। তাঁর মতন সংযত মিত-আগ্রহী ব্যক্তিও এই অপরিচিত যুবকটিকে

দেখে কেমন বিস্ময় বোধ করেছিলেন। কোনো কোনো আশ্চর্য মুখ আছে যেখানে মানুষের অনুভূত যন্ত্রণা ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়িত মুখের মতন অনাবৃত হয়ে থাকে। সুচারুর মুখে সেই রকম কোনো যন্ত্রণার ছায়া গিরিজাপতি যেন দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই এই মানুষটির আচরণে অনিশ্চয়তা ভীরুতা দ্বিধা গিরিজাপতি লক্ষ্য করেছিলেন। মনে হয়েছিল অস্বাভাবিক কোনো অবসাদ ক্লান্তি ওর মুখে মাখানো আছে। গিরিজাপতি আরও লক্ষ্য করেছিলেন, কোনো গভীর অন্যমনস্কতার ফলে ওর কথাবার্তা ছিন্নসূত্র, দৃষ্টিতে কেমন এক রুগ্ন দুর্বল ভাব, যেন কোনো আগুন নিবে এসেছে, সাদা ছাই দেখা যাচ্ছে।

উমার কাছে পরে তিনি এই ছেলেটির সম্পর্কে কিছু কিছু শুনলেন। সুচারুর সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ আরও বাড়ল। কিন্তু এ-যাবৎ সে সুযোগ আর হয় নি।

ওপরতলার পরিবারের সঙ্গে সুচারুর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও গিরিজাপতি অনুমান করতে পেরেছেন। আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন, উমা যখন সুধার হয়ে সেদিন একটা অনুরোধ জানাল। সুচারুর জন্যে নীচের তলাটা ভাড়া করিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না সুধা জানতে চেয়েছে। বাড়িঅলা সুধাদের ওপর অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট। নতুন ভাড়াটে বসানোর সময় তাদের সুপারিশ বাড়িঅলা শুনবে না। গিরিজাপতি যদি এ-ব্যবস্থা করে দিতে পারেন!

গিরিজাপতির কথাটা এখন আবার মনে হল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কলকাতা ছাড়ার আগে ছোট বড় নানা ব্যাপারে তিনি কিছু ব্যস্ত। প্রেস কবেই ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই পুরোনো ইনসিওরেন্সের এজেন্সির জন্যে আবার কত ঘোরাঘুরি। সময়ও পান নি। একদিন বাড়িঅলা বলাইবাবুর কাছে যেতে হবে।

বিচ্ছিন্ন ও অন্যমনস্কভাবে আরও একটি কাতর চিন্তা তাঁর মনে আসছিল। সুধার ব্যাধির কথা। সুচারু কি জানে?···এই জগতের অনেক বিচিত্র উপহাসের মধ্যে এও একটা—বিড়ম্বিত মানুষের নিভৃত একটি ত্রুটি লাঞ্ছিত

আশাও শেষাবধি পূর্ণ হয় না। গিরিজাপতির হয় নি। হয়ত সুধারও হবে না।···উমার কথা তাঁর মনে পড়েছিল।

সুচারু বাইরে বারান্দায় সাড়া দিল। গিরিজাপতি উঠে দরজার কাছে গেলেন, 'আসুন।'

ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে রেখে সুচারু ঘরে এল। ওপরতলার ঘরের মতনই ছোট, তবু এ-ঘরে সেই চাপা বিবর্ণ ভাব অনেকটা কম। অতখানি দৈন্য এখানে প্রকট নয়। গিরিজাপতির বিছানা, একটা হেলানো কেম্বিসের চেয়ার, বেতের মোড়া, ছোট একটা বেতের টেবিল, একপাশে কিছু মাসিকপত্র, কাগজ, দু' একখানা বই, দেওয়াল-আলনায় গিরিজাপতির জামা কাপড় ঝুলছে।

কেম্বিসের চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন গিরিজাপতি, 'বসুন—।'

সুচারু বসল। গিরিজাপতি নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেন, অতিথি বাতাস পাচ্ছে কি না, বললেন, 'পাখাটা একটু ঘুরিয়ে দেব।'

সুচারু যথেষ্ট বাতাস পাচ্ছিল। মাথা নাড়ল। 'না; বেশ হাওয়া পাচ্ছি, আপনি বসুন।'

গিরিজাপতি বসলেন না। বললেন, 'একটু বসুন, আমাদের চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে আসি, তৈরী আছে।' তাঁর সমাদর ও সুষ্ঠু ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল, সুচারু যেন কত মাননীয় অতিথি।

গিরিজাপতি চলে গেলেন। সুচারু অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের চারপাশ দেখছিল। সুধা এই ঘরে, নীচের তলায়, তাকে আনতে চায়। সুচারু নীচে গিরিজাপতির সঙ্গে আলাপ করতে আসছে শুনে একটু আগে সুধা বলছিল, 'আমি নীচের তলার ভাড়ার জন্যে বলেছি ওঁকে।' সুচারু বিস্মিত বোধ করেছে। এ-বাড়িতে আসার কথা সুধা অবশ্য প্রায়ই বলে, সুচারু শোনে। কোনো স্পষ্ট মতামত জানায় না। বলে, ভেবে দেখি। সুচারুর ভেবে দেখার ওপর কোনো ভরসা না রেখে তার অজান্তেই সুধা-তাকে এখানে টেনে আনছে।

'তুমি কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছ তা হলে।' সুচারু ক্লিষ্ট করে আজ হেসে বলল।

'না রাখলে। ওঁরা শীঘ্রি চলে যাচ্ছেন।···আজকাল বাড়ি পাওয়া যে কী কষ্ট।' সুধা অধিকার-পাওয়া গলায় বলেছিল।

'কিন্তু—'

'কিন্তু কি—?'

'এটা কি ভাল হবে?'

'ভাল হবে না!' সুধা কেমন অবাক চোখে চেয়ে থাকল।

'জানি না। অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে।···মাসিমার কাছে এটা কেমন দেখাবে কে জানে—' সুচারু স্পষ্ট করে তার কথা বলতে পারছিল না। তার কোথায় যেন একটা বড় বাধা আছে, দ্বিধা রয়েছে যা প্রকাশ করা যায় না।

সুধা মন দিয়ে কথাগুলো শুনল কি না বোঝা গেল না। বলল, যেন জেদ করে, কোনো কিছু গ্রাহ্য না করেই বলল, 'নতুন করে কিছু দেখবে না। যা দেখার মা দেখেছে।' একটু থেমে কি ভাবল সুধা, আবার বলল, 'আজ আমি ভাঙা কুলো, কেউ কিছু দেখবে না। যদি বা দেখেই কিছু আসে যায় না।'

সুচারু লক্ষ্য করেছে, সুধা আজকাল এই রকম হয়ে উঠেছে। সুচারু ফিরে আসার পর যেন ওর এতদিনের বঞ্চনার একটা পূরণ-স্পৃহা জেগে উঠেছে। সংসার তার কাছে যত যা নিয়েছে সবকিছুর প্রতিশোধ যেন এমনি করে সে নেবে, নিজেকে কোনো আশ্রয়ে সমর্পণ করে। কিন্তু সুচারু কি সেই আশ্রয়? সুধা অন্তত সেই রকম ভেবে নিয়েছে। সে যেন আজ অনেক নিশ্চিন্ত নিঃসন্দেহ। সুধার এই নির্ভরতা সুচারুকে বিব্রত ব্যথিত করে। সুধাকে একদিন অনেক কথা বলতে হবে। সুচারুর অনেক কথা আছে যা সুধা জানে না, ভাবে না। একদিন···

গিরিজাপতি চা নিয়ে ঘরে এলেন। সুচারু চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হল। সোজা হয়ে বসে সে বাঁ হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, সচেতন হয়ে হাত গুটিয়ে নিল, সঙ্কুচিত হয়ে থাকল।

গিরিজাপতি জানতেন। তিনি কোনো কিছু লক্ষ্য করেন নি, বেতের টেবিলটা টেনে এনে চায়ের কাপ রেখে দিলেন, একটি কাচের প্লেটে কিছু কুচো নিমকি। বললেন, 'গরম আছে, মন্দ লাগে না খেতে।'

নিজের চা আনতে দরজা পর্যন্ত গেলেন। উমা বাইরে চা নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

বিছানায় এসে বসলেন গিরিজাপতি। 'আমার ভাইঝির কাছে· আপনার কথা শুনেছিলাম।...আপনার পুরো নামটি কি?' সহজ শালীন ভাবে গিরিজাপতি আলাপ শুরু করলেন।

সুচারু নাম বলল। গিরিজাপতি নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর দেশ বাড়ির কথা উঠল, আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর। সাধারণ আলাপের প্রত্যেকটি পর্ব শিষ্টাচারের সঙ্গে পালন করে গিরিজাপতি থামলেন। সুচারুর মনে হচ্ছিল, প্রাচীন একটি সামাজিক রীতির এমন সহজ অন্তরঙ্গ পরিচয় সে বোধ হয় কদাচিৎ পেয়েছে এই ভদ্রতা, ভব্যতা, অপরিচিতকে গ্রহণ ও সমাদর করার প্রথাটাই এখন দুর্লভ।

কুচো নিমকি আর চা খেতে খেতে সুচারু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন শুনলাম।'

হাঁ—' মাথা নাড়লেন গিরিজাপতি। কি ভেবে বললেন, 'আপনার ভাড়ার জন্যে ওরা আমায় বলেছে।'

সুচারু নীরব থাকল।

'সময় করে উঠতে পারি নি। একদিন বাড়িঅলার কাছে যাব।'

সুচারু বুঝতে পারল, গিরিজাপতি ধরে নিয়েছেন বাড়িটা সুচারু ভাড়া নিতে চায়।

প্রাথমিক সৌজন্যোচিত আলাপের পর্ব শেষ হয়েছে। গিরিজাপতি চা শেষ করে কাপটি নামিয়ে রাখলেন। আপাতত যেন কেউ কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আরতি বাড়ি ফিরল, সদর থেকে কথা বলতে বলতে আসছে, উমা বোধ হয় সদরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গলিতে বেলফুলের মালা বেচতে আসে একটা বাচ্চা, তার ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে

বাতিটা ঈষৎ ক্ষীণ হয়ে এসে আবার স্বাভাবিক ভাবে জ্বলতে লাগল।

সুচারু সিগারেট বের করে লাইটার জ্বালাচ্ছিল। হঠাৎ যেন গিরিজাপতির সম্পর্কে সচেতন হল। এ-রকম সঙ্কোচ সে বড় একটা অনুভব করে না, তবু শ্বেতকেশ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে, ওঁর নির্মল ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণত্বের মর্যাদা অনুভব করে সঙ্কোচ বোধ করল।

গিরিজাপতি লক্ষ্য করেছিলেন। অনাহত মৃদু হাসি মুখে। বললেন, 'আপনি খান। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

'থাক...পরে...'

'পরে কেন, আপনি খান। তামাক পান নস্যির অভ্যেস বড় সাঙ্ঘাতিক। ঠিক সময় না পেলে মন হাঁসফাঁস করে, তখন আর গল্প করতে ইচ্ছে করে না।' গিরিজাপতি প্রায় বন্ধুজনোচিত গলায় হেসে বললেন।

সুচারু সিগারেট ধরাল। তার কিছুটা আড়ষ্ট লাগছিল।

'বলুন। আপনার কাছে কিছু শুনি –' গিরিজাপতি সুচারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'আমি...! কি বলব!' সুচারু বিস্মিত হল।

'আপনি অনেক দেখলেন। আমরা ত ঘরে বসে থাকলাম। বাইরেটা আর দেখা হল কই।' গিরিজাপতি এমনভাবে বললেন কথাগুলো যেন সুচারুর কাছ থেকে কিছু শুনতে তিনি খুবই আগ্রহী।

সুচারু অপ্রসন্ন বোধ করল। এ-সন্দেহ তার ছিল, গিরিজাপতি তার কাছে সেই যুদ্ধের গল্প শুনতে চাইবেন। সকলেরই কি এই স্বভাব? দেখা হলে একই কৌতূহল, একই রকম আগ্রহ? সুচারু পর পর কয়েক গাল ধোঁয়া ঢোঁক গিলে নিল।

'যুদ্ধের কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।' সুচারুর গলার স্বরে বিরক্তি এবং অসন্তোষ। তার মুখের ভাবও অপ্রসন্ন দেখাচ্ছিল।

গিরিজাপতি মনে মনে বিস্ময় বোধ করলেও সুচারুর বিরক্তি ও অসন্তোষে

বিব্রত এবং লজ্জিত হলেন। অনুতপ্ত গলায় বললেন, 'না—না, যুদ্ধের নয়; আমি ঠিক তা বলি নি।'

সুচারু নীরব থাকল।

গিরিজাপতির কুণ্ঠার শেষ ছিল না। বললেন, 'আমরা আজকাল এমন একটা অবস্থায় রয়েছি যা ভাল করে দেখা যায় না, বোঝাও যায় না।... আপনি অল্প বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বেশী দেখেছেন।...আমি ধারণার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

সিগারেটের ধোঁয়া যেন ফুসফুসে প্রবল ভাবে ঢুকে কেমন ব্যথা দিল। সুচারু কাশল। তার মনে হল, সে অকারণে একটু বেশী বিরক্ত হয়েছে। এখন কেমন অস্বস্তি বোধ করল।

'না, মানে—লোকের ধারণা আমি যুদ্ধ থেকে এসেছি বলে একটা আরব্য উপন্যাস তৈরি করে এনেছি।' সুচারু নিজের অপ্রসন্নতার কারণ বর্ণনা করল যেন। সামান্য চুপ করে থেকে আবার বলল, 'মানুষের কাছে ভূতের গল্পও যেমন মজার, যুদ্ধের গল্পও তেমনি।'

গিরিজাপতি কোনো কথা বললেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যে কোনো কারণেই হোক সুচারু তার যুদ্ধজীবনের ইতিবৃত্ত জানাতে চায় না, পছন্দ করে না।

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল, পরস্পরকে অনুভব করে অথচ নিঃশব্দে।

'আপনি কিছু মনে করবেন না—' সুচারু নিজেই এবার গিরিজাপতির কাছে মার্জনা চাইল। 'যুদ্ধের কথাটা আমি ভুলে থাকতে চাই। সব জিনিস মনে রাখতে নেই, রাখলে কষ্ট।'

'ভুলে যাওয়াও কঠিন।...'

'তবু ভুলে থাকার চেষ্টা করা উচিত।..আমি অনেক কিছু ভুলে গেছি।'

গিরিজাপতি বুঝতে পারলেন সুচারু জোর করে শেষ কথাটা বলল। সে ভোলে নি। ভুললে এ-রকম হত না।

'জগতে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেগুলো ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকে, মানুষ মনে রাখে না।' সুচারু মৃদু গলায় বলল। গিরিজাপতির

দিকে তাকাল ম্লান চোখে, 'আপনাদের জীবনেই একটা যুদ্ধ ঘটেছে। মনে আছে আপনার?'

গিরিজাপতি ভাবলেন। সত্যিই কি মনে আছে? না। যে-সব টুকরো খুচরো ঘটনা বা খবরের কথা এখন অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ছে তাকে মনে পড়া বলে না, কেন না সেই স্মৃতির সঙ্গে তাঁর বর্তমান জীবনের কোথাও যোগ নেই। মহাভারতের যুদ্ধও যেমন কল্পনাকে বশ করে এও তেমনি। সুচারুর কথা তাঁর আশ্চর্য মনে হল, ভাল লাগল। বললেন, 'না, তেমন কিছু মনে নেই।'

'এ যুদ্ধও মানুষ একদিন ভুলে যাবে।' সুচারু বলল।

'এত বড় যুদ্ধ কি ভোলা সহজ?' গিরিজাপতি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। '...তা ছাড়া আগে যুদ্ধের ক্ষতিটা ছিল ছ আনার—এখন ষোল আনার। তখন যুদ্ধ মানুষের জীবন এমন করে ওলট পালট করে দিত না বোধ হয়। কি বলেন আপনি?'

'কেমন করে বলব, আমি জানি না। হয়ত এ-যুদ্ধটা ভুলতে বেশী সময় লাগবে। আমার বিশ্বাস সময় লাগবে কিছুদিন—দশ বিশ তিরিশ বছর···কত সময় লাগবে জানি না। একদিন শেষ পর্যন্ত ভুলে যাব।'

'তারপর?'

'আবার যুদ্ধ হবে।···যদি এটা ষোল আনার ক্ষতি এনে থাকে সেটা আরও বেশী আনবে।' সুচারুর গলার স্বর মুখের ভাব এখন এত পরিবর্তিত যে তাকে অন্য কোন মানুষ বলে মনে হতে পারে। বয়ঃপ্রোজনোচিত সেই কণ্ঠস্বর তাকে প্রবীণ করে তুলেছিল যেন, তার বক্তব্যে নিঃসংশয়ীর দৃঢ়তা। মুখের কয়েকটি কালো দাগ থেকে কালি গড়িয়ে যেন সমস্ত মুখটি মলিন হতাশ করে তুলেছে।

গিরিজাপতি অনুভব করতে পারছিলেন, যে-সুচারুকে অল্প আগে তিনি দেখেছিলেন সেই সুচারু তার আপাতদৃশ্য আবরণ থেকে ক্রমে মুক্ত হয়ে আসছে। মানুষ অজ্ঞানে তার হৃদয় চেতনার বিস্তৃত ও দুর্বোধ্য

জগতে যেমন করে প্রবেশ করে, সুচারু তেমনি ভাবে তার গুপ্ত আত্মবোধের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

'এই যুদ্ধের পরও আবার—' গিরিজাপতি বিশ্বাস করতে পারছিল না; এই যুদ্ধ আজও শেষ হল না। কবে হবে তারই বা নিশ্চয়তা কই। তাঁর ভাল লাগছিল না পরবর্তী আর-এক যুদ্ধ কল্পনা করতে। 'এ যা দেখছি এটা ত কিছু কম নয়। মানুষের পক্ষে অনেক বেশী।' ধীর গলায় তিনি বললেন।

'কমেও যুদ্ধ হয়েছে, বেশীতেও হবে। যতদিন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে যুদ্ধ হবে।'

গিরিজাপতি একাগ্র মনে সুচারুর কথা শুনছিলেন। সুচারু খানিকটা যেন অবহেলা খানিকটা অভ্রান্ত মতামত ঘোষণা করার মতন কথাগুলো বলল। গিরিজাপতির মনে হল, ছেলেটি আগামী সমস্ত যুদ্ধের হিসেব যেন মনে মনে করে ফেলেছে।

'আমরা আজ পর্যন্ত—মাঝে এই-যুদ্ধটা বাঁধার আগে কতকগুলো যুদ্ধ করেছি জানেন? বড় যুদ্ধ—মেজর ওআর, ছোটখাট যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে বলছি, অন্তত পাঁচশ''। আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু খুব একটা ভুল হবে না।...কয়েক শ কয়েক হাজার যুদ্ধের পরও আমরা আবার যুদ্ধ করব।'

'আপনি কি সত্যিই তা মনে করেন?' গিরিজাপতি অবিশ্বাসের গলা করে বললেন।

'করি, আমি মনে করি।'

'তা হলে যুদ্ধটাই মানুষের সভ্যতা?'

'জানি না।...সভ্যতা কবে শুরু হয়েছিল আমি জানি না। যদি মহাভারতের যুগ থেকে হয়ে থাকে, যুদ্ধ দিয়েই শুরু হয়েছিল। সভ্যতা বোধ হয় যুদ্ধ দিয়েই শেষ হবে।'

গিরিজাপতি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন। সুচারুর গলার স্বর যেন যাদুকরের মতন শোনাচ্ছিল। কোনো ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় ও একটি অপ্রাকৃত

অমঙ্গল আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলছে। ছায়ার একটা বড় পাতা সুচারুর মুখের পাশ ঘাড় এবং পিঠের কিছু অংশ ঢেকে আছে।

'আমার মনে হয়—' গিরিজাপতি আচ্ছন্নতার ভাব কাটিয়ে বোধ ফিরে পেলেন, লক্ষ্য করলেন সুচারুকে, বললেন, 'আমার মনে হয়, যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি সর্বনাশ দেখে আমরা একদিন এই পথ থেকে ফিরে আসব। মারামারি কাটা-কাটি অনিষ্ট আমাদের কোনো মঙ্গল করে না।'

সুচারু কয়েক পলক চেয়ে থাকল। উনি শান্ত জগতের স্বপ্ন দেখছেন, সুচারু গিরিজাপতিকে দেখতে দেখতে ভাবছিল, উনি সুখ নিদ্রায় শায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। 'আপনি প্রবীণ লোক, গীতাটীতা পড়েছেন বোধ হয়, আমি পড়ি নি—কিন্তু কয়েকটা শ্লোক জানি। ...সেই যে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যুগে যুগে আসবেন, এও তেমনি, এক এক যুগে এক এক শ্রীকৃষ্ণ-অবতার আসে, বলে, ধর্ম রাজ্য স্থাপন করতে এসেছি আর সেই ছুতোয় অর্জুনরা যুদ্ধ করে।'

গিরিজাপতি হতবাক। এ-ধরনের কথা শুনবেন তিনি হয়ত প্রত্যাশা করেন নি। বললেন, 'আমি সামান্য গীতা পড়েছি। আমি ঈশ্বর বা অবতারে বিশ্বাসী নই। কিন্তু আপনি যে ভাবে বলছেন...'

'আমি একটুও খারাপ ভাবে বলি নি।' সুচারুর কথার মধ্যে বাধা দিল। 'আদর্শ আর মানবতার নাম করেই ঢেউগুলো আসে। পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য বিস্তারের জন্যে সবাই পাগল। এক সময় আমি বোকা ছিলাম, ছেলেমানুষ ছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম জগতে একটা অন্যায় একটা ন্যায় আছে, আমার ধর্ম ন্যায়। এখন তা বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করেন না?' গিরিজাপতি বিস্মিত অথচ শান্ত গলায় বললেন, 'ন্যায় না থাকলে আমাদের বাঁচাটাই ত অর্থহীন হয়ে পড়ে।'

সুচারু জবাব দিল না। আবার একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া টানতে লাগল অন্যমনস্ক ভাবে।

ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল, এ ঘরের বাতাস পুরু হয়ে উঠেছে, আলোর জোর অনেক কমে গেছে। শেডের আড়াল-

পাওয়া আলো স্থির, ছাদ থেকে অন্ধকার দেওয়ালের গা গড়িয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে আছে।

'ন্যায় আছে এ-বিশ্বাসই আমার নেই।' সুচারু নিরাসক্তের মতন বলল। যেন তার আশেপাশে কোথাও এই অদ্ভুত বস্তুটির দেখা সে কখনো পায় নি। উপেক্ষার ধ্বনিটি তার গলার স্বরে বলার ভঙ্গিতে স্পষ্ট।

গিরিজাপতি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অশেষ বিস্ময় এবং কেমন এক বিমূঢ়তা বোধ করছিলেন। ছেলেটি কি বলছে জানে না। জানে না তার কথা অর্থহীন। গিরিজাপতি হঠাৎ কেমন উত্তেজনা অনুভব করতে পারছিলেন। ন্যায়ে বিশ্বাস করে না ও? যা সৎ, যার মধ্যে মঙ্গল তাকে ও অবিশ্বাস করে? নিজেকে সংযত করে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। কখনও কখনও মানুষ উন্মাদের মতন কথা বলে. গিরিজাপতি ভাবলেন, সুচারু নিতান্ত উন্মাদের মতন কথা বলছে।

'ন্যায় না থাকলে কি আছে?' গিরিজাপতি সংযত স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'কিছু না।...যুদ্ধে অনেক সময় দেখেছি রাশ রাশ গোলাগুলি খরচ করে আমরা এমন এক-একটা জায়গা দখল করতাম যেখানে একটিও শত্রু থাকত না। অথচ দখলের আগে আমরা ভাবতাম জায়গাটা শত্রুপক্ষে ভর্তি হয়ে আছে।' সুচারু ম্লান ঠোঁটে হাসল, 'অনুমান আর বাস্তব এক নয়।'

'হ্যাঁ, এক নয়; কিন্তু অনুমান ত আকাশ থেকে পড়ে না।'

'পড়ে—অনেক সময় পড়ে। মানুষ স্বভাবদোষে ভয়ে বা ভক্তিতে অনেক মিথ্যে অনুমান করে নেয়।'

গিরিজাপতি বুঝতে পারছিলেন এই বাক্যালাপ সুচারুকে খুবই অব্যবস্থা-চিত্ত করে তুলেছে। যেন ও মনে মনে এক ভাবছে, মুখে অন্য বলছে। কিংবা ও যা ভাবছে তা এত বিক্ষিপ্ত ও বিবিধ হয়ে মনে এসেছে যা স্পষ্ট করে গুছিয়ে নিতে পারছে না। অকারণ তর্ক করার কোনো আগ্রহও বোধ করছিলেন না গিরিজাপতি। সুচারু কোন কথাটা সঙ্গত বলছে কোনটা

বলছে না এ-বিচার অনাবশ্যক। ও কি বলছে গিরিজাপতির পক্ষে নীরবে শুনে যাওয়া ভাল।

'ন্যায় বলে তবে কিছু নেই ?' গিরিজাপতি পুরোনো কথায় ফিরে গেলেন।

'না।' আমি ত কোথাও ন্যায় দেখছি না।'

'তাহলে মানুষ বাঁচবে কেন ?' গিরিজাপতি স্থিতধীর মতন বললেন।

'অকারণে, না বেঁচে উপায় নেই বলে।' সুচারু দীর্ঘ করে সিগারেটের ধোঁয়া টানল। যেন কোনও অভ্যন্তরের ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করল। অল্প সময় নীরবে এই ক্লান্তি এই আলস্য নিরসনের চেষ্টার পর বলল, 'ন্যায়ের ধারণা আছে বলেই কি মানুষ যুদ্ধ করে! হিটলার স্ট্যালিন চার্চিলদের ন্যায়ের ধারণা আছে বলে আপনি মনে করেন ? লক্ষ লক্ষ লোক রাইফেল আর মেশিনগান নিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রক্তপাত করছে, তাদের কি ন্যায়বোধ আছে ?'

গিরিজাপতি অস্পষ্টভাবে সুচারুর হৃদয় অনুভব করতে পারছিলেন। হতাশা এবং মানসিক আঘাত সম্ভবত ওকে সংসারের সং বোধগুলির ওপর বিতৃষ্ণ অবিশ্বাসী করেছে। কিছুক্ষণ অপলকে তিনি সুচারুর দিকে চেয়ে থাকলেন। সুচারুকে অতি অসহায় ক্লান্ত নিঃসম্পর্ক দেখাচ্ছিল।

'ন্যায়ের বোধ না থাকলে সংসারে বাঁচা যায় না।' গিরিজাপতি মৃদু গলায় ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বললেন, 'এটা ভাল ওটা মন্দ এই জ্ঞান না থাকলে আমরা ত পশু।'

'আমরা পশুর বেশী কিছু নই।' সুচারুর গলায় সহসা যেন এক তাপ এল, মুখ আরও কাল হল, 'আমরা পশু এ-কথা বলতে লজ্জা নাই। কিন্তু আমরা পশুই। হয়ত তার চেয়েও অধম কিছু। কি ভাল, কোনটা মন্দ তার কোনো ঠিক নেই; অবস্থার ওপর নির্ভর করে সব—।' সুচারু সিগারেটের টুকরো চায়ের পেয়ালায় ফেলে দিল, গিরিজাপতির দিকে তাকাল। 'আমি আপনাকে গুলি করে মেরে ফেললে সেটা মন্দ, কিন্তু আমরাই যখন সরকারীভাবে পাইকেরি ঢালাও খুনের হুকুম পাই তখন সেটা ভাল।'

গিরিজাপতি অনুভব করতে পারছিলেন, সুচারুর কথায় এক সত্য আছে যা হৃদয়কে স্পর্শ করে। ন্যায়ের বোধ কি সংসারে বেঁচে আছে আজ? এই যুদ্ধের ডামাডোলে ঘরে বসে বসে তিনি যতটুকু দেখলেন, যা দেখলেন, তা কি ন্যায়ের ফল? কোন্ ন্যায়ে এই অসন্তোষ বিক্ষোভ হত্যা? অনাহার মৃত্যু দুর্ভিক্ষ? কোন নীতিজ্ঞানের বশে পদ-দলন? কোন সংবোধে এই মানুষের সমাজে আজ লোভ-লালসার প্রমত্ততা?

'নীতি ন্যায়—এ-সব ধারণা মানুষের আদপেই হয় নি। বা এর ধারণা কোনো কালেই হবে না।...অনেক ধারণা কেবল কল্পনা হয়ে বেঁচে থাকে, হয়ত এও তাই।' সুচারু বলল।

গিরিজাপতি চঞ্চল হয়ে পড়ছিলেন। কেউ যেন তাঁর নিভৃত কোনো পরম বিশ্বাসকে সুকৌশলে আঘাত করছিল। তাঁর ভাল লাগছিল না। তিনি অব্যক্ত এক বেদনা অনুভব করছিলেন। মনে হল, নিতান্ত নিষ্ঠুর এক উন্মাদ তাঁর লালিত বিশ্বাসকে আঘাত করছে। গিরিজাপতি আহত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সুচারুর দিকে তাকালেন। 'আমি পুরনোকালের মানুষ। ন্যায়নীতি বিশ্বাস করে এসেছি। একালে তার হয়ত দাম নেই। কিন্তু, একালই সব নয়। ভবিষ্যৎ আছে।'

'আপনি ভবিষ্যতের আশা করেন?'

'না করলে বাঁচা কেন!'

'ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। ওটা মনের সান্ত্বনা।...' সুচারু যেন কি ভাবল, বলল, 'একটা কথা মনে পড়ছে, আমিতে একদিন একজন আমেরিকান ছেলে আমায় বলেছিল, সভ্যতা আর পশুত্বের মধ্যে তফাত এই, সভ্য মানুষ বুঝতে পারে সে কখন সর্বস্বান্ত হয়েছে, পশু পারে না। ক্ষতি অনুভব করার পরও যদি মানুষ নিজেকে বাঁচাতে না চায় তবে সে পশুই।... আমার মনে হয়, আমরা নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা আগেও করি নি, এখনও করছি না; কাজেই ভবিষ্যতের আশা বৃথা। ভবিষ্যতেও আমরা পশু থাকব।'

গিরিজাপতি কথা বললেন না। নীরবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

না। ভবিষ্যত বৃথা নয়। তিনি বিশ্বাস করেন না—ভবিষ্যতেও এই বর্বরতা থেকে যাবে।

সুচারু দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল। ঘাড় ব্যথা করছিল সামান্য, ঘাড়ে হাত দিল, মাথার চুলে আঙুল টানল।

'মাঝে মাঝে আমার অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে পড়ে।' সুচারু যেন পরিহাস করার জন্যে বলছে এমনভাবে বলল, 'মানুষের মতিগতি বিচিত্র।... আপনি কি কোনোদিন লক্ষ্য করে দেখেছেন, আমরা যাদের বীর বলি, হিরো বলে পুজো করি তারা এক-একজন সাংঘাতিক খুনে। গ্রেট কিলার্স।'

গিরিজাপতি অন্যমনস্কভাবে কথাটা শুনছিলেন, কথাটা অদ্ভুত বলে যেন সচকিত হলেন, প্রশ্নের চোখে তাকালেন।

'মানুষের সভ্যতার বড় বড় বীররা সকলেই সুদক্ষ খুনে—' সুচারু যেন নিজেকে এবং সমস্ত মানুষকে ভয়ঙ্করভাবে বিদ্রূপ করছে, 'যারা খুনীর ভক্ত, অ্যাড্‌মায়ারারস্ অফ দি কিলার্স তারা যে ন্যায়ের ওপর আস্থা রেখেছে এ-কথা আপনি বলতে পারবেন না।' অপ্রকৃতিস্থর মতন সুচারু হাসল হঠাৎ।

গিরিজাপতি নীরব। তিনি কথাটা ভাবছিলেন। এ-কথা ঠিক আমরা যোদ্ধাকে বীরত্বের আখ্যা দিয়ে থাকি। যে-যোদ্ধা যত কুশলী সাহসী নির্ভয় এবং . এবং গিরিজাপতির অজ্ঞাতেই নির্মম শব্দটা মনে আসছিল সে তত বীর। তিনি কেমন মানসিক বিব্রতি অনুভব করলেন।

সুচারু মেঝেতে পা ঘষছিল। পাখাটা ঝড়ের মতন বাতাস কেটে চলেছে, শব্দ হচ্ছিল। এই শব্দে কান পেতে থাকল সুচারু অল্পক্ষণ, একটি অসাড় ভাব অনুভব করল ভুরুর ওপর, হয়ত কোনো ক্লান্তির দুর্বলতা, হয়ত নিদ্রার স্পর্শ।

'মানুষ বীরত্বকে শ্রদ্ধা করে এজন্যে নয় যে বীরত্বের অর্থ হত্যা।' গিরিজাপতি আবেগপূর্ণ স্বরে ভরা-গলায় বললেন, 'প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের যে জীবনসংগ্রাম, সেই সংগ্রামের আদর্শ বীরের কর্মে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার কারণ সেটা, হত্যা নয়।'

কথাটা স্থচারু শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। কোনো জবাব দিল না। রুমাল বের করে কপালের কাছটা মুছছিল।

গিরিজাপতি অপেক্ষা করে থাকলেন। প্রত্যাশা করছিলেন স্থচারু তাঁর কথার প্রতিবাদ করবে।

'যারা হেরে যায় পারে না তারা তবে অশ্রদ্ধার, উপহাসের?' স্থচারু মুখ ফিরিয়ে গিরিজাপতির দিকে তাকাল।' 'এই তবে আপনাদের সভ্যতা। হেরে-যাওয়াদের জন্যে ঘৃণা অনুকম্পা।'

গিরিজাপতি বুঝতে পারলেন না স্থচারু বলতে চাইছে। তিনি কি এমন কিছু বলেছেন যা অন্যায়, অনাস্য! স্থচারু ভুল বুঝেছে। তিনি কি এমন কথা বলতে চান ন যাতে মনে হতে পারে জীবনের যুদ্ধে পরাজিতদের ঘৃণা এবং অনুকম্পাই প্রাপ্য। 'আমি তা বলি নি—' গিরিজাপতি বললেন, 'আমার কথা হয়ত আপনি খেয়াল করে শোনেন নি।.'

স্থচারু অন্যমনস্ক। গিরিজাপতির কথা সে শুনছে কি না বোঝা গেল না। দেওয়ালের অন্ধকারে শূন্য চোখে তাকিয়েছিল। খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ওকে আরও মলিন রিক্ত দেখাচ্ছিল।

গিরিজাপতি ব্যথিত। স্থচারু বোধ হয় কোনো কারণে নিজের পরাজয়ের ব্যর্থতার সঙ্গে গিরিজাপতির বক্তব্যকে ভুল করে জড়িয়ে নিয়েছে। এই সংসারে আজ ক'জন বিজয়ীবেশে রথ ছুটিয়ে চলেছে? অল্প, খুবই অল্প কয়েকজন হয়ত। অন্যরা পরাজিত। ওপর নীচে আশেপাশে রাস্তায় চারধারে গিরিজাপতি যাদের নিত্য দেখছেন তারা প্রাণান্ত যুদ্ধের পরও জয়ের মুখ দেখে নি। শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের মতন তাদের কেউ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গিরিজাপতি এদের জন্যে সর্বদা ব্যথা ও মমতা বোধ করেছেন।

স্থচারুর তেষ্টা পেয়েছিল। জল চাইল। গলির বাইরে একটা ঝগড়া লেগেছে।

গিরিজাপতি জল আনতে উঠে গেলেন।

স্থচারু ক্লান্তি বোধ করছিল। সমস্ত গরমটা যেন তার শরীর থেকে সার টেনে নিয়ে কষ্টকর এক অবসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই ঘরের দেওয়ালের গা গড়ানো অন্ধকারের মতন এক বিষাদের কুয়াশা তাকে ক্রমশ গ্রাস করছে। সুচারুর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছিল না, ভাল লাগছিল না।

গিরিজাপতি জল নিয়ে এলেন। সুচারু তৃষ্ণার্তের মতন এক নিশ্বাসে জলের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করল।

তারপর অদ্ভুত আশ্চর্য এক নিস্তব্ধতা। গিরিজাপতি কোনো কথা অথবা আলাপের বিষয় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন; ওই যুবকটির সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় আছে—এ-মুহূর্তে যেন তা বোধের অথবা চেতনার মধ্যে ধরা পড়ছে না। সুচারু এখন এত পৃথক, এত সুদূর। ওকে, গিরিজাপতির মনে হল, তিনি যথার্থভাবে অথবা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারেন নি। ও দেবব্রত অথবা নিখিল নয়, ও অবনী নয়। ও পৃথক, স্বতন্ত্র, অন্য এক চরিত্র।

সুচারুর লাইটারের আলো জ্বলল। ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গের আভায় ওর নাকের তলা এবং ঠোঁট দেখা গেল। কাঠের মতন শুকনো হলুদ দেখাল ওখানটায়। সিগারেট ধরাল সুচারু। এবার সে উঠবে।

গিরিজাপতি অনেক দ্বিধার পর মৃদু স্বরে বললেন, 'কোথাও কোনো আশ্বাস না পেলে মানুষের পক্ষে টিঁকে থাকা মুশকিল।...দু-একটা বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।'

'আমার কোনো বিশ্বাস নেই।' সুচারু স্বগতোক্তি মতন বলল, দম-ফুরোনো ক্লান্ত গলায়।

গিরিজাপতি সতর্ক এবং অত্যন্ত মনোযোগে সুচারুকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর ধারণা হল, সুচারু পরিপূর্ণ হতাশায় ডুবে আছে। কখনও কখনও হতাশা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। হয়ত সুচারু সেই শূন্যতার মধ্যে বাস করছে।...গিরিজাপতি সুচারুর জন্যে মমতা বোধ করছিলেন, গভীর গূঢ় বেদনা, সন্তানের প্রতি মানুষ যেমন মমতা অনুভব করে, এবং স্নেহ—অনেকটা সেইরকম। সহসা গিরিজাপতির মনে হল, সুচারুকে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা কি বলবেন? ও বলছিল,

মানুষ তার ক্ষয়-ক্ষতির এবং সর্বনাশের পরও বুঝতে পারে না, সে সর্বস্বান্ত হয়েছে ; বুঝতে পারে না বলেই তার নিবুদ্ধিতা তাকে আরও পশুতুল্য করে তোলে।

কথাটা ঠিক নয়। সভ্যতার ইতিহাস কোনোদিন এ-কথা বলে নি। অব্যবস্থায় অমনোযোগে এবং অযত্নের ফলে যখন বাসস্থান জঙ্গলে আর আগাছায় ভরে ওঠে, তখন কারও না কারও চোখে পড়ে, কেউ না কেউ অনুভব করে এ বাসভূমি জীবনের পক্ষে অযোগ্য। তখন সযত্নে তা পরিচ্ছন্ন করা হয়, বাসযোগ্য করে তোলা হয়।···গিরিজাপতি কি একদিন এমনিভাবে অনুভব করেন নি, তাঁর জীবন অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল ? তিনি কি নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন নি ?

করেছিলেন। তিনি আজও সেই ক্ষতির প্রায়শ্চিত্ত্য করে যাচ্ছেন। হয়ত সমস্ত মানুষকেই একদিন তাদের উন্মত্ততা ও নির্বোধ কর্মের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করতে হবে। কুরুক্ষেত্রের পরও বিবেচনার শোকের একটি অধ্যায় আছে।

সুচারু উঠে দাঁড়াল। চেয়ার ঠেলার শব্দে গিরিজাপতি সজ্ঞান হলেন।

'আজ চলি।' সুচারু বলল।

গিরিজাপতি উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

গায়ে ফতুয়া ছিল। গিরিজাপতি বারান্দায় এলেন। সুচারু জুতো-জোড়ায় পা গলিয়ে নিল।

রাস্তায় নেমে পাশাপাশি হাঁটছিলেন দুজনে। গলিটা ফাঁকা, গ্যাসের মুখ-ঢাকা আলোয় তাঁদের ছায়া তৈরি হচ্ছে, আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। দুজনেই নীরব।

শেষে সুচারু কথা বলল। 'আমরা কি ভাবে যুদ্ধ করতে শিখেছি জানেন ?'

গিরিজাপতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। সুচারুর মুখের রঙ কাল দেখাচ্ছিল, তার দৃষ্টি বোঝা যাচ্ছিল না।

'আমরা সকলেই নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। সকলেই

বলছিলাম, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি। আত্মরক্ষার মাত্রা শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ হয়ে দাঁড়াল। দি প্রসেস্ অফ্ ডিফেন্স লীডস্ টু অফেন্স।...' সুচারু যেন সামান্য পা টেনে হাঁটছিল, গলির রাস্তাটা সুড়ঙ্গের মতন মনে হচ্ছিল গিরিজাপতির, দু পাশের বাড়ি দীর্ঘ প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে তাঁদের দুজনকে এক অদ্ভুত পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। গিরিজাপতির মনে হচ্ছিল, তাঁরা দুজনে—একজন অতীতের এবং একজন বর্তমানের—একজন প্রত্যয়ী বিশ্বাসী অন্যজন অপ্রত্যয়ী অবিশ্বাসী—এই পথ ধরে কোনো অফুরন্ত পথে হেঁটে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, কেউ জানে না, শেষ পর্যন্ত কে এই পথ অতিক্রম করতে পারবে।

'কখনও কখনও আমার মনে হয়, আমরা যদি আর একটু কম আত্মরক্ষার চেষ্টা করতাম, বা না-করতাম ; হয়ত পৃথিবীর অবস্থা এমন হত না।'

গিরিজাপতি সাড়া দিলেন না, কোনো রকম শব্দ করলেন না।

'যখন আমি যুদ্ধে যাই আমার বয়স ছিল অল্প, সাতাশ বোধ হয়। আমি ছেলেমানুষের মতন, মূর্খের মতন আবেগে তাড়িত হয়ে একটা কি যেন দেখতে গিয়েছিলাম।...' সুচারু আত্মমগ্ন, তার গলায় অনুশোচনা ও ব্যর্থতা, 'কেন যে গিয়েছিলাম আমি আজ আর ভেবে পাই না। ..পৃথিবীতে যেন লোকসংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছিল, আমরা খুব তাড়াতাড়ি রাতারাতি এই ভার কমাতে চাইছিলাম। গাড়ি ভর্তি করে বাড়তিদের নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর কাছে ফেলে দিয়েছি।...এইটেই সেরা পথ, সহজ পথ। সভ্যতা বড় অধীর, তার কাজ সে খুব তাড়াতাড়ি করতে চায়।'

গলি পেরিয়ে শ্রীনাথ দাশ লেনের মুখে এসে পড়েছিলেন গিরিজাপতি। রেডিয়োয় এখন একটি গানের সুর শোনা যাচ্ছে।

'কোনো একদিন—' সুচারু হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমার সন্দেহ নেই, আমরা নতুন এক যুদ্ধের সময় বুঝতে পারব, জগতের সমস্ত লোককে যুদ্ধে পাঠানো উচিত। সব মানুষ মরে গেলে সমস্যা আর থাকবে না।'

গিরিজাপতি বলতে চান নি, তবু যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য আগ্রহে বললেন, 'এ-যুদ্ধ আর সে-যুদ্ধের মধ্যে মানুষ কি করে বাঁচবে ?'

'জানি না। আমি জানি না।...হয়ত মূর্খের মতন, পশুর মতন।...মানুষ কবে আর জ্ঞানবানের মত বাঁচে! জীবনের প্রবৃত্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে, ইতর প্রাণীর মতনই সে বাঁচে!...অর্থটর্থ বাজে কথা, জীবনের কোনো অর্থ নেই, বাঁচারও কোনো অর্থ নেই ; আমরা যেহেতু জন্মগ্রহণ করি সেহেতু মৃত্যু পর্যন্ত বাঁচি।'

গিরিজাপতির মনে হল, পথ এখানে কেমন করে যেন শেষ হয়ে গেছে। তিনি সুচারুর সঙ্গে আর হাঁটতে পারছেন না।

একটা ট্রাম আসছে। শব্দ শোনা যাচ্ছিল। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল—' গিরিজাপতি বললেন সৌজন্যোচিত স্বরে, 'আমি চলে যাচ্ছি, নয়ত মাঝে মাঝে দেখাশোনা হত।···আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

সুচারু গিরিজাপতির চোখে চোখ রেখে দু মুহূর্ত তাকাল। বলল, 'আপনার বোধ হয় কষ্ট হল।···কিছু মনে করবেন না।'

গিরিজাপতি কোনো জবাব দিলেন না। সম্ভবত, তিনি কোনো চাপা প্রচ্ছন্ন কষ্ট এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারছিলেন!

পঁচিশ

মধ্যরাত্রে একটি লোকালয় পুড়ছিল। পশ্চিম প্রান্ত রক্তাভ। জ্বলিত অঙ্গারের মতন আকাশ আগ্নেয় রঙ ধরে আছে। ধোঁয়ার স্ফীত কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল না, পর্যাপ্ত অন্ধকারে বন্যার স্রোতের মতন মিশে যাচ্ছিল। বাতাসে দাহের গন্ধ এবং তাপ ভেসে আসছিল। পাখি অথবা পশু আর ডাকছে না, হয় মৃত না হয় পলাতক। নিস্তব্ধ নিশীথ অসহায়ের মতন পুড়ছিল।

'ইট্‌স্ কোয়ায়েট।'

বাতাসের দমকায় উত্তাপের হল্কা ও পোড়া গন্ধ ভেসে এল। ওরা গাছ লতাপাতার মধ্যে মাটি আঁকড়ে শুয়ে আছে।

'ইটস্ কোয়ায়েট নাও।'

'আর ইউ সিওর?'

'ইফ্ ইউ আস্‌ক্ মি, স্যর।'

'অল্ রাইট। কন্‌ডাক্‌ট্ এ ব্যাক্ ওয়াক্, সার্জেন্ট্...। ব্যাক্, আপ দি হিল্।'

গাছের গুঁড়ির পাশ থেকে সুচারু মাথা তুলল। সমস্ত গায় বুনো লতাপাতার গন্ধ। পুরু অন্ধকার চারপাশে। এই অন্ধকারে আঙুল ডোবানো যায়। কোনো কাঁটা-লতায় আঙুল কেটেছে। কপালের তলায় পোকা কামড়েছে। জ্বালা করছিল।

হুকুম শুনতে পেল সুচারু। একটি অদ্ভুত স্বর অন্যের কণ্ঠে দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ানোর মতন হুকুমটা ছুঁইয়ে দিল, পরবর্তী স্বর যেন মশাল হয়ে জ্বলে উঠল, স্বরের মশাল প্রতিধ্বনিত হয়ে হুকুম ছড়াতে লাগল, 'এভরিবডি টু দেয়ার ক্যাম্প...এভরিবডি...'

অন্ধকারে ছায়ার প্রেতের মতন মাটি থেকে ওরা উঠে দাঁড়াচ্ছিল। বুট রাইফেল হেলমেট। কখনও ধাতব, কখনও দেহের, কখনও নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল এতক্ষণে। হামাগুড়ি দেওয়া ইতর সরীসৃপগুলো যেন প্রাণ পেয়েছে, মেরুদণ্ড পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'সার্জেণ্ট ?'

'ইয়েস্, স্যর।'

'আই ওআণ্ট ফাইভ মেন '

'লেট্ মি অ্যারেঞ্জ, স্যর।'

'ও ইয়েস্! পুট দেম্ ওভার দি আপ্ হিল।'

'ফর ওয়াচ, স্যর ?'

'ও সিওর।'

পাঁচজন লোক অন্ধকারেই বাছাই হচ্ছিল।

'হি ইজ এ সান অফ এ বিচ ' অ্যালেক্স বলল।

'এভরিবডি অফ দ্যাট্ র‍্যাঙ্ক ইজ এ সান অফ এ বিচ।' জর্জ শান্ত দার্শনিকের মতন জবাব দিল।

ওরা হাঁটছে। সুচারুর মনে হল সকলেই যেন খোঁড়াচ্ছে। খঞ্জের শোভাযাত্রা। পায়ে জোর নেই, ঘাসের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে চলেছে। আকাশে কি মেঘ আছে ? বৃষ্টি হবে ?

বাছাই পাঁচজনের একজন দাঁড়িয়েছিল। সুচারু তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মূলচাঁদকে অন্ধকারে দেখল।

'আই এক্সপেক্টেড সাম হোর হাউস দেয়ার --' মূলচাঁদের পাশের লোক আগুন-এর দিকটা দেখিয়ে বলল, 'ইয়োলো ব্যাস্টার্ডস হ্যাভ বার্নট দেম। লেট দেয়ার বি সামওআন লিভিং ফর মি ..'

সার্জেণ্টের গলা: কিপ ইওরসেল্ভস অ্যালার্ট·· কিপ্ দি প্রপার স্টেপস্...।

প্রপার স্টেপ স্ ফৌজী কদম কত ? তিরিশ ইঞ্চি কত.. ?

রাত্রির সঙ্গে দিন মিশে গেল। সর্বত্র আলো। গাছের মাথায় সূর্য

ডিমের কুসুমের মতন রঙ ধরে আছে। পাখি ডাকছিল। অজস্র সবুজ পাতার কণায় রোদ পড়ে ঝিকমিক্ করছে।

তিনজনে সেই লোকটাকে বয়ে আনছে। কি নাম ওর সুচারু মনে করতে পারছে না। সকলে অপেক্ষা করে আছে, অ্যালেক্স জর্জ রবার্ট সার্জেন্ট। লোকটা কালকের পাঁচজন পাহারাদারের একজন। লোকটা আক্ষেপ করে বলেছিল, সামনের লোকালয় পুড়ে যাওয়ায় কোনো বেশ্যাখানাও নিশ্চয় পুড়ে গেছে। ও আশা করেছিল, প্রার্থনা করেছিল—ওর জন্যে যেন একটা বেশ্যা অন্তত বেঁচে থাক।

মিনিস্টারী অফ ওআর, প্রোপাগাণ্ডা ডিপার্টমেণ্ট, ফিল্ড ফটোগ্রাফারস। সুচারু সহসা তার দায়িত্ব অনুভব করতে পারল। অ্যাসাইনমেণ্ট উইথ দি ব্রিটিশ ট্রুপ, ...রেজিমেণ্ট, নাইনথ ইউনিট। ছেলেবেলায় জ্যামিতি পরীক্ষার আগে সুচারু সব সময় যেমন থিয়োরেম মুখস্থ করত—টু সাইডস্ অফ এ ট্র্যাংগল্.., মনে মনে সুচারু তার কর্তব্যের তালিকা মুখস্থ করতে লাগল: পিক্চারস্ অফ দি ইনভেসান. পিক্চারস্ অফ দি ক্যাপচারড্ ট্রুপ, অ্যাট্রোসিটি পিকচারস্ অফ লোকাল ওম্যান অ্যাণ্ড চিলড্রেন ডেড্ ফ্রম জাপানীজ বোম্বিং, পিক্চারস্ অফ বার্নট ডিভাসটেটেড হাউসেস্ অ্যাণ্ড পিক্চারস্ অফ আওয়ার মেন ফাইটিং ব্রেভ্‌লি...

সূর্যের রশ্মি প্রখর লাগছিল। একটা সবুজ সাপ ঘাসের উপর দিয়ে সর সর করে চলে যাচ্ছে, তার গায় লাল পোখরাজের মতন লালের ছিট। সাপটা বেশি দূর যেতে পারবে না, কেউ না কে তাকে মেরে ফেলবে।

গাছতলায় মৃতদেহটা ওরা নামিয়ে রাখল। লোকটা বয়স্ক। মাথায় টাক। হাত দুটো খুব লম্বা। মুখটা বুড়ো কুকুরের মতন।

'আর ইউ গোয়িং টু টেক এ পিকচার অফ হিম্?'

'ইয়েস স্যার।'

'কিলড্ ইন অ্যাকশান।' লেফটেনাণ্ট অসাধারণ শান্ত গলায় বলল। 'মেক হিম লুক ব্রেভ।'

প্রয়োজন ছিল না। তবু সুচারু বলল, 'ইয়েস, স্যর।'

সুচারু ক্যামেরার চোখ মৃতদেহের দিকে রাখল। 'এ লো অ্যাঙ্গেল শট অলওয়েজ মেকস্ দি অবজেক্ট লুক বিগ।'

দৃশ্যটা তোলা হয়ে গেল যেন। ক্যামেরার গহ্বরে আবার অন্ধকার। ছবির ফিতে গুটিয়ে ক্যামেরাটা সুচারু আবার সরিয়ে রাখল। তার হাত বিছানার চাদর স্পর্শ করে আছে। বাঁ হাত। ডান হাত অনুভব করতে না পারায় সুচারুর মনে হল, ছবিটা সে তোলে নি, অন্য কেউ তুলেছে। মাথা বরাবর খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসছে। রাস্তার নিস্তব্ধতা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। সর্বত্র ঘুমের স্তব্ধতা। হোটেলের ঘর খুব অচেনা অদ্ভুত লাগছিল তার। এক বিন্দু আলো জ্বলছে না কোথাও। এখানে সে কবে এসেছে সুচারু মনে করতে পারল না।

মৃত লোকটার মুখ মনে করার চেষ্টা করল সুচারু। পারল না। গাছ এবং অন্ধকারের যবনিকার মধ্যে নিতান্ত অসহায়ের মতন শুয়ে থাকল যেন। পোড়া গন্ধ কি এখনও নাকে লাগছে! এই ঘটনা কোথায় ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল সুচারু মনে করতে পারল না। আরাকান পার্বত্য এলাকার কোথাও। গ্রীষ্মের শেষ তখন। হেড কোয়ার্টারের এক টুকরো কাগজ তাকে কোনো মালের মতন স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠাচ্ছিল।...সুচারু আর-একবার সেই মৃতদেহের মুখ মনে করবার চেষ্টা করল এখন। মনে পড়ল না। ওর হাত খুব লম্বা ছিল। যেন কোনো কিছু পাবার জন্যে হাত দুটো যথেষ্ট লম্বা করেছিল। মরার পর ওর হাতে কিছু ছিল না, রাইফেলটাও না।

ধোপারা যেমন করে রাশীকৃত কাপড় ভাটিতে চড়িয়ে দেয় এবং কেচে ফেলে, সুচারু এই ছবি অন্যান্য অজস্র ছবির সঙ্গে অক্লেশে ধুয়ে ফেলল। দ্বিতীয়বার আর সে-ছবি দেখল না। ছবিটার পরিচয় মনে মনে লিখল : হি থট ওআর ইজ এ হোর হাউস।

...

অপরাহ্ণ। ওরা সমুদ্র উপকূলে। সাগরের ফিকে নীল জল অজস্র কাচের চুড়ির মতন চিক চিক করছে। পশ্চিমের দিগন্তে যেন সোনার গুঁড়ো ধুলোর মতন ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেই গুঁড়ো ক্রমাগত এদিকে এগিয়ে আসছে।

সতর্ক ভীত পশুর মতন ছোট জাহাজটা তীরভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দূরান্তে নিষিদ্ধ সীমা। বোয়া ভাসছে ফাতনার মতন। এখানে ঢেউগুলো শান্ত, ছোট। দূরে সাগরের উন্মত্ত ঢেউয়ের চূর্ণ কুয়াশার মতন দিগন্ত আবরিত করে রেখেছে। সুচারু সেঁকা চামড়ার গন্ধ অনুভব করছিল। জাহাজে সৈন্যদের গায়ে এই গন্ধ, সেঁকা নোংরা গন্ধ। এই গন্ধ রুগ্নতা এবং প্রায় মৃত মানুষের কথা মনে পড়ায়। স্বেদ মলমূত্র বারুদে ওদের সর্বাঙ্গ অপরিচ্ছন্ন। ওদের দাঁত বাসি পচা গোমাংসের মতন হলুদ।

ক্ষুদে জাহাজটা ক্রমশ তীর ছুঁয়ে আসছে। প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে জল কেটে পালাচ্ছে। গোধূলি সমাগত, সন্ধ্যের আগে ওকে তীর ছুঁতে হবে। সুচারু ডেকের একপাশে দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বিস্তৃত সমুদ্র গোধূলির আলোয় স্বর্ণ বর্ণ। ঢেউয়ের মাথায় সোনার টোপর যেন।

মাছের মতন দেখাচ্ছিল জিনিসটা, কোনো সামুদ্রিক মৎস্য। অনেকটা কাছে এলে এই মৎস্য মানুষে রূপান্তরিত হল। লাইফ বেল্টের সঙ্গে বাঁধা একটি মানুষ। সৈন্য। ভাসছে। ঢেউয়ের তালে দুলছে, উঠছে নামছে। মুখ দেখা যাচ্ছিল না, ভেজা চুলে মুখ ঢাকা।

হয়ত কাল, হয়ত পরশু এখানে কাছাকাছি কোথাও জাহাজ ডুবি হয়েছে। বোমা বা মাইনের জখম। সমুদ্র সেই বিগত ঘটনা ধুয়ে মুছে শান্ত।

সুচারু নিষ্পলকে দেখছিল। সমুদ্র যেন ক্রমশ সোনার রঙ হারিয়ে একটু লালচে এবং অন্ধকার হয়ে আসছিল। লাইফ বেলটের সঙ্গে বাঁধা লোকটা এখনও ভাসছে।

'ইজ দ্যাট এ ম্যান ফ্লোটিং?'

সুচারুর পাশ দিয়ে দুই ছোকরা নেভি অফিসার যেতে যেতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল।

'এ সোলজার।' বেঁটে মতন অফিসার বলল। 'আর উই গোয়িং টু টেক্ হিম আপ।' 'নো ...' লম্বা মতন অফিসার যেন দ্বিতীয় জনের মূর্খতায় বিস্ময় বোধ করল, 'হি ইজ প্রেটি সোয়ালন, ডেড।'

সুচারু কেমন অস্বস্তি বোধ করল। এক ঝলক পলাতক আলো পড়ে আছে ওখানে। ঢেউয়ের মাথায় উঠে ও যেন ওকে তুলে নিতে বলছিল।

'হি ইজ অফ নো ইউজ টু আস।' লম্বা অফিসারটি রেলিঙ থেকে মাথা সরিয়ে নিল। তারপর তার অধস্তনকে যেন কোনো নীতি কথা শেখাচ্ছে এমন গলায় বলল, 'অফ্ কোর্স ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট বেল্ট, বাট নট দ্যাট পুয়োর সোল এগেইন।'

'ইয়েস, স্যর।'

ওরা চলে গেল। জাহাজ তীর ছুঁয়ে আসছে। জায়গাটা বিপজ্জনক। সূর্য ডুবে গেল।

এই অনন্ত প্রসারিত সমুদ্রে একটি মৃত সৈনিক যৎসামান্য একটি জীবন রক্ষার সরঞ্জাম নিয়ে ভাসছে। সুচারুর কেমন অদ্ভুত এক অনুভব হল।... একটা ছবি নেবে সুচারু? অন্ধকার হয়ে গেছে। অনেকটা উঁচু থেকে নীচের ছবি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেখায়। তাৎপর্যহীন, নগণ্য।

বালিশের পাশে মাথা গড়িয়ে গিয়েছিল সুচারুর। অন্ধকার ঘরে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছিল না। নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। রাস্তায় একটা কুকুর কাঁদছে। কান্নাটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে বুক টেনে টেনে সুচারুর অনুভবের মধ্যে এগিয়ে আসছিল। সমুদ্রের সেই দৃশ্য আজ আবার মনে পড়ছে। মানুষ বোধ হয় এই ভাবেই ভাসছে। সে মৃত, তার প্রাণ কোনো শত্রুর প্রচণ্ড আঘাতে শূন্যগামী হয়েছে, তথাপি সে ভেসে আছে—দেহটা কোনো কিছুতে আশ্রয় করে এই অসীম জলরাশির মধ্যে ভাসছে। কি অর্থ এই ভেসে থাকার!

ভুরুর কাছটায় আঁচড়ানোর মতন জ্বালা ও ব্যথা অনুভব করল সুচারু। দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার সমুদ্রে মৃত সৈনিকটি যেন ভাসতে ভাসতে তার দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে কোথাও অদৃশ্য হল।

নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল সুচারু, যেন স্লিটট্রেঞ্চের মধ্যে শুয়ে আছে। নাকের কাছে বালিশের ওয়াড় খড় কুটোর মতন খস খস

করছিল। ফিস ফিস গলায় কিছু বলতে গিয়ে সুচারুর মনে হল, তার আশে পাশে কেউ কোথাও নেই।

...

দিন। আকাশ মেঘলা, ভয়ঙ্কর মেঘলা। একটানা বৃষ্টি চলেছে ক'দিন। এখানে বর্ষার চেহারা এই রকম। শুরু আছে শেষ নেই। সর্বত্র ভিজে, গাছপালা মাটি, চাঁচের দরমা দেওয়া ব্যারাক। মেঘলার অন্ধকার দিনের আলোয় সর্বক্ষণ মিশ্রিত। মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক এক পশলা বৃষ্টি আসছে, যাচ্ছে, আবার আসছে। বিরাট মাইল তিনেক এলাকা জুড়ে অক্ষৌহিণী বসে আছে। বর্ষায় পথ বন্ধ। আর্মি ব্যারাকের অনেকেই রোগে ভুগছে। ম্যালেরিয়া, আমাশা, পোকার কামড়ে ঘা বিষিয়ে উঠে জ্বর জ্বালা; দুটো কালাজ্বরের ঘটনা ঘটে গেছে। অনেকটা পিছুতে হাসপাতালের ছাউনি, মাঝে মাঝে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এসে দু চার জনকে নিয়ে যায়। পালা করে রুটিন মাফিক মশার তেল ছড়ায় স্যানিটারি থেকে। আর কুইনাইনের বড়ি বিলাচ্ছে মেডিকেল ইউনিট। প্রচণ্ড বর্ষায় ইণ্ডিয়ান আর্মির এই অংশটা এখানে কাদায় পড়া জন্তুর মতন পড়ে আছে।

ওরই মধ্যে ফেটিগ, মার্চ, নাইট মার্চ; খানিকটা দূরে জঙ্গলে যুদ্ধের মহড়া, শেখা জিনিস বার বার রপ্ত করাচ্ছে। ছ সাত ফার্লং দূরে আর্টিলারির হালকা কামানগুলো রবার ক্লথ আর তেরপল চাপা পড়ে রয়েছে।

এরা ফৌজের সেপাই। ফুরসত পেলে তিন মাইল দূরের ছোট শহরটায় পালায়। মদ খায়, মেয়েমানুষ ভোগ করে আসে।

অফিসারস মেসে সুচারু ইণ্ডিয়ান আর্মির অফিসারদের নিত্য জোক শোনে।

'আপনি মশাই বেশ আছেন?' মেডিকেল সার্ভিসের ছোকরা ডাক্তার সান্যাল একদিন বলল 'যুদ্ধে এসেছেন না বেড়াতে এসেছেন বোঝা যায় না।'

'বেড়াতে।' সুচারু সামান্য হাসল।

'আমাদের মেজর ভাদুড়ি আপনাকে কি বললেন জানেন?'

'কি?'

'থাক্ ···নাই বা শুনলেন।···যে কদিন চলে চালিয়ে দিন। ড্রিংক্, ফর ওআন্স ডেড্ ইউ শ্যাল নেভার রিটার্ন।' সান্যাল কথা শেষ করে দু বার শিস দিল। ..'আমাদের হাসপাতালে আসুন, ভাল ছবি দেব। জাস্ট এ লিটল বিট অফ বিউটি। চারটে এদেশী নার্স পেয়েছি মশাই। একটার ব্রিডিং খুব পিকিউলিয়ার, ইণ্ডো-বার্মিজ অ্যাণ্ড শ্যায়ামিজ। দে কেম ফ্রম সম মিশনারি সোর্স। যখন যাবে, দে উইল্ গেট সাম আনমিশনারি চ্যারিটি।' সান্যাল হাসতে লাগল। পশুর মতন। তারপর আবার শিস দিল।

পরের দিন সুচারুকে সান্যাল জোর করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালের বিশ পঁচিশ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে অনেকটা মাটি খুঁড়েছে তিনটে ধাঙড়ে মিলে। খাকি হাফ্ প্যান্ট, খাকি শার্ট। সান্যালকে দেখে মাটি খোঁড়া বন্ধ করে দাঁড়াল। সান্যাল গর্তটা একবার দেখে নিল।

'কি হবে এখানে?' সুচারু সাধারণ ভাবে জানতে চাইল।

'কবর।'

'কবর—?'

'পেট্রল ট্রুপের এক বেটা জখম হয়ে এসে গ্র্যাংগ্রীনে ভুগছে। ছাটস এ ম্যালিগনান্ট...। হি ইজ মেকিং দি হোল হস্‌পিটাল ইনহ্যাবিটেবল্।'

সুচারুর পা পাথর। সান্যালকে বিন্দুমাত্র বিহ্বল বা কাতর দেখাচ্ছিল না। 'গ্যাংগ্রিনের গন্ধে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে, মশাই; হাসপাতালে ঢোকা যায় না।' সান্যাল বলল, 'অন্যরা দিনরাত বমি তুলছে।'

'লোকটাকে জ্যান্ত অবস্থায়—'

'জ্যান্ত! গ্যাংগ্রিনের রুগী আবার জ্যান্ত কি! বেটা বোধহয় খতম হয়ে গেছে।'

সান্যাল পকেট থেকে রুমাল নিয়ে নাক চাপল, যেন হাসপাতালের দিক থেকে বাতাসে গ্যাংগ্রিনের জীবাণু ভেসে আসছে।

'ইট ইজ অ্যান অর্ডার ফ্রম কর্নেল।' সান্যাল বলল। 'তবু তো কর্নেল সাহেব চার মাইল দূরে বড় হাসপাতালে বসে আছেন, গন্ধটা নাকে ঢোকে নি।'

বাঁশের মাচার ওপর খড় চাপানো হাসপাতাল। ফিনাইল আর কার্বোলিক অ্যাসিডের গন্ধে মনে হচ্ছিল এটা বোধ হয় অ্যাসিড তৈরির কারখানা।... একেবারে শেষ প্রান্তে পাতার আড়াল দিয়ে একটা লোককে ফেলে রেখেছে। লোকটা মারা গেছে। গন্ধ আসছে উৎকট।

সুচারুর বমি পাচ্ছিল।

সান্যাল ঘাসের পথ দিয়ে যেতে যেতে বাঁ চোখ একটু টিপল। 'ওই যে মশাই, নথ-এ দেখুন। খাশা চেহারা। এ ভেরী গুড্ ব্রিডিং।' সান্যাল ধীরে ধীরে শিস দিল।...সুচারু পাতার আড়ালটার দিকে তাকিয়েছিল।

খুব স্পষ্ট ফটোগ্রাফের মতন সুচারুর সেই ঘটনা মনে পড়েছে। গ্যাংগ্রিনের গন্ধের মতন একটা দুর্গন্ধ যেন নাকে এল হঠাৎ। নিশ্বাস বন্ধ করে থাকল সুচারু অল্প সময়; বমির ভাব হল সামান্য।

জানলা দিয়ে বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ আনল। মাঝ রাতে কি বৃষ্টি নামবে! আকাশ কি কালো হয়ে গেছে মেঘে মেঘে! সুচারু বিছানা হাতড়াল, সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব।

লাইটারের ক্ষণিক আলোয় বিছানার চাদর একটু সাদা দেখাল, আবার অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস বাইরে। হয়ত বৃষ্টি নামবে।

কোচিনের কোনো অলস শান্ত গ্রাম থেকে একটি নিতান্ত মূর্খ কয়েক হাজার মাইল দূরে গিয়ে কেন যে মরবে সুচারু সেদিন বুঝতে পারে নি। আজও পারল না। বোধ হয়, ওই ছেলেটা জীবনে কোনোদিন একটা গুলি খরচ করারও সুযোগ পায় নি, অথচ মারা গেল। এই মৃত্যুর কি অর্থ?

'ডোন্ট্ আস্ক্ ইন্ আর্মি হোয়াট ইজ হোয়াট।' কোন প্রবীণ অফিসার একদিন বলেছিল, 'দি আর্মি ইজ নট ইনটারেস্টেড ইন ইওর প্রবলেম।'

গ্যাংগ্রিন রুগীর সেই কবর সুচারু মনে করতে পারল। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি চাপা দেবার পর জায়গাটা ভরাট হয়ে গিয়েছিল। তারপর বৃষ্টির জলে সেই মাটি কাদা হল। একদিন কাদা শুকিয়ে গেল রোদে। ওখানে ঘাস হবে। তারও পরে কোনো বুনো লতা কিংবা গাছের চারা পড়ে ঝোপ জঙ্গল বা বৃক্ষ দেখা দেবে। কেউ জানবে না, মাটির তলায় গ্যাংগ্রিনের সার আছে।

এই সভ্যতার কবর খুঁজলে কি পাওয়া যাবে? সুচারুর আজ পুরোপুরি সন্দেহ হল। তার সন্দেহ, এই যুদ্ধের তলা খুঁড়লে মানুষেরই বা কোন মূর্তি দেখা যাবে কেউ জানে না।

হয়ত, সুচারু গলা ভর্তি ক'রে ধোঁয়া টেনে অন্ধকারে আস্তে আস্তে সেই ধোঁয়া মিলিয়ে দিল, ভাবল, হয়ত এই মানব সভ্যতা আমার তোমার ব্যক্তিগত সমস্যার জন্যে মাথা ঘামায় না। আমির মতন। প্রয়োজনে তোমায় ব্যবহার করবে, এবং স্বকার্য সাধন হলে তোমায় কবর দিয়ে দেবে।

সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল সুচারু। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। শব্দ শুনল সুচারু। আকাশে বিদ্যুত চমকাচ্ছে। ধুলো মাটিতে ফোঁটা পড়েছে জলের, মধ্যরাত্রে তার গন্ধ কেমন অদ্ভুত লাগছে। জানলার দিকে মুখ করে সুচারু শুয়ে পড়ল আবার।

...

দুপুর। রাস্তাটা বরাবর উতরাই। খানিক আগে একটা বিরাট কনভয় চলে গেছে। এখন খান চারেক জিপ ছুটে চলেছে। পার্বত্য উপত্যকা। আকাশ রোদে রাঙা। দু'খণ্ড সাদা মেঘ বিশাল গা ছড়িয়ে ভাসছে। চারখানা জিপই ওআর করস্পন্ডেন্ট-যে ভর্তি। সকলেই বিদেশী। আমেরিকান বৃটিশই বেশী একজন চীনে। এদের সঙ্গে চড়িয়ে দিয়েছে সুচারুকে। কোলাহং-এ গিয়ে তিন নম্বর কোম্পানিতে রিপোর্ট করতে হবে। কেন সুচারু জানে না।

জেনারেল স্টিলওয়েল সীমান্ত সফর করে বেড়াচ্ছে। আমেরিকানরা বাঁধ ভাঙা জলের মতন সীমান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। শত উপকরণে বলবান। হয়ত ইনভেসানের ছবি নিতে হবে।

সুচারুর পাশে এক আমেরিকান। সুচারুর প্রায় সমবয়সী। তার বিশাল চেহারার পাশে সুচারুকে নিতান্ত নাবালক মনে হয়। কথা বলছিল লাইটফুট। বলছিল সে এক বছর আগে ইণ্ডিয়ায় এসেছে। বড় বড় জায়গার মধ্যে দিল্লি দেখেছে, আর কলকাতা। কলকাতায় প্রায় দেড় মাস ছিল। দেআর ওআজ এ ফেমিন সাম টাইম এগো। এখনও তার জের চলেছে।

আমি শুনেছি চল্লিশ লক্ষ লোক মারা গেছে তোমাদের দেশে। তোমরা বড পুয়োর। একটা শু বয় আমার জুতো পালিশ করে মাত্র আট আনা নিয়েছিল। তোমরা এত কম চাও কেন? মানুষের চাওয়া কম হলে কোনোদিন ডিগনিটি থাকে না।

'হ্যাভ্ ইউ সিন এ ফ্রণ্ট?'

'নো।' সুচারু মাথা নাড়ল।

ডোন্ট গো টু এ ওআর ফ্রণ্ট।...দে আর লাইক এ রাইজিং ভলক্যানো।' লাইটফুট তাকে বোঝাল, যুদ্ধ সীমান্ত বিস্ফারিত আগ্নেয়গিরির মতন, মানুষের সমস্ত বর্বরতা পাশবিকতাকে তুমি সেখানে নগ্ন চেহারায় দেখতে পাবে। নেভার গো টু এ ফ্রণ্ট, ইট উইল আপসেট ইউ।

সুচারু মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

'লেট্ মি টেল ইউ অনেস্টলি, ওআর করসপনডেণ্টস আর অলওয়েজ এ লাকি ফেলো; দে টেক ডাস্ট অফ দি ফ্রণ্ট, নেভার এ বুলেট।'

আই অ্যাম্ ইন আর্মি ডিরেক্টলি। প্রোপাগাণ্ডা ডিপার্টমেণ্ট।'

'ইজ ছাট এ সিক্রেট সার্ভিস?'

'নো।'

'মেক্ ইট এ সিক্রেট সার্ভিস দেন।' লাইটফুট বিচক্ষণের মতন বলল। সুচারু বুঝল না। লাইটফুট জিপের বাইরে হাত বাড়িয়ে বাতাস পরখ করল। বলল, 'অল দি প্রোপাগাণ্ডস আর মেড ইন সিকরেট। আওয়ার বয়েজ অলঅয়েজ মেক ইট্।'

পথের ঢালু শেষ হয়ে রাস্তাটা সমতলে এসেছে। আদিগন্ত ফাঁকা মাঠ, কিছু গাছ পালা। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে একটা প্লেন অনেক নীচুতে উড়ছিল। অ্যালমিনিয়ামের গায়ে রোদ লেগে ঝকঝক করছে। কনভয় যাচ্ছে বলেই বোধ হয় পথঘাট লক্ষ্য রাখছিল।

'ডু ইউ নো হু হ্যাজ মেড্ দিস ওআর?'

'হিটলার।'

'ও, ক্রাইস্ট! নো। ইট ইজ নট হিটলার। আই হ্যাভ্ এ থিয়োরি

অফ ওআর।' লাইটফুট সিগারেট দিল সুচারুকে। তারপর তার তত্ত্ব বোঝাল যুদ্ধের। রূপকথার গল্প বলছে যেন সেই ভাবে শুরু করল, বিফোর দি বার্থ অফ্ ক্রাইস্ট, বিফোর এ ম্যান অ্যাণ্ড এ ওম্যান ওয়াজ ক্রিয়েটেড্, তারও বহু পূর্বে গ্রীক পৌরাণিক দেবতাদের মতন দুই দেবতা ছিল, একজন বলত আমার প্রখর বুদ্ধি আছে, অন্যজন বলত আমার বিশাল শক্তি আছে। দুজনে দুজনার বন্ধু বলে পরস্পরের দম্ভ শুনত আর হাসত, ঝগড়া করত না। একদিন দু জনেই একটা মেয়ে দেখতে পেল—নিম্ফ, সমুদ্র থেকে উঠেছে। সি ওআজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ্ ডায়না। দুই বন্ধুই পাগল। ঝগড়া বাঁধল। দে কোয়ারল্ড্ ফর সেঞ্চুরিস। অ্যাণ্ড হোয়েন দে ফিনিশড্ দেয়ার কোয়ার্লস···ঝগড়া থামলে দেখল মেয়েটি আবার সমুদ্রে ডুবে গেছে। তখন পরস্পরে পরস্পরকে আবার দায়ী করে শত্রু ভেবে ঝগড়া করতে লাগল। দে হ্যাভ্ নট ইয়েট ফিনিশড দেয়ার লাস্ট কোয়ার্ল।

লাইটফুট তার রূপকথা শেষ করে দূরান্তে একটি গ্রামের দিকে তাকাল। বলল, 'ডোণ্ট গো টু এ ওআর ফ্রণ্ট। ইউ ওণ্ট বি কনটেণ্ট ইফ ইউ গেট এ বুলেট ইন ইওর বলস্।'

জিপের রাস্তায় ট্রাক চাপা পড়া একটি গ্রাম্য লোক রক্ত মাংসের ডেলা হয়ে পড়ে আছে। পাশের মাঠে একটা ট্রাক উলটে পড়ে তখনও জ্বলছে, ধোঁয়া আছে অল্প, ড্রাইভারটার একটা পা একপাশে বেরিয়ে আছে। লাইটফুট বলল, 'আই থিংক হি ইজ এ ব্রিটিশ ব্যাস্টার্ড।'

সিনেমার ছবির মতন এই সন্নিবদ্ধ দৃশ্যগুলি সুচারু কয়েক লহমায় দেখে নিল। হঠাৎ অন্ধকার। কিছু আর মনে পড়ল না। যেন ফিতে কেটে যাওয়ায় পরদায় অন্ধকার ভাসছে।

বৃষ্টি পড়ছে। হোটেলের কোনো কোনো ঘরে ঘুমের মধ্যে নিদ্রিতরা জানলা বন্ধ করছে। মেঘ ডাকছিল। জলো বাতাস আসছে, দু এক মুঠো ছাট। সুচারু বালিশে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকল।··লাইটফুটের গল্প আজ আবার মনে পড়েছে। গল্পটার শেষ ছিল না। শেষ ছিল না বলেই মনে আছে সুচারুর। জলকন্যার মতন যে উঠেছিল, সে আবার অতলে ডুবেছে।

হয়ত এই রূপকের গল্পে একটি কথা বাদ দিয়েছিল লাইটফুট। কোনো দিন সুচারু সেই বর্জিত অংশটুকু জুড়ে নেবে।

...

সুচারুর আর একটি ছেলের কথা মনে পড়ল। জেমস্। আইরিশ। দর্শনের ছাত্র, যুদ্ধে এসে স্মোক-গান ট্রেনার। আশে পাশে কোথাও একটা চার্চ নেই দেখে তার খুব দুঃখ। বলত, জীবনে শান্তি পাওয়ার অন্য পথ খুঁজে না পেয়ে আমরা এই হত্যার পথ নিয়েছি। হত্যায় কোনো গৌরব নেই, ন্যায় নেই। কিন্তু মানুষ বোধ হয় উপায়হীন। ক্যারি মারসি ইন ইওর কার্টিজেস। যে লোক হত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে তার বিবেককে সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে! কিল্ উইথ্ এ সেনস অফ সরো।

তুমি হিংসায় উন্মত্ত হয়ে খুন করলে কি অনিচ্ছায় বেদনায় খুন করলে তাতে কিছু আসে যায় না। যে মরার সে মরে। ওটা তোমার বিবেককে সান্ত্বনা দেওয়া। (ইয়েস, ইট ইজ দি ওনলি ওয়ে ইউ ক্যান মেক ইওর কনসিয়েন্স সাফার।) তুমি জানো না জেমস, আমরা হিন্দুরা তার চেয়েও ভাল যুক্তি তৈরী করে খুনের সাফাই গেয়েছি· আত্মা অবধ্য, তাকে বধ করা যায় না; সকলের দেহেই এক আত্মা। তাই কোনো প্রাণীর জন্যেই দুঃখ করা উচিত নয়। (হোয়ার ডিড্ ইউ গেট ইট?) গীতায় পেয়েছি, জেমস।

বৃষ্টিতে রাত্রের আকাশ বোধ হয় স্ফুরিত। অন্ধকার সর্বাঙ্গে জল মেখে দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্ধকারের কোথাও কি জেমস আছে? একদিন দূরাগত কামানের গোলায় জেমস কয়েকটা চতুষ্পদ প্রাণীর সঙ্গে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তার বিবেক সমেত উধাও হয়েছে। যে লোকটা গোলা দিয়েছিল কামানের গহ্বরে সে জেমসকে জানত না নিশ্চয়, তার গোলার বারুদে ক্ষমা দয়া মায়া কিছু ছিল না। (হি প্রেসেড দি শেল উইদাউট অ্যানি সেন্স অফ সরো, জেমস।)

...

আংশিক ভাবে সুচারু কতক দৃশ্য মনে করতে পারছিল। এই দৃশ্য ধারাবাহিক নয়, সম্পূর্ণ নয়; এর কোনো স্থান কালের ঐক্য ছিল না।

পার্বত্য কোনো স্টেশন। দীর্ঘ সাপের মতন একটা রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্স ট্রেন। বন্ধ কাচের জানলার আড়ালে নীলাভ মৃদু আলো। আহত অফিসারদের নিরাপদ কোনো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরো তিন দিন অ্যাম্বুলেন্স ট্রেন চলেছে, রাত্রে অন্ধকারে।

মাঠ ভরা ধোঁয়ার গাঢ় কুয়াশা। স্মোক ফায়ার। জেমস নেই।

পুরো দু'মাস ধরে এই রাস্তাটা তৈরী হল। বুলড্রেজারগুলো চল্লিশ মাইল পথ তৈরী করে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে একপাশে। আর নতুন রাস্তা ধরে ক্রমাগত কনভয় চলেছে, ক্রমাগত; দিন বা রাত নেই, রাত বা দিন ছিল না।

ট্যাংক আর আর্মার কার। ফ্লোটিং জিপ। কত সহস্র এখানে এসে জমা হল কেউ জানে না। খেলনার মতন হাজার হাজার তৈরী হয়েছে আধুনিকতম কারখানায়।

এবং প্লেন। কত অজস্র হাউই জাহাজ। ভিন্ন ভিন্ন গড়ন। ওটা বোম্বার, ওটা স্পিট ফায়ার, ওটা ফাইটার। ড্রিল করা ছেলেদের মতন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের কিরণে ঝলমল করছে। নদীর বালুচরের মতন শান্ত দেখায় দূর থেকে, চকচক করে। এভরি ম্যান ইন আমেরিকা ইজ মেকিং এ প্লেন। ঠাট্টা করে কে যেন বলেছিল।

পৃথিবী এখন অতি ব্যস্ত। মানব নিধনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্ঝঞ্ঝাট অস্ত্র তৈরী করছে। যেন প্রত্যেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে মারবে।

দুটো আধা বর্মী মেয়ে গুটি দশেক কিশোরী নিয়ে ছোট একটা পতিতালয় খুলেছে ভাঙা প্যাগোডার পাশে। একদিন এক উন্মত্ত নিগ্রো রাইফেল চালিয়ে ছ'টাকে মেরে ফেলল।

বৃটিশ তাঁবুতে এত দিন পরে এনটারটেইনাররা আসছে। দে আর কামিং ক্রস হিলস্। ফ্রেশ গার্লস।

তারপর শীত। শীত শেষে বসন্ত।

•••

সুচারুর কানে কানে কথাটা কে বলেছিল মনে নেই সুচারুর। কেউ

বলেছিল। আমেরিকান স্কোয়াড্রনের একটি ছেলেকে কাল গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। ছেলেটা পাগল হয়ে গিয়েছিল। হি ওয়াজ এ গুড্ গানার। গোধূলির আলোয় জাপানী গেরিলাদের তল্লাসী করতে গিয়ে প্লেনটা খুব নীচুতে নেমে মেশিনগান চালাচ্ছিল। এক দল বাচ্চা ছেলে ভয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছিল। দি গানার টুক এইম্ অ্যাণ্ড কিল্ড্ দেম অল। ওরা নিতান্ত অসহায় গ্রাম্য কয়েকটি শিশু।...তিন বারের বার একেবারে মাঠ ছুঁয়ে প্লেনটা উড়ে যাবার সময় গানার শিশুগুলোর মৃত ছত্রাকার চেহারা স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিল।

প্লেন ফিরে এল। গানার নীচে নামল। তারপর পাগলের মতন অনেকটা ছুটে গিয়ে হঠাৎ এক গার্ডের রাইফেল কেড়ে নিয়ে প্লেনের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। পাগল হয়ে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ অন্য একজন তাকে গুলি করল। দি লেড্ ওয়েন্ট্ স্ট্রেট ইন টু হিজ হার্ট।

লোকটার বিবেক জেগেছিল। সুচারু সেদিন ভেবেছিল লোকটার বিবেক তাকে দংশন করেছিল, আজ ভাবছে এই ক্ষণিক উন্মত্ততা অর্থহীন। পথের পাশে কয়েকটি মেয়ে বুড়ো বা জোয়ান মরে পড়ে থাকলেও গুলির দাম বাড়ত না।

বিবেক অথবা করুণার জন্যে কি যুদ্ধ! ওরা কি কোটি কোটি টাকা খরচ করে তোমায় করুণা বিলোতে এসেছে! এত অজস্র উপাচার দিয়ে কি মানুষের বিবেককে তারা বন্দনা করছে?

বৃষ্টির জলের ছাটে সুচারু একটু কাঁপল। সামান্য শীত করল। কিন্তু এই বর্ষণ তার ভাল লাগছিল।

ন্যায় না থাকলে ভালমন্দ বোধ না থাকলে মানুষ কেন বাঁচবে, কি আশায়! গিরিজাপতির এই সরল সংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে সুচারু এখন শুয়ে শুয়ে উপহাস করল। উনি কিছু জানেন না। অনবহিত বৃদ্ধ। ন্যায় বা নীতি, করুণা অথবা বিবেক এসব আসলে কাল্পনিক দেবদেবীর মতন। দুর্বলে বিশ্বাস করে সবলে উপেক্ষা করে। পৃথিবী এখন অনেক সবল ও সাবালক। আমরা কে না এখন মাসে চারশো ট্যাংক, দুশো প্লেন, তিন হাজার বাজুকা

তৈরী করতে পারি। আমাদের হেভী বোম্বার রোজ দু-চারশো টি এন টি অনায়াসে ফেলে আসতে পারে।

নৃশংস। যদি বল মানুষের উপাস্য কি, তবে এই যুদ্ধ তোমায় তার উপাস্য স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবে। আমি সামান্য কিছু দেখেছি। মনে মনে সুচারু বলল : আমি কিছু দেখেছি। আমি দেখেছি, বিধ্বস্ত শহরের একটি ভাঙা-বাড়ির তলায় চাঁদের আলোয় এক মা তার ছেলের বোমায়-উড়ে-আসা এক টুকরো কাটা পা কোলে নিয়ে বসে আছে ; আমি দেখেছি, ওরা নষ্ট ফলের বাগানে একটি যুবতীকে সেদ্ধ মুরগীর মাংসর মতন ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে উপভোগ করছে, জাপানী গেরিলারা কিশোরী মেয়ের স্তন কেটে মৃতদেহ ফেলে গেছে, অথর্ব বৃদ্ধকে বাঁশের মাচার ওপর বেঁধে স্নাইপাররা ঝোপের পাশে লুকিয়েছে, গ্রাম লুঠ করে পালাবার সময় অবশিষ্ট পাতার আর বাঁশের কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ধানের গোলা পুড়ে তার গন্ধ আমার নাকে কেমন লেগেছে, আমি জানি। আমি আরও দেখেছি, অন্য ছবিও তুলেছি। যুদ্ধের মহাদেশে কোনো ভেদাভেদ নেই, জাপানী অথবা বৃটিশ, আমেরিকান অথবা ইণ্ডিয়ান সব সমান। সাদা হাত, হলুদ হাত, কালো হাত—সব হাতই সমানভাবে রাইফেলের ট্রিগার টেনে দেয়, একইভাবে গ্রেনেড ছোঁড়ে। এ সোলজার ইজ এন অটোমোবাইল দ্যাট ওয়ার্কস্ পারফেক্টলি রাইট হোয়েন দি এঞ্জিন রানস্।

বিবেক! সুচারু বালিশে কপাল মুখ আরও চেপে ধরল, ঠিক যেন এয়ার রেডের সময় মাটিতে কাদায় মুখ চেপে ধরছে। মুখ চেপে ধরে গিরিজাপতিকে মনে করে বলল : এই সভ্যতা বিবেকের ওপর নির্ভর করে বসে নেই। দশ পনেরো হাজার অ্যামুনিশান কারখানা বিবেকের ওপর চলছে না, প্রতিটি মুহূর্তে যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে বিবেকের চাহিদায় না কি! আমাদের কেউই আজ পর্যন্ত বিবেক পুরে দিয়ে একটি যৎসামান্য বুলেট তৈরী করতে পারি নি। অগত্যা বিবেকে কি প্রয়োজন।

একজন বলত : 'ইন এ ওআর ইট স্মেলস্ অব ইউরিন এক্তরিহোয়্যার,

ইন এ ট্রেঞ্চ, ইন এ ক্যাম্প, ইন আওয়ার বেড সীটস। ড্যামড্ সিভিলিজেশন ব্রট এভরিওয়ান হিয়ার ফর ছাট ফিজিকাল পারপাস।'

বৃষ্টির জলে সেই মূত্র গন্ধ যেন ভেসে আসছিল। সুচারুর মনে হল, মানুষের সমস্ত শারীরিক ক্লেদ নিষ্কাশিত হয়ে এই কদর্য গন্ধ বাতাস পূর্ণ করেছে। নিষ্কৃতি নেই।

'ইট স্মেলস অফ ‑ইউরিন এভরিহোয়ার। আই উইল নেভার রিটার্ন টু মাই ক্লীন বেড, অনেস্টলি, আই উইল নেভার '।

...

বৃষ্টি ধরে নি। ফোঁটাগুলো ছোট হয়ে এসেছিল বোধ হয়। মেঘ দূরান্তে মন্দ্রিত হচ্ছিল। শীতার্ত সিক্ত অন্ধকার সুচারুর চেতনাকেও যেন ক্রমশ আচ্ছন্ন ও তন্দ্রাভিভূত করে ফেলছে। সে কি অনেকক্ষণ বিনিদ্র হয়ে শুয়ে নেই? সময় আরও দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। যেন অনেক দিন, অনেক মাস ও বৎসর তার নিদ্রা নেই। মানুষ ভাল করে ঘুমোতে পারল না, এক থেকে আরেক যুদ্ধের ব্যবধানে তার নিদ্রা, এই অর্ধ এবং অতৃপ্ত নিদ্রার পর এই চক্ষুদ্বয় তোমায় দেখতে পায় না। তুমি কে? তুমি পরিণতি। মহাসমুদ্রে যেমন তটরেখা অগোচর, হয়ত এই সভ্যতার পরিণতি তেমনি, অদৃষ্ট অজ্ঞেয়।

সুচারু অবশেষে সেই দুপুর মনে করতে পারল, যখন সে বিচ্ছিন্ন এবং পনেরো বিশ জন সঙ্গী সৈনিকের সঙ্গে একটি গ্রামের উপকণ্ঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথ নিস্তব্ধ শান্ত। বড় বড় গাছের ছায়ায় রৌদ্র শীতল। বুনো পাখি ডাকছিল। বাতাসে বেতবন কোথাও শব্দ তুলছে। যেতে যেতে ··· যেতে যেতে সুচারুর বাংলাদেশের কোনো গ্রামের কথা মনে পড়ছিল, শীতের গ্রাম। আকাশ নীল, গভীর নীল।

মাইল খানেক পথ পার হয়ে একটি মাঠ। মেঠো রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। কিছু হলুদ ফুল একপাশে, আরও দূরান্তে আখের ক্ষেত বোধ হয়।

সুচারুর পাশে নিতান্ত একটা বাচ্চা ছেলে, হয়ত উনিশ বিশ বছর বয়েস। নাম কি কেউ জানে না।

'মাই ফাদার ইজ এ ব্লাইণ্ড ওল্ড ডু ইউ নো ছাট, ফেলো ?'

স্থচারু মাথা নাড়ল, না সে জানে না। তার জানার কথা নয়।

'মাই মাদার ইজ সিক্। শি হ্যাজ ডেভেলাপড অ্যান অ্যালসার।'

স্থচারু নীরব। ওরা সকলেই কিছু অলস ক্লান্ত এবং অগোছালো ভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। সার্জেন্ট বার বার থুতু ফেলছে। অনেক—অনেকটা দূরে মাঝে মাঝে কামান গরজিত হচ্ছিল। আশা করা যাচ্ছিল ওটা মিত্রপক্ষের।

'হ্যাভ ইউ সিন এ বী› ফাইট ?'

'নো।'

'দে অলওয়েজ আর গুড্ ফাইটারস। নম্বার ওয়ান। . দেয়ারস জব ইজ রিস্কি। বাট দে ডোনট গেট এ গুড পে ছান দি ফ্লাইং মেন। ফ্লাইং মেন আর ওয়েলপেড বিকজ দে ওয়েস্ট মোর বোম্বস্।'

আচমকা গগনপ্রান্তে একটি ধ্বনি শোনা গেল। দূরাগত ধ্বনি।

'ছাটস্ এ প্লেন। আওয়ারস।'

সকলেই প্রথমত মনে করেছিল তাদের। অল্প পরেই বোঝা গেল ওটা শত্রুপক্ষের। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রয়ের কোনো জায়গা ছিল না। ওরা সহসা যেন প্রাণভয়ে উধ্বশ্বাসে আক-ক্ষেতের দিকে ছুটছিল। প্লেনটা চিলের মতন ছোঁ দিয়ে নীচে নেমে আসছে। তার যান্ত্রিক গর্জন সমস্ত বাতাস প্রকম্পিত করে নির্মম ভাবে হাসছে। স্থচারুরা ছুটছিল—ছুটছিল, তাদের পায়ের শব্দ আর হৃৎপিণ্ডের শব্দ সমান, জামা বাতাসে উড়ছে। সমস্ত রোদ সেই মুহূর্তে অন্ধকারের চেয়েও দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছিল।

চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূর থেকে প্লেনটা মেশিনগানের গুলি চালাতে শুরু করল। আকের ক্ষেত তখনও অনেকটা দূরে। ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। প্লেনটা যেতে যেতে এক ঝাঁক বুলেটে দুটো প্রাণ নিয়ে গেল—তার মধ্যে সেই ছেলেটা ছিল। অল্প আগে ও আক্ষেপ করছিল, ফ্লাইং মেন আর ওয়েলপেড বিকজ দে ওয়েস্ট মোর ।

প্লেনটা আর-একবার গোলাকার হয়ে ঘুরে তাদের মাথায় নামার আগে স্থচারুরা আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটছিল। মৃতরা পড়ে থাকল, আহত

একজনকেও ফেলে রেখে যেতে হল আরেক দফা গুলি খাওয়ার জন্যে। ওরা সবাই দরদর ঘামছিল। ওদের পায়ে ধুলো উড়ছে। যেন জীবনের আশা মৃত্যুকে ধুলো দিয়ে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে। প্লেনটা পাক খেয়ে ঈগলের মতন নেমে এসেছে। সহসা একজন ফিরে দাঁড়াল, টমি গানের মুখ নিশানা করে দাঁড়িয়ে থাকল। সার্জেন্ট চিৎকার করে উঠল. ইউ ব্যাস্টার্ড ফুল্, টেক ইওর গান অ্যাওয়ে রাইট আউট

লোকটা তার সার্জেন্টের হুকুম অমান্য করল। হয়ত এই প্রথম। ও জানত এ-ভাবে ছুটে ছুটে বাঁচা যাবে না। মাথার ওপর মৃত্যু পাক খাচ্ছে লুব্ধ শকুনির মতন। প্লেনটা ছোঁ মেরে নেমে আসার সময়ও সে মাঠে একা টমি-গান তুলে দাঁড়িয়ে। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

আকের ক্ষেত নয়, অন্য কিছু ক্ষেত। বোধ হয় কোনো ভিন্ন ফসলের। সেই ক্ষেতে শামুকের মতন পেট রেখে বুক টেনে টেনে ওরা ঢুকে পড়েছিল। বার দুই আরও মাথার ওপর পাক খেয়ে মেশিনগান চালিয়ে প্লেনটা চলে গেল। তার বিদায় হাস্য নিষ্ঠুর উপহাসের মতন ধ্বনিত হতে হতে শেষে অশ্রুত হল। ক্ষেতের একান্তে আগুন ধরে গেছে ততক্ষণে।

সুচাকুরা ক্ষেত থেকে বেরিয়ে মাঠে নামল আবার। আকাশে বুঝি রোদ কমে আসছে। দুপুর ফুরিয়ে এল। সর্বত্র এখন শান্ত নিস্তব্ধ। মনে হবে না একটু আগে মৃত্যুর কোনো অনুচর পাহারায় বেরিয়ে প্রাপ্যটুকু আদায় করে নিয়ে গেছে। বরং মনে হবে, এখানেও বাংলাদেশের মতন রোদ, আর রোদের তলায় প্রজাপতি।

হেঁটে হেঁটে বিকেল ফুরলো, গোধূলি হল। ওরা ক্লান্ত। এ পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কেউ জানে না। অবশেষে সেই গ্রামের গাছ-পালা দু চার ঘর বাড়ি এই নির্জনে পরম আশ্রয়ের মতন ডেকে নিচ্ছিল হাতছানি দিয়ে। কিছু ঝোপ, ঝিল আর বাঁশবনের পাশ দিয়ে নিশ্চুপ শান্ত কুঁড়েগুলোর দিকে এগিয়ে আসছিল ওরা। সহসা গুলির ঝাঁক এসে পড়ল সামনে। বাঁশবনের আড়াল পেয়ে ওরা পিছু সরে গেল। বোঝা যাচ্ছিল, এবার তারা শত্রুর মুখোমুখি, সম্ভবত মৃত্যুর। কী আশ্চর্য, মৃত্যু যদি

আয়ত্তাতীত শক্রর মতন মনে না হয় মানুষ বোধ হয় তাকে পরাস্ত করার স্বপ্ন দেখে।...তিনদিক থেকে, চতুর এবং বুদ্ধিমান আক্রমণকারীর মতন, সার্জেন্ট সেই গ্রাম্য দুটি কুটির আক্রমণ করল। রাইফেলের গুলিতে বাঁশবনের মাথায় বসা বাদুড় ও বিহঙ্গ চিৎকার করছিল, কিছুক্ষণ এই গুলির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও ছিল না। কৃষক শ্রেণীর গরীব একটি বৃদ্ধ এবং তিন চারটি মেয়ে মরে পড়ে আছে। একটি জাপানী সৈন্য। প্রায় কিশোর। কাঠের সিঁড়ির তলায় মুখ থুবড়ে রয়েছে। মৃত। মুরগীগুলো তখনও ঝটপট করে উড়ছিল আর দূরে গিয়ে ডাকছিল আর্তস্বরে, উঠোনটায় কত কি ছড়ানো। একটা বাচ্চা মেয়ে, বছর দুয়েকের একপাশে বসে তারস্বরে কাঁদছে।

ওরা ঘর-বাহির ঝোপ ঝাড় সব তন্ন তন্ন করে খুঁজল। জাপানী একটা মেশিনগান চিকের আড়াল থেকে অগ্নিবর্ষণ করে এখন পাকা শয়তানের মতন মুখ বুজে পড়ে আছে।

'দেয়ার আর সাম স্নাইপারস সামহোয়্যার।' সার্জেন্ট বলল, 'উই শ্যাল ওয়েট টিল ডার্কনেস।'

সেই বাচ্চাটা কেঁদে চলেছে এক নাগাড়ে, একটু থেমেছে, আবার কেঁদেছে। এক পাশে তাকে সরিয়ে রেখেছিল কেউ।

তারপর সন্ধ্যা হল, অন্ধকার। চারপাশে মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল। বাতাস না স্নাইপারদের পায়ের শব্দ কে জানে। সুচারুরা আরও অন্ধকার প্রত্যাশা করে বসে থাকল। কেননা অধিক অন্ধকারের পর ম্লান চাঁদ উঠবে আকাশে।

চাঁদ ওঠার সময় এল। এই ঈষৎ আলোয় আবার পথ ঠাওর করে শক্র এড়িয়ে পথ চলতে হবে। ওরা সকলেই সতর্ক, বাতাসে নাক দিয়ে যেন সমস্ত কিছুর ঘ্রাণ নিতে পারছে, রাইফেলের ট্রিগার আঙুলে।

'আর উই গোয়িং টু ক্যারি দি চাইল্ড?'

'নো। সার্জেন্ট জোনাকি দেখছিল। কি ভাবল যেন, বলল, 'প্লেস হার সামহোয়্যার ইন্ হেভেন।'

চাঁদ উঠে এসেছে। বাঁশবনের মাথায় কালো আকাশ নুয়ে আছে।

ওপাশে ক'টা জোনাকি। মেয়েটাকে কেউ বয়ে নিয়ে যাবার নেই। কোথায় বা নিয়ে যাবে।

'সার্জেণ্ট?'

'অ্যানি কোশ্চেন?'

'ক্যান উই নট ক্যারি দি পুয়োর চাইল্ড!' সুচারু ঘামছিল।

'টু হোয়ার?' সার্জেণ্ট তাকাল। যেন প্রশ্নটা এই, আমরা কে কাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারি?

কোথাও নয়। আমরা কিছুই পারি না, কোথাও কাউকে নিয়ে যেতে পারি না।

যাবার সময়, নিতান্ত একটা তুচ্ছ হাঁস বা পাখি মারার মতন করে কে যেন গুলি করল। মাত্র একবার কচি গলা দিয়ে ভীত আর্ত একটি স্বর ফিনকির মতন ফুটে বেরিয়ে আসার আগেই সব আবার নীরব, নিস্তব্ধ। স্বর্গের কোথাও তাকে রাখা হল, তারপর বাঁশবনের মাথায় তারা-ফোটা কালো আকাশ পিছনে রেখে যাত্রা।

সেদিন শেষ রাতে বৃটিশ লাইন ছোঁয়ার আগে সুচারু আহত হল। সাঁতার দেওয়া ছোট রূপালী পাখির মতন জ্যোৎস্নায় একটি জাপানী প্লেন উড়ে এসে এসে বোমা ফেলে গেল

ছাব্বিশ

খাতাটা নতুন। বাংলা বছরের প্রথমে যথারীতি একটি নতুন খাতায় 'নিজের কথা' শুরু করেছিলেন গিরিজাপতি। কিন্তু গত তিন মাসে খুব অল্পই লেখা হয়েছে। পুরোনো খাতাটা তুলে রাখবার সময়ও গিরিজাপতি লক্ষ্য করেছেন শেষের দিকের অনেক পাতাই সাদা থেকে গেছে। সারা শীত মাত্র দু চারটি পাতা লিখতে পেরেছিলেন। অসুস্থতা তাঁকে দীর্ঘ দিন কলম ধরতে দেয় নি।

অবশ্য পরে বছরের অন্তিম পত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর 'নিজের কথা' যেন পাতা ঝরে-যাওয়া বৃক্ষ হয়ে উঠেছে। হয়ত কথা তাঁর ফুরিয়ে এল, হয়ত যে-শিকড় বৃক্ষকে শেষাবধি সজীব রাখার চেষ্টা করছিল, তার মূল শুকিয়ে আসছে, গাছটাও মরে আসছে ক্রমশ।

এখন আর ভাল লাগে না, ক্লান্তি অনুভব করেন। মনে হয় এ-সবই অকারণ। বস্তুত তাঁর কি বা কথা আছে আর। এই বিচিত্র বহুবাক বহু-মস্তিষ্ক জগৎ তাঁর ধারণার অতীতে চলে গেছে। যতদিন নিজের মধ্যে একে অনুভব করতে পেরেছেন দেখতে পেয়েছেন ততদিন ধারণামত বিচার করার চেষ্টা করেছেন। এখন গিরিজাপতি যেন নতুন দেশে আসা আগন্তুক, এই দেশের আচার বিচার ব্যবহার নীতি তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয় না। অগত্যা তিনি প্রায় নীরব, হতবাক।

কিংবা, গিরিজাপতি ভেবে দেখেছেন, কিংবা তাঁর সমস্ত জিজ্ঞাসা যেন পরাস্ত হয়েছে। পৃথিবী যেদিকে ছুটছে গিরিজাপতি তার উলটো পথের মানুষ, তাঁর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। অনেকখানি পথ এদের সঙ্গে হেঁটে এসে আর তিনি পারলেন না। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সব তীর্থযাত্রীই শেষ পর্যন্ত তীর্থে পৌঁছোয় না, মহাপ্রস্থানের পথ সকলেই কি অতিক্রম করতে পেরেছিল।

আজ, প্রায় শব্দ কাল পরে, গিরিজাপতি 'নিজের কথার' পাতা খুলে লিখতে বসেছিলেন। কলকাতার বাড়িতে বসে এই তাঁর শেষ লেখা, পরশু সকালে তিনি আবার ফিরে যাচ্ছেন।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে, জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টি। এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল বিকেলে, সন্ধ্যের দিকে ঝিরঝির করে পড়ছে।

ছাতা মাথায় দেবব্রত এসে হাজির। জুতো প্যান্ট ভিজেছে খানিক। বারান্দায় জুতো খুলে রেখে ঘরে এসে ঢুকল।

গিরিজাপতি পায়ের শব্দ আগেই শুনেছিলেন। খাতা কলম গুটিয়ে রেখে চশমা নামালেন। 'এস দেবু।'

দেবব্রত পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল। বলল, 'ড্রাফটটা রেখে দিন।'

ব্যাংকের ড্রাফট। এই কাজটার ভার তিনি দেবব্রতর ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। খাতার মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট রেখে দিতে দিতে গিরিজাপতি বললেন, 'এর জন্যে ভিজতে ভিজতে এলে। আমি কাল তোমার কাছে যেতাম।'

দেবব্রত চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 'উমা কোথায়?'

'নীচে সাড়া শব্দ পেলে না?'

'না।'

'তবে ওপরে গেছে। আসবে এখুনি।'

দেবব্রত রুমাল দিয়ে মুখ ঘাড় হাত মুছল। ঘড়িটা খুলে মুছে নিল, আবার পরল।

গিরিজাপতি ডেসক্ সামান্য পাশে সরিয়ে রাখলেন। গলিতে আজ অনবরত রিকশা ঢুকছে। ঠুন ঠুন শব্দ কানে আসছে প্রায়ই, কচিৎ মেঘের ক্লান্ত ডাক আকাশের দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। বর্ষা এসে গেল। গিরিজাপতি বললেন, 'আমার ত ভাবনাই হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত না নৌকো ভাড়া করে ফিরতে হয়।' বলে সরল মুখে সামান্য হাসলেন।

'এ বৃষ্টি থাকবে না।' দেবব্রত জবাব দিল। 'নর্থওয়েস্টার।'

'কিছু বলা যায় না—' গিরিজাপতি মাথা নাড়লেন ধীরে, 'হয়ত কাল রাত থেকে তুমুল বর্ষা লাগবে। তোমাদের কলকাতার কথা কিছু বলা যায় না।'

গিরিজাপতি কলকাতায় আসার দিনটির কথা ভাবছিলেন। দুর্যোগের মধ্যেই না এসেছিলেন। বললেন, 'আমি যেদিন কলকাতায় পা দিলাম, বুঝলে দেবু, সে এক ভীষণ অবস্থা। পুরো বর্ষা। এই বাড়িতে এসে ঢুকেছি আধকোমর জল ভেঙে। ঘোড়ার গাড়ি ঢুকতেই চায় না।' জলে ডোবা ফটিক দে লেনের সেই চেহারা যেন মনে করলেন গিরিজাপতি, অল্প সময় চুপ করে থাকলেন, শেষে কি ভেবে বললেন, 'বড় দুর্যোগের মধ্যে এসেছিলাম, কি জানি দুর্যোগের মধ্যেই হয়ত ফিরছি।'

দেবব্রত নিবিষ্ট চোখে গিরিজাপতির দিকে তাকিয়ে থাকিয়ে আজ শেষবারের মতন এই মানুষটিকে দেখছিল। সেই গিরিজাপতি, যাকে স্থিতধী শান্ত সংযত ও প্রাজ্ঞের মতন একদা দেবব্রতর মনে হত এখন যেন আর তা মনে হয় না। মনে হয়, একটি একান্ত বটবৃক্ষ নানা দুর্বিপাকে জলে ঝড়ে আঘাতে ভগ্নদশায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ওঁর স্বাস্থ্য ভেঙেছে, এখন কেমন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতন দেখায়, মুখে পরিশ্রান্ত মানুষের অবসাদ, চোখে কাতরতা, চিবুকে হতাশার মালিন্য রেখা। ওঁর মানসিক শান্তি ও সংযম পালন যেন নিতান্ত অভ্যাসগত। প্রকৃতপক্ষে উনি শান্তি পরিতৃপ্তি অথবা স্থিতি লাভ করতে পারেন নি। এই ব্যক্তিত্বময় বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে দেবব্রত তাঁর হৃদয়স্থ বিচলিত বেদনার্ত একটি সত্তাকে অনুভব করতে পারছিল।

'জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে আপনাদের?' দেবব্রত অন্যমনস্ক স্বরে প্রশ্ন করল।

'কি আর জিনিসপত্র। ও-ঘর প্রায় ফাঁকাই হয়ে গেছে, নিখিল তার জিনিস বইপত্র মেসে নিয়ে গেছে। বাকি যা, কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলেছে উমা। কাল বাঁধা ছাদা শেষ করা যাবে।' গিরিজাপতি নিজের ঘরের জিনিসপত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, 'আজকাল মানুষই গাড়িতে উঠতে পারে না, ত মালপত্র! বয়ে নিয়ে যাওয়া বড় ঝঞ্ঝাট। আমি টুকটাক

কিছু ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি, এ-ঘরের তক্তপোশ আর ক্যাম্বিসের চেয়ারটা রেখে যাব।' গলায় সামান্য শ্লেষ্মা জমেছিল, পরিষ্কার করে নিলেন, বললেন, 'তোমায় সেই যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম, সুচারু, উনিই ভাড়া নিলেন নীচেটা। ওঁর কাজে লাগবে।'

সুচারুর পরিচয় দেবব্রত জেনেছে। গিরিজাপতিই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'জানো দেবু—অদ্ভুত মানুষ ছেলেটি। দোষের মধ্যে ওই যা, একেবারে নিরাশ, ফ্রাস্ট্রেটেড যাকে বলে আর কি। আলাপ হলে তোমার ভাল লাগবে। অনেক কথা বলে যা খুবই খাঁটি।'

'নিখিলের মেসটা কোথায়?' দেবব্রত শুধলো।

'কলেজ রো-তে। ঠিকানা তোমায় দিয়ে যাব।' সামান্য থেমে কি ভাবলেন যেন, দেবব্রতর চোখে চোখে তাকালেন, 'ওকে একটু দেখ। কলকাতায় আমার ভরসা বলতে তুমি।'

একদা নিখিলকে যথেষ্ট স্নেহ করেছে দেবব্রত। ক্রমে সেই স্নেহ কেমন বিরক্তি আর অসন্তোষে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। নিখিলকে দেখার কিছু নেই। সে সাবালক স্বাধীন আজকাল। দেবব্রত নিজের বিরক্তি প্রকাশ করল না, চুপ করে থাকল।

অল্প সময় কোনো কথা হল না। দু'জনেই নীরব। গিরিজাপতি অন্যমনস্ক ভাবে 'নিজের কথা'র বাঁধানো খাতাটার ওপর হাত বোলালেন, ডেস্ক থেকে কাগজের পুরিয়া তুলে একটা লবঙ্গ মুখে দিলেন। দেবব্রতও চুপ করে বসে থাকল, দরজার দিকে তাকিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছিল।

'কাল ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে প্রেসে গিয়েছিলাম।' গিরিজাপতি হঠাৎ যেন কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলছে এমন গলা করে বললেন, 'মিহির সুকিয়া স্ট্রীটে একটা বাড়ি কিনবে, তারই বায়না দিচ্ছিল। আমায় দেখে বলল, গিরিজাদা শুভসময়ে এসেছেন আপনি। চলুন বাড়িটা আপনাকে দেখিয়ে আনি।' কথা শেষ করে থামলেন উনি, চুপ করে থাকলেন সামান্য, নিশ্বাস ফেললেন, 'আমি অবশ্য গেলাম না। সময় ছিল না।...তাই ভাবছি, দেবু—'

'কত টাকা দিয়ে বাড়ি কিনছে ?' দেবব্রত উপহাসের মতন গলা করে বলল।

'তা জানি না।' মাথা নাড়লেন গিরিজাপতি। তারপর যেন যুক্তি দেখানোর মতন করে বললেন, 'টাকার লোভ ওর সব গুণ নষ্ট করল। আমি ওর অনেক গুণ দেখেছি, পরিশ্রমী বুদ্ধিমান আপদবিপদ সহ্য করার ক্ষমতা বন্ধুপ্রীতি—'

'আপনি শুধু গুণই দেখেন।' বাধা দিয়ে দেবব্রত বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'দোষ আর কবে দেখলেন ? দেখলেন না বলেই একটা লোক চোখের ওপর দু'বচ্ছর ধরে চুরি জোচ্চুরি করে গেল।'

দেবব্রতর অসন্তোষ ও গলার উত্তাপ অনুভব করে গিরিজাপতি কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। ইতস্তত করে বললেন, 'তুমি আমায় অযথা দুষছ কেন। আমি কি তাকে আটকাতে পারতাম '

'পারতেন না, কিন্তু লোকটা আপনার ভালমানুষি আর বিশ্বাস চুরি করে কার্যোদ্ধার করেছে।'

গিরিজাপতি দেবব্রতর অবিবেচনায় মনে মনে পীড়িত হলেন বোধ হয়। বললেন, 'আমায় দিয়ে কার্যোদ্ধার করেছে এ কথাটা ঠিক নয়। আমার অজ্ঞাতে যা করার সে করেছে, আমি ওকে বিশ্বাস করতাম বলে শেষ পর্যন্ত অন্যের কথায় কান দিই নি।'

'এখন লোকটা ফুল ফ্লেজেড্ ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার।' দেবব্রত ঘৃণার স্বরে বলল।

কথাটা সঙ্গত, গিরিজাপতি নীরব থাকলেন। শুধু ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার বললে অবশ্য কিছু বলা হয় না। সরকারী কাগজ লুকিয়ে বেচে মিহির তার পুঁজি যোগাড় করেছে, কিন্তু অর্থের সেই নালা নদী হয়েছে অন্য ভাবে : আর তার মধ্যে জোচ্চুরি, প্রবঞ্চনা, অসৎ উপায়, ব্যবসায়িক বুদ্ধি, আরও অনেক কিছু আছে। সরকারী গুদোম থেকে আসা কাগজ আর অর্ডার কোনোটাই হিসেব মত ছাপা হয় নি, ডেলিভারীও দেওয়া হয় নি, গিয়েছে পাঁচ হাজার —সরকারী দপ্তরে জমা হয়েছে পনের হাজার, কনট্রাকটের টাকা ভাগাভাগি

হয়েছে কনট্রোলার আর মিহিরের মধ্যে স্টোরের কর্তাকে বখরা দিয়ে। তার পর ওরা পাঁচ সমান দরের লোক মিলে খুলেছে ট্রেডিং করপোরেশন লিমিটেড, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের—মানে অন্যের কষ্টার্জিত গচ্ছিতের টাকায় ব্যবসা করে গেছে ট্রেডিং করপোরেশান, কাপড় ধরেছে গাঁট গাঁট, বাইরে জমি ধরেছে নামমাত্র মূল্যে, সাফসুফ করিয়ে চারগুণ দামে বেচেছে, মেশিনারীর লাইসেন্স বেচেছে অন্যকে চড়া দরে, এমন কি শেষ পর্যন্ত চালের ব্ল্যাক মার্কেটেও হাত বাড়িয়েছে। .এক লাফে কোনোদিন মাচায় চড়া যায় না, মিহিরের মতন বিত্তহীন ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি সিঁড়ি বিচার বিবেচনা করে লাভক্ষতি তলিয়ে দেখে আস্তে আস্তে ধাপ ধাপ করে উঠতে হয়েছে। এ-কথা অবশ্য সত্যি মিহিররা যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মতন এই যুদ্ধের বাজারের প্রতিটি সুযোগ নিয়েছে। বাস্তবিক মিহির ধুরন্ধর এবং চতুরের মতন প্রত্যেকটি দিকে নজর রেখে আজ মাচার কাছাকাছি উঠে এসেছে।

'নিজের কথা'য় গিরিজাপতি মিহিরদের সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা লিখেছেন, লিখেছেন মানুষের চরিত্র বড় অদ্ভুত, তার সকাল দেখে সন্ধ্যে চেনা যায় না। কার মনে কোন কুবৃত্তি লুকিয়ে লুকিয়ে সদ্‌বৃত্তিগুলোকে আঁচড়ে তুলে ফেলছে বোঝা যায় না। এক সময় যৌবনে যে মিহির চিত্ত ছিল স্বদেশসেবক,আদর্শবান বলে যাদের মনে হত, দেশের কাজের জন্যে নিত্য দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সয়েছে আজ তারা দল বেঁধে দেশের মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে, তারা প্রবঞ্চক অর্থলোলুপ হৃদয়হীন ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। ঢালা হাতে অসৎ কাজ করে চলেছে এরা, বিন্দুমাত্র বিবেকবোধ দংশন করছে না। এই লোভার্ত প্রবঞ্চকদের দেখে মনে হয় না, কোনো কালে এরা সত্যিই মানুষের আদর্শ নীতি স্বদেশ—কোনো কিছুই প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল।

নিশ্বাস ফেললেন গিরিজাপতি, দীর্ঘ নিশ্বাস। ঘরের ম্লান আলো যেন তাঁর মনের চারপাশ ম্লানতর করে রেখেছিল। জানলার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'দেবু, আমি নিজে সৎ সাধারণ থাকতে চেয়েছি চিরকাল। ওদের অসৎ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে আমি বেঁচেছি।'

'বেঁচেছেন, তবে ওপর ওপর।'

গিরিজাপতি মুখ ফিরিয়ে দেবব্রতকে দেখলেন। কথাটা কি সত্য? তিনি কি ওই বিষচক্র থেকে একেবারে অক্ষত হয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন! ওরা কি গিরিজাপতির মনে ছুরির ফলা দিয়ে অনেক কষ্টকর দাগ কেটে দেয় নি! মিহিরদের মতন মানুষ দেখে আজ তাঁর সরল বিশ্বাসী নীতিশীল মনে কি কোনো প্রতিক্রিয়া আসে নি? গিরিজাপতি শূন্য চোখে ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, 'নিজের কথা'য় তিনি যা লিখেছেন তা সত্য: যুদ্ধের লোকক্ষয় লক্ষ লক্ষ, কিন্তু এই যুদ্ধে মানুষের নীতিক্ষয় কোটি কোটি। যে পশুত্ব থেকে সভ্যতা ক্রমশ জেগে উঠেছিল, নীতিক্ষয় তাকে আবার অনেক পিছুতে ঠেলে দিয়েছে। কষ্টার্জিত ন্যায় এবং সৎ বোধ আজ মানুষের হৃদয়ে মরে গেল। এই চরম ক্ষতির পরিণাম মানুষ ভবিষ্যতে হয়ত অনুভব করতে পারবে।

কি ভেবে সহসা গিরিজাপতি দেবব্রতর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিষণ্ণ ম্লান হাসলেন, 'জানো দেবু, মিহিরের অফিসে গান্ধী নেহরুর বড বড় ছবি দেখলাম নতুন। খুব দাম দিয়ে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে।'

দেবব্রত কিছু বলল না।

'কংগ্রেসের শামিয়ানা মিহিরদের মতন লোকই আবার দাঁড করাবে বোধ হয়। আমার সে-রকম মনে হচ্ছে কেন যেন।'

অসম্ভব নয়! দেবব্রত স্বীকার করল মনে মনে, অসম্ভব নয়। জগতে সর্বত্র কিছু সুবিধাবাদী থাকে। আজ এরা যে-ভাবে ঘুষ দিয়ে মদ খাইয়ে মেয়ে-ছেলের খরচা জুগিয়ে কনট্রাকট লাইসেন্স পারমিট যোগাড় করেছে কাল এরাই সেই ভাবে কংগ্রেসের ভক্ত কর্মী হবে পরবর্তী সুযোগের জন্যে। কংগ্রেস বলে কথা নয়, লীগ কমিউনিস্ট হিন্দু মহাসভা যে দলই ক্ষমতা পাবার আশা রাখবে ওরা সেই দলে গিয়ে ভিড়বে। সবে য়ুরোপের যুদ্ধ থেমেছে—কিন্তু এখন থেকেই এরা হাঁ করে বসে আছে কোন রন্ধ্র দিয়ে কংগ্রেসে ঢুকবে।

গিরিজাপতি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। উদাস গলায় বললেন, 'দেবু, আজ যারা মুঠোয় করে ধুলো তুলেছে আর দেখেছে সেই ধুলো সোনা হয়ে গেছে তারা এর পর কি করবে? স্বভাব বদলাতে পারবে?

দেবব্রত জবাব দিল না কথায়। ভাবছিল। এ-ভাবনা তাকেও মাঝে মাঝে চিন্তিত করে। আজ যারা সর্বরকমে অসৎ হয়েছে, প্রত্যাশার বহু অতিরিক্ত পেয়েছে কাল কি তারা সৎ হবে, অতিরিক্ত না পেলে সন্তুষ্ট হবে?

'গভর্নমেন্টের অ্যাডমিনেস্ট্রেশনের ওপর নির্ভর করছে সব।' দেবব্রত বলল, 'যদি শাসন শক্ত হয় চোর জোচ্চোরের মতন এরাও শায়েস্তা হবে।'

গিরিজাপতি কথাটার যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করলেও সেই শক্ত সরকারের অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেন না। কিছু ভাবছিলেন, বললেন, 'যুদ্ধের ফাঁপা বাজারে এই যে নতুন মানি-মেকস তৈরী হয়ে উঠল এরা দিনে দিনে একটা ভিসাস সার্কেল তৈরি করবে। নানাদিক থেকে এরা হবে দেশের সমস্যা। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এরা রোগটা সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে দেবে।'

আশ্চর্য নয়, গিরিজাপতি যা বলেছেন তা অসম্ভব নয়, তবু দেবব্রত বিশ্বাস করতে পারল না সমাজে বরাবরের মত এটা স্থায়ী থাকবে। বলল, 'কেন, রোগটা প্রতিরোধও হতে পারে।'

'না—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন গিরিজাপতি, 'প্রতিরোধ হবে না। হবে না কেন জান? বাইরের শাসন দিয়ে চিত্ত সংশোধন হয় না। মানুষ আজ নীতিতে বিশ্বাস করে না, সৎ অসৎ বিবেচনা করে না। নৈতিক বোধ না থাকলে মানুষের মন শোধরায় না।'

'দুর্নীতি দারিদ্র্যের জন্যে।' দেবব্রত অসতর্ক ভাবে বলল।

'তোমার কথাটা নিখিলদের কথার মতন হল।' গিরিজাপতি শান্ত গলায় বললেন, 'আমি ওটা বিশ্বাস করি না। মিহির যখন পয়সার মুখ দেখল প্রথম তখন সে সেই পয়সা নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল ভাবে থাকতে পারত না? আমি তার অনেস্ট ইনকামের কথা বলছি। বল, পারত কি না?'

'পারত।' দেবব্রত স্বীকার করল।

'পারত, অথচ সে ওতে সুখী হল না। সে আরও চাইল, তারপর আরও। খেতে পরতে না পেয়ে যেমন অনেকে চোর হয়, খেতে পরতে পেলেও অনেকে চোর হয়। যারা আজ টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটেছে

এদের কি ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার উপায় ছিল না, কপর্দকহীন মানুষ ত ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার বা হোর্ডার হতে পারে না।' একটু যেন দম নিলেন গিরিজাপতি, বললেন, 'দারিদ্র্য থেকে দুর্নীতি আসে—কিন্তু সমস্ত দুর্নীতির মূল দারিদ্র্য এ-কথা মিথ্যে। · তোমার কথা ধরো দেবু, আমি তোমায় চিনি—' কথাটা বলতে গিয়ে গিরিজাপতির সহসা আবেগ এল, গলার স্বর কেঁপে গেল, 'তুমি ডাক্তারী কর; তোমার অর্ধেক রুগী আমাদের মতন, তোমার রোজগার খুবই সাধারণ; কই তুমি ত তাতে অসুখী হয়ে অর্থ রোজগারের চেষ্টায় জাল ওষুধ ভুয়ো ইনজেকশন বেচ না।'

দেবব্রত আড়ষ্ট হল, সঙ্কোচ বোধ করল। কথাটা হালকা করার জন্যে হেসে বলল, 'কে বলল আমি সুখী?...পয়সা করাটা কপাল। আমার ঠিক হচ্ছে না।'

গিরিজাপতি কান দিলেন না। কথা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, ভেতরের আবেগ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করছিল। বললেন, 'চোখের সামনে আরও একটা উদাহরণ রয়েছে। এ-বাড়ির ওপরতলার কথা ভেবে দেখ। সুধা। আজকের দিনে ওই মেয়েটিকে দেখে কি মনে হয় বল। ওদের দারিদ্র্য কি কম! আমি অনেক সময় সুধার কথা ভাবি। কী দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে, কই আজ পর্যন্ত কখনও একটু বেচাল দেখলাম না। অথচ তুমি জান, কলকাতা শহরের আবহাওয়াটা আজকাল বাড়ির চাকরি করা মেয়েদের পক্ষে কী খারাপ!'

দেবব্রত স্বীকার করল। সুধার সততা সম্পর্কে একটি দাগও সে টানতে পারে না। মানুষকে অন্তত সেটুকু চিনতে শিখেছে দেবব্রত।

'ভালো কথা—' দেবব্রত বলল, 'আপনি ওর মাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে দেখুন না।'

'কি?'

'ওঁর কিছুদিন বাইরে গিয়ে থাকা উচিত। যদি বাঁচতে চায়।' দেবব্রত উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'আমি অনেক বলেছি। ফল হল না।...এই সব কেস্ বড় অদ্ভুত। হয়ত পাঁচ সাত দশ বছর এই ভাবেই থেকে গেল, আবার হয়ত দু

তিন মাস এক বছরের মধ্যে ডিটোরিয়েট করে গেল। কিছু জোর করে বলা যায় না।'

মনোযোগ এবং সবেদনায় গিরিজাপতি দেবব্রতর কথা শুনছিলেন। তাঁর কাতর মুখে অক্ষমের শীর্ণ রেখা পড়েছে। বললেন, 'তুমি আগেও বলেছ, দেবু। নিজেই জানো ওদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়—।'

সম্ভব নয় দেবব্রত জানে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে সে বোধ হয় মাঝে মাঝে অন্য উপায় না দেখে কথাটা বলে। তার চিকিৎসা অনেকটা 'উপকার' দিয়েছে বলেই বোধ হয়। হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল দেবব্রত।

'আরতির চাকরি এখন ওদের ভরসা। ছেলেটাকে ত দেখেছ, অপদার্থ বকে যাওয়া। বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দু মাস রাখবে সে সামর্থ্য ওদের কই!' গিরিজাপতি নিশ্বাস ফেললেন।

দেবব্রত কেন যেন, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ওপর ক্ষোভ ও আক্রোশ বোধ করে বলল, 'তাহলে আর আমরা কি করব, নাইন্টি পার্সেন্ট কেসই এই রকম। যত্ন পরিশ্রম করে যদি বা কাউকে একটু ভাল করি এত নিঃস্ব আমাদের অবস্থা, বাকি প্রয়োজনগুলো মেটানো যায় না।...হাওয়ার সঙ্গে লড়াই।'

গিরিজাপতি নীরব থাকলেন। সুধার জন্যে বহু দিন মনে মনে তাঁর একটি বেদনা বোধ ছিল। মেয়েটিকে তিনি অনেক সময় শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তার প্রবল অহংকার সম্মান ও শুচিতা নষ্ট হতে দেয় নি।...সুচারুর কথা তাঁর মনে হল। ব্যাপারটা কোথায় যেন অস্পষ্ট হয়ে আছে। সুচারুকে যতদূর বুঝতে পেরেছেন গিরিজাপতি তাতে মনে হয় না, ও-রকম নিরাশাবাদী সর্বরিক্ত ছেলে সুধার সঙ্গে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

চিন্তাটা আনুমানিক এবং তাঁর সবিস্তার ভাবনার যোগ্য নয় মনে করে গিরিজাপতি যেন চিন্তার পল্লবিত লতাটিকে কেটে দিলেন। কী ভেবে বললেন, 'আমি ঠিক জানি না। তবে পরে একবার তুমি সুধাকে বুঝিয়ে বলো। যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারে।' বলে দু মুহূর্ত থেমে কি যেন মনে

হল, 'আর একটা ব্যবস্থা হতে পারে, আমি হেতমপুরে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসি, মাস খানেক দেড়েক, তারপর আমার ওখানে ও যেতে পারে…'

দেবব্রত স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল। এত সাধারণ সরল ভাবে এই প্রস্তাব তিনি করলেন যেন এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আমরা যাকে উদারতা বলি, এ নিশ্চয় তেমন উদারতা; কিন্তু গিরিজাপতির ঔদার্য প্রকাশের বিন্দুমাত্র ভঙ্গি ছিল না, আত্মতৃপ্তির ভাব ছিল না। দেবব্রতর মনে হল, গিরিজাপতি স্বাভাবিক কর্তব্যকে যেভাবে গ্রহণ করেন, অবিকল সেভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। উনি, দেবব্রত নিঃসন্দেহ হল, উনি মনে করেন এটাও যেন তাঁর কর্তব্য।

দেবব্রত অন্যমনস্ক হল। এই বোধ কি তার আছে? চিকিৎসক হিসেবে সে বিবেচক, তার নীতি আছে; কিন্তু মানুষ হিসেবে? আছে, কিন্তু গিরিজাপতির মতন নয়। উদারতাকে সে মমতা অথবা করুণা কি সহানুভূতি হিসেবে দেখেছে।

'একটা কথা আজ আপনাকে জিজ্ঞেস করব—'দেবব্রত অন্য মানুষের মতন, যেন সে কোনো আদালতে বিবাদী পক্ষকে শেষ কথা জিজ্ঞেস করছে, প্রশ্ন করল 'আচ্ছা এও কি আপনার কর্তব্য? কর্তব্য আপনি কাকে বলেন?'

গিরিজাপতি আচমকা এই রকম একটা প্রশ্ন শুনবেন আশা করেন নি; অপ্রত্যাশিত দুরূহ প্রশ্নে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সামান্য সময় লাগল। বললেন, 'তুমি একটা বড় বেয়াড়া প্রশ্ন করলে, দেবু।'

দেবব্রত অপেক্ষা করতে লাগল।

'জন্ম কি, মৃত্যু কি—'গিরিজাপতি ভেবে ভেবে আস্তে বলছিলেন, 'সৎ কি সুন্দর কি এই সব প্রশ্নের মতন কর্তব্য কি এও একটা বেয়াড়া প্রশ্ন। এদের একটা সহজ জবাব আছে, আবার খুব জটিল ব্যাখ্যাও আছে। আমি বাপু সে সব ভাল বুঝি না, জানিও না।' গিরিজাপতি অল্প সময় থামলেন, তাঁর পরবর্তী কথা গুছিয়ে নিলেন, বললেন, 'কর্তব্য বলতে আমি বুঝি মানুষের নিজের পূর্ণতা অনুভব।…মানুষ যখন জন্মায় সে কাদার তালের মতন, পদার্থ কিন্তু আকারহীন। যেমন করে কুমোর মাটির তাল কাজে লাগিয়ে তাকে

আকার দেয়, ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলে, তেমনি আমাদের জীবনকে, আমরা একটা আকার দেবার চেষ্টা করি। কর্তব্য বোধ হয় সেই আকার দেবার পন্থা।'

দেবব্রত কি ভাবল, বলল, 'নিজেদের পূর্ণতা সমাজের পূর্ণতা না'ও হতে পারে।

'যদি না হয় তবে সে-পূর্ণতা নিজের পূর্ণতাও নয়।'

'আপনি ত উগ্র ব্যক্তিত্ববাদী, সমাজের নকশার মধ্যে ঢুকতে হলে অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিত্ব কি নষ্ট হয় না?'

'হয়ত হয়, কিন্তু সেটা ত্রুটিহীন সমাজ নয় বলেই।..আমাদের যৌবনে পড়েছিলাম, পারফেক্ট সোসাইটি অ্যাণ্ড পারফেক্ট হিউম্যানবিইং নেভার কোলাইডস। কথাটা আমি আজও বিশ্বাস করি।'

'তেমন সমাজ এখনও আদর্শ। গান্ধীজী—'

'গান্ধীজীকে টানার কোনো দরকার নেই, দেবু। তোমার আমার কথা আমরাই বলি।' গিরিজাপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'আদর্শ সমাজ জগতে হয়ত নেই, পূর্ণ হয়ে বিকাশ লাভ করেছে এমন মানুষও হয়ত পাবে না। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আদর্শ ছাড়া মানুষ এগুতে পারে না। আমাদের এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যই ত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া।'

'এতে সুখ আছে?'

'কি বল তুমি, সুখ নেই! সৎ হওয়ার আনন্দ আছে এই আনন্দেই তুমি সুখী।'

দেবব্রত নীরব। ঘরের আবহাওয়ায় আশ্চর্য এক আত্মবিমগ্নতা ও প্রশান্তি যেন। সমস্ত বাস্তবতার অতীতে কোথাও একটা ইন্দ্রিয়াতীত আবেগ সঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

দেবব্রত আর কোনো কথা বলল না। তার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কখনও কখনও সামনে বসে থাকার চেয়ে চোখের আড়ালে সরে গেলে আরও ভাল লাগে। এখানে আপাতত বসে থেকে আবহাওয়া আরও বিষণ্ণ

করে তুলতে তার ইচ্ছে করছিল না। সামান্য ইতস্তত করে দেবব্রত উঠল। 'উমার সঙ্গে দুটো গল্প করে আসি—' দেবব্রত বলল, বলে পা বাড়াল।

'নেমেছে ও ?'

'মনে হচ্ছে। সাড়া শব্দ পাচ্ছি।' দেবব্রত জবাব দিল। বাইরে চলে গেল আস্তে আস্তে।

গিরিজাপতি দরজার দিকে তাকিয়ে যেন চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেবব্রতর সঙ্গে অনেকটা হেঁটে গেলেন, তারপর থামলেন, দেবব্রত চলে গেল।

সে দিন আরও রাত্রে গিরিজাপতি তাঁর 'নিজের কথা'য় লিখছিলেন:

"আজ যাবার সময় দেবু বলল, আপনি যতই চেপে রাখার চেষ্টা করুন, জানি আপনি অনেক দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা আপনাকে কেউ একটু শান্তি দিতে পারলাম না।

আমি যে অনেক দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি এ-কথা সত্যি। কিন্তু সব দোষ আমি দেবুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই নি। ওকে আগেই কথাচ্ছলে বলেছি, তোমাদের আমি সাধ্যমত বোঝার চেষ্টা করেছি, দেবু; যদি না পেরে থাকি সে আমার স্বভাবের দোষ; বুদ্ধির, চোখের দোষ। কিন্তু আমি একেবারে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি না।

এই যুগটার সব মন্দ এমন কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তেমন যদি ধরি তবে আমাদের কালের মিহির বা চিত্ত এরাও কি প্রশংসার যোগ্য ? মাঝে মাঝে বরং আমার মনে হয়েছে, এ-কালের মানুষ যদি আমাদের মিহিরদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, আপনারা খুব আদর্শবাদী আর নীতিবাগিশ বলে গুজব ছিল—আপনারাও আমাদের মতন অসৎ। সুবিধে সুযোগ পেলে আমরা যা করছি আপনারাও করতেন।

সৎ এবং এবং অসৎ-এর বিচার পাইকারি ভাবে হয় না। হওয়া উচিত নয়। আমরা অবশ্য যুগের মোটামুটি একটা চরিত্র বিচার করি। সেটা সম্ভব। প্রতিটি ঋতু যেমন তার বিশেষ চেহারাটি স্পষ্ট করে তুলে নিজের

স্বভাবটি জানায়, প্রত্যেক যুগেরই তেমনি স্বতন্ত্র একটি চেহারা ফুটে ওঠে। এই যুগের সেই চরিত্র আমি বোঝার চেষ্টা করেছি।

যুদ্ধ মাথায় করে এই যে যুগটি চলেছে তার চেহারা আমার তেমন ভাল লাগে নি। আমার স্বভাব মন এ-কালের সঙ্গে খাপ খেল না বলেই হয়ত ভাল লাগল না।

আমার যতটুকু ধ্যান ধারণা তাতে জানি, মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে, একটা তার বাইরের দিক, অন্যটা ভেতরের। সংসার সমাজের জন্যে আমরা যে জীবনটা ধারণ করি তা বাইরের, ভেতরের জীবন মানুষের বড় ব্যক্তিগত ও গভীর। ধর্মশাস্ত্রে একটা সহজ তুলনা দিয়ে জিনিসটি বোঝান হয়েছে। তাতে বলেছে, গাছের ফল শুধু অন্যের ভক্ষণের জন্যে নয়, পৃথিবীকে ফলবান করে রাখার জন্যেও। ফলবান বৃক্ষের এইটিই ধর্ম। মানুষের জীবনও তেমনি, তার এক জীবন সংসার ও সমাজকে দান করতে হবে, অন্য জীবন এই বৃহৎ মানব চৈতন্যের প্রবাহকে সজীব করে রাখবে। আমি এই দুটি জীবনই বিশ্বাস করেছি।

এ-কালে মানুষ কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করতে চায় না। সুচারু যা বলেছে তাতে মনে হয়, প্রকৃতির খেয়ালে মানুষ জন্মলাভ করছে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতে হবে, এর বেশী জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার কথা থেকে মনে হয়, বেঁচে থাকাটা যেন আমাদের দায়, কেউ বাঁচতে বাধ্য করছে।

আমি সেকেলে লোক; আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সামান্য। জীবনকে আমরা এ-ভাবে দেখি নি। আমরা জানি, জীবনকে ধারণ করতে হয়। মানুষ মাত্রেই জীবন পায়, কিন্তু যে-মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না সে জীবন ধারণের অযোগ্য। সমাজ ও সংসারের জন্যে বেঁচে থেকে আমরা এই জীবন ধারণ করতে পারি। অন্যের পরিতৃপ্তি সুখ ও আনন্দের মধ্যে আমাদের যথাসাধ্য ব্যয় করতে হবে, সাংসারিক জীবন ধারণের এই ত পথ। গভীরতম যে জীবন ধারণ, যাকে আত্মার ব্যাপ্তি বলে তার ধারণা আমার আজও স্পষ্ট করে হয় নি। পূর্ণ জীবনের মধ্যে প্রবেশ করাই বোধ হয় তার ধর্ম।

এ-কালের মানুষ জীবনকে ধারণ করতে চায় না। আমি যখন বলি জীবন ধারণ তখন স্পষ্টই বুঝি কতক নীতি ও নিয়মের মধ্যে জীবনকে ধরে রাখা। জীবনের মধ্যে অনেক প্রবৃত্তি আছে, ক্ষয় আছে, শনি আছে, যা মানুষকে পশুত্বের পথে নিয়ে যেতে চায়। নীতি ও নিয়ম দিয়ে আমরা সেগুলোকে আগলে রাখি। সৎ অসৎ বোধ, ন্যায় অন্যায়, বিবেচনা, বিবেক, কর্তব্য এ-সবই শুধু ওই কারণে, জীবনকে পশুত্বের হাত থেকে ধরে রাখতে।

আজকের দিনে মানুষ জীবন ধারণ করতে চায় না, ভোগ লোভ আত্মপরতা তার মনকে এমন করে গ্রাস করেছে যে, সে বেঁচে থাকার মধ্যে তার আসক্তিকে শুধু মেটাতে চায়। এমন জীবন যা হয়, অবিশ্বাসী আদর্শহীন নীতিহীন। তার কোনো শুভ বোধে আস্থা নেই, ভরসাও না।

কেন এমন হল আমি জানি না। কিন্তু এই কষ্টের দিনে আপদকালে দেখলাম তার ভেতরের সব ব্যাধি প্রকট হয়ে উঠল। লোভে লালসায় এরা মত্ত হল, ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির জন্যে এরা কুকুরের মতন ঝগড়া করছে, স্বার্থের বোধ এদের স্বৈরাচরী করে তুলেছে।

এই কলকাতার চেহারা দেখে আমি মাঝে মাঝে এ-দেশের কথা ভাবি। দুধ উথলে উঠে পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে ভীষণ ভাবে, কেউ সেদিকে মন দিচ্ছে না, আর কড়ার দুধ পুড়ে ধরে যাচ্ছে। হয়ত একদিন আমরা স্বাধীনতা পাব, কিন্তু তখন কি পাব কেউ কি জোর করে বলতে পারি। দুধের পোড়া কড়ায় জল মিশিয়ে তখন হয়ত সান্ত্বনা পেতে হবে।

আমার জীবনে এত বড় অপচয় দেখব, এ আমি ভাবি নি। দেবুকে বাদ দিলে আর সবই আমার কাছে অপচয় বলে মনে হয়। মিহির, অবনী, বাসু, সুধা, নিখিল, সুচারু,...সমস্তই আজ এক না এক ভাবে মানবতার অপচয়। এরা কেউ চোর হয়ে কেউ ভীরু দুঃখবাদী হয়ে, কেউ বুদ্ধিহীন পশু হয়ে, কেউ সমাজের অবিচার আর মার খেয়ে বেঁচে আছে। নিখিলকে আমি ছেড়ে দিয়েছি কারণ সে এমন দিনেও কোনো আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। একদিন সে ঘা খাবে হয়ত। কিন্তু জীবনেই মানুষকে তার নিজের শিক্ষা পেতে হয়। সে পাবে।

দেবুকে আমি যে বলেছি,"আমি একেবারে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি না, সে-কথা সত্যি। দেবু সুধা এরা আজ সংখ্যায় নগন্য। তবু এরাই আমার সান্ত্বনা, এদের হাতে আমাদের সৎ গুণগুলো বেঁচে রয়েছে এখনও।

সুচারু ছেলেটির সঙ্গে আমার পরিচয় সবচেয়ে কম। আমি ওর অন্তরটি দেখবার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। একটা কথা বলি, আমার বার বার মনে হচ্ছে, ও হৃদয়ের দিক থেকে বোধ হয় সবার চেয়ে বড়। আমরা ব্যক্তি থেকে বিচার বিবেচনা করি, সে সমষ্টি থেকে করেছে। সে মানুষের ধর্ম ও শুভ বোধের ওপর অনেক বেশী আস্থাবান ছিল বলেই এ রক্তক্ষয় ও প্রাণক্ষয় থেকে জীবনের মূল্য খুঁজতে গিয়েছিল। হতাশ ও অবিশ্বাসী হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু তার হতাশা অবিশ্বাস ব্যর্থতার কারণ; বিশ্বাসহীনতার জন্যে নয়। কারও যদি পাঁচটি সন্তান পর পর মারা যায়, যে অন্য দুটি সন্তান সম্পর্কে হতাশ হয় অনিশ্চয় হয়, মৃত্যুর ওপর ভাগ্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—কিন্তু যদি জীবিত সন্তান দুটিকে মৃত মনে করে নেয় তবে ভুল করবে। মানুষ সম্বন্ধে সুচারুর হতাশা সেই রকম। যে-মানুষ বিবেক শুভবোধ জীবনের তাৎপর্য অস্বীকার করে যথার্থ ভাবে তার অত দুঃখ হয় না, এমন যন্ত্রণা নয়। সুচারুর কাতরতা, দুঃখবোধই বলে দেয় সে আসলে বিশ্বাসহীন মানুষ নয়।"

গিরিজাপতি এখানে এসে থামলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল আরও 'যেন কিছু বাকি থাকল। কি? শেষটা মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন আবার। তাঁর মন তৃপ্ত হল না। কোথায় একটা ফাঁক থেকে গেল।

কলম বন্ধ করে মুদিত চোখে বসে থাকলেন। অতৃপ্ত। অনেক বলেও যেন মূল কথাটা বলা হয় নি। ডায়েরীর পাতা তাঁর মনের অজস্র কথা কি ধরতে পারে? তাঁর মন কি সব কথা বলতে পারে? সমস্ত অনুভব কি তিনি প্রকাশ করতে পারেন?

না। চোখ খুললেন গিরিজাপতি। শেষের দিকটা আবার পড়লেন। সুচারুকে তাঁর যেন এখন অতি তীব্র কোনো শক্তি বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সেই তিক্ত রিক্তহৃদয় আধুনিক মানুষটি কেমন আসুরিক উপহাসে তাঁকে বলছে, অন্যায় বলে কিছু নেই জগতে, সবই ন্যায়, বিবেককে কোথাও

দেখা যায় না, পকেট ঘড়ির মতন তাকে বুকের সঙ্গে বেঁধে দুর্বল মানুষ তার কর্মের ফলাফল ঠিক করে। ন্যায় নীতি বিবেক সবই কাল্পনিক, সমস্তই অনুমান।

গিরিজাপতি চাঞ্চল্য অনুভব করছিলেন। ডায়েরীর পাতা কেমন অস্বস্তির সঙ্গে তিনি বন্ধ করে ফেললেন। পাশের ঘরে নিখিল এসে গেছে। তার গলা বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি বন্ধ। ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ঘনিয়ে আসছে। পাখাটা কর্কশ শব্দ করছিল, দেবু কাল ওটা নিয়ে যাবে।

সহসা গিরিজাপতির মনে হল সুচারু তাঁর সামনে বসে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে আছে। যেন সে জানতে চাইছে গিরিজাপতির কি কিছু বলার আছে?

গিরিজাপতি তাঁর চেতনায় তড়িৎস্পর্শের মতন শিহরণ অনুভব করলেন, কোনো প্রবল আবেগ তাঁর সর্বাঙ্গিয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিস্তব্ধ করে রাখল। সুচারুর অস্বস্তিকর অস্তিত্বের সামনে তিনি যেন এতক্ষণ অসহায়ের মতন বসেছিলেন, এখন আত্মশক্তি অনুভব করে ক্রমশ তাঁর চিত্তের জড়তা ও ভীতি অপসৃত হল। উজ্জ্বল প্রখর হয়ে জ্বলে উঠল সেই গুপ্ত অগ্নিকণা যা এ-যাবৎ তিনি কোনো নিভৃত প্রদেশে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মনে মনে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁর বলার আছে। মানব-জীবন আয়ুর দাস নয়, মনুষ্যত্বের কাছে আমরা বাঁধা রয়েছি। এর ঋণ শোধ করে দিয়ে যেতে হয়।

নিজের প্রথম যৌবনের কথা স্মরণ করে গিরিজাপতি কোনো বিগত কলঙ্ককে যেন আজও অনুশোচনার সঙ্গে দেখছিলেন। সেই কাল আজ তার বিশ্রী দাহ, উৎক্ষিপ্ত অবস্থা চাঞ্চল্য হারিয়েছে। বাংলা দেশের ইতিহাস তাকে কল্পনায় কত না উজ্জ্বল করছে আজ। কিন্তু গিরিজাপতি জানেন সেই উত্তেজনা ও আবেগ এবং নিষ্ঠার মধ্যেও কোথায় যেন একটা অমানুষিক ত্রুটি ছিল। উন্মাদ সাধনার মতনই সেই চরম স্বদেশ প্রীতি অনেক সময় হৃদয় ও বোধকে নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করেছে।

গিরিজাপতিও করেছিলেন। অন্যদের মতন তিনিও যে শপথ নিয়েছিলেন সেখানে অবিচল কর্তব্য পালন ছাড়া অন্য নীতি ছিল না। নেতা ছিলেন

সর্বশক্তিমান। নেতার আদেশ পালনের বিরুদ্ধে কোনো কথা ছিল না। অজুহাত দেখানো চলত না।

গৃহপরিজনের সমস্ত মোহ ত্যাগ করে গিরিজাপতি এই উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কাজ করছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে বোমা রিভলবারের পথ দিয়ে আসবে এ সম্পর্কে তাঁর যদি বা সন্দেহ থাকে—সেই পৌরুষ নামধেয় হিংসার মূর্তির সমান দাঁড়িয়ে তা ভাববার অবকাশ ছিল না।

এই উন্মত্ত ভাবপ্রবণতার দিনেই তাঁর জীবন সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। ঘটনাটা মনে করতে পারছিলেন গিরিজাপতি। একদিন, তখন শীতকাল, রাত্রে গিরিজাপতির মেসে এসে একজন খবর দিয়ে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে মীর্জাপুর স্ট্রিটের বাড়িতে হাজির থাকতে হবে। রাত আটটা বেজেছে সবে। গিরিজাপতি যথাসময়ে মির্জাপুরের বাড়িতে গেলেন। তেতলার চিলে কোঠায় তিনজন অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। একজনকে গিরিজাপতি চিনলেন, তাঁর নেতা। অন্য দুজন অপরিচিত।

সামান্য কয়েকটা কথায় নেতা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। চিৎপুরের এক বাড়িতে গিয়ে একজন ট্রেটারকে আজ রাত্রেই গুলি করে মারতে হবে। লোকটাকে গুলি করার পর দরজা জানলা সব বন্ধ রেখে, ঘরের বাইরে তালা দিয়ে চাবিটা নিয়ে গিরিজাপতি রাস্তায় নেমে আসবেন, সেখানে উলটো দিকে একটা পানের দোকান আছে, চাবিটা পানওলার হাতে দিয়ে তিনি চলে যাবেন।

গিরিজাপতির হাতে একটা রিভলবার দেওয়া হল, একটা তালা চাবি। বলা হল, কাজটা রাত দশটার পর করতে হবে।

সমস্তই যেন বাঁধা ছক করা ছিল। দশটার কিছু আগে সেই অপরিচিতদের মধ্যে একজন গাড়ি নিয়ে এল। গিরিজাপতি উঠলেন। শীতের নিস্তব্ধ কলকাতার রাস্তা দিয়ে গাড়িটা তাঁকে চিৎপুরে একটা বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, দোতলার শেষের ঘরটা।

বাড়িটা কাঠগোলার মতন। নীচে অজস্র জঞ্জাল। ভাঙা সিঁড়ি।

কোনো মানুষ জনের সাড়া নেই। পাশের বাড়িটা বোধ হয় কোনো পতিতার। নাচ গানের শব্দ আসছিল।

গিরিজাপতি নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলেন। দোতলায় দুটো ঘর। তালা বন্ধ। শেষ ঘরটায় টিম টিমে বাতি জ্বলছিল। গিরিজাপতি দরজায় আস্তে আস্তে শব্দ করলেন।

দরজা খুলে দিয়ে যে লোকটি দাঁড়াল গিরিজাপতি তাঁকে দেখবেন কল্পনা করেন নি। তিনি একজন বিখ্যাত বিপ্লবীকর্মী। গিরিজাপতি তাঁকে চিনলেন, তিনি গিরিজাপতিকে চিনলেন না। চেনার কথা নয়। দু জনে দু দলের। 'এস।' তিনি দরজা থেকে সরে এসে পথ দিলেন, 'বিপিন তোমায় চিঠিটা নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে?'

গিরিজাপতি নীরব। কে বিপিন? কিসের চিঠি? গিরিজাপতি জানেন না। নির্বাক থাকলেন।

'অল্প বস। চিঠিটাই আমি লিখছিলাম, একটু বাকি আছে।'

গিরিজাপতি ঘরের একপাশে একটা ভাঙা টুলের ওপর বসে থাকলেন। উনি মেঝের ওপর নোংরা বিছানায় বসে চিঠি লিখতে লাগলেন। আর কোনো কথা নয়। দরজা খোলা।

সেই ম্লান আলোয় নির্বিকার চিত্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে গিরিজাপতির বিশ্বাস করতে বাধছিল, সবত্যাগী সন্ন্যাসীর মতন এই কর্মী বিশ্বাসঘাতক? এ কি সম্ভব? কিন্তু, মনের এই প্রশ্ন বা দ্বিধাকে গিরিজাপতি বড় হতে দিলেন না। বিপ্লবীর জীবনে কোনো প্রশ্ন নেই, কেবল আনুগত্য। সুযোগের অবসরে অপেক্ষা করতে লাগলেন গিরিজাপতি। ঘরের একটি জানলা শীত বলে বন্ধ ছিল।

চিঠি লেখা শেষ হলে উনি মুখ তুললেন, চিঠিটা মুড়ে খামে পুরলেন, 'স্ত্রীকে লেখা চিঠি ভাই, অনেক লিখলাম। পাঁচ বছর বিয়ে করেছি, তিনখানা চিঠিও লিখতে পারি নি।' খামে চিঠি মুড়ে তিনি ঠিকানাটা লিখে উঠে দাঁড়িয়েছেন, গিরিজাপতি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। উনি বিস্মিত হয়েছিলেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গিরিজাপতির রিভলবার তাঁর অনুচ্চারিত কথাকে আর্তস্বরের মধ্যে থামিয়ে দিল।

পর পর দুটো গুলি করেছিলেন গিরিজাপতি। বাতি নিবিয়ে চলে যাবার সময় কি ভেবে চিঠিটা উঠিয়ে নিয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে চাবিটা পানের দোকানে জমা দিয়ে গিরিজাপতি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন।

চিঠিটা গিরিজাপতির কাছে থাকল। তিন চার দিন কেউ কোনো খোঁজ করল না। সেই চিঠি গিরিজাপতি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মনে হল, এই চিঠি তাঁর পড়ে দেখা দরকার।

চিঠিতে এক সং নিষ্ঠাবান মানুষ তাঁর স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে লিখেছিলেন। নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখ দ্বন্দ্ব··· । লিখেছিলেন, বিপ্লবীদের প্রমত্ত ক্ষমতা অধিকারের কথা। অবিশ্বাস আর নৃশংশতার কথা। লিখেছিলেন, এরা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে, তাঁকে নজরবন্দী করে রেখে দিয়েছে, আর খানিকটা বিষ দিয়ে গেছে খেয়ে মরার জন্যে।

উনি নিশ্চয় সেই বিষ খেতেন। কিন্তু অন্যেরা তা বিশ্বাস করে নি, কিংবা ধোঁকা দিয়েছিল। গিরিজাপতিকে দিয়ে তারা ওঁকে হত্যা করাল।

যে আদর্শ উন্মত্ততা নৃশংসতাকে একদিন গিরিজাপতি পৌরুষ মনে করতেন সেই আদর্শ তাঁর কাছে দানবের আদর্শ মনে হল, মনে হল এই বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন তাণ্ডব কেবল স্বৈরাচার আর আত্মমোহ। এখানে যে কি হীনতা কত পশুত্ব লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। মোহের বেদীতে দেশ পুষ্পমাল্য দিচ্ছে।

গ্লানি অনুশোচনা পীড়ন ও বিবেকের দংশনে গিরিজাপতি পাগল হয়ে যেতে বসেছিলেন। তিনি এই পশুর মতন কাজ কেন করলেন, কেন? লোকটিকে তনি নামে চনতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনি অপরিচিত অজ্ঞাত নিঃসম্পর্ক। কোন নীতি বলে তিনি একটি অপরিচিতকে হত্যা করলেন? কে তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ করবে? ওঁর দুটি অবোধ শিশুর কথা উনি চিঠিতে বার বার লিখেছেন। লিখেছেন, তাঁর কেউ নেই বলে ঈশ্বরের হাতে তাদের দিয়ে গেলেন।

শেষাবধি এই বিবেক দংশন গিরিজাপতির অসহ্য হল। তিনি সেই চিঠি পকেটে করে চলে গেলেন বাংলা দেশের অখ্যাত এক গ্রামে।

সেখানে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের পর্ব শুরু হল। একটি নম্র চিরদুঃখী বিধবা এবং অবোধ দুটি শিশু নিয়ে। নিখিল তখন মাত্র বছর চারেকের, উমা সদ্য শিশু। সেই নিঃস্ব সংসার দেখে গিরিজাপতি অনুভব করেছিলেন, তাঁর পশুত্বের কদর্যতা কী প্রচণ্ড। যে কোনো মানুষকে প্রায় নামমূল্য ব্যয়ে হত্যা করা যায়, কিন্তু একটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখা নিত্যদিনের আত্মব্যয়। এই আত্মব্যয়কে গিরিজাপতি গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করলেন প্রায়শ্চিত্ত ও কর্তব্য হিসেবে। নিঃসহায় অবস্থা গিরিজাপতিরও, তবু এই ভার তিনি যেন কোনো দেব-উপাসনার মতন তুলে নিলেন। খুবই আশ্চর্য, নিতান্ত যেন ভাগ্যবশেই গিরিজাপতির এবং নিখিলদের উপাধি একই ছিল। ভাগ্য কি জানত? মনে হয় এও কোনো ললাট লিখন।...দুঃখ দারিদ্র্য নানা আপদ বিপদ সেই উন্মাদদের হল্লাসী সমস্ত অগ্রাহ্য করে গিরিজাপতি জীবন রক্ষার ব্রত পালন করে যাচ্ছিলেন। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘর বেঁধেছেন, কোনো দুর্যোগ এসে সে-ঘর ভেঙেছে। আবার অন্যত্র। এমনি করে কত বছর কাটল, বউদি মারা গেলেন নবদ্বীপে। হেতমপুরে এসে স্থায়ী ঘর বাঁধতে পারলেন নিখিল উমাকে নিয়ে। ওরা কোনোদিন জানতে পারল না এই কাকাই তাদের পিতৃহন্তা।

অতীত থেকে যেন আর সহজে বর্তমানে ফিরে আসতে পারছিলেন না গিরিজাপতি। বিস্মৃত ঘৃণিত সেই জীবন আজ তাঁর চেতনাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ পর ক্রমে ক্রমে তাঁর চেতনা স্পষ্ট হল। তিনি বর্তমানকে উপলব্ধি করতে পারলেন, সুচারুকে আবার যেন দেখতে পেলেন।

যদি নীতি না থাকে এ-সংসারে, যদি অন্যায়ের গ্লানি না বিবেককে পীড়িত করে তবে আমার এ জীবন কেন? মনুষ্যত্ব না থাকলে কেন এই প্রায়শ্চিত্ত।

আমি বিশ্বাস করি সুচারু, মানুষের নৈতিক চেতনাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এ-বোধ না থাকলে জীবন অর্থহীন। শুভ বোধেই আমার অন্তর মুক্তি থাক। আমি সে কালের মানুষ। এ কালের অবিশ্বাস আমার সইবে না।

সাতাশ

শেষ পর্যন্ত গৌরাঙ্গর সাড়া পাওয়া গেল বাড়িতে। নীচে নেমে এল গৌরাঙ্গ।

বাসু ভীষণ চটে ছিল। সন্ধ্যে থেকে এই নিয়ে তিনবার সে গৌরাঙ্গর খোঁজ করতে এসেছে। গৌরাঙ্গকে দেখেই বাসু খিঁচিয়ে উঠল, 'কি রে শালা, বউয়ের পাশে বসে থাকিস ডাকলে সাড়া দিস না।'

'এই বাড়ি ফিরলাম', গৌরাঙ্গ বলল, 'মিনিট পনের হবে।'

'গুল দিস না, গোরে।' বাসু বিশ্বাসই করল না গৌরাঙ্গ বাড়িতে ছিল না। 'তুই আজকাল অ্যায়সা ছোটলোক হয়েছিস বউ ছাড়া কিছু চিনিস না।'

'বউ নেই।' গৌরাঙ্গ কেমন ফাঁকা গলায় বলল।

'নেই?'

'বাপের বাড়ি গেছে।'

বাসু গলার মধ্যে ঠাট্টার শব্দ করল, গৌরাঙ্গকে দেখল দু পলক, 'তাই বুঝি তোর মুখ শুকিয়ে রয়েছে।'

গৌরাঙ্গ কি ভাবছিল। অন্যমনস্ক। বলল, 'ছেলেটার জন্যে ভাল লাগে না রে।' গৌরাঙ্গর নিশ্বাস পড়ল।

বাসু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল গৌরাঙ্গকে। একদিন ছেলে না থাকলে মন খারাপ হয়ে যায় গৌরাঙ্গর। গৌরাঙ্গর পিতৃত্ব বাসু যেন খুব সহজেই অনুভব করতে পারল। রত্নময়ীর কথা তার মনে পড়ল। বাসুর হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হল, গৌরাঙ্গ কাকে বেশী ভালবাসে, বউ না ছেলেকে? গৌরাঙ্গর কাঁধে ঠেলা দিয়ে বাসু হাঁটতে লাগল। 'হ্যারে, তোর সবচেয়ে পেয়ারের কে? বউ না ছেলে?'

গৌরাঙ্গ জবাব দিল না। বাসু সকৌতূহলে অল্প অপেক্ষা করল। 'কি রে—?'

'দু জনকেই।' গৌরাঙ্গ বলল।

'তুই যে দাড়িপাল্লা দিয়ে ভালবাসিস তবে!' বাসু ঠিক হাসল না, হাসার মতন করে বলল। 'তুই চোট্টা—'

গৌরাঙ্গ জবাব দিল না। গলি দিয়ে এগিয়ে আসতে বাসু চারপাশ দেখছিল। আজকাল আবার একটু বেশী আলো হয়েছে বড় রাস্তায়, গলিতে যে কে সেই। ব্ল্যাক আউট উঠে যাচ্ছে, তবু টিমটিমে বাতি। 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।' বাসু বলল, 'ইমপরটেণ্ট টক।'

আজকাল গৌরাঙ্গ বাসুর 'ইমপরটেণ্ট টক'-এর ওপর তেমন খুশী নয়। যত জরুরী কথাই হোক বাসুর, শেষ পর্যন্ত সেই টাকা ধার চাওয়াতে গিয়ে দাঁড়াবে। ছ আনা চার আনার কথা বাদ দাও, দু এক টাকা, পাঁচ সাত টাকা করেও কি কিছু কম দিয়েছে গৌরাঙ্গ। হিসেব জুড়লে কোন না দু তিন শো টাকা হবে। গৌরাঙ্গ সে-সব কোনোদিন জোড়ে নি। কিন্তু আজকাল তার দিতে ইচ্ছে হয় না। পারবেই বা কোথা থেকে? ছেলে বউয়ের খরচটাই কি কম। তার ওপর অফিসেও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে এসে বাসু বলল, 'গোলপুকুরের দিকে চল। ওদিকে চায়ের দোকানটা ফাঁকা থাকে।'

এখন রাত সাড়ে সাত প্রায়। দু পাশে লোহার দোকানগুলো বন্ধ। ট্রাম এবং বাস অনবরত যাচ্ছিল, হঠাৎ কিছুক্ষণ রাস্তা একেবারে ফাঁকা। কোনোদিক থেকেই কিছু আসছে না। আকাশে মেঘ। বর্ষার ভিজে ভিজে ভাব আসছে বাতাসে।

'আজ এক জায়গায় গিয়েছিলাম, বুঝলি—?' হাঁটতে হাঁটতে বাসু বলল।

গৌরাঙ্গ পকেট থেকে বিড়ি বের করছিল। শুধলো 'কোথায়?'

'কোথায় আবার শালা, ধাপ্পায়।' বাসু যেন কিসের ওপর আক্রোশে বিরক্তিতে চটে উঠে বলল, 'জীবন ভোর কেবল শালা ধাপ্পায় থাকো। বেশ্যা মাগিদের মতন।'

'বিড়ি ধরা।'

'বিড়ি ফিড়ি ধরিয়ে কি হবে, একটা বাম্বু দে ধরিয়ে নি। পেছনে বাম্বু, সামনে বাম্বু। বেশ হবে।' বাসু কেমন উপহাসের মতন বলল, গলার স্বর বলার ভঙ্গি থেকেই মনে হচ্ছিল ওর মেজাজ তেমন ভাল নেই।

বিড়ি ধরিয়ে দু জনে হেঁটে হেঁটে অনেকখানি চলে এল। স্ট্রীটের রাস্তায় আবার ট্রাম বাস দেখা দিয়েছে।

'কাবলেটা আমার সঙ্গে হারামিপনা করল, বুঝলি—' বাসু বলল, 'চাকরিটা ও শালা জবার দাদাকে পাইয়ে দিল।...জবাটা বেশ টাটকা মাল হয়ে গেছে ত, কাবলে টোপ মারল।'

চায়ের দোকানের সামনে এসে পড়েছিল ওরা। দোকানে ঢোকার মুখে বিড়ি সিগারেটের ছোট দোকান। বাসু নিজের থেকেই পাঁচটা সিগারেট কিনল।

দোকানটায় সত্যিই ভিড় নেই। কতক টেবিল চেয়ার পড়ে আছে। দু তিন জন মাত্র লোক। ক্যাশের দিকে মালিক চেয়ারে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে কিসের হিসেব করছে। গোটা দুয়েক ছোকরা উনুনের দিকটায় গিয়ে গল্প করছিল।

বাসু একদিকে ফাঁকায় চেয়ার টেনে বসল। দু কাপ চা চাইল।

'দিদির কাছ থেকে একটা টাকা ধার করলাম আজ।' বাসু হঠাৎ বলল, যেন এই সংবাদটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

গৌরাঙ্গ ঠিক বুঝল না। তাকিয়ে থাকল।

বাসু নিজের থেকেই ব্যাখ্যা দিল। 'দিদির কাছে দশ বিশ টাকা আছে। মেয়েরা খুব কিপ্পিস্ হয়, বুঝলি না, আমাদের মতন লেলা নয়।' এই কথা থেকে পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না। বাসু ভাবল এতেই যথেষ্ট বলা হয়েছে।

'সুধাদির চাকরি হয়েছে আবার?'

'না। চাকরি কিসের—? অফিস থেকে এক থোকে চারশো পাঁচশো টাকা দিয়েছিল না, তা ছাড়া তিরিশটা করে টাকা এখনও দেয়। আরও পাঁচ ছ মাস পাবে।' বাসু বলল, বলেই কি ভেবে আবার যোগ করল, 'দেখ গৌরে, নিজের আর পরের বলে একটা কথা আছে। দিদিই ত, নিজের বোন। পরের কাছে হাত পাতলে বেইজ্জতি করত।'

বাসুর গলা থেকে এমন একটা গভীর দুঃখ ও অভিমান উঠে আসছিল যা গৌরাঙ্গ অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিল না। তার মনে হল, বাসু কি তাকে ঠুকে কথা বলছে? গৌরাঙ্গ আর টাকা দেয় না বলে কথা শোনাচ্ছে?

'তুই আমায় বলছিস?' গৌরাঙ্গ তাকাল চোখে চোখে।

'না।' বাসু মাথা নাড়ল।

'আমিই ত পর।'

'যা শালা, কেউও পর কি। পর আছে...' বাসু সিগারেটের প্যাকেট খুলে ফেলল।

এই পরটা কে গৌরাঙ্গ বুঝতে পারল না। আরতি?

চা দিয়ে গেল ছোকরাটা। খুব গরম। ধোঁয়া উঠছে। 'তুই আরতির কথা বলছিস?' গৌরাঙ্গ শুধলো।

বাসু জবাব দিল না। সিগারেট বের করে গৌরাঙ্গর দিকে ঠেলে দিল একটা, নিজে নিল।

গৌরাঙ্গ সিগারেট উঠিয়ে আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে লাগল। আরতির চাকরিটা যে বাসু খুব খুশী মনে মেনে নেয় নি গৌরাঙ্গ জানে। সেই ছেলেটার কথাও বাসু গৌরাঙ্গকে আগে বলেছিল। কিন্তু এর জন্যে আরতি পর হয়ে যাবে কেন গৌরাঙ্গ বুঝতে পারল না।

'তোর যেন একটা কি হয়েছে—' গৌরাঙ্গ বাসুর দিকে চেয়ে বলল, 'আজকাল সব সময় মেজাজ বিগড়ে থাকিস।'

চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ ওঠাল বাসু। বলল, 'তুমি শালা স্ট্যাম্প ঝাড়ছ, বউ ছেলে নিয়ে বিছানায় শুচ্ছ, মেজাজ খারাপের তুমি কি বুঝবে!'

'তুইও বিয়ে ছেলে কর।' গৌরাঙ্গ লঘু স্নিগ্ধ মুখে হাসল। চায়ের পেয়ালায় মুখ ঠেকাল।

'করব।' বাসু সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কবে?' গৌরাঙ্গ হাসল।

'পরের জন্মে।'

গৌরাঙ্গ তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ দেখল বাসুর।

অল্প সময় ওরা নীরব থাকল। চা খেল মাঝে মাঝে, ধোঁয়া টানল সিগারেটের।

'ফালতু কথা রেখে আসল কথা বল।' গৌরাঙ্গ বলল, 'তোর মতলবটা কি?'

বাসুর যে একটা মতলব আছে বোঝাই যাচ্ছিল। মতলব না থাকলে তিন দফা গৌরাঙ্গর বাড়িতে ধরনা দিয়ে তাকে ধরে আনত না। এ-সব কথাবার্তাও বলত না।

আজকাল নিজের ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় গৌরাঙ্গ আর আগের মতন বাসুর রোজকার খবর তার সব কথা তেমন করে জানতে পারে না। দেখাও হয় না রোজ। মোটামুটি যা জেনে নেয়। বাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গর আজ কেন যেন মনে হল, বাসু বেশ রোগা হয়ে গেছে, চোয়াল দুটো কটকট করছে, চোখের তলায় কালচে ভাব, অমন ধবধবে রঙ বেশ ময়লা হয়ে এসেছে। বাসুকে আগের মতন তেজালো দেখাচ্ছে না। গৌরাঙ্গর দুঃখ হল; দুঃখ হল কারণ বাসুর এই চেহারার মধ্যে কেমন এক ক্ষয়ে যাওয়া ভাব ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া অলস ভাবে গিলে নিতে নিতে গৌরাঙ্গ ভাবল, বাসুর একটা কিছু হল না। কাবুলের দোষ কি, সমস্ত পাড়ায় বাসুর বড় দুর্নাম। তার স্বভাব এবং মেজাজের জন্যে কেউ ওকে বিশ্বাস করতে পারে না। চাকরি দিতে ভয় পায়। ছেলেটা যে গুণ্ডা, চোর, স্বভাব চরিত্র খারাপ, ভীষণ তেরিয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন—সবাই তা জানে। শুধু জানেই বা কেন, বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে বলে ভয় পায়। কত চেষ্টা গৌরাঙ্গ নিজেই করেছে। কি হল! আজকালকার দিনে একটা মুটে মেথর নাপিতও চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, বাসু পেল না। কি করতে পারে গৌরাঙ্গ। সে তার সাধ্যমত ওদের জন্যে করেছে।

'দেখ, গৌরে—' বাসু বলল। টেবিলের ওপর পিঠ কুঁজো করে ঝুঁকে বসল। 'তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

গৌরাঙ্গ তাকিয়ে থাকল। কি কাজ?

'আমি কাল পরশু কেটে পড়ব।' নানা ভাবনার মধ্যে থেকে যেন বাসু কথা বলে উঠল।

'কেটে পড়বি—!' গৌরাঙ্গ কিছু বুঝতে পারল না।

'একেবারে শালা—' বাসু মুখ বিকৃত ও তিক্ত করে বলল। 'এই চুতিয়া বউবাজার পাড়ায় বাসু ভট্‌চাযকে আর দেখতে পাবি না।'

গৌরাঙ্গ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। 'কোথায় যাবি?'

'যুদ্ধে।'

'যু—দ্ধে...!' গৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকল। চোখের পাতা পড়ল না। বুঝেও যেন বুঝল না, বিশ্বাস করল না। যুদ্ধে যাবে কি বাসু? কোন যুদ্ধে? এক যুদ্ধ ত খতম। বার দুই শুকনো ঢোঁক গিলে গৌরাঙ্গ বলল, 'এখন যুদ্ধে যাবি কি! কে তোকে বলেছে?'

'আমি গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলি! কোথায়—?'

'হসপিটাল রোডে।' বাসু সিগারেটের টুকরোর আগুন চায়ের মধ্যে ফেলে দিল।

'সেখানে কী?'

'লোক নিচ্ছে।'

'বলিস কি রে, এখনও লোক নিচ্ছে!' গৌরাঙ্গ বলল। বলেই মনে পড়ল, কাগজে এখনও বিজ্ঞাপন বেরোয় ছবি দিয়ে, বিমান বাহিনীতে যোগ দিন, নৌবাহিনীর সুযোগ হারাইবেন না, আহতদের শুশ্রূষাদান পুণ্যকর্ম। আজ পাঁচ বছর ধরে লোক নিয়ে যাচ্ছে বেটারা তবু লোক নেওয়ার শেষ নেই! জাপানীদের সঙ্গে লড়তে এখনও লোক দরকার!

'তুই গিয়েছিলি?' গৌরাঙ্গ যেন এখনও বিশ্বাস করছিল না।

'বলছি ত যে গিয়েছিলাম।' বাসু চটে উঠল।

থতমত খেয়ে গেল গৌরাঙ্গ।

বাসু কাপটা প্লেটের ওপর উপুড় করে রাখল। মাটিতে গোড়ালি ঠুকে

শব্দ করছিল থেমে থেমে। বলল, 'আরও একবার গিয়েছিলাম, নন্দীর সঙ্গে। তখন শালা ঢুকে পড়লেই হত।' বাসু যেন আফশোস করল।

কি বলবে গৌরাঙ্গ বুঝতে পারছিল না। বাসুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে সত্যিই গিয়েছিল। ভাল লাগছিল না গৌরাঙ্গর। যুদ্ধে কেন? যুদ্ধ কি ছেলেখেলা। জেনে শুনে মরতে যায় কোন বুদ্ধু!

'অনেক লোক দেখলি?'

'না, কম। খুব কম।' বাসু বলল, 'সেবারে গিয়ে দেখেছিলাম খুব ভিড়, হাট যেন। এবারে দশ বিশ জন। আগের বারেরটায় যাই নি, সেটা খিদিরপুরের দিকে।'

'তুই নিজে চলে গেলি?' গৌরাঙ্গ ধাঁধায় পড়ে যা মনে আসছে বলছে।

'ত কি দোগলা নিয়ে যাব।' বাসু বেমেজাজে বলল, 'খোঁজ নিয়েছিলাম।'

গৌরাঙ্গ বিমূঢ় হয়ে বসে থাকল। এখনও তার পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না বাসু সত্যি সত্যি নাম লিখিয়ে এসেছে। হয়ত গিয়েছিল ঝোঁক করে, কিন্তু নাম লিখিয়েছে কি!

'তুই নাম লিখিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের চাকরি?'

'জানি না। ওরা বলছিল, মুদ্দোফরাসের।' বাসু নিস্পৃহের মতন বলল।

'বাঃ।'

'কে জানে! ...হবে একটা কিছু। আমার শালা মাগীও যা মুদ্দোও তাই—দুই সমান।' বলতে বলতে বাসু আবার সিগারেটের প্যাকেট বের করল। চায়ের দোকানের একপাশে দুই মাঝবয়সী লোক মিলে থিয়েটার নিয়ে গল্প করছে, মাঝে মাঝে তাদের কথা কানে আসছিল, অন্য এক টেবিলে একটি ছেলে রাস্তার দিকে চেয়ে গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজছে।

সিগারেট বের করতে করতে বাসু কি ভেবে বলল, 'কেটে পড়ব বলেই দিদির কাছে একটা টাকা ধার চাইলাম, বুঝলি গৌরে। কেমন ইচ্ছে হল। দিদি হাঁ হয়ে গেছে।'

গৌরাঙ্গকে সিগারেট দিয়ে বাসু নিজের সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, 'আর এক কাপ চা খাবি?'

'না।' গৌরাঙ্গ মাথা নাড়ল।

'খা রে খা, আমি পয়সা দেব।' বাসু কেমন করে যেন হাসল।

'না।' গৌরাঙ্গ মাথা নাড়ল। 'তুই খা।'

বাসুও খেল না। ইচ্ছে করল না। সামান্য সময় বসে থেকে বলল, 'চল্ পার্কে গিয়ে বসি। কেমন গুমোট লাগছে।'

গৌরাঙ্গ বুঝতে পারল, বাসু কিছু বলতে চায়, বলতে পারছে না। সে আরও ফাঁকা জায়গা চায়, আরও নিরিবিলি। 'চল্' গৌরাঙ্গ বলল, বলে উঠে দাঁড়াল।

পয়সা গৌরাঙ্গই মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল। বিশ পঁচিশ পা হেঁটেই পার্ক।

রাস্তা পেরোতে পেরোতে গৌরাঙ্গ বলল, 'কাজটা তুই ভাল করিস নি।'

'নাম লিখিয়ে?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে জানতে পারলে—'

'জানছে কে। আমি একটা গুল মেরে কেটে পড়ব। তারপর তুই গিয়ে আসল খবরটা দিবি।' বাসু বলল।

গৌরাঙ্গ এতক্ষণে বুঝতে পারল তার সঙ্গে বাসুর জরুরী দরকারটা কিসের। ও নিজে কেটে পড়বে, আর যত ঝঞ্ঝাট ঝামেলার কাজ করাবে গৌরাঙ্গকে দিয়ে। না, গৌরাঙ্গ পারবে না। কাজটা খুব সোজা কি না, সুখের কি না! তুমি শালা যুদ্ধে পালাবে আর আমি তোমার বিধবা মা রুগ্ন দিদিকে গিয়ে বলে আসব, বাসু যুদ্ধে গেছে। মানুষ মরলে তার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া যেমন নিষ্ঠুরের কাজ, এ-কাজ তার চেয়ে এক রত্তি কম নয়।

পার্কে পা দিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, 'মাপ করো ভাই, আমি ও-সব পারব না।'

'পারবি না?'

'না।'

দু চার পা হেঁটে ফাঁকা দিকটায় এগিয়ে গিয়ে বাসু দাঁড়াল। 'পারবি না কেন?'

'কেন কি, পারব না ; ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল।' গৌরাঙ্গ আরও একটু ক্রীক রোর দিকে এগিয়ে মাঠে বসে পড়ল। ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ।

বাসু পাশে ছিল। সেও বসল। এদিকটায় বেশ আঁধার। ক্রীক রোর দিকে রাস্তার বাতি আগের মতই জ্বলছে। মাঠে কিছু লোক জন, বসে আছে, বেড়াচ্ছে। আকাশে মেঘ। ওপাশে দু তিন ছোকরার মধ্যে একজন বাঁশি বাজাচ্ছিল। বাঁশের বাঁশি। মেঠো মেঠো সুর। অন্ধকারে করুণ লাগছিল।

'তুই পারবি না কেন, বল্—?' বাসু জিজ্ঞেস করল। দু বন্ধু পাশাপাশি বসে। গৌরাঙ্গ বসেছে বাবু হয়ে। বাসু এক পা ছড়িয়ে বন্ধুর দিকে মুখ করে এক হাতে ভর রেখে।

'বললাম ত পারব না। কেন ফেনর জবাব আমি দেব না। ...তুই অন্য কাউকে বল।' গৌরাঙ্গ অবিচলিত।

'অন্য কাউকে বল—' বাসু খিঁচিয়ে উঠল, 'অন্য কাউকে বললে যদি হবে তবে শালা তোমার ও-তে তেল দিচ্ছি কেন!'

'কে বলেছে দিতে—' গৌরাঙ্গ বিরক্ত। তার পছন্দ হচ্ছিল না বাসু তাকে অযথা এ-ভাবে জোর জবরদস্তি করে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল বাসু। বলল, 'তুই আমার ফ্রেণ্ড।'

'যা শালা, ফ্রেণ্ড! ফ্রেণ্ড বলে তুমি আমায় ম্যাক্ পুরে দিয়ে যাচ্ছ!' ক্ষুব্ধ আহত স্বরে গৌরাঙ্গ জোরে জোরে বলল।

'ম্যাক্ কেন? কি আছে না-বলার? তোকে কেউ মার ধোর করছে না, পুলিসে দিচ্ছে না। স্রেফ বাড়িতে গিয়ে মা-কে বলে আসবি। ...আচ্ছা বে, তোকে তাও বলতে হবে না, তুই শুধু গিয়ে মাকে বলবি, শুনলাম বাসু যুদ্ধে গেছে। ...আমি ত চিঠি দেবই ক'দিন পরে, ওরা জানতে পারবে।'

গৌরাঙ্গ মেট্রোপলিটান স্কুলের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। অন্ধকারে ওদিকটা ঝাপসা হয়ে আছে। একটা প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় দু পাঁচ গজ যাচ্ছিল আর দাঁড়াচ্ছিল, আবার যাচ্ছিল। কলকব্জা বিগড়েছে নিশ্চয়। ওয়েলিংটন স্ট্রীট দিয়ে ট্রামগুলো ঘন্টি ঠুকে বাতাসে তার শব্দ ফেলে যাচ্ছে

আসছে। বাসও যাচ্ছিল। গৌরাঙ্গর মনে হল, বাসু শেষ পর্যন্ত যাবে না, যেতে পারবে না।

'যুদ্ধে কারা যায়!' গৌরাঙ্গ বলল, 'যারা উড়ো মাল। বাপ নেই মা নেই তিনকুলে কোথাও কেউ নেই, যুদ্ধে চলে যায়। তুই কেন যাবি?'

'আমার কেউ নেই।' বাসু উদাস গলায় জবাব দিল।

'বেশী ন্যাকামি করিস না, বাসু। তোর মা নেই, দিদি নেই, বোন নেই?'

বাসু একটু ভাবল। বলল, 'অমন সবারই থাকে। থাকলেই একেবারে কেতাথ হয়ে ওঠে নাকি সবাই!...' দু পা মাটিতে টান করে ছড়িয়ে বাসু বসল, পিছনে দু হাত রেখে পিঠ কেদারার মতন এলিয়ে দিল, বলল, 'এই দুনিয়াটা অত সোজা নয়, শালা। তোর কি, বাপ মা আছে—চাকরি করছিস, দু হাতে লুঠছিস, বউ পাশে নিয়ে ঘুমোচ্ছিস—আরামে দিন কাটছে। আমার মতন অবস্থা হত ত ঠেলা বুঝতে!'

অবস্থাটা গৌরাঙ্গ জানে। কিন্তু তার মানে কি যুদ্ধে যাওয়া? 'তুই আরও চেষ্টা কর।' গৌরঙ্গ বলল।

'চুপ কর বে, চুপ কর—' বাসু ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মুখ চোখের কদাকার ভঙ্গি করে বলল, 'চেষ্টা কর—, চেষ্টা শালা তোর মাগ কি না, করলেই বিয়োবে।...আমার কাছে ও-সব লেকচার ঝাড়িস না, গৌরে। আমি সব হারামিকে চিনি।' বাসু ক্ষোভে ক্রোধে হতাশায় জ্বালায় বেপরোয়া হয়ে বলছিল, 'তোদের সব্বাইয়ের বিচিতে তেল দিয়েছি, পা ধরেছি, এর কাছে ওর কাছে গিয়েছি তোদের সঙ্গে, কি বা ..হল! কোনো বানচোত আমায় চাকরি দেবে না।' বাসুর মুখ থেকে দু চার কণা থুতু ছিটকে এসে গৌরাঙ্গর মুখে লাগল। বাসু থামল না। দম নিয়ে আবার বলল, 'আমায় কেন লোকে চাকরি দেয় না রে, আমি জানি। সব বেটা ভয় পায়। জানে এ-বান্দা বাপকে তোয়াক্কা করেও কথা বলবে না। হারামিরা আমায় গুণ্ডা ভাবে, শয়তান ভাবে।...'

'তুই ফরনাথিং চেল্লাচ্ছিস—' গৌরাঙ্গ বাসুর কথার মধ্যে বাধা দিল ভয়ে ভয়ে।

'আলবৎ চেল্লাব। আস্থক না কোন বাপের বেটা আমার সামনে আসবে। ওই শালা পোস্টের এস. এ. ও-বেটা ভাবে নি, তোর মল্লিকমা ভাবে নি, কাবলের চৌধুরী ভাবে নি !·· সবাই শালা আমায় গুণ্ডা আর শয়তান ভাবে। ...আরে পরের কথা বাদ দে, নিজের বাড়িতেই ভাবে। মা ভাবে চোর গুণ্ডা, দিদি ভাবে । আরতিটা ত আরও ভাবে, ভাবে আমি শয়তান।' বলতে বলতে বাসুর গলা যেন অনেক দিনের কোনো পুরোনো নষ্ট হয়ে যাওয়া হারমোনিয়ামের মতন আচমকা বাতাসের চাপে বিশ্রী বেখাপ্পা এক শব্দ করে উঠল। গলার সমস্ত স্বর তারপর কণ্ঠায় ফাঁস লাগা গোঙানো শব্দের মতন শব্দ করতে করতে থেমে গেল।

গৌরাঙ্গ চুপ। তার মাথার ওপর যতদূর চাও কালো মেঘ ভরা আকাশ। তার চোখের সামনে মেট্রোপলিটান ব্রাঞ্চ স্কুলের বাড়িটা ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাম ঘণ্টি মেরে চলে যাচ্ছে, আর পার্কে একটা ঘুঘনিঅলা আস্তে গলায় সামনে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে 'পাঁঠার ঘুঘনি—।'

মন যেন কেমন করে এসেছিল গৌরাঙ্গর। ফাঁকা ভাব লাগছিল। তার কষ্ট হচ্ছিল, বাসুর দুঃখ সে পুরোপুরি অনুভব করে ভাবছিল, ওকে সবাই গুণ্ডা ভাবে চোর ভাবে।

'বাড়িতে এখন কেউ আমায় পোঁছে না, বুঝলি—' বাসু গলা সামান্য পরিষ্কার করে বলল, 'কেয়ারও করে না। বাড়ির সামনে কুকুর থাকলে যেমন দু বেলা লোকে পাত কুড়োনো ফেলে দেয়, আমায় তেমনি করে দু মুঠো দেয়।'

'কি বলছিস যা তা—' গৌরাঙ্গ ক্লিষ্ট স্বরে বলল।

'যা ট্রু তাই বলছি।' বাসু ঝোঁক দিল উচ্চারণের মাত্রায়, 'এই দুনিয়াকে তুমি ভীমনাগের সন্দেশ ভাবছ ! না বে, না। আমি হালচাল সব দেখেছি। ···একটা কথা বলব তোকে ?'

গৌরাঙ্গ চুপ করে থাকল।

'কাজে না লাগলে কেউ শালা তোমায় পুছবে না, সে বাপই হোক মা দিদি যেই হোক। বাড়িটাও হোটেল। মুফতে বেশীদিন চলে না।' বাসু

জামার বোতাম খুলে দিল, পা দুটো আরও ছড়িয়ে মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে বলল, 'মা আর এমনিতেও বেশীদিন বাঁচবে না। যা হাল হয়েছে। বাবা, বুঝলি গৌরে, বাবা মাকে অ্যায়সা ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল যে মা বেচারীর আর সুখ হল না।'

'তুই যুদ্ধে কেটে গিয়ে আরও সুখ দিবি নাকি ?'

'না। না রে, তা আমি জানি।' বাসু ধীরে ধীরে নরম গলায় বলল, 'মা বুক চাপড়াবে, কে জানে মরেই যাবে কি না। তা বলে ঝুটমুট আর বসে থেকে কি হবে।'

গৌরাঙ্গ বাসুর দিকে ফিরে আড় হয়ে শুয়ে নিল। ঠাণ্ডা বাতাস এসেছে এখন। বাঁশিঅলা ছেলেটা চলে গেছে। অন্ধকারে বাসুর মুখ অস্পষ্ট ছায়ার মতন দেখাচ্ছে। ঘাসের ডগা ছিঁড়ে গৌরাঙ্গ দাঁত দিয়ে চিবোলো একটু। তারপর আচমকা বলল, 'ও-সব মতলব তুই ছেড়ে দে। বেকার কেন প্রাণটা দিবি ?'

বাসু চুপ করে থাকল। তার প্রাণ আছে কি না হয়ত সেটা বোঝার চেষ্টা করছিল, হয়ত প্রাণ না থাকলে কেমন লাগবে তা ভাববার চেষ্টা করল। কিংবা অন্য কোনো কথা ভাবছিস।

গৌরাঙ্গ তার চেনা জানা যাবতীয় জায়গার কথা ভাবতে ভাবতে বলল, 'দেখ বাসু, চাকরি কপাল। তোর হচ্ছে না হচ্ছে না। হবে যখন, ঝট্ করে লেগে যাবে।'

'লাগবে না রে, লাগবে না।' বাসু শুয়ে শুয়ে মাথা নাড়ল।

'এ ত তুই গায়ের জোরে বলছিস। লাগবে।' গৌরাঙ্গ যেন বিশ্বাস করেই বলল, 'আরও এক দু মাস ধর কিছু হল না তোর, তারপর—'

'তারপর ঘোড়ার ইয়ে হবে।'

'এই ত তোর দোষ, কোনো কিছু ভেবে দেখবি না। আমি বলছি হবে। গৌরাঙ্গ হাত বাড়িয়ে বাসুর বাহু ছুঁয়ে নাড়ল, 'আফিসে আমাদের এক ভদ্রলোক আছে, তার দাদা কাশীপুর গান শেলে ভাল চাকরি করে। ভদ্রলোককে আমি সেদিন পুলিসের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি, ক্যাশ শর্ট

করেছিল। তাকে ধরব রে, হয়ে যাবে। বুঝলি—।' গৌরাঙ্গ এমন ভাবে বলল, যেন কাশীপুরে গান শেলে হয়েই গেছে চাকরিটা। 'কালই আমি ভদ্রলোককে বলছি। দাঁড়া, কালকেই ধরব চেপে—'

'ধরগে যা—', বাসু উপেক্ষার গলায় হাসল, 'তলায় আর ধরিস না গৌরে, ওপরে ধরিস।'

বাসুর হাসি আর কথা গৌরাঙ্গকে আবার কেমন অসহায় করল। 'তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না?'

দুপাশে মাথা নাড়ল বাসু; বলল, 'না। তোর এই পট্টি আমি জানি, গৌরে।'

'পট্টি?'

'আমায় তুই অত গেঁড়ে ভাবিস না কি! আমি সব জানি। আগে, শালা মেয়েছেলের মতন পট্টিতে ভুলেছি। এখন আর বাবা ও-সবে ভুলছি না।' বাসু নির্বিকার ভাবে বলছিল, যেন কোনো প্রজ্ঞার ফলে সে এখন সব জলের মতন বুঝে নিয়েছে, তার আর কোনো সংশয় নেই।

গৌরাঙ্গ কথা বলতে পারল না। বাসুকে মিথ্যে বলে স্তোক আশ্বাস দিয়ে আর ভোলানো চলবে না। কিন্তু গৌরাঙ্গ পুরোপুরি পট্টি দেয় নি। সত্যি এক ভদ্রলোক আছে আফিসে, খুব বোলচাল দেয়, কিন্তু সত্যিই কি সে চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবে। গৌরাঙ্গ জানে না। তার আজ আরও কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, বাসু এতদিন সবই বুঝেছে, বুঝেছে গৌরাঙ্গ চাকরির পট্টি দিয়ে দিয়ে তাকে ভুলিয়েছে।

মাঠে মাটিতে শুয়ে শুয়ে বাসু আবার সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা গৌরাঙ্গর কোলের কাছে ফেলে দিল। বলল, নে শালা ধোঁয়া উড়িয়ে নে। কাল থেকে বাসু ভট্‌চাযের পয়সায় তুমি আর সিগারেট ফুঁকতে পারছ না।'

সিগারেট ধরাল গৌরাঙ্গ। অন্ধকারে দুই বন্ধুর মুখে দুই বিন্দু স্ফুলিঙ্গ, আর কিছু চোখে পড়ছিল না। আকাশ মেঘে মেঘে বোধ হয় আরও কালো হয়েছে।

'বাসু।'

'বল।'

'সুধাদিকে অন্তত বল একবার।'

'খুব পরামর্শ দিচ্ছিস!'

'কেন? কাউকে কিছু না বলে—'

'দিদিকে বলব কি রে। এক ঠেলাতেই দিদি আধমরা হয়ে বসে আছে। লভারটার কাটা হাত, তার ওপর আমি যদি বলি ঠিক ভাববে ভাইটা গলা কাটা হবে। পাগল, এ-সব সিক্রেট দিদিকে বলে!'

'তা হলে আমি মাসিমাকে গিয়ে বলি আজ?'

'বলে দেখ, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

গৌরাঙ্গ সবই যেন ফাঁকা দেখছিল। সমস্ত পথ বন্ধ। কোথাও একটা উপায় নেই। বলল, 'আরতিকেই বলি না হয়।'

'কাকে—' বাসু অন্ধকারে গৌরাঙ্গর মুখের দিকে তাকাল, 'খবরদার গৌরে, ওই বেইমান নেমকহারামটাকে কিছু বলবি না। আমি ওকে চিনে নিয়েছি। ওর হয়ে গেছে, আমি তোকে লিখে দিচ্ছি গৌরে, এ-বাড়ি থেকে ও কেটে পড়বে, দুচার মাস পরেই দেখবি, ভেগে গেছে।...মা দিদির মুখে চুন কালি মাখিয়ে ও ভাগবে।'

গৌরাঙ্গ নীরব। সে সবই জানে। বাসুর মুখে শুনেছে। কথাটা গৌরাঙ্গ বিশ্বাস করে নি এতকাল, এখন কেন যেন তার মনে হল, বাসু বোধ হয় ঠিকই বলছে।

'দিদি—'বাসু বলল, 'দিদি আর ওই সুচারুটার যদি বিয়ে হয় গৌরে, আমায় একটা চিঠি লিখিস।' বাসু মুখ হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকল। অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। গৌরাঙ্গও চুপ। তার বুক বড় ফাঁকা লাগছিল। সেই কবে কোন বাচ্চা বয়স থেকে বাসু আর সে বন্ধু। এই বন্ধুত্ব আজ গৌরাঙ্গর কাছে সহসা যেন এক গভীর সম্পর্কের মতন মনে হল, মনে হল তার জীবনের এক বিরাট বিচিত্র ভালবাসা বাসু আজ মুছে দিল। গৌরাঙ্গর গলা বুজে চোখে জল এসে গেল।

'আমি তোকে চিঠি দেব, বুঝলি গৌরে।' বাসু সুপুরিগাছের মাথাটা অন্ধকারে দেখছিল, দেখে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট শয়তান কালো কুচকুচে মুখ নিয়ে তাকে দেখছে। তার কথা শুনছে। বাসু একটু জোরে জোরে, যেন শয়তানটাকে শোনাচ্ছে, বলল, 'মা-টা যদি মরে যায়, বুঝলি গৌরে, তা হলেও আমায় চিঠি দিস। আমি আসব।'

গৌরাঙ্গর কান্নার দমকা ফোঁপানো শব্দ বাসুর কানে গেল। অন্ধকারে বাসু গৌরাঙ্গর মুখ দেখবার চেষ্টা করল, পারল না। উঠে বসল। তারপর হাত বাড়িয়ে এক ঠেলা মারল গৌরাঙ্গকে, 'কি রে শালা, তুই যে...! ...তোর মতন মাগী আর দেখি নি।' বলতে বলতে বাসুও কেঁদে ফেলেছিল।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বাসু এক সময় বলল, 'গৌরে, তুই আমায় দশটা টাকা দিবি। তোর কাছে এই শেষ ধার।'

'দ-শ টাকা?'

'হ্যাঁ রে, ওই ডাক্তারী পরীক্ষা করে যে বান্‌চোত তাকে কাল পাঁচটা টাকা চড়াব।'

'তোর মেডিক্যাল এক্‌জামিন হয় নি?'

'সময় উতরে গিয়েছিল। কাল হবে।... মাথার ওপর হাত তুলে পা ফাঁক করে নাচাবে, বুঝলি। নাচাক্, আমরা ত শালা নেচেই আছি।'

আঠাশ

ক.

এ-বাড়িতে যেন সদ্য একটি শোকের ঘটনা ঘটে গেছে. সমস্ত বাড়ি প্রায় নীরব। মনে হবে, ওপরতলা খাঁ খাঁ করছে, নীচের তলাও। উমারা চলে যাবার পর নীচের তলা নিঃসাড় লাগত, বাসু চলে যাবার পর সেই অসাড় ভাব সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে গেছে। নীচের তলায় সুচারু এসেছে, ওপর তলায় সেই নিত্যদিনের সংসারের ছবি পাঁচিলের তলায় ভাঙা টব, উঠোনের তারে মেলা শাড়ি, কাক চড়ুইয়ের যথারীতি উচ্ছিষ্ট অন্বেষণ সুধা আরতি রত্নময়ীকে দেখা যায় –তবু এ-বাড়ি আজ ভীষণ শূন্য লাগে। প্রত্যহের যে সাংসারিক জীবন এখানে স্পন্দিত হত, বাসু চলে যাবার পর সেই স্পন্দন এত ক্ষীণ, মনে হয়, সমস্ত বাড়িটা আজ নিষ্প্রাণ। এমন স্তব্ধ অসাড় আর কখনও মনে হয় নি বাড়িটাকে। বাসু যে এমন করে সংসারের মানুষগুলোকে বিমূঢ় অথর্ব করে দিয়ে যেতে পারে কে ভেবেছিল!

সুধা রত্নময়ীকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করেছে। নিজের মনে যার আশ্বাস নেই সে অন্যকে কতটুকু ভরসা দিতে পারে। সুধার সমস্ত স্তোকবাক্য এবং আশ্বাস অর্থহীন মনে হয়েছে। রত্নময়ী নীরবে শুনেছেন, মনে হয় না সেই-স্তোকবাক্যে নিরুদ্বিগ্নতা তাঁর কিছু কমেছে।

সুচারুও সান্ত্বনা দেবার, বোঝাবার চেষ্টা করেছে। রত্নময়ী অর্ধ-জ্ঞানে, নিষ্প্রাণ রক্তশূন্য মুখে ওদের আশ্বাস শুনেছেন। তিনি কোনো কথা বলেন নি। বলার কি বা ছিল! একা একা ঘরে বসে তিনি সর্বক্ষণ শত আশঙ্কা কল্পনা করেছেন, প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ যেন তাঁর বুক এবং কণ্ঠ চেপে ধরেছে, ভয়ঙ্কর শূন্য লেগেছে চারপাশ। তাঁর মনে হয়েছে, বাসু সারা জীবন মিথ্যে কথা বলেছে, ধোঁকা দিয়েছে, উনি বরাবর এতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কিন্তু আজ যদি বাসুর এই যুদ্ধে যাওয়ার কথাটা মিথ্যে হয়, ধোঁকা হয়, যদি

হঠাৎ সে ফিরে আসে বাড়িতে রত্নময়ী খুশী হবেন, শান্তি পাবেন। মনে মনে বাসুকে যেন তিনি কাতর হয়ে বলেছেন : হারামজাদা, তুই লক্ষটা মিথ্যে কথা বলেছিস, এটা তোর মিথ্যে বলতে কি দোষ ছিল !

আরতি নীরব। সে সকালে সংসারের কাজ করছে, যথা সময়ে চাকরিতে যাচ্ছে, সন্ধ্যেয় ফিরে আবার এই সংসারের খুচরো কাজ নিয়ে বসছে। রত্নময়ী এবং সুধার ধারণা, বাসু যে যুদ্ধে পালাচ্ছে আরতি নিশ্চয় জানত, কাউকে বলেনি। রত্নময়ীর এই সন্দেহ এখনও দূর হয় নি। মা তাকে এত অবিশ্বাস করছে দেখে আরতির খারাপ লাগে। সুধাকে আরতি বলেছে, 'যাবার আগের দিন দাদা আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি, দিদি ; আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি কিছু জানি না।...' মনে মনে আরতি ভেবেছে, এতকাল যার এ-বাড়িতে কোনো দাম ছিল না হঠাৎ তার এত দাম হয়ে গেল কি করে! আরতির ভাল লাগে নি বাসুর এই পালিয়ে যাওয়া।

চরম অস্বস্তি বোধ করছিল সুচারু। এ-বাড়িতে নীচের তলায় সে আসার পরের দিনই বাসু পালিয়েছে। ওপর তলার সংসারের এমন একটা বিশ্রী বেয়াড়া সময় তার উপস্থিতি তাকে সঙ্কুচিত করে তুলছিল। রত্নময়ী আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অর্ধ-মৃতের মতন পড়ে আছেন ; সুধা ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন, ভাইয়ের ওপর তার সুপ্ত মমতা আজ বোধ হয় স্পষ্ট করেই বোঝা যায়, যদিও সুধা তা প্রকাশ করতে চায় না। সুচারুর মনে হচ্ছিল, এই পরিবারের এমন এক অশান্তির মধ্যে সে অকস্মাৎ এসে পড়েছে যা তাকে এবং ওই পরিবারটাকে ভীষণ বিব্রত করছে। সুচারুর আসা উচিত হয় নি। কিন্তু সুধা বা সুচারু কেউ কি জানত এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

চার পাঁচটা দিন এই ভাবে কাটল, আঘাতের প্রাথমিক শোক সামলে নিতে, বজ্রাহত অবস্থা সয়ে আসতে। তারপর নিত্যদিনের সংসার তার খোঁড়া-ঘোড়ার রথ আবার যেন কায়ক্লেশে চালাতে শুরু করল। বাসুর

একটা চিঠি এল ছোট, রত্নময়ীকে লিখেছে। ভাবতে বারণ করেছে মাকে, লিখেছে তার চাকরিতে থাকা খাওয়া পরার খরচ নেই, সে বাহাত্তর টাকা মাইনে পাবে এখন। 'আমি মাইনে পেলে তোমায় টাকা পাঠাব।' সুধার খবর নিয়েছে শেষে। আরতি সম্পর্কে একটাও কথা নেই। সেই চিঠি একে একে সবাই পড়ল, রত্নময়ী সুধা আরতি। আরতি তার প্রতি এই নিষ্ঠুর উপেক্ষায় অভিমানে মুখ আরও কালো করেছে।

বাসুর চিঠির পর বাড়ির অবস্থা ঈষৎ স্বাভাবিক হয়ে এল। যে-রত্নময়ী গত কয়েকটা দিন মৃতের মতন পড়েছিলেন, অনাহার এবং অনিদ্রায় ক্ষয়িত রুগ্ন শরীরকে আরও রুগ্ন অসুস্থ করে তুলেছিলেন, সেই প্রথম দিন, বাসুর চিঠির পর, যেন জীবনের সাড় জানাতে পারলেন। তাঁকে আবার রান্নাঘরে পিঁড়ি টেনে বসতে দেখা গেল, আবার সেই কুলপাতার মতন এক কুচি পান মুখে দিলেন, রুক্ষ চুলে সামান্য তেল পড়ল, তাঁর গলার স্বর শোনা গেল।

শোকের ধর্ম বোধ হয় এই, এ যেমন এক থেকে অন্যকে সংক্রামিত করে তেমনি একজন মুক্ত হলে অন্য জনও ক্রমশ মুক্ত হয়ে আসে। রত্নময়ী শোক-মুক্ত হন নি, দমন করতে পেরেছিলেন। হয়ত বাসুর চিঠি থেকেই তিনি প্রথমে খানিকটা সত্যকার আশ্বাস পেলেন। সুধা অথবা সুচারুর আশ্বাস নিষ্ফল হয়েছিল, বাসুর চিঠি সান্ত্বনার মতন তাঁকে আবার মন বেঁধে নিতে সাহায্য করল। রত্নময়ীর ভূমিকা এখানে মূল ছিল বোধ হয়, কেন না তিনি জননী; তিনি নিজেকে দমন করেছেন দেখে সুধার উদ্বেগ দুর্ভাবনাও কেমন কমে আসতে লাগল। আরতি বোধ হয় সারা বাড়ি ভরে এই নির্জীব নিঃসাড় অবস্থাটা মেনে নিতে পারছিল না, মা এবং দিদির শোক আরোগ্য হয়ে আসছে দেখে সেও স্বস্তি পেল।

সে দিন সন্ধ্যেবেলায় মঙ্গলচণ্ডীতলায় পুজো দিয়ে এসে রত্নময়ীকে আরও একটু হালকা দেখাল। পুজোর রেকাবি থেকে আশীর্বাদী ফুলপাতা মেয়েদের মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন, মুখে এক টুকরো করে প্রসাদ ফেলে দিলেন আলগোছে, বললেন, 'গৌরের সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়। বলল, বাসুর চিঠি পেয়েছে।'

সুধা তাকাল মার দিকে, আরতি রান্না গুছোচ্ছিল। রান্নাঘরের চৌকাটে রত্নময়ী দাঁড়িয়ে।

'গৌর বলল, বাসুর চাকরি হাসপাতালের।' রত্নময়ী মেয়ের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে কথাটা বললেন যেন মনে হল তিনি সুধার কাছে জানতে চাইলেন, হাসপাতালের চাকরিতে আর কি ভয়, না কি রে!

'কোথায় আছে?' সুধা শুধলো।

'তা জানে না। আমি জিগগেস করলাম, বলতে পারল না। বললে, কাছাকাছি কোথাও।' রত্নময়ী বললেন।

সুধা অন্ধকারে মার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

পুজোর রেকাবিটা নিজের কপালে ছুঁইয়ে রত্নময়ী যেন কাকে প্রণাম জানালেন। 'গৌর বলছিল, বাসুদের নাকি নিয়ম, কোথায় থাকে লিখতে পারবে না।'

মাথা নাড়ল সুধা। হ্যাঁ, তারও তাই মনে হয়।

ঘরের দিকে যেতে যেতে রত্নময়ী দাঁড়ালেন। 'আমায় একটু চা দিবি রে?'

আজ এক হপ্তার মধ্যে রত্নময়ী মুখ ফুটে এই প্রথম কিছু চাইলেন। মার কণ্ঠস্বর সুধার কাছে কেন যেন অদ্ভুত শোনাল, মনে হল মা কেমন ছেলেমানুষের মতন বলল কথাটা। যেন সংসারে মা তাদের হাতে সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিজেই এখন প্রার্থী হয়ে গেছে।

'চা আছে রে আরতি?'

'আছে। সুচারুদার জন্য করেছিলাম।' সুচারুর জন্যে তৈরী চা পড়ে আছে। আরতি চা নিয়ে গিয়ে সুচারুকে পায় নি। কোথায় বেরিয়ে গেছে।

সুধা একতলার দিকে তাকাল। এখান থেকে নীচের তলা দেখা যায় না। সুচারু বিকেল বেলায় বাড়িতে ছিল, সন্ধ্যের মুখে কোথায় বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। ঘর খোলা রেখেই চলে গেছে।

মনে মনে সুধা একটু অসন্তুষ্ট হল। কোথাও যাবার আগে বলে গেলে কি কোনো দোষ হয়! সুচারুর স্বভাবই ওই, থাকে থাকে কোথায় যে বেরিয়ে

যায় বোঝার উপায় নেই। আসলে ওর মনে যেন কিসের এক অন্যমনস্কতা আছে, অস্থিরতা। আগে এ-স্বভাব ওর ছিল বলে সুধার মনে হয় না। এবারই যেন দেখছে।

আরতির চা ঢালা হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'দিদি, তুমি একটু তরকারিটা বসিয়ে দেবে, আমি মাকে চা পান দিয়ে আসছি।'

আরতি কলাইকরা বাটিতে চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে চলে গেল। সুধা চৌকাঠের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল।

আকাশ মেঘলা করে আছে। মাসটা আষাঢ়। কালও বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে। আজ সারাদিন মেঘলা করেছে বেশী, রোদ মাঝে মাঝে ফুটে উঠছিল, সে-রোদে তেমন প্রখরতা ছিল না। এখন অন্ধকারে আকাশে কতটা মেঘ হয়েছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মেঘ যে ঘন হয়েছে বোঝা যায়, কোথাও একটি তারা নেই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

মেঘাবৃত আকাশ এবং বৃষ্টির আশঙ্কায় সুধা সুচারুর জন্যে ঈষৎ উদ্বেগ বোধ করল।

সুধা রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে বসল। উনুনের আঁচে তার বড় কষ্ট হয়। সে রান্নাবান্না করে না, কদাচিত হয়ত চা করল, কিংবা কোনো কিছু নামিয়ে দিল। মা তাকে রান্নাঘরে আসতেও দেয় না। আজকাল অফিস টফিস নেই বলে সুধা মাকে রান্নার কাজে কিছু হালকা সাহায্য করে।

এই রান্নাটা আমিষ। মাছের তরকারি। সুচারুর জন্যেই। নয়ত তাদের সংসারে রাতে আমিষ আর কবে হয়!

মা এ ক'দিন সংসারের কিছুই দেখে নি। সুধাকে সব দেখতে হয়েছে। আরতিই রান্নাবান্না যা করার করেছে, কিন্তু তার চাকরি, সাত সকালেই বেরোতে হয় এক-রকম, ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও সুধাকে রান্নার কিছু না কিছু করতে হয়েছে। উপায় কি! বাড়িতে বাড়তি মানুষ এনেছে সে, এ দায় তার। সুচারুকে ঠিক তাদের মতন দুবেলা দুটো ডালভাত ফেলে দিয়ে রাখা যায় না। সুধা যদি তার যত্ন না নেবে তবে এনেছে কেন।

এ কদিন সংসারের যা অবস্থা গেল তাতে সুচারুর খাওয়া থাকার দিকে ভাল করে নজর করবে সুধার মনের অবস্থা তেমন ছিল না। নীচের ঘরদোর, সুধা ভেবেছিল, সুচারুর সুবিধে মতন সে সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবস্থা করে দেবে। এখন পর্যন্ত তা হয় নি। সুধা ভেবেছিল, সুচারুর খাওয়া দাওয়ার সুবিধে পছন্দ অপছন্দগুলো জেনে নেবে, তাও হয় নি। আরও কিছু কিছু ভেবেছিল সুধা, তার কোনোটাই হয় নি।

তরকারির কড়া চাপিয়ে দিল সুধা। উনুনের আঁচ মুখে লাগছিল। গায়ের চামড়া গরম হলেই জ্বালা করে, জ্বালা করলেই সুধার মনে হয় তার জ্বর এসেছে। জ্বরকে বড় ভয় সুধার।...পিঁড়িটা পিছিয়ে নিল।

সামান্য পরেই আরতি এল। রান্নাঘরের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিল, 'তুমি উঠে এস, আমি দেখছি।'

সুধা পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বাইরে এল। বাইরে বাতাস আরও ঠাণ্ডা হয়েছে, কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি নেমেছে। উনুনের আঁচে সুধার মুখ গলা ঈষৎ গরম, কপালে সামান্য ঘাম।

'দিদি—' আরতি তরকারি নাড়তে নাড়তে বলল, 'সুচারুদা রোজ সকালে বড় বেশী বেশী বাজার করে আনে। কে এসব খাবে, কে বা রাঁধবে। তুমি বারণ কর, জিনিস নষ্ট হয়।'

সুচারু সকালবেলা বাজারে যায়। ঝাঁকা মুটের মাথায় করে বাজার এনে দেয়। সুধা জানে, ঝাঁকা মুটেটা প্রয়োজন—কিন্তু এ-সংসারের ঠিক কতটুকু প্রয়োজন সে জানে না। তারও মনে হয়েছিল, সুচারু বাড়তি বাড়তি আনছে, নিজের থেকে সুচারুকে কিছু বলতে পারে নি সুধা। কেন পারে নি কে জানে! হয়ত, সুধা ভেবেছিল, সুচারুর স্বার্থ দেখতে গিয়ে সংসারের কাছে বিসদৃশ কিছু হয়ে পড়ে।

'তুই রান্না করিস, তুই বলতে পারিস না।' সুধা বলল।

রত্নময়ী বাইরে এসেছিলেন। দালানে দাঁড়িয়ে থাকলেন অল্পক্ষণ, পাঁচিলের দিকে গেলেন, কিছুক্ষণ কি দেখলেন, ফিরে এলেন।

'বৃষ্টি আসছে।' রত্নময়ী বললেন, বলে তারে মেলা শুকনো কাপড় তুলে নিতে লাগলেন।

একটু পরেই সুধা দু এক ফোঁটা বৃষ্টি তার গালে মুখে অনুভব করল। বাতাস বেশ ভেজা। মনে হল, আকাশে বিদ্যুৎ ঘন ঘন চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছিল। সুচারুর জন্যে সুধা আবার উদ্বেগ বোধ করল।

রত্নময়ী বারান্দা থেকে কি একটা কথা বললেন, সুধা বুঝতে পারল না।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল। দালানে শব্দ উঠল। জলের ফোঁটাগুলো বড়, বাতাস ছিল, প্রথম ঝাপটায় সুধার মুখ চুল সামান্য ভিজে গিয়েছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে সুধা হঠাৎ অনুভব করল, তার মুখ ঠাণ্ডা। উনুনের আঁচে বোধ হয় তার কপাল গাল একটু গরম হয়েছিল।

বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সুধার খেয়াল হল, একবার নীচে যাওয়া দরকার। সুচারুর ঘরের জানলা হয়ত খোলা পড়ে আছে, ঘর বিছানা ভিজছে। জলের ছাটটা কোন দিকে সুধা বোঝবার চেষ্টা করল, বুঝতে পারল না। দালান অন্ধকার। বারান্দায় সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে দালানের বাতি জ্বালবার চেষ্টা করল সুধা। বাতি জ্বলল না।

'কি দেখছিস—?' রত্নময়ী শুধোলেন। সুধা জানত না রত্নময়ী ঘরের বাইরে চৌকাঠের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন আবার।

'বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে।' সুধা বলল।

রত্নময়ী কিছু বললেন না। রান্নাঘর থেকে আরতি কি যেন বলল, তখন বৃষ্টির সঙ্গে মেঘ ডাকছিল বলে শোনা গেল না। অন্ধকারে সুধা হাত বাড়িয়ে দিল। জলের ছাট অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কি বোঝা যায়?...সুধা ঘরে গেল। বাসু চলে যাবার পর এই ঘরে আজ দু তিন দিন সুধা একলা থাকছে। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালল সুধা। জানলা দিয়ে ছাট আসছে জলের।

সুচারুর ঘর ভিজে যাচ্ছে।

বাইরে এসে সুধা বৃষ্টির মধ্যেই নীচে যাচ্ছিল। রত্নময়ী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। বৃষ্টির মধ্যে সুধাকে পা বাড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'নীচে। ঘরের জানলা বোধ হয় খোলা আছে।'

'সুচারু বাড়ি নেই ?'

'না।'

'কোথায় গেছে ?' রত্নময়ী শুধোলেন, অপেক্ষা করলেন সামান্য, বললেন, 'কেমন বেখেয়ালের ছেলে, বর্ষার দিন, বাইরে যাবার সময় ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে না !'

সুধা দাঁড়াল। তার এক পা বৃষ্টিতে, গায়ে জলের ছাট লাগছে। বারান্দা অন্ধকার, মার মুখ তরল ছায়ার মতন অস্পষ্ট; বোঝা যায়, দেখা যায় না। সুধার কেন যেন মনে হল কথাটার জবাব আছে। সুধা জবাবটা ভাবল : ওই রকমই মানুষ ও, বাইরে যাবার সময় ঘরের কথা ভাবে না।

কিছু বলল না সুধা, আঁচলের কাপড় মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে নীচে নেমে গেল।

রত্নময়ী দাঁড়িয়ে থাকলেন। আজ তাঁর মন খানিক ভাল লাগছিল। বাসুর জন্যে বাসুর বাবার কাছে অনেক বলেছেন। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে তিনি চোখ বুজে ঠাকুরের মূর্তি ভাবতে বসেছিলেন, ভাবতে পারেন নি, বার বার বাসুর বাবার মুখ মনে আসছিল। মনে হচ্ছিল, স্বামীর কাছে তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার আছে। একমাত্র পুত্রকে তিনি রত্নময়ীর হাতে রেখে গিয়েছিলেন, সেই ছেলেকে রত্নময়ী যেন নিজের হাতে শ্মশানে দিয়ে এসেছেন। স্বামীর কাছে এই অপরাধের ভারে তাঁর সমস্ত সত্তা গ্লানিতে দুঃখে ও যন্ত্রণায় নত হয়েছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি, তিনি তাঁদের বংশের শেষ প্রদীপটি নিবিয়ে দেবার জন্যে বাতাসে রেখে এলেন।

বাসুর বাবাকে মনে করার সময় রত্নময়ী সেই শান্ত স্মিত স্নেহময় মানুষটির কাছে ভূমিলগ্ন হয়ে মার্জনা চাইছিলেন; নিরুপায় হয়ে বলছিলেন, আমি কি করব বল ! আমি কি জানতাম ও এমনি করে চলে যাবে ? ..ও যে কেন গেছে আমি বুঝতে পারি। দু বেলা নিত্য আমাদের দুর্ব্যবহার পেয়েছে, গালাগাল খেয়েছে, এ-সংসারে যাকে উঠতে বসতে তেঁতো মুখ করেছি আমরা

সে আর কতকাল সহ্য করবে! ওর একটা চাকরি জুটছিল না। সমস্ত জগতটাই ওর শত্রু হয়ে ছিল। কত ছেলে কত কি কাজ পায়, ও কেন পায় না। সমস্ত দরজাই কি ওর মুখের ওপর বন্ধ হয়ে থাকবে? কেন? কোথায় ওর দোষ?

স্বামীর কাছে নিজের অপরাধের মার্জনা চাইতে গিয়ে রত্নময়ী দেখলেন, স্বামী নীরব। মনে হল না, তিনি রত্নময়ীকে দায়ী করেছেন বা অপ্রসন্ন হয়েছেন। বরং যেন শান্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, জানি, আমি সবই জানি, রত্ন। তোমার কোনো দোষ নেই। এই রকমই হবে, ছটফট করে আরও অশান্তি বাড়িয়ে কি লাভ! সহ্য করে যাও, সহ্য…

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছিল, অল্প অল্প ধোঁয়া, গুগগুলের আর ধুনোর, রত্নময়ী চোখের জল মুছে বিগ্রহের কাছে নিজের নিবেদন জানালেন।

পথে নেমে গৌরাঙ্গর সঙ্গে দেখা। কেন যেন তারপর তাঁর মন অনেকটা শান্ত আশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। হয়ত আর ফেরাবার কিছু নেই বলে, হয়ত বাসুর চাকরিটা তেমন ভয়ের কিছু নয় ভেবে, হয়ত বাসুর এই চলে যাওয়া অনেক গৌরবের ভেবে রত্নময়ী নিজেকে সংযত করে নিতে পারছিলেন। অথবা, এমনও হতে পারে, আজ স্বামীর স্মৃতি স্মরণের সময় যেন তিনি কোনো আশ্চর্য সান্ত্বনা পেয়েছেন।

সুধা নীচে থেকে ভিজতে ভিজতে ওপরে উঠে এল। মাথায় আঁচলের আড়াল। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ভিজে দালানে তার পা পিছলে গিয়েছিল, সামলে নিল কোনোরকমে। রত্নময়ী সচকিত হয়ে তাকালেন। বারান্দায় এসে সুধা মাথার ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে নিচ্ছে। ঘোমটার মতন এই আড়ালের তলায় সুধার অস্পষ্ট মুখ দেখে, কি যেন মনে হল রত্নময়ীর।

'ভিজলি?' রত্নময়ী বললেন।

'কাপড়টা ভিজেছে খানিক। যা বৃষ্টি!' সুধা বারান্দায় গামছা খুঁজছিল, মুখ হাত মুছবে।

'কাপড় বদলে নে; ভেজা জিনিস গায়ে রাখিস না।' রত্নময়ী মৃদু নরম স্বরে বললেন।

সুধা তার গামছা নিয়ে মুখ হাত মুছছিল। শাড়ির আঁচল পিঠ বেশ ভিজেছে। কাপড়টা বদলে নেওয়াই উচিত। সকালের শুকনো শাড়িটা পরে এটা ঘরে টাঙিয়ে দিলে এই ভেজাটুকু কাল ভোরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

মুখ হাত পা মুছে সুধা ঘরে ঢুকছিল, পিছনে রত্নময়ী।

বাসুর ঘর। এখনও তার কয়েকটা জিনিস পড়ে আছে। আলনাটা সেই ভাবে বেঁকা হয়ে ঝুলছে, বাসুর ছেঁড়া একটা শার্ট; উত্তরের দেওয়ালে বাসু মাটির মাছ পেরেকে গুঁজে রেখেছিল, মাছটা ধুলোয় ধূসর, তার ভাঙা তোরঙ্গটা পড়ে আছে, টিনের সুটকেসটা নেই।

সুধা দড়ির আলনা থেকে শাড়ি তুলে নিয়ে এক পাশে সরে শাড়ি বদলাচ্ছিল। রত্নময়ী বিছানার ওপর গিয়ে বসলেন। সুধার পিঠ তাঁর চোখে পড়ছে।

'তুই বড় কুঁজো হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন—' রত্নময়ী হঠাৎ বললেন। 'একটু পিঠ সোজা করে দাঁড়া।'

সুধা জবাব দিল না। কোমরে কাপড় জড়িয়ে কুঁচি গুঁজছিল পেটের কাছে, পিঠের তলা থেকে শাড়ির অংশ ঝুলে পড়ে আছে।

রত্নময়ী মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন, অন্যমনস্ক। বললেন, 'উমার কাকা অত করে বলে গেলেন, তা যা না ওঁদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে আয়। শরীরটা সেরে যাবে।'

সুধা পিঠের ওপর দিয়ে আঁচল তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভিজে কাপড় তুলে জানলার দিকে রাখল, পরে শুকোতে দেবে। 'কারও বাড়ি গিয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে না।' সুধা বলল, 'ওরা যতই ভাল হোক, আত্মীয়ের মতন হোক, আমার যাওয়া উচিত না।'

রত্নময়ী স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন। হয়ত উচিত নয়, কিন্তু শরীরটা যদি সারে তবে ক্ষতি কি যেতে! উমার কাকা অত করে বলে গেছেন। মানুষ

আজকের দিনে কটা সুখ সুবিধে সুযোগ পায়, এ নিতান্ত ভাগ্য বলেই যেন পাওয়া যাচ্ছে।

'ওখানে গিয়ে দু এক মাস থাকলে তোর শরীরটা সারত।' রত্নময়ী এমন গলায় বললেন যেন তিনি বিশ্বাস করে নিয়েছেন সুধার শরীর ওখানে সেরে উঠত।

সুধা জবাব দিল না। জানলা খুলে বৃষ্টির ছাট দেখছিল। এখন আর জল আসছে না। বৃষ্টি কমেছে খানিক, ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস আসছে।

'নিজের জন্যে এবার বাপু নিজেরাই ভাব।' রত্নময়ী নিশ্বাস ফেললেন, 'আমার সাতকাল তোমাদের কথা ভাবতে ভাবতে গেল। তোমার বাবা আমায় দিয়ে কম করিয়ে নিল না। আর পারি না। এবার আমায় ছেড়ে দাও!' রত্নময়ীর কণ্ঠস্বরে গভীর ক্লান্তি ও ক্লেশ। বড় অসহায় নিরুপায় দেখাচ্ছিল তাঁকে, মনে হচ্ছিল এই সংসার তাঁকে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করে করে আজ প্রায় সারহীন করে ফেলেছে।

সুধা মাকে দেখছিল। গায়ের রঙ নখের মতন সাদা হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গে শুধু হাড়, মুখের আদল এত শুকনো নিষ্প্রাণ যে মনে হয় দীর্ঘকাল মা কোনো ব্যাধিতে ভুগে ভুগে এখন মৃত্যুর পথ চেয়ে বসে আছে। মার মুখে বসন্তের দাগ ক'টি চামড়ার সঙ্গে কুঁচকে গেছে, চোখ দুটো এমন ঢুকে আছে যাকে অতীত বলে মনে হয়, যেন অনেকটা দূর থেকে মা তাদের দিকে চেয়ে আছে।...সুধা আজ খুব আচমকা মার এই শোষিত ক্লান্ত অবসন্ন রূপটি দেখতে পেল।

'তোর বাবা আমায় বলত, বয়স হলে সংসারের বাইরে এসে চৌকাটে দাঁড়িয়ো, সময় হলেই টপ্ করে বেরিয়ে আসতে পারবে; ভেতরে থাকলে দেখবে নানা বাধা—' বলতে বলতে রত্নময়ী উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন, পরে আবার বললেন, 'আর আমার ভাল লাগে না। যে চার দেওয়ালের ঘরের মধ্যে তোমাদের এনে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম সে-ঘর বড় হবে। হল না। দেওয়ালগুলো আরও ছোট হল, তোমরা বেড়ে উঠলে।...' রত্নময়ী স্তব্ধ হয়ে থাকলেন অল্পক্ষণ। বললেন, 'আমি তোমাদের কাউকে

বাঁচাতে পারিনি, পারবও না। নিজেরা যদি বাঁচতে পার বাঁচো।' সামান্য থেমে কী ভেবে আবার বললেন, 'তোমার বাবার কোথাও কলঙ্ক ছিল না। তাঁর মুখে চুন কালি না মাখিয়ে আর যা পার কর। আমার বলার নেই।' কথা শেষ করে স্থাণুর মতন বসে থাকলেন রত্নময়ী, তাঁর চোখের কোটর থেকে কয়েক বিন্দু জল কোঁচকানো গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামল। আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন তিনি।

খ.

স্বপ্ন দেখে সুধার ঘুম ভেঙে গেল। চোখের সামনে অন্ধকারে তখনও রত্নময়ীর মুখ ভাসছিল। মুদিতনেত্র, স্থির; সাদা সিঁথিটা খুব চওড়া, রুক্ষ চুল এলিয়ে রয়েছে, কপালের পাশে বসন্তের একটি দাগ। অন্ধকারে সামান্যক্ষণ এই ছবি পটের মতন টাঙানো থাকল, তারপর কে যেন সরিয়ে নিল ছবিটা। সুধা হয়ত স্বপ্নের মধ্যে কেঁদে উঠেছিল, স্বপ্ন টুটে গেলে, নিজের ঘর শয্যা এবং নিশ্বাস সম্পর্কে চেতনা হলে সুধা দুর্বল কাঁপা আঙুলের ডগায় তার চোখের পলক দেখল। না, সে কাঁদে নি। মা বেঁচে আছে। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুধা। খোলা জানলা দিয়ে বাদলা বাতাস ঘর ঠাণ্ডা করে রেখেছে। একটু শীত করছিল। বাইরে বৃষ্টি নেই, মেঘও ডাকছে না। মার মৃত মুখের স্বপ্ন সুধা কেন দেখল বুঝতে পারল না। হয়ত আজ মা সন্ধ্যেবেলায় যে-সব কথা বলছিল সেই কথারই জের। কে জানে, কেন।

বিছানায় পাশ ফিরল সুধা। এই ঘরে সে একা। একা ঘরে সুধা কোনোদিন শুতে পায় নি। বাসু চলে গিয়ে তাকে একটা পুরো ঘর দিয়ে গেছে। যেন ভয়ঙ্কর এক পরিহাস করেছে বাসু, বাড়ির মালিককে আর ক্ষোভ করতে দেয় নি, যথেষ্ট জায়গা দিয়ে গেছে।

এই ঘর পেয়েও সুধা কোনো স্বস্তি পাচ্ছে না। তার ভাল লাগছে না।

পাশের ঘরে মার কাছাকাছি শুয়েও যেমন হাঁপ লাগত, এই ঘরেও তেমন হাঁপ লাগছে। মনেই হয় না, কোনো তফাত হয়েছে।

আজ মা যা যা বলেছে সুধা সব মনে রেখেছে। ঘুমোবার আগে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন আবার সেই সব কথা মনে পড়ছিল। মার যে কি উদ্দেশ্য ছিল শেষের কথাগুলো বলার সময় সুধা ধরতে পেরেছিল। মা বলতে চাইছিল, সুধা যদি বাঁচতে চায় নিজের ভালমন্দ বেছে নিয়ে নিজেকে বাঁচাক। সেই বাঁচাটা শুধু যেন এ-বাড়ির সম্ভ্রমকে নষ্ট না করে।

এ-কথা বলার কারণ স্পষ্ট। সুচারুকে এ-বাড়িতে এভাবে আনা রত্নময়ীর পছন্দ হয় নি। মা কিছু বলে নি, বলার সাহস পায় নি হয়ত, কিন্তু সুধা বুঝতে পেরেছিল, তাদের অভাব দৈন্যের সংসারে একটা লোক টাকা দিয়ে দুবেলা খাবে এ যদি বা মা মেনে নেয়, তবু যে-ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের সামাজিক কোনো সম্পর্ক নেই সেই ছেলেকে মেয়ের মুখের সামনে পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে রাখতে মার বেধেছে। যে সম্পর্ক থাকলে সুচারুর সব কিছু দেখাশোনা করা সুধার পক্ষে উচিত হত, ন্যায় হত, কর্তব্য হত—সে-সম্পর্ক যখন নেই তখন সুচারুকে এভাবে একই বাড়ির মধ্যে এনে রাখা রত্নময়ীর চোখে বিসদৃশ লেগেছিল।

আজ সেই কথাটা মা এক রকম স্পষ্ট করে মন খুলে জানিয়ে দিল। সুধা যদি সুচারুকে নিয়েই বাঁচতে চায় বাঁচুক, মার কোনো আপত্তি নেই, তবে সে-বাঁচার ইতিহাসে যেন কলঙ্ক না থাকে।

মার ওপর সুধা আজ বিরূপ হল না, রাগ করল না। তার মনে হল না, মা কোনো অন্যায় কথা বলেছে। সুধা নিজেই বুঝতে পারে, তার বাঁচা এখন নিজের প্রশ্ন। এতদিন এই সংসার তাকে চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছে, তারা সুধাকে নিজের কথা ভাবতে দেয় নি, এখন—এতকাল পরে ছেড়ে দিয়েছে। তুলনা করা বড় নিষ্ঠুরের মতন হবে, তবু অনেকদিন ধরে একটা তুলনা ও ভাবছে। সুধা এই সংসারের নলকূপ ছিল, তাকে সবক্ষণ এরা ব্যবহার করেছে, জল তুলেছে। এখন কলটা খারাপ, বা যেখান থেকে জল টেনে আনছিল সুধা সেখানে জল নেই আর। বালি উঠছে। ওরা তাই

ছেড়ে দিয়েছে সুধাকে। না দিয়ে উপায় ছিল না, সুধার জীবনের শেকড় এখন বালিতে আটকে গেছে।

স্বার্থপর ইতর সংসারকে মনে মনে এতদিন বিরক্তি রাগ ক্ষোভ ও ঘৃণায় সুধা দুবেলা অনেক আঁচড়েছে, আজ আর তার সে আক্রোশ ও ঘৃণা হল না। হয়ত ঘৃণা করবে এমন মানুষ আর এ-সংসারে নেই। মার যে শোষিত নিঃস্ব অসহায় রূপ আজ সে দেখেছে তাতে মনে হয়েছে, মার নিঃস্বতাই কি কিছু কম! সমস্ত জীবনই মার ক্ষয়ের বৃত্তান্ত। কি পেয়েছে মা? জীবনের শেষ সিঁড়িতে পা দিয়েও আজ না সুখ না শান্তি! আর কাকে ঘৃণা করবে সুধা? বাসুকে? বাসুকে ঘৃণা করতে সুধা পারল না। কেন পারল না সেও এক আশ্চয। বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে, যুদ্ধের চাকরিতে ঢুকেছে বলেই কি? হয়ত। হয়ত, যে-ভাই সুধার কাছে অমানুষ পশু ইতর বর্বর বলে মনে হত, সেই ভাইকে সুধা এখন অনুভব করতে পারছে। এতকাল সে ভাইকে দেখেছে, ভাইয়ের হৃদয় বা মন অনুভব করার চেষ্টা করে নি। আজ বেদনায় ও দুঃখে, সহানুভূতি এবং উদ্বেগে সে ভাইয়ের হৃদয় অনুভব করতে পারছে। বা যে-আশ্চর্য পারিবারিক সম্পর্কে রক্তের বন্ধনে তারা কোনো অজ্ঞেয় গভীরে একে অন্যের সঙ্গে গ্রথিত, সুধা সেই গভীরতম বোধের স্পর্শ পাচ্ছিল। যাবার দু দিন আগে বাসু বড় আশ্চর্য ভাবে তার কাছে এসে একটা টাকা চেয়েছিল। টাকা সুধা দিয়েছিল, কিন্তু কেমন একটা শঙ্কা লেগেছিল। তাদের অনেক দিনের নীচ শত্রুতাকে ওই ভাবে যেন বাসু মুছে দেবার চেষ্টা করেছিল।...সুধা আর কিছু ভাবে না, শুধু ভয় হয়, এই যুদ্ধে যদি তার ভাই হারিয়ে যায়! সুধার কপাল ভাল না, কে বলতে পারে ফটিক দে লেনের একটি রুগ্ন মেয়ের কপালে ভগবান কি লিখে রেখেছেন! এই যুদ্ধ সুধার এক অবলম্বনকে অক্ষম অসহায় করে ফিরিয়ে দিয়েছে, হয়ত বাসুকে তাও দেবে না।...সুধা এই অমঙ্গল চিন্তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শাসন করে প্রার্থনা করল, বাসু নিরাপদে থাক, তার যেন কোনো অকল্যাণ না হয়।...এ-সংসারে অবশিষ্ট থাকে আরতি। সুধা ছোট বোনের ওপর রাগ বা ক্ষোভ অনুভব করল না। কারণ, সুধার ভূমিকা শেষ হয়ে গেলে, সুধা বাতিল হলে আরতি এসেছে। আরতি হয়ত

অনেকটা সুসময়ের মধ্যে এসেছে। তা হোক, তবু তার আসা স্বেচ্ছাকৃত," সংসারের মুখ চেয়ে। সুধা আজ ছোট বোনের জন্যে এই প্রার্থনা করতে পারে, আরতির-পরিণাম যেন সুধার মতন না হয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুধা তারপর অনেকক্ষণ ফাঁকা মনে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল, নিশ্বাস ফেলল, ঠোঁটে মাঝে মাঝে আঙুল বুলিয়ে নিজেরই চেতনার স্পর্শ নিল।

সুচারুকে এ-ভাবে চোখের সামনে রেখে দিয়ে সুধা কি বেঁচে থাকতে পারবে? নিজের মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করেছে সুধা আজ ক'মাস। এক সময় তার মনে হয়েছিল, সুচারু বড় অসময়ে এসেছে; সুধার আর এমন কি আছে যা দিয়ে সে ভরসা করবে, আশ্বাস পাবে। সেদিনও সুচারুকে সেই জোয়ারের স্বপ্নের কথা বলে সুধা বলেছিল, আমায় যখন হাসপাতালের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়েছে তখন তুমি এলে! আমার কেমন ভাগ্য!

সুচারু জবাব দেয় নি। স্বপ্নের কথাটা দু তিন বার শুনেছে সুচারু, কিন্তু কখনও কোনো কথা বলে নি, যেন বলতে ভয় পেয়েছে, বা কি বলবে বুঝে পায় নি।

সুচারুর মন সুধা এখন আর বুঝতে পারে না। এই নতুন সুচারুকে সুধা আজ পর্যন্ত পরিষ্কার করে জানতে পারল না। মানুষটা ওপরে এক রকম করে বেঁচে আছে, ভেতরে অন্য রকম। ওর স্নেহ সহানুভূতি ভালবাসা সবই অনুভব করা যায়, অথচ মনে হয়, এ-সবই সে অন্যের হয়ে দিচ্ছে, যেন তার প্রতি কোনো আদেশ আছে দেবার। সুচারুকে দেখে দেখে তার কথা শুনে সুধার মনে হয়েছে, মানুষটা অনেক একা, সে আলাদা হয়ে গেছে, অনেকের সঙ্গে পথ চললেও দলের বাইরে, পাশে পাশে নিজের মনে হাঁটছে। কেন? কেন সুচারু এভাবে আলাদা একা হয়ে আছে সুধা বুঝতে পারল না। দুঃখ, আঘাত? অঙ্গহানির লজ্জা? বীতরাগ? বৈরাগ্য? কি যে, সুধা জানে না।

কিন্তু এ-ভাবে সুধা তোমায় চোখের সামনে ধরে রেখে ত বাঁচবে না। তুমি আমায় একদিন বসিয়ে রেখে তোমার বীরত্ব দেখাবার জন্যে পালিয়ে

.য়ছিলে, দীর্ঘ দিন শুধু উদ্বেগ আর অশান্তির মধ্যে, নিরাশা হতাশায় নয়ে রেখেছিলে, আজ তুমি ফিরে এসে আবার কি কোনো অন্য জোয়ারের থা ভাবছ!

না। সুধা অন্ধকারে প্রথমে অস্ফুট, তারপর স্পষ্ট করে বলল, না। না, মি তোমায় আর ওই জোয়ারে লাফিয়ে পড়তে দেব না। তুমিও সাঁতার ন না। আমি জানি না বলে বসে থাকি, তুমি না জেনেও বোকার মতন াপ দাও।...তোমার এই ছেলেমানুষি কেন? কেন মেনে নাও না, আমরা সবাই এই সংসারের এই সময়ের জোয়ারে ভাসছি। নতুন করে জোয়ার দেখে তাতে লাফিয়ে পড়ে কি লাভ!

সুধা উঠল। জল তেষ্টা পেয়েছে খুব। একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে, জানলার দিকে অন্ধকার যেন কেউ খানিকটা নরম করে দিয়েছে, বাতাস ঠাণ্ডা।

বাতি জ্বালল সুধা, জল গড়িয়ে খেয়ে ঘরের দরজা খুলল। বৃষ্টি ধোওয়া রাতের বাতাস আলুথালু হয়ে ঘরে এসে সুধার শাড়ি অগোছালো করল, ঝাপটা হাওয়ায় প্রথম নিশ্বাস নিতে কেমন অসুবিধে বোধ করল সুধা। তারপর সয়ে গেল।

বাইরের দিকে তাকিয়ে সুধার মনে হল রাত ফুরিয়ে আসছে। বৃষ্টি নেই। বাতাস হু হু করে ভেসে যাচ্ছে দালানে। ঘরের মধ্যে ঢুকে বাতি নিবিয়ে দিল সুধা, ঘরের দরজা খোলা থাকল, দালানে এসে দাঁড়াল। আকাশ ঈষৎ পরিচ্ছন্ন। প্রত্যুষের খুব চিকণ ফরসা যেন অন্ধকারের গায়ে আঁশের ' ড়ন লেগেছে। একটা কাক ঘুম চোখে স্কুলবাড়ির গাছের মাথা থেকে বার দুই ডেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

দালানে সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুধা কলঘরে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে অন্ধকারে একবার সুচারুর ঘরের দিকে তাকাল। সিঁড়িগুলো বৃষ্টির জলে ধোওয়া, ঠাণ্ডা, পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা অনুভব করছিল সুধা। ভাল লাগছিল।

৭

সুচারু লক্ষ্য করছিল। সুধা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, পিঠ সামান্য কুঁজো, গায়ে ঘন করে আঁচল জড়ানো কপালে কানে অগুছোলো কিছু চুলের গুচ্ছ, ঘাড়ের তলায় ভাঙা খোপা, রোগা সামান্য দীর্ঘ গলা সাদা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। এত কৃশ করুণ, স্তব্ধ ও একান্ত দেখাচ্ছিল সুধাকে যে সুচারু বেদনার বোধে কেমন ম্রিয়মাণ হয়েছিল।

এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত ছুঁয়ে ঘড়ির কাঁটা সময়কে অতীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আজ বৃষ্টি নেই। মেঘ ডাকছে না। ঘরে সামান্য গরম। খোলা জানলা দিয়ে গলির বাতাস কখনো সখনো মুখ বাড়িয়ে এই দুই বিষণ্ণ প্রাণীকে দেখে যাচ্ছে।

সুচারু সিগারেটের টুকরো ফেলে দিল। অনেকক্ষণ সে কথা বলেছে। এখন ক্লান্ত লাগছিল। অত কথা দিয়ে সুধাকে কি বোঝাতে চেয়েছে সুচারুর আপাতত আর মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, সুধা হয়ত এত কথা শোনে নি, শুনলেও তার কাছে সুচারুর সমস্ত ক্ষোভ সম্পর্কহীন মনে হয়েছে বোধ হয়

'সুধা—' সুচারু ডাকল।

সুধা নীরব। মানুষ অচৈতন্যের চোখে যে-ভাবে তাকায়, না-বোধ না-আগ্রহ, সুধা সে-ভাবে তাকাল। ওর চোখের পল্লব বড় কালো দেখাচ্ছিল, রুগ্ন কাতর প্রাণীর কালিমা তার চোখে, শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণায় মুখ যেমন বিবর্ণ শুকনো দেখায় সুধার মুখ সেই রকম নিষ্প্রাণ অসুস্থ দেখাচ্ছিল। নাকের পাশে গালের হাড়ের তলায় ক্ষতের দাগের মতন ছায়ার দাগ।

'আমি হয়ত তোমায় আমার কথা ঠিক বোঝাতে পারলাম না।' সুচারু ইতস্তত করে মৃদু গলায় বলল, 'মুশকিল...। মানুষের যা যা মনে হয় তা যদি সব বোঝান যেত!'

সুধার চোখের পাতা কাঁপল না, সে নিশ্বাস ফেলল না, সুচারুর ক্ষোভ

শুনল। তারপর সামনে তাকাল, দেওয়ালের দিকে। আলনায় সুচারুর জামা ঝুলছে। জামা দেখতে দেখতে সুধার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। সুচারু সুধার কোলে জামাটা গচ্ছিত রেখে জোয়ারের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। এখন ফিরে এসে আবার কি সেই জামা মুঠোয় ধরিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চায়।

সে-দিন, সে-অবস্থা, সেই অপেক্ষা আমার আর নেই। সুধা মনে মনে ভাবছিল, শুধু মনের স্পর্শ আর স্মৃতি জড়িয়ে সুধা বাঁচতে পারবে না। আমি তোমার জামা কোলে করে বসে থাকতে পারব না আমি তোমার স্পর্শ সান্নিধ্য তোমার সুখ দুঃখ সমস্ত একমাত্র করে একান্ত নিজস্ব করে পেতে চাই। আমার রিক্ততা মানুষের, গাছ বা পাথরের নয়। যদি এই কামনা অপূর্ণ রাখায় তোমার স্বস্তি থাকে, তবে মিছিমিছি কেন আবার এখানে এসেছ? কেন?

'এ-ভাবে…' সুধা বলতে গিয়ে থামল, স্বর শ্লেষ্মায় জড়িয়ে আছে, কথা ফুটল না। গলা পরিষ্কার করে সুধা মৃদু গলায় আবার বলল, 'এ-ভাবে আমি বেঁচে থাকতে পারি না।'

সুচারুর যেন চোখে ধোঁয়া লাগছিল, সামান্য ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'তুমি স্পষ্ট করে যা বলার বলো। সুধা বিছানার পাশ থেকে সরে খুব ক্লান্তের মতন জানলার দিকে গেল। কপালে দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। 'তুমি যদি সব জিনিসেই তোমার কথা বড় করতে চাও আমি আর কি বোঝাব তোমায়!'

সুচারু কি তাই চেয়েছে? এই জগতের ধারণা তার যদি আজ বদলে গিয়ে থাকে, যদি মনে হয়ে থাকে জীবনের কোথাও শান্তি নেই, কেউ কাউকে আরোগ্য করতে পারে না, আমরা নিরাশার কূপে পতিত জন্তুর মতন বাস করছি, এবং এ-সংসারে আজ যে-হৃদয়বৃত্তি মহৎ বলে মনে হয়, কাল তার আসল মূল্য প্রকাশ পায়।

'আমার মনে কোনো শান্তি নেই, সুধা।' সুচারু হতাশ গলায় বলল।

'কার আছে?'

'জানি না। অনেকে শান্তির আশা করে অন্তত।'

'তুমিও করো।'

'পারি না।···নানা দিক থেকে আমি অক্ষম।'

'আমিও কি সক্ষম ?'

'তোমার ত ভরসা আছে, আশ্বাস আছে কোথাও।'

'আমার ভরসা তুমি! আশ্বাস আর কি, তুমি একদিন আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলে বলে বিশ্বাস করে বসেছিলাম।'

সুচারুর মনে কোনো তীক্ষ্ণ বেদনা তার বুকের তলায় ছুঁচের মতন ফুটে গেছে। কষ্ট হচ্ছিল তার, কপালের পাশ চোখের আঁচড়ে যেন জ্বালা করছে।

'বাইরে থেকে ময়লা এনে তুমি ঘরের মধ্যেটা ময়লা করছ।' সুধা আচমকা বলল। সুচারু কেমন যেন নতুন ভাবে কথাটা শুনল।

'আমি কি ইচ্ছে করে ময়লা এনেছি ?' সুচারু প্রতিবাদ করল।

'তুমি ভেবে দেখো এনেছ কি না!' সুধা এখন অনাবৃত সাহসে বলল, তার দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল, বলল 'তোমার বিশ্বাস নেই আশা নেই শান্তি নেই—এ-সব কথা আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ।'

'তোমায় ?' সুচারু বিস্মিত।

'তা ছাড়া কি! আমার এই বসে থাকার দাম কি, তুমি ফিরে এলেই বা কেন ?' সুধা আজ যেন তাদের সম্পর্কের একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া করে নিচ্ছে, সে এভাবে ধাঁধা সাজিয়ে বসে থেকে নিজেকে অহরহ ক্লিষ্ট করতে পারে না। সুচারুর যদি কোনো বিশ্বাস না থাকে তবে বলো সুধার ভালবাসায়ও তার বিশ্বাস নেই, নিজের ভালবাসা—তার ওপরও তবে তার আস্থা নেই! সুধার চোখ স্থির অপলক। সে সুচারুর উত্তরের অপেক্ষা করে থাকল।

সুচারু অস্বস্তি বোধ করছিল। সুধাকে অবিশ্বাস করার মতন মূঢ়তা তার নেই।

'তুমি শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে আছ।' সুধা বলল, 'বাইরে তাকিয়ে

থাকলে তোমার পাশে তোমার কাছাকাছি যারা তাদের দেখা যায় না।...
আমার দিকে তাকিয়ে বলো, ফিরে এসে আমায় তুমি খুঁজে পেয়েছ কি না?'

'পেয়েছি।' সুচারু তার সমস্ত বোধ অনুভূতি সত্তায় স্বীকার করল সে এই প্রকাণ্ড মড়কের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হতশ্রী আহত কাতর হয়েও ফিরে এসে সুধাকে খুঁজে পেয়েছে।

'পেয়েছি।' সুচারু আস্তে জবাব দিল।

'তবে?' সুধা ধাঁধা চায় না, সুধা অন্য কোথাও কি হচ্ছে তার দিকে তাকাতে রাজী নয়। অথচ এই 'তবে' খুব সাধারণ একটি প্রশ্নও নয়। যদি সুচারু সুধার প্রেম নিষ্ঠা একাগ্রতা সততা বিশ্বাস করে নিয়ে থাকে তবে—সুধার দিকে তাকিয়ে সে কেন সংসারে বিশ্বাস পাবে না, কেন আশা পাবে না? তুমি বাইরে থেকে ময়লা কুড়িয়ে এনেছ বলে সংসারের সব কিছু ময়লা হয়ে যাবে!'

সুচারু বুঝতে পারছিল সুধা সামান্য কথায় সাধারণ গলায় এমন এক সত্য ও সৎ কথা বলছে যা তার পক্ষে উপেক্ষা করা মুশকিল।

'তুমি যদি শুধু তোমার কষ্টের কথা ভাব—' সুধা জানলা থেকে সরে এল, এ-পাশ ঘেঁষে আলনার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'নিজের কষ্টের কথাই যদি ভাব আমার বলার কিছু নেই। আমি জানতাম, আমার কষ্টের কথাও তুমি ভাববে।'

কথাটা এত রিক্ত সর্বহৃত মানুষের হাহাকারের মতন শোনাল যে সুচারু তার এবং সুধার মধ্যে এক মৌন প্রগাঢ় আত্মীয়তা অনুভব করতে পারছিল, অথচ সে আত্মীয়তা সুচারু নিষ্ঠুরের মতন উপেক্ষা করে যাচ্ছে।

'আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে চাইছ—' সুচারু আড়ষ্ট ক্লান্ত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার সামর্থ্য কোথায়?'

'নেই?'

'না। আমার শরীর ক্ষত, মন অসুস্থ।...আমার ভবিষ্যত নেই। বেঁচে আছি ওই যা, এ-বাঁচায় শান্তি নেই।'

'আমার বাঁচা কি কিছু আলাদা—' সুধা গাঢ় গলায় আস্তে আস্তে বলল,

'তুমি জান আমি কোন অসুখে ভুগছি। এর কোনো কিছু বলা যায় না। কে বলতে পারে কবে কি হবে। তবু আমি আরোগ্যের আশা করি, তুমি না এলে হয়ত করতাম না। ...আমার মনও কি খুব সুস্থ?'

'তা হলে?'

'কি!'

'এই অনিশ্চয়ের মধ্যে তুমি কেন শান্তির আশা করছ?'

'জানি না। হয়ত মানুষ জীবনে শান্তির আশা করে—।' সুধা চোখের পাতা ফেলল, কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল, বলল, 'আমার কি মনে হয় জান?'

'কি?'

'আমাদের এই সময়টাই বোধ হয় এই রকম। সবাই ভাঙা, সকলেরই সমান অবস্থা, টুকরো-টাকরা হয়ে আমরা আছি, নিটোল পুতুল কেউ নই। হয়ত তাই দুই অন্ধ দুই খোঁড়া মিলে থাকতে হবে আমাদের।'

'না থাকলে?'

'আরও দুঃখ।...তোমায় যদি আমি আজ আমার কষ্ট অভাব অসামর্থ্য দিয়ে না বুঝি, তুমি আমায় না বোঝ, আর কে বুঝবে!'

সুচারু স্তব্ধ। শ্বাস বন্ধ করে যেন কথাগুলো শুনছিল সুধার। সুধা কি ঠিক বলেছে?

আজকের ক্ষয়িত, অক্ষম, আংশিক, এই অপূর্ণ মানুষের দিকে সুচারু যেন তাকিয়ে থাকল। সুধাকে সেখানে দেখা যায়। সুচারুকেও। ভাঙা মূর্তির মতন পাশাপাশি রাখা রয়েছে।

সুধা বোধ হয় খুব ক্লান্ত হয়েছিল, বিছানার পাশে এসে পায়ের দিকে বসল। তার এই মূর্তি এখন ভাঙা প্রতিমার মতন মনে হচ্ছিল। সুচারু শোক পরিতাপ বেদনা ও দ্বিধা অনুভব করছিল।

বসে থেকে থেকে আচ্ছন্ন গলায় সুধা এক সময় বলল, 'একটা কথা বলি তোমায়। আমার খুব একটা মোহ আর কিছুতেই নেই, কদিন বাঁচব তার

ঠিক কি। কিন্তু মায়া আছে। বাঁচার ইচ্ছেও। মরে না যাওয়া পর্যন্ত ত বাঁচতে হবে।'

স্থচারু নিস্পন্দ নিশ্চল হয়ে বসেছিল। বুকের কাছটায় ঠাণ্ডা। হয়ত জমেছে। কখনও এই শীতল স্পর্শ সুধার হাতের স্পর্শের মতন লাগছিল। যেন সুধা তার রক্তাল্প দুর্বল কম্পিত হাত তার বুকে রাখছে, যে-হৃদয় অজ্ঞেয় অদৃশ্য অথচ যা সত্য তা অনুভব করার চেষ্টা করছে। স্থচারু অনুভব করতে পেরেছিল, বাইরের সড়ক একমাত্র বস্তু নয়, ঘরের এই নিভৃত রক্ষিত মায়া প্রেম নিষ্ঠা ও বস্তুতা এর কোনো মূল্য আছে। যদি না থাকত তবে স্থচারু প্রাণ বেঁধে কিসের অন্বেষণে ফিরে এসেছে।

সুধার সেই ভাঙা প্রতিমার মতন মূর্তির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ স্থচারু অনুভব করল, সুধার কাছে স্থচারু যেন জীবনের কয়েকটি মূল্যবান বস্তু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, সে অনর্থক এখানে ফিরে আসে নি, তার গচ্ছিত সম্পদ গ্রহণ করতে ফিরে এসেছে। এই ভগ্ন জীর্ণ ক্ষতবিক্ষত সিন্দুকের তলায় স্থচারুর সেই বিশ্বাস-করে রেখে-যাওয়া বস্তুগুলো রক্ষিত আছে।

বৃহৎ জগত তাকে শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছিল, এই ক্ষুদ্র চার দেওয়ালের হাত যেন তাকে অকস্মাৎ আজ সেই শূন্যতাকেও সহনীয় করে তুলল।

স্থচারু আজ আবার হলুদ ম্লান আলোটা দেখতে পেল। মনে হল, সুধা এই মুহূর্তে ওই আলোটা আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ সময় এই ঘর নিঃশব্দ শান্ত থাকল। যেন দুই ভগ্ন মূর্তি পরস্পরের মধ্যে তাদের গভীরতম যোগসূত্র অনুভব করছিল।

সমাপ্ত